অলৌকিক নয়, লৌকিক

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবীর ঘোষ

অলৌকিক নয়, লৌকিক

দ্বিতীয় খণ্ড

দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

অলৌকিক নয়, লৌকিক প্রথম খণ্ড

পিংকি ও অলৌকিক বাবা

বিশ্ব কুইজ

যাঁদের সৌজন্যে আলোকচিত্র পেয়েছি–

তাপসকুমাব দেব
কুমাব বায
সৌগত রায বর্মন
গোপাল দেবনাথ
জ্যোতিপ্রকাশ খান
সজল মুখার্জি
বিকাশ চক্রবর্তী
অসীম হালদাব
ও
আজকাল

ভূমিকা

বিজ্ঞান লেখক মাত্রেই বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজমনস্ক নন। এঁরা অনেকেই তাগা-তাবিজ ধারণ করেন, কুসংস্কারের কাছে ব্যক্তি জীবনে নতজানু হয়েও লেখনিতে হাজির করেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠিন-কঠোর শব্দবাজী। বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজমনস্কতা, শুধুমাত্র কলমের ডগায় বা জিভের আগায় কথার ফুলঝুড়ি জ্বেলে অর্জন করা যায় না, এটা বেঁচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাস ও ভাত-রুটির মতই জীবনের প্রতিমুহূর্তের কাজ-কর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়ার ব্যাপার। প্রবীর ঘোষ লেখনিতে, কথায় ও জীবনচর্যায় একাত্ম এক বিরল ব্যক্তিত্ব, জীবন্ত কিংবদন্তী। সুদীর্ঘ বছর নিজেকে মগ্ন রেখেছেন সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজমনস্ক করে গড়ে তোলার কাজে। সুকঠিন এই কাজকে বাস্তবায়িত করতে একই সঙ্গে তুলে নিয়েছেন কলম, ছুটে যাচ্ছেন গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে, বক্তব্য রাখছেন, হাতে-কলমে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, গড়ে তুলছেন আন্দোলন, মুখোমুখি হচ্ছেন চ্যালেঞ্জের, প্রলোভনের এবং অবশ্যই মৃত্যুর। যে দেশে সাংসদ বিক্রি হয় গরু-ছাগলের মতই, যে দেশের শাসকদল নির্বাচনের খরচ চালাতে, দলের সম্পত্তি বাড়াতে প্রতিনিয়ত শোষকদের কাছে বিক্রি হয়, যে দেশের শাসক দলের চুনো মস্তানরাও চাকরী-ব্যবসা না করেই গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে যায়, সে দেশেরই একজন প্রবীর ঘোষ একটা প্রবন্ধ না লেখার জন্য পনের লক্ষ টাকার প্রস্তাব পেয়েও পরম অবহেলায় ও ঔদাসিন্যের সঙ্গে প্রস্তাবের মাথায় পদাঘাত করেন। বিনিময়ে মেনে নেন জীবনের ঝুঁকি। তাঁর এই নির্লোভ সাহসিকতা বহুজনকে অবশ্যই

প্রেবণা দিযেছে এবং দেবে। বহুব মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে এবং তুলবে জীবনেব মূল্যবোধ।

প্রবীব ঘোষেব 'অলৌকিক নয, লৌকিক' বইটিব দ্বিতীয খণ্ড প্রকাশিত হলো এমন এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন ধর্মেব উন্মাদনা ও সম্প্রদাযগত উন্মাদনা দেশেব শ্রমজীবী মানুষদেব সংগ্রামী প্রতিবাদী চেতনাকে বিশাল অজগবেব মতোই একটু একটু কবে গ্রাস কবে চলেছে। আমবা একবিংশ শতাব্দীতে যখন পা দিতে চলেছি তখন শাসকশ্রেণী তাদেব একান্ত স্বার্থে আমাদেব চেতনাকে ফিবিযে নিযে চলেছে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে। জাত-পাতেব নামে, ধর্মেব নামে লডতে নেমেছে নিপীডিত মানুষদেব বিকদ্ধে নিপীডিত মানুষবা। বঞ্চিত, নিবন্ন এই মানুষগুলোকে 'মুবগী লডাই'তে নামিযেছে শাসক ও শোষণ শ্রেণী এবং তাদেব কৃপায পালিতেবা। ভাবাবেগে অথবা নিপুণ কৌশলী প্রচাবেব ব্যাপকতায যুক্তি আমাদেব গুলিযে যায। আমরা বিস্মৃত হই—যে কোনও ধর্মেব, যে কোনও জাতেব, যে কোনও ভাষাভাষী কালোবাজাবি এবং শোষণকাবী সাধাবণ মানুষেব শত্রু এবং শোষক, আব যে কোনও ধর্মেব, যে কোনও জাতেব, যে কোনও ভাষাভাষী গবীব শ্রমিক-কৃষক গবীবই এবং শোষিত। শোষিত, নির্যাতিত মানুষেব নিজেদেব মধ্যে ধর্ম নিযে ভাষা নিযে, জাত-পাত নিযে অনৈক্য সংঘর্ষ শোষক শ্রেণীব সুবিধেই কবে। তাই শোষক শ্রেণী প্রযোজনে বাব বাব শোষিত শ্রেণীব মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কবতে ধর্ম-ভিত্তিক, ভাষা-ভিত্তিক, জাত-পাত ভিত্তিক উত্তেজনা ও উন্মাদনাব সৃষ্টি কবে। সংবক্ষণবাদেব তকমা এঁটে যাঁবা নিপীডিত জনগণেব মুক্তিব কথা বলেন, তাঁবা বিভেদকামী, মিথ্যাচাবী, ধান্দাবাজ ও শোষকশ্রেণীব দালাল ছাডা কিছু নয। নিপীডিত শ্রমিক-কৃষকেব মুক্তি সংবক্ষণেব হাত ধবে কোনও দেশে কখনও আসেনি, আসতে পাবে না। বর্তমানে এদেশে সাম্প্রদাযিকতাব যে বিপুল উত্থান ঘটেছে, তাব কাবণ, সাম্প্রদাযিকতাবাদ ধর্মকে অবলম্বন কবে এমনই এক বাজনৈতিক দর্শন, যে দর্শন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কাবেব ওপব ভিত্তি কবে দাঁডিযে বযেছে। এই দর্শনকে পুষ্টি যোগাচ্ছে শোষক শ্রেণীব প্রতিনিধি বিভিন্ন বাজনৈতিক দল। এই কঠিন সমযে একান্তভাবে প্রযোজন এক দীর্ঘস্থাযী সুপবিকল্পিত মতাদর্শগত সংগ্রামেব। আব তাবই প্রযোজনে একান্ত কাম্য সাধাবণেব চেতনাকে এগিযে নিযে যাওযা, কুসংস্কাব মুক্ত, সমাজ সচেতন নতুন এক সাংস্কৃতিক পবিবেশ তৈবি কবা। এমনই এক প্রযোজনেব কথা মনে বেখেই বিজ্ঞান আন্দোলনেব নেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রবীব ঘোষ সংস্কাবমুক্ত নতুন সমাজ গডতে লেখনি তুলে নিযেছেন। ধর্মান্ধতা বিবোধী, সাম্প্রদাযিকতা বিবোধী এবং সংস্কাব মুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা গ্রহণকবীদেব কাছে এই বইটি অবশ্যই একটি জোবালো হাতিযাব হিসেবে গণ্য হবে।

গ্রন্থটিব লেখক প্রবীব ঘোষ—'ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'ব প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সম্পাদক, যে প্রতিষ্ঠান কুসংস্কাব মুক্তিব আন্দোলনে সন্দেহাতীত ভাবে সঠিক, বলিষ্ঠ ও আন্তবিক ভূমিকা গ্রহণ কবে চলেছে। 'অলৌকিক নয, লৌকিক' বইটিব নামকবণেব মধ্যেই বযেছে বিষয বস্তুব নির্দেশ। বস্তুত অলৌকিকতাব প্রশ্নটি তিনি সমাজ, সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, বাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক

থেকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর জ্ঞানের স্বচ্ছ আলোকে আমাদের আলোকিত করতে চেয়েছেন। আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যাপক কাজ হয়নি বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না।

গ্রন্থে আটটি অধ্যায়। অধ্যায় শুরুর আগে রয়েছে লেখকের 'যুক্তিবাদী প্রসঙ্গ' লেখা 'কিছু কথা'। 'কিছু কথা'য় রয়েছে যুক্তিবাদ নিয়ে বহু যুক্তির অবতারণার পাশাপাশি আমাদের দেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা। এসেছে মুখোশধারী বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা, বস্তুবাদী রাজনৈতিক নেতা ও বিজ্ঞান সংস্থার কথা। উচ্চারিত হয়েছে বিজ্ঞান আন্দোলনের স্বার্থে এদের চিহ্নিত করা এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার কথা। কারণ এইসব মুখোশধারীরা চিরকালই আমাদের পরিচিত শত্রুদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ভয়াবহ। পাশাপাশি বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের দিশা দেওয়া হয়েছে কী ভাবে তাঁরা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলে প্রত্যেকে এক একজন সংগঠক, যোদ্ধা হয়ে উঠবেন, কী ভাবে মানুষদের সাথে নিয়ে এগুবেন।

পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে এসেছে ভূতে ভর, ডাইনির ভর, ঈশ্বরে ভরের নানা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এবং সে-সব আলোচনায় উদাহরণের সূত্র ধরে বহু অসাধারণ আকর্ষণীয় সত্যি ঘটনা—যার অনেকগুলিই কাল্পনিক অ্যাডভেঞ্চারকেও টেক্কা মারার ক্ষমতা রাখে। এসেছে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার রোমাঞ্চকর বহু কাহিনী। এ-সব কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা অনেকেই আক্ষরিক অর্থেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভূত খ্যাতির অধিকারী। এঁদের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা প্রবীর ঘোষের আগে অনেকেই করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ চেষ্টাকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু ব্যক্তি ও সংবাদমাধ্যম। প্রবীর ঘোষের নিররচ্ছিন্ন জয় আমাদের মত সম-মতাবলম্বীদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখায়, লড়াই করার শক্তি যোগায়, যখন-শোষক শ্রেণী আমাদের বিরুদ্ধে তিনটে ফ্রন্ট খুলে যুদ্ধ চালিয়ে যায় (এক অবতার ও জ্যোতিষী, দুই মুখোশধারী আন্দোলনকারী, তিন 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের আড়ালে থেকে প্রচার-মাধ্যমকে ও গণ-মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে গণ-ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে আমাদের কাছ থেকে জনগণকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।) তখন অনেক সময়ই আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান দেখে নৈরাশ্যপীড়িত হই, ভুলে যাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে, আর তাইতেই সামনের দীর্ঘস্থায়ী লড়াইকে বড় বেশি ভারী মনে হয়। এই সময় বড় বেশি প্রয়োজন স্বপ্ন দেখানোর। এই স্বপ্নই আন্দোলনকারীদের উদ্বুদ্ধ করবে জনগণকে সংগঠিত করতে। প্রবীর ঘোষের ধারাবাহিক সাফল্য আমাদের স্বপ্ন দেখায়।

গ্রন্থটিতে ডাইনী সমস্যার আলোচনার পাশাপাশি এসেছে তার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়। আলোচনায় এসেছে তুক্-তাক, ঝাড়-ফুঁক, বাটি চালান, কঞ্চি-চালান, থালা-পড়া, কুলো-পড়া, চাল-পড়ার মত নানা বিষয় ও তার গোপন রহস্য। বিস্ময়কর শিশু-প্রতিভা তৈরি করা যায়, বাড়ানো যায় স্মৃতি—এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এসে পড়েছে মানুষের ওপর প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক

পরিবেশের প্রভাব প্রসঙ্গ। আলোচনার এই অংশে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী এবং পাঠক-পাঠিকাদের ধন্যবাদ কুড়োবেন—এই প্রত্যাশা রাখি। এই অংশে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বহু বিস্ময়কর শিশু ও কিশোর প্রতিভার। বোঝাতে চেয়েছেন, এদের প্রতিভা বিকাশের কার্য-কারণ সম্পর্কে, প্রমাণ করতে চেয়েছেন এরা কেউই অলৌকিকতার প্রতীক নয়।

অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষায় লেখক বিচরণ করেছেন আটটি অধ্যায়ে, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষা কখনই সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বাধার পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায়নি।

প্রবীর ঘোষ দেশের মানুষকে জানতে, তাদের মনস্তত্ত্বকে জানতে, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজনীতি, রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞানকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করতে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে যে সাহায্য পেয়েছেন, তার চেয়ে বহুগুণ তিনি অর্জন করেছেন অধ্যয়ন করে, যাযাবরের মত ঘুরে, মানুষের সঙ্গে আপনজনের মত মিশে। ফলশ্রুতিতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতিয়ার নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি—যুক্তিবাদীদের 'গাইড, ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ফিলোজফার'।

আতুর মথুস্বামী

প্রেসিডেন্ট
ইরাডিকেশন অফ হোয়াইট শাড়ি
উইডো রি-হেবিলিটেশন মুভমেন্ট
পেট্রোন
সাইন্স অ্যাণ্ড র‍্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া
আত্তুর টাউন
তামিলনাড়ু



কিছু কথা

যুক্তিবাদ প্রসঙ্গে

যুক্তিবাদী আন্দোলনেব প্রথম কথা, প্রথম সর্ত—আমবা সব কিছুকেই যুক্তি দিযে বিচাব কবব, শুধুমাত্র তাবপবই গ্রহণ কবব বা বাতিল কবব। আমবা লক্ষ্য বাখব—আমাদেব যুক্তি যেন শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠিস্বার্থ দ্বাবা পবিচালিত না হয। তেমনটি হলে আমবা যুক্তিব পবিবর্তে গলাব জোব ও পেশীবলেব উপবই একটু বেশি বকম নির্ভবশীল হযে পডব।

কিছু সন্ধিক্ষণ আসে যখন মানুষ যুক্তিব চেযে আবেগকে মূল্য দেয বেশি। সেই সময একটি মানুষ কোন্ যুক্তিকে গ্রহণ কববে এবং কোন্ যুক্তিকে বর্জন কববে—এই বিচাবেব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তাব কবে ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা, গোষ্ঠিস্বার্থ ইত্যাদি। এই আবেগকে কাজে লাগিযেই শোষিত মানুষদেব মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস ও ঘৃণাব বীজ বপনে পবিকল্পিতভাবে সচেষ্ট থাকে শাসক ও শোষক শ্রেণী। এই পবিকল্পনা শোষিতদেব উন্মাদনাব নেশায ভুলিযে বাখাব স্বার্থে, শোষকদেব অস্তিত্ব বক্ষাব স্বার্থে। আব তাইতেই জন্ম নেয বামজন্মভূমি বাববি মসজিদ সমস্যা, চাকবি ক্ষেত্রে সংবক্ষণ সমস্যাব মত সমস্যাগুলো। শোষক নিজ স্বার্থেই চায সাধাবণ মানুষ যুক্তিব দ্বাবা নয, আবেগেব দ্বাবাই পবিচালিত হোক।

**শোষক শ্রেণী কখনই
চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের
চেতনাকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে, বেশি দূর পর্যন্ত
এগিয়ে নিয়ে যেতে।**

এর বাইরেও আমরা ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠিস্বার্থে অনেক সময় হৃদয়াবেগে আপ্লুত হয়ে যুক্তিছাড়া যুক্তিকে অর্থাৎ কুযুক্তিকে সমর্থন করি। যখন আমি একজন বাসকর্মী, তখন অপর কোনও বাসকর্মীর প্রতি যে কোনও কারণে আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই—তা সে আইন ভাঙার জন্যে পুলিশ আইন সম্মত ব্যবস্থা নিলেও। যখন আমি ছাত্র, তখন আমারই সহপাঠী বিনা টিকিটে, ট্রেনে কলেজে আসার সময় গ্রেপ্তার হলেও রেলকর্মীদের হাত থেকে বন্ধুকে মুক্ত করতে স্টেশনে হামলা চালাই। আমি কখনও প্রতিবেশীর মৃত্যুতে ডাক্তারের দায়িত্বহীনতার দাবী তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়ি। আমিই আবার হাসপাতাল-কর্মী হিসেবে ওই আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার দাবীতে হাসপাতালের কাজকর্মকে অচল করে দিই। এই ব্যক্তি স্বার্থে বা গোষ্ঠি স্বার্থে পরিচালিত হয়ে কখনও আমরা বাঙালী, কখন বিহারী, কখনও অসমী, কখনও অন্য কিছু। কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও বা অন্যধর্মী। কখনও শুধুমাত্র ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়ার অপরাধে, ভিন্ন ধর্মীয় হওয়ার অপরাধে, ভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাস পোষণ করায় একে অপরের জীবনধারণের অধিকার কেড়ে নিতেও দ্বিধা করি না। যুক্তিহীন আবেগই আমাকে হত্যাকারী, অত্যাচারী করে তোলে, কুযুক্তির দাস করে তোলে।

মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব অতি প্রবল। আমরা পরিবেশগতভাবে সাম্প্রদায়িক হয়েছি, প্রাদেশিক হয়েছি। যুক্তির পরিবর্তে শুধুমাত্র কুযুক্তির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি। সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদের ইতিহাস পড়ে সাম্প্রদায়িক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছি। 'হিন্দু' ঐতিহাসিকরা 'হিন্দু' রাজাদের রাজাংশ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধকে স্বদেশ প্রেমের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভুলে থাকতে চেয়েছি—দেশ শুধুমাত্র একটা ভূ-খণ্ড নিয়ে নয়, ভূ-খণ্ডের মানুষদের নিয়ে। কোনও দেশের উন্নতির অর্থ সেই দেশের অধিবাসীদের উন্নতি। স্বদেশ প্রেম বলতে, দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির প্রতি প্রেম। এই অর্থে রাজাদের দেশপ্রেমের সামান্যতম হদিশ মেলে কী?

সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের যুদ্ধকে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুদ্ধ বলে প্রচার করতে চাইলেও বাস্তব সত্য কিন্তু আদৌ তা নয়। আকবরের পক্ষে হিন্দু রাজপুত সেনার সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। সেনাপতি মান সিংহও ছিলেন রাজপুত। অপর পক্ষে রাণা প্রতাপের বাহিনীতে ছিল বিশাল সংখ্যায় পাঠান সৈন্য। সেনাপতি ছিলেন হাকিম খাঁ। এ-ছাড়া তাজ খাঁর নেতৃত্বেও ছিল আর এক পাঠান বাহিনী। অতএব দুই রাজার এই লড়াই কোনও সময়ই মুসলমান ও হিন্দুদের যুদ্ধ ছিল না। ছিল দুই রাজার মধ্যকার স্বার্থের লড়াই।

রাণা প্রতাপের
রাজ্য ফিরে পাওয়ার
চেষ্টাকে স্বদেশ প্রেম বলার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও
কারণই থাকতে পারে না। নিজ স্বার্থে লড়াই স্বদেশ

প্রেমের নিদর্শন হলে, আকবর কেন স্বদেশ প্রেমিক হবেন না ?



একই ভাবে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর লড়াইও ছিল এক বাদশাহ এবং এক রাজার স্বার্থের দ্বন্দ্ব মাত্র ।

ইতিহাসেব নিবিখে ভাবতেব মধ্যযুগেব দিকে একটু চোখ ফেবান যাক । তুর্কি সেনাব বিরুদ্ধে বাজপুত প্রভুদেব লডাই শুধুই দু-দলেব সেনাবাহিনীবই লডাই ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রেই । কোথাও তুর্কি সেনাদেব বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবোধ গডে ওঠেনি । ভোগসর্বস্ব হিন্দু বাজাদেব জন্য লডাই কবাব কোনও প্রেরণাই প্রজাবা অনুভব কবেনি । এই কঠিন সত্যকে হিন্দু ইতিহাস বচযিতাবা 'হিন্দু' স্বার্থেই দেখতে চাননি । তাঁবা দেখাতে চাননি—মুঘল যুগে মুঘল বা মুসলমান প্রজাবাও ছিল চূডান্ত ভাবে শোষিত দাবিদ্র্যতায জর্জবিত ।

'হিন্দু' ঐতিহাসিকবা যেভাবে তুর্কিদেব বহিবাগত বলে বর্ণনা কবেছেন, আগ্রাসকেব ভূমিকায় বসিযেছেন সেভাবে তো তাঁবা বর্বব আর্য উপজাতিদেব চিত্রিত কবেন নি ? তুর্কিদেব চেযে তো আর্যবা কোন অংশেই কম বহিবাগত বা কম বিধর্মী ছিল না । কযেক সহস্রক আগে তাবাও তো তুর্কি ভূখণ্ড থেকেই ভাবতে প্রবেশ কবেছিল। আর্যবা ভাবতীয হতে পাবলে তুর্কিবা কেন ভাবতীয বলে পবিচিত হবে না ? প্রাক্-আর্য জাতি পবাজিত হযেছিল বলেই তাদেবকে অনার্য-রূপে এমনভাবে ঐতিহাসিকবা চিত্রিত কবেছেন যে, বর্তমানে 'অনার্য' শব্দটি 'অসভ্য'-ব প্রতিশব্দ হযে দাঁডিযেছে । অথচ মহেঞ্জোদডো, হবপ্পা ও নর্মদা উপত্যকাব প্রাক্ আর্য যুগেব যে নিদর্শন পেযেছি তা ঐতিহাসিকদেব মিথ্যাচাবিতাবই প্রমাণ । তাদেব গৃহনির্মাণ প্রণালী, নগববিন্যাস, বযন, অঙ্কন, লিখন, ভাস্কর্য প্রতিটিই ছিল অতি উন্নত পর্যাযেব । আর্যবা প্রাক্ আর্য মানুষদেব কাছ থেকে এইসব বহু বিষযে শিক্ষা গ্রহণ কবেছিল এ কথা চূডান্তভাবেই সত্য । আর্য সভ্যতাব কোনও নিদর্শন না পাওযায অনুমান কবতে অসুবিধে হয না, আর্য সভ্যতা ছিল গ্রামীণ । তাই প্রাত্নিক উপকবণ খুঁজে পাওযা সম্ভব হযনি ।

আর্যরাই ভারতে প্রথম সভ্যতার আলো এনেছে, এ কথা যেমন মিথ্যা । একইভাবে মিথ্যা ভারতের বর্তমান সভ্য জাতিগোষ্ঠিগুলো সবই আর্যদের থেকেই সৃষ্ট । এই চিন্তাই আমাদের আর্যজাতির বংশধর হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছে প্রাক-

আর্য জাতিকে অনার্য, অসভ্য হিসেবে চিত্রিত করতে ।

আমাদেব দেশেব 'হিন্দু' জাতীযতাবোধ পবিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সুলতান মামুদ এবং ঔবঙ্গজেবেব মন্দিব ধ্বংসকে 'হিন্দু' বিদ্বেষেব এবং হিন্দুত্বেব অপমানেব প্রমাণ হিসেবে হাজিব কবেছে। একই সঙ্গে ষষ্ঠ শতকে হর্ষেব একেব পব এক হিন্দু মন্দিব লুণ্ঠনেব ঘটনা বিষযে নীবব থেকেছে। হর্ষ তো মন্দিব লুণ্ঠনেব জন্য 'দেবোৎপাটননাযক' নামে এক শ্রেণীব বাজকর্মচাবীবাই নিযোগ কবেছিলেন। মন্দিব লুণ্ঠনেব জন্য যদি মামুদ ও ঔবঙ্গজেব হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত হন, তবে হর্ষ একই কাজেব জন্য কেন হিন্দু বিদ্বেষী হিসেব চিত্রিত হবেন না ?

হর্ষেব মন্দিব লুণ্ঠন প্রসঙ্গে আমাব এক ইতিহাসেব অধ্যাপক বন্ধু জানিযেছিলেন, "আমাদেব আলোচনা কবা উচিত শুধুমাত্র যুক্তিব উপব নির্ভব কবে নয, বাস্তব অবস্থাব বিশ্লেষণ কবে। সে যুগে মন্দিব শুধু দেবোপাসনাব স্থল ছিল না, মন্দিবেব গুপ্ত কক্ষে সঞ্চিত থাকত ভক্তদেব দান ও শ্রেষ্ঠীদেব বত্নবাশি। অর্থ ও বত্ন বাজ্য শাসনে অপবিহার্য। বাজ্য শাসনেব স্বার্থেই বত্ন আহবণেব জন্য হর্ষ মন্দিবে হাত দিতে বাধ্য হযেছিলেন।"

এই যুক্তিই মামুদ বা ঔবঙ্গজেবেব ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হবে না ? গোটা হিন্দু যুগব্যাপী বীব-শৈব ও লিঙ্গাযেৎ সম্প্রদাযগুলো যে নিষ্ঠুবতাব সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিব মঠ পুঁথি ধ্বংস কবে গেছেন, আমাদেব দেশেব ইতিহাসেব বইগুলো সে বিষযে নীবব কেন ?

হিন্দুদেব জোব কবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবাব জন্য মুঘল যুগেব শাসকদেব 'হিন্দু' ঐতিহাসিকবা যতই তাঁদেব লেখনিতে অভিযুক্ত করুন, বাস্তবক্ষেত্রে কোনও মুঘল সম্রাটই কিন্তু গণ-ধর্মান্তবেব চেষ্টায নিজেদেব নিযোজিত কবেন নি। এমনকি ঔবঙ্গজেবও নন। সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে বাজধর্মে দীক্ষিত কবা নিন্দনীযই যদি হয, তবে নিন্দাব প্লাবনে ভাসিযে দেওযা উচিত সম্রাট অশোককে। নিজ ধর্মে দীক্ষিত কবতে তিনি কী না কবেছেন ? তবু তিনি মহান। তিনি ধর্মাশোক। তিনি শান্তি ও অহিংসাব প্রতীক।

সাম্প্রদাযিক ঐতিহাসিকবা এমন ইতিহাসই বচনা কবেছেন, যা পড়ে মনে হওযাটা স্বাভাবিক ভাবতেব সমস্ত কিছু গৌববেব কৃতিত্ব হিন্দুদেব, যা কিছু অগৌববেব তাব সমস্ত কিছুব দাযই মুসলমানদেব। দেশেব এই শিক্ষা পবিবেশেব মধ্যে মানুষ হযে সাধাবণভাবে মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদাযেব প্রতি বিদ্বেষই পোষণ কবেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায বৈষম্যমূলক আচবণ পেযে সংখ্যাগুরু সম্প্রদাযেব প্রতি সন্দেহই পোষণ কবছে। ফলে একই দেশে বাস কবেও সংখ্যাগুরুদেব অবিশ্বাস ও পক্ষপাত সংখ্যালঘুদেব ভাবতকে আপন দেশ ভাবাব সুযোগ দিচ্ছে না। ববং ভ্রাতৃঘাতী বক্তক্ষযেব মধ্য দিযে মৌলবাদী পবিবেশই আবও বেশি কবে জাঁকিযে বসছে।

ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠী স্বার্থে যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই পুষ্ট করেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষের বীজ কৈশোরেই ইতিহাস পাঠকদের মাথায় বপন করা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, রক্তপাত, লুণ্ঠন, হত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করেই চলেছে।

যুক্তিবাদীদেব কাছে কোন্ যুক্তি গ্রহণীয় হবে ? নিশ্চযই এমন কোনও যুক্তি গ্রহণীয় হবে না যা সাম্প্রদাযিক, শুধুমাত্র গোষ্ঠিস্বার্থে চূডান্ত মিথ্যাচাবিতা। যুক্তিবাদীবা পবীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানেব সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছোয। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও গোষ্ঠি স্বার্থকে সমর্থনেব প্রশ্নই যদি বিশাল বড হয়ে ওঠে, তবে আমবা দ্বিধাহীনভাবে শোষিতদেব স্বার্থকেই নিজস্বার্থ জ্ঞান কবব। কাবণ, যুক্তিবাদীবা মানবিকতাব বিকাশকামী, যুক্তিবাদীবা দেশপ্রেমী। যুক্তিবাদীদেব ধাবণায ‘দেশ’ বলতে মাটি নয, দেশে বলতে ভূখণ্ডেব মানুষগুলো। ভূখণ্ডেব সংখ্যাগুক মানুষদেব প্রতি অকৃত্রিম প্রেমই দেশপ্রেম। আমবা চাই সাধাবণ মানুষেব মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতা গডে তুলতে। যাব পবিণতিতে তাঁবা যুক্তি দিযে বিচাব কবে শুধুমাত্র তাবপবই কোনও কিছুকে গ্রহণ কববেন অথবা বর্জন করবেন। যুক্তিবাদী চিন্তাই তাঁদেবকে বুঝিযে দেবে তাঁদেব প্রতিটি বঞ্চনাব কাবণ সমাজ ব্যবস্থাব মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই মুহূর্তে প্লেটোব একটা কথা বড বেশি মনে পডছে।

প্লেটো বলেছিলেন, “মহান মিথ্যে ছাড়া রাষ্ট্র চালান যায় না।” এই ‘মহান মিথ্যে’ দিয়েই শোষিত মানুষগুলোর প্রতিবাদের কণ্ঠ, বিপ্লবের ইচ্ছে, একত্রিত সংগ্রামের প্রয়াসকে প্রতিহত করার চেষ্টা চলেছে ধারাবাহিকভাবে।

এককালে ‘ঈশ্ববতত্ত্ব’ মহান মিথ্যে হিসেবে যতখানি কার্যক্রব ভূমিকা নিযেছিল এখন আর ততখানি জোরাল ভূমিকা পালন কবতে পাবছে না। অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলির বাষ্ট্রশক্তিব কাছে ঈশ্ববেব জীবন্ত প্রতীক হিসেবে অবতাবদেব হাজিব কবাব

প্রয়োজনীয়তা তাই অনেক কমেছে। রাষ্ট্র শক্তি এখন বিজ্ঞান বিরোধিতা করতে বিজ্ঞানীদের উপরই বেশি করে নির্ভর করছে। এসেছে প্যারাসাইকোলজিস্টের দল, যাঁরা বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে দিয়ে বিজ্ঞানেরই বিরোধিতা করতে চায়। উদ্দেশ্য—বিজ্ঞান মনস্কতার ছোঁয়া থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখা।

সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি ঘোষণা করেছে, তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়ে কুলাগিনা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ইতিমধ্যে কুলাগিনাকে নিয়ে ফিল্ম তোলা হয়েছে। নিজের দেশে এবং বিদেশে দূরদর্শনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের সামনে কুলাগিনাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবেই হাজির করা হয়েছে। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় কুলাগিনা সম্পর্কে বিজ্ঞান-আকাদেমির সিদ্ধান্তের কথা অতি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হওয়ায় ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের অলৌকিক বিরোধী বক্তব্যের ক্ষেত্রে বহু মানুষের মধ্যেই যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের যুক্তি রুশ সাইন্স আকাদেমি কি আর মিথ্যে বলেছে? ওঁদের কাছে আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান আন্দোলনকারীরা তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ি না। ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্রকাশিত 'যুব সমীক্ষা'য় কুলাগিনাকে নিয়ে একটি বহু ছবি সহ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনেও বিজ্ঞান আকাদেমির পরীক্ষা গ্রহণ ও সিদ্ধান্তের কথা লেখা ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে 'যুব সমীক্ষা'কে এই প্রসঙ্গে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি আমাদের সমিতির কর্মপদ্ধতি। জানিয়েছি, আমাদের সমিতির একটি দল কুলাগিনার অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। এও জানিয়েছি, কুলাগিনার ঘটানো তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা লৌকিক উপায়েই আমি ঘটাতে সক্ষম। শেষ পংক্তিতে ছিল—আপনাদের তরফ থেকে সহযোগিতা না পেলে ধরে নিতে বাধ্য হবো—আপনারা সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং একই সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কালো দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। দূতাবাস আমাদের চিঠি পেয়েছে ফেব্রুয়ারি '৯০-এ। এখনও পর্যন্ত কোনও রকমের সাড়া না পেয়ে আমাদের মনে সেই সন্দেহটাই গভীরতা পাচ্ছে—সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতে বিজ্ঞানকেই কাজে লাগিয়েছে।

এই ধরনের উদাহরণ দেওয়া যায় ভূরি ভূরি। শুধু সোভিয়েত দেশেই নয়, পৃথিবী বহু দেশের রাষ্ট্রশক্তিই বিজ্ঞান মনস্কতা থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখতে বিজ্ঞানীদেরই কাজে লাগাচ্ছেন, প্যারাসাইকোলজি বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে গবেষণাকে নানাভাবে উৎসাহিত করছেন। আমাদের দেশও এর বাইরে নয়।

যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে বহু ধরনের প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে সেই সব রাষ্ট্রশক্তি, যারা সাধারণ মানুষের চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভয় পায়, যারা জানে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগতাড়িত মানুষগুলোকে 'মহান মিথ্যে'র সাহায্যে অবহেলে শাসনে রাখা যাবে, শোষণ করা যাবে। পরিণতিতে 'যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি'কে কাজে লাগাতে রাষ্ট্র যন্ত্রকে সচেষ্ট হতে দেখছি।

এখন রাষ্ট্র শক্তিগুলি টিকে থাকার পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে। যুক্তির বিরুদ্ধে বিপরীত যুক্তির আক্রমণ চালিয়ে সরাসরি লড়াইতে নামার চেয়ে যুক্তি নির্ভর কোনও আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে আপাতদৃষ্টিতে সমধর্মী যুক্তি নির্ভর সাজান আন্দোলনকে গতিশীল করাকে অনেক বেশি কার্যকর মনে করছে।

তাবই প্রকাশ ধাবাবাহিকভাবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্দোলনেব ক্ষেত্রেই আমবা দেখতে পাচ্ছি। ইউবোপে নিউক্লিযাব পাওযাব স্টেশনেব বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হযেছিল, সেই আন্দোলন থেকে সাধাবণ মানুষকে সবিযে দিতে 'যুক্তিব বিরুদ্ধে যুক্তি'কে কাজে লাগিযে আমেবিকা ও বাশিযা যুক্তভাবে প্রচাবে নেমেছিল নিউক্লিযাব বোমেব বিরুদ্ধে।

ভাবতবর্ষে অসমান বিকাশেব ফলে কোনও অঞ্চলে পুবোহিত তন্ত্র প্রবল বিক্রমে বিবাজ কবছে, কোথাও পবাবিদ্যা সে জায়গা দখল কবতে হাজিব কবেছে কম্পিউটাব জ্যোতিষ, আস্ট্রোপামিস্ট, বিজ্ঞান সম্মতভাবে জ্যোতিষ চর্চাব নানা প্রকবণ, আবাব কোথাও যুক্তিবাদেব সম্প্রসাবণ ঠেকাতে মুখোসধাবী যুক্তিবাদীদেব পথে নামিযেছে। আমাদেব দেশেব বাষ্ট্রশক্তি মহান মিথ্যে হিসেবে এ সবেব সঙ্গে আসবে নামিযেছে লটাবি, জুযা, টেলিভিশন স্ক্রিনে বামাযণ, মহাভাবত, নানা ধর্মীয অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন যুগে 'মহান মিথ্যে' পাল্টায়, যুক্তিবাদ কখনই একটা স্তরে থাকতে পারে না। প্রতিটি স্তরের যুক্তিবাদের পাশাপাশি 'মহান মিথ্যে' পাল্টায়, পাল্টায় কুসংস্কার।

আমাদেব দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু কবতেই কোনও কোনও বিদেশী বাষ্ট্রশক্তি এবং আমাদেব দেশেব বাষ্ট্রশক্তি অতি মাত্রায সচেতন হযে উঠেছে। বাষ্ট্র শক্তিব কাছে এ এক বিপদ সংকেত। কুসংস্কাব ও জাতপাতেব বিশ্বাস যতদিন শোষিত মানুষগুলোব চিন্তাকে আচ্ছন্ন কবে বাখবে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যাযেব দিকে এগোতে পাববে না। শোষিত একটি গোষ্ঠীব বিরুদ্ধে আব একটি গোষ্ঠীব অবিশ্বাস ও ঘৃণাকে যতদিন বজায বাখা যাবে, ততদিন তাদেব মধ্যে শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পাবে না।

শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেলে কুসংস্কার, জাতপাতের মত বিষয়গুলো দূরে সরে যায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী চেতনাই হিন্দু মুসলমানদের একসঙ্গে লড়াইতে নামিয়ে ছিল। মাও সে তুং এর 'হোনান' রিপোর্টেও দেখি শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষকেরা নিজেরাই বাড়ির ও 'থানের' অধিষ্ঠিত কাঠের দেবমূর্তিগুলিকে অপ্রয়োজনীয় এবং কুসংস্কার প্রসূত জ্ঞান করে চ্যালা কাঠ করে জ্বালানী বানিয়েছিল।

আমাদের দেশে 'যুক্তিবাদ' এখন আন্দোলন গড়ার স্তরে। প্রতিরোধে স্বার্থান্বেষী মহল অতি সচেতন। 'যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। মেকি আন্দোলন সৃষ্টি করতে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা, রাষ্ট্রশক্তি। বিদেশী সাহায্যে বা রাষ্ট্র যন্ত্রের সহযোগিতায় শুরু হয়ে গেছে তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলন।

জনগণের মধ্যে যুক্তিবাদী চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একান্তভাবেই প্রয়োজন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার। এরজন্য প্রয়োজন অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ না পাওয়া তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মধ্যে হাজির হয়ে তাদেরই সঙ্গে আপনজনের মত মিশে-গিয়ে কুসংস্কার ও তার মূল কারণগুলো বিষয়ে সচেতন করা। প্রয়োজনে তাদের সামনে হাতে-কলমে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়গুলো হাজির করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই নিরক্ষর। আমাদের লেখা তাদের মধ্যে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজ সচেতন মানুষরা নিজেদের তৈরি করে নিয়ে তাদের কাছে আহরিত জ্ঞান বিতরণ করলে তবেই সাধারণ বঞ্চিত মানুষদের চেতনার বিকাশ সম্ভব, যুক্তিবাদী চিন্তাকে জনগণের আন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এর জন্য চাই বহু সমাজ সচেতন কর্মী। কিছু কিছু মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে যতটুকু কাজ করছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল।

আমাদের সমিতি বহু সহযোগী ও সম-মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাহায্যে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে যাচ্ছে, মানুষের মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, সক্ষমও হচ্ছে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি কৃষক-শ্রমিক ঘরের নিরন্ন ছেলে-মেয়েরা কী অসাধারণ দক্ষতায় প্রাণঢালা আন্তরিকতায় মানুষের ঘুম ভাঙাতে গান বেঁধেছে, গাইছে, নাটক করছে, আলোচনাচক্রে অন্যদের বোঝাচ্ছে, হাতে কলমে ঘটিয়ে দেখাচ্ছে অনেক বাবাজী-মাতাজীদের বুজরুকি। সাধারণ মানুষদের দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—যে-কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা তারা দেবে। গ্রহণ করবে যে কোনও অবতার বা জ্যোতিষীদের চ্যালেঞ্জ। এদের প্রত্যেকটি আশ্বাস ও চ্যালেঞ্জকে মূল্য দিতে, রক্ষা করতে আমি ও আমাদের সমিতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা প্রয়োজনে প্রতিটি সহযোগী সংস্থার এই জাতীয় দায়-দায়িত্ব অতি আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করে থাকি। পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও সম-মনোভাবাপন্ন মানুষদের নিয়ে স্টাডি ক্লাসের ব্যবস্থা করি, নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানকে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও স্বচ্ছ করতে।

শুধু সহযোগী সংস্থার ক্ষেত্রেই নয়, যে ব্যক্তি বা সংস্থা আমাদের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করেছেন, তাঁরাও যখনই কোনও অলৌকিক বিষয়ক ব্যাখ্যা চেয়েছেন অথবা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন—আমরা সহযোগিতা করেছি।

আমরা জানি, তবুও আমরা অনেকেরই দাবি মেটাতে পারছি না, অনেকেরই বিশাল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছি না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে যখনি কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়, সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসতে থাকে উৎসাহী, জিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছ থেকে। তাঁরা চান পত্র-পত্রিকাগুলোয় এই বিষয়ে আমার বা আমাদের মতামত যেন জানাই। বিশেষ করে যখন কোনও পত্র-পত্রিকায় আমাকে বা আমাদের সমিতিকে আক্রমণ চালিয়ে বা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই আমার এবং আমাদের সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল সর্বশ্রেণীর মানুষ প্রত্যাশার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোন—আমি নিশ্চয়ই কিছু উত্তর দেব। সহৃদয় উৎসাহী পাঠক এবং বিজ্ঞানকর্মী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীরা আমার এবং আমাদের সমিতির উত্তরের প্রত্যাশায় পত্র-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য রাখেন। উত্তর প্রকাশের প্রত্যাশিত সময় পার হয়ে গেলে নিরাশ, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল মানুষগুলো আমাকে চিঠিও দেন। নীরবতার কারণ জানতে চান। জানি, চিঠি দেন না এমন আশাহত মানুষের সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি। বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে এই নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয়। মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তরে যা জানাই, এখানেও সমস্ত সহানুভূতিশীল শ্রদ্ধেয় প্রতিটি জিজ্ঞাসু পাঠকদের, মানুষদের তাই জানাচ্ছি।

অতি স্পষ্ট ভাবেই জানাতে চাই, আমি জেনেছি, শুনেছি অথবা পড়েছি অথচ উত্তর দিইনি, এমন ঘটনা একটিও ঘটেনি। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সেগুলো প্রকাশ না করে ধারাবাহিকভাবে আশ্চর্যজনক নীরবতা পালন করে চলেছেন।

এমনকি এমন ঘটনাও
বহুবার ঘটেছে, আমাদের বিরুদ্ধে
চ্যালেঞ্জ জানানো চিঠি যে পত্রিকা
প্রকাশ করেছেন, তাঁরাই কিন্তু
এই বিষয়ে আমাদের উত্তর
প্রকাশ করার সামান্যতম
নৈতিক দায়িত্বটুকুও
পালন করেননি।

সত্যতা বিচার করার সামান্যতম চেষ্টা না করে মিথ্যে খবর প্রকাশ করার প্রবণতা বহু পত্র-পত্রিকাতেই বিপদ্‌জনক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতাকে রোধ করার

দায়িত্ব কিন্তু প্রতিটি সমাজ সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের, শুধুমাত্র আমাদের নয়।

আমরা যখন এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষিত নিরন্ন মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংস্কৃতি ও চেতনাকে তুলে আনতে চেষ্টা করছি, সমাজ সচেতন করে তুলতে চাইছি, ঠিক তখনই আমাদের সামনে এলো বিদেশী সাহায্যের প্রলোভন। আমাদের স্পষ্টতই মনে হয়েছিল, সাহায্য পাওয়ার বিনিময়ে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে যুক্তিবাদী আন্দোলনের মৃত্যুবাণ। বিদেশী সংস্থারা যেমন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে, যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিকে নিয়োজিত করতে সাহায্যের ঝুলি হাতে ব্যক্তি ও সংস্থাকে ধরতে বেরিয়ে পড়েছে, তেমনই কিছু সংস্থার কর্ণধার ও কিছু ব্যক্তি বিদেশী সাহায্য শিকার করতে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে। আমরা যে আমেরিকান সংস্থার সাহায্য ঠেলে দিয়েছি অবহেলে পরম ঘৃণায়, সে সাহায্য নিয়েই স্বগর্বে নিজেদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে চলেছে এক স্বঘোষিত যুক্তিবাদী সমাজসচেতন পত্রিকাগোষ্ঠি ও তাদের গুরু—বিদেশী প্রেমে আনন্দমুখর মহান যুক্তিবাদী নেতা। এই পত্রিকাগোষ্ঠি সোচ্চারে ঘোষণা করেন, জেমস র‍্যাণ্ডি, মার্ক প্লামার ও তাঁদের ভারতীয় এজেন্টদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে বিপ্লব আনবেন। আমেরিকা থেকে যাঁরা বিপ্লব আমদানীর কথা বুক ঠুকে ঘোষণা করেন, তাঁরা এক নিশ্বাসে আরও দুটি কথা ঘোষণা করে থাকেন—অবতার ও জ্যোতিষী বিরোধী ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জ 'মহান' এবং প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ 'অশোভন'। বিচিত্র এঁদের 'মহান' যুক্তি। এঁদের এই স্ববিরোধিতা ও যুক্তিহীনতার পিছনে দুটি বিষয় কাজ করতে পারে। এক তীব্র ঈর্ষাকাতরতা। দুই বিদেশী সাহায্যকারীরা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগতে যে যোগ্য ও অপরিহার্য মানুষদেরই বেছে নিয়েছেন, এই বিষয়ে তারা যে সর্বোত্তম, এমনটা প্রমাণ করতে গিয়ে উচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়িয়েছে। এমনও হতে পারে, দুটো কারণই কাজ করেছে।

এই মেকী আন্দোলনকারীরা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার আয়াসসাধ্য ব্যাপার-স্যাপারে আগ্রহী নন। ওঁরা নিরাপদ দূরত্বে বসে মহানগর থেকে পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিজেদের পক্ষে হাওয়া তুলতে আগ্রহী। ওঁদের কাছে 'আন্দোলন', 'সংগঠন' ইত্যাদি শব্দগুলো বড় বেশি স্বার্থ-বিরোধী। তাই মূল যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে, একজনকে কিংবদন্তী পুরুষ করে তুলতে প্রতিনিয়ত ব্যাপক ও নিবিড় প্রচার চালিয়েই যান। যাঁর পক্ষে এই প্রচার তিনি কিন্তু একদিনের জন্যেও সমাজ সচেতনতার প্রতি পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে উচ্চারণ করেননি—ঈশ্বর, অবতার, জ্যোতিষী, অলৌকিক, জন্মান্তর, কর্মফল ইত্যাদির প্রতি সাধারণ মানুষের, শোষিত মানুষের প্রবল অন্ধ-বিশ্বাসের কারণগুলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, পালিত হচ্ছে, পুষ্ট হচ্ছে শোষকশ্রেণী ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীদের স্বার্থে। শোষক শ্রেণী চায় শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী না করে দায়ী করুক নিজেদের ভাগ্যকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে এবং ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়াকে।

ওই কিংবদন্তীর নায়কও যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার আয়াসসাধ্য ব্যাপার-স্যাপারে

আগ্রহী ছিলেন না। নিজের প্রয়াসকে নিয়োজিত রেখেছিলেন শুধুমাত্র বাবাজী-মাতাজীদের চ্যালেঞ্জ জানানোর মধ্যেই।

সাধারণ মানুষরা ওই অসাধারণ বিজ্ঞান পত্রিকা গোষ্ঠির চোখে কেমন ?—তারই একটা উদাহরণ পেশ করছি। '৮৯-তে উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রামে সাত-আটটি বিজ্ঞান সংস্থা মিলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন, শিরোনাম ছিল 'বিজ্ঞান আন্দোলন কী ? ও কেন ?' আমন্ত্রিত ছিলেন এই পত্রিকা গোষ্ঠি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং আমাদের সমিতি। পত্রিকাগোষ্ঠিকে বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানাতে পর্যায়ক্রমে উঠলেন এক ডাক্তার ও এক ডক্টরেট। তাঁরা দর্শকদের বললেন—'বিজ্ঞান আন্দোলন কী ? ও কেন ?' ও-সব নিয়ে আলোচনা, এ সভায় অর্থহীন বলেই মনে করি। কারণ ও-সব ভারী ভারী কথা বললে আপনারা কিছুই বুঝবেন না। তার চেয়ে বরং আপনাদের কোনও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিন, উত্তর দিচ্ছি।'

ওঁদের নাক উঁচু ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যে দর্শকরা অপমানবোধ করেছিলেন। আমরাও হত-চকিত হয়েছিলাম এমন চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন, নাক তোলা বক্তব্যে। ওঁরা তবে সাক্ষরতার সুযোগ না পাওয়া মানুষদের কী বলবেন ? তাঁদের বাদ দিয়েই শুধু উচ্চকোটির মানুষদের নিয়েই কি ওঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ার স্বপ্ন দেখেন ? সেদিন ওঁদের ধৃষ্টতার জবাব শ্রোতারাই দিয়ে দিয়েছিলেন তীব্র ধিক্কারে।

আবার আর এক ধরনের সদা-সতর্ক বিজ্ঞান আন্দোলনের স্রোতও এদেশে লক্ষ্য করছি। যাঁরা অবতার বা জ্যোতিষীদের বুজরুকি ফাঁস করার নামে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত হানতে নারাজ। তাঁদের ধারণায় এই পথ 'হটকারি' পথ। এতে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। এঁদের চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনের অর্থ বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলন।

আমাদের সমিতির দৃষ্টিভঙ্গিতে সে কাজ সরকারের প্রশাসনের। গ্রামে গ্রামে টিউব-কল, বিদ্যুৎ, ফোন, দূরদর্শন ইত্যাদি বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধে পৌঁছে দেওয়া যদি বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য হয়, তবে তো রাজীব গান্ধীকেই ভাবতের বিজ্ঞান আন্দোলনের সবচেয়ে বড় নেতা হিসেবে ওই বিজ্ঞান আন্দোলন গোষ্ঠির পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

আমাদের চোখে বিজ্ঞান
আন্দোলনের অর্থ—বিজ্ঞানমনস্কতা
গড়ার আন্দোলন, সাধারণ মানুষকে
যুক্তিনিষ্ঠ করার
আন্দোলন।

বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিজ্ঞান

আন্দোলনের জন্য অর্থের প্রয়োজনের চেয়ে, অর্থের জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন করাটা বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

মুখোশধারী যুক্তিবাদীদের ভিড় যত বাড়বে, সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের বিপদও ততই বাড়বে। ভারতীয় উপমহাদেশে কম্যুইনিজমের হাওয়া পৌনে এক শতাব্দি ধরে বইলেও, এই অঞ্চলে যুক্তিবাদী মানুষ আজও দুর্লভ। যুক্তিবাদী বলে পরিচয় দিয়ে যাঁরা সমাজে বিচরণ করেন তাঁদের বেশির ভাগই রত্নধারী যুক্তিবাদী, তাবিজধারী যুক্তিবাদী, হিন্দু যুক্তিবাদী, মুসলমান যুক্তিবাদী, ব্রাহ্মণ যুক্তিবাদী, তপসিলী যুক্তিবাদী, বাঙালী যুক্তিবাদী, বিহারী যুক্তিবাদী, পারলৌকিক কর্মে মুণ্ডিত-মস্তক যুক্তিবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা একই সঙ্গে বিজ্ঞান মেলা ও ধর্মসভা উদ্বোধন করেন, পুজো কমিটি ও বিজ্ঞান সংস্থার চেয়ারম্যানের চেয়ারটি কৃপা করে অলংকৃত করেন, জ্যোতিষ সভা ও বিজ্ঞান সভা দুয়েরই সমৃদ্ধি কামনা করে বাণী পাঠান। এরই সঙ্গে আর এক নতুন হুজুক—আধ্যাত্মিক জগতের রাজা-মহারাজাদের দিয়ে বিজ্ঞান সভার উদ্বোধন করানো। এইসব রাজা-মহারাজের দল 'অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার কোনও বিরোধ নেই' ইত্যাদি বলে শ্রোতাদের চিন্তাকে আরো বেশি বিভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ করে তুলছেন।

'৮৮-র একটি ঘটনা। স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শীর্ষক আলোচনা সভায় গেছি। সেখানে আমার বক্তব্যের সূত্র ধরে এক স্বীকৃত মার্কসবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বললেন, 'আমি প্রবীরবাবুর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। বস্তুবাদে বিশ্বাসী মানুষও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতেই পারেন।'

বছর দুয়েক আগে জনৈক প্রগতিশীল বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক একটি আড্ডায় বলেছিলেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেও যুক্তিবাদী হওয়া যায়।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতাকে বলতে শুনেছিলাম, 'বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বা অধ্যাত্মবাদের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। বরং অধ্যাত্মবাদই পরম বিজ্ঞান।

'৮৩ সালে তপসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ডাইনিবিদ্যা ও ডাইনি বিশ্বাসের রূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এক আলোচনাচক্রে যোগ দেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণাগারের গবেষকবৃন্দ, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ ও বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এইসব সমাজ সচেতনতার দাবিদার ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেরই আলোচনায় যুক্তির পরিবর্তে একান্ত বিশ্বাসের কথাই উঠে এসেছিল। এঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী জানগুরুরাও। ডাইনিবিদ্যার অপকারিতা বিষয়ে ডাইনিদের সচেতন করতে নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বললেন কেউ। কারো বা ধারণা, এখনকার জানগুরুদের আগেকার দিনের জানগুরুদের মতন অতটা অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তবে জানগুরুদের ঠেকাতে তাদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বুঝুন। আলোচকদের ধারণাটাই যদি এমনতর ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ হয়, তবে আদিবাসীরা রোগের ও মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডাইনিদের দোষী সাব্যস্ত করলে সেটা খুব

একটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে কী ?

এতক্ষণ যেসব মুখোসধারী যুক্তিবাদীদের, অস্বচ্ছ চিন্তার যুক্তিবাদীদের, ভ্রান্ত চিন্তার যুক্তিবাদীদের কথা বললাম, জানি না এঁদের কত জন অস্বচ্ছচিন্তার শিকার, কতজন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার ঠিকা নিয়েছেন।

বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যেও চিন্তার স্ব-বিরোধিতা, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির অভাব, আদর্শহীনতা এবং নেতা সাজার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীরা সচেতন না হলে, যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ভুল পথে চালিত করতে সদা সচেষ্ট, যাঁরা শোষিত শ্রেণীর চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভীত, তাঁরাই কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে মেকি আন্দোলনের পালে ঝড় তুলবে।

আপনি আমি আমরা যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে, বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, সেই আমরা যদি নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

আমরা অর্থাৎ বিভিন্ন গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে ব্রতী বা ইচ্ছুক, সেই আমরা যদি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, গণসংগঠন ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাধারণ মানুষদের সামনে হাজির করি কুসংস্কার বিরোধী আলোচনা, শিক্ষণ-শিবির, নাটক, মাইম, গান, পোস্টার ইত্যাদি, যদি হাতে কলমে ঘটিয়ে দেখাই অলৌকিক বাবাদের সব কাণ্ডকারখানা, যদি স্পষ্ট ঘোষণা রাখি—আপনাদের এলাকার কোনও অলৌকিক বাবাজী-মাতাজীদের লৌকিক কৌশল জানতে চাইলে আমরা অবশ্যই জানাবো। আপনার এলাকার কোনও অবতার বা জ্যোতিষী তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা বা জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে চাইলে সে চ্যালেঞ্জ আমরা নেবো——তবে নিশ্চিতভাবে দেখবেন আমরা স্থানীয় মানুষদের দীর্ঘ দিনের অন্ধ বিশ্বাসকে নিশ্চয়ই নাড়া দিতে পেরেছি। কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যার প্রশ্নে, কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের প্রয়োজনে অথবা আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোনও সহযোগিতার প্রশ্নে আমি ও আমাদের সমিতি আপনাদের পাশে আছি, থাকবো। আসুন আমরা সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনের শরিক হই।

কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনে নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা নিজেরা নিশ্চয়ই আমাদের নিজেদের নিজেদের এলাকার মানুষদের নিয়ে বসতে পারি সপ্তাহে বা মাসে অন্তত একটি করে দিন। সাধারণ মানুষদের পাশাপাশি ডাকি না কেন দল-মত নির্বিশেষে আমাদের পাড়ার শিক্ষক, ছাত্র, অধ্যাপক, চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীদের। আলোচনায় বসার আগে সুযোগ থাকলে আলোচ্য বিষয় নিয়ে সাধ্যমতো পড়াশুনো করে নিলে প্রয়োজনে প্রশ্ন তুলে, অথবা নিজের পড়ে জানা মতকে সাধারণের সামনে তুলে ধরে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনাসভাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি। আর, একান্ত পড়ার সুযোগ না পেলে আলোচকদের কথা শুনে নিজেদের জ্ঞান বর্ধিত ও পরিমার্জিত করতে পারি। মনে কোনও প্রশ্ন হাজির হলে, নিশ্চয়ই আমরা তা হাজির করবো। না জানা বিষয় জানার চেষ্টায় প্রশ্ন করা বিজ্ঞতার এবং না জেনে

জানার ভান করা মূর্খতারই লক্ষণ। আলোচনার বিষয়ের তো অভাব নেই—যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান আন্দোলন, ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, আত্মা, জাতিস্মর, প্ল্যানচেট, ভর, বিশ্বাসে রোগ মুক্তি, এমনি কত বিষয়ই পাওয়া যাবে।

আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেই নিশ্চয়ই কুসংস্কার বিরোধী বুলেটিন, বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করতেই পারি, তা সে যত কৃশ কলেবরের বা হাতে লেখাই হোক না কেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা চেষ্টা করলে কিছু লিখতে পারি, আসুন না তাঁরা সাধারণের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে সাধ্য-মতো কলম ধরি সংস্কার মুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে। এই জাতীয় লেখার বিষয়ের তো শেষ নেই। শেষ কথা তো কোনও দিনই বলা হবে না বা লেখা হবে না। যুক্তিবাদ এগুবে, প্রতিটি স্তরের যুক্তিবাদের পাশাপাশি ভাববাদী দর্শনও যুক্তিবাদকে বোঝার স্বার্থে পাল্টাবে, এগুবে নতুন নতুন রূপে।

শত-সহস্র বছর ধরে আমরা ভাববাদী সাহিত্য, সংগীত, নাটক, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই বেড়ে উঠছি। সেই পরিমণ্ডলের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে চাই যুক্তবাদী মুক্ত-চিন্তার এক পরিমণ্ডল। এর জন্য সাহিত্য, সংগীত, নাটক ইত্যাদিতে চাই ভাববাদী চিন্তার বিরোধিতা, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার। এর জন্য চাই বেশি বেশি করে ভাববাদ বিরোধী বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হোক, রচিত হোক সংগীত, নাটক, শিল্প।

বহু সংস্থা ও ব্যক্তি এ-বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের সাধ্যমত বিজ্ঞানমনস্ক বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন, যদিও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পক্ষে বর্তমানের এই সামগ্রিক প্রচেষ্টাও প্রয়োজনের তুলনায় যৎ-সামান্য। তবুও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে প্রচণ্ড রকমের আশাব্যঞ্জক। আশা রাখি, নতুন চেতনার পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে আরো বেশি বেশি করে মানুষ ও সংস্থা এগিয়ে আসবেন এবং তাঁদের সাধ্যমত নিজেদের ভূমিকা পালন করবেন।

আমাদের সমিতি এবং আমি মনে করি, শুধুমাত্র কোনও সংস্থার ওপর বা সেই সংস্থার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলে তা শুধুমাত্র স্বপ্নই থেকে যাবে। কারণ, ভাববাদী দর্শনের ওপর আক্রমণ যখন তীব্রতর হবে তখন শোষক শ্রেণী-স্বার্থ বা রাষ্ট্রশক্তি কঠিন প্রত্যাঘাত হানবে। এরা আন্দোলনের মূল উৎপাটন করতে নেতৃত্বদানকারী সংস্থা ও ব্যক্তিদেরই চিহ্নিত করে তাদের উপরও সর্বপ্রকার নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাবে। এই জাতীয় আক্রমণে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি শেষ হয়ে গেলেই যাতে আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে না যায় তারই জন্য প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংস্থার যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী হওয়া একান্তই প্রয়োজন। এমনটি হতে পারলে, শোষক শ্রেণী ও রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্বকে আঘাত হেনে আন্দোলন শেষ করে দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই একটি মাত্র কারণে আমরা সংগঠনের তরফ থেকে কোনও মুখপত্র প্রকাশ থেকে বিরত ছিলাম এতদিন। জানতাম, আমরা প্রথম থেকেই আমাদের মুখপত্র 'যুক্তিবাদী' প্রকাশ করতে থাকলে আমাদের সহযোগী, সহযোদ্ধা বহু সংগঠন ও শাখা

সংগঠন আমাদের ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আমরা বরং বিভিন্ন সংগঠন ও সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করেছি পত্র-পত্রিকা ও বই প্রকাশে। আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

আমাদের সমিতি যখন সামগ্রিকভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন সংস্থার সহযোগী ও সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে চলেছে, বিভিন্ন সংস্থাকে নানা ধরনের কার্যক্রমে, অনুসন্ধানে, পরিসংখ্যান গ্রহণে ও গবেষণা কাজে, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে, নাটক করতে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করে চলেছে, ঠিক তখনই একটি কুসংস্কার বিরোধী গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদকারী জনৈক বিজ্ঞান লেখক তাঁর বইটির ভূমিকায় সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, তাঁর বইয়ের (অনুবাদ কর্মটির) জনপ্রিয়তায় অনেকেই নাকি স্রেফ কিছু কামানোর ধান্দায় অথবা ব্যক্তি প্রচারের জন্য এইজাতীয় বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে মন দিয়েছেন।

অনুবাদকের এই ধরনের রুচিহীন মন্তব্যে বহু সংস্থা ও ব্যক্তি ব্যথিত হয়েছেন—আমরা জানি, আমাদের সমিতিও একইভাবে ব্যথিত। তাঁর এইজাতীয় অশালীন মন্তব্যকে উপযুক্ত ধিক্কার জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই। ওই অনুবাদক যদি মনে করে থাকেন, কুসংস্কার বিরোধী বই লেখার ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি এবং তাঁর ক্ষুদ্র পত্রিকাগোষ্ঠিই একচেটিয়া 'ঠিকা' নিয়ে রেখেছেন, তবে বলতেই হয়, তিনি ভাববাদী পরিমণ্ডল বজায় রাখার ক্রীড়নক হিসেবে শোষণ শ্রেণী ও রাষ্ট্র ক্ষমতারই সহায়তা করছেন। অনুবাদকের কাছে আমাদের একটি বিনীত জিজ্ঞাসা—তিনি যে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছিলেন, সেই মূল গ্রন্থটি অনুবাদের বহু বছর আগে থেকেই যুক্তিবাদী নির্ভর দর্শন, রচনা, শ্লোক, গ্রন্থ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেইসব রচনার জনপ্রিয়তার কারণেই কি মূল গ্রন্থের লেখক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন বলে অনুবাদক একান্তভাবে বিশ্বাস করেন? বিনীতভাবে আর একটি কথা নিবেদন করি—এই লেখক ওই অনুবাদকের দ্বারা গ্রন্থটি অনুবাদের বহু আগে থেকেই বাংলা ভাষার এক সময়কার জনপ্রিয়তম সাপ্তাহিক 'পরিবর্তন' পত্রিকায় 'লৌকিক-অলৌকিক' শিরোনামে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জের 'প্লাস পয়েন্টকে' কিছু অক্ষম ঈর্ষাকাতররা 'ব্যক্তি প্রচার' অশোভন' ইত্যাদি ভাষায় ভূষিত করে নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট।

আমরা মনে করি, এক-তরফাভাবে যুক্তিবাদী আলোচনায় সাধারণ মানুষের ওপর যতটা প্রভাব ফেলা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি প্রভাব ফেলা যায় জ্যোতিষী, অবতার, অলৌকিক ক্ষমতাধর ও ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তাদের মুখোমুখি হয়ে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে পারলে। আমরা তাই বার বার জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হয়েছি বেতারে, জ্যোতিষ সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে, আমরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে হাজির হয়েছি আলোচনায়, আমাদের সমিতির আয়োজিত বিতর্ক সভায় ধর্মের পক্ষে আমন্ত্রণ করে এনেছি তাবড় ধর্মবেত্তাদের, আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে শ্রোতাদের সামনে আনতে পেরেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রথম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের। আমরা প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতাবান ও জ্যোতিষীদের ও

মুখোমুখি হয়েই তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করতে চাই। এ-পথে তাঁরা কিছুতেই এগুতে চাইবেন না, যাঁদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আছে, যাঁদের অনেক জায়গাই হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিজেদের খামতিকে আড়াল করতে তাই গোয়েবেলসের কায়দায় প্রচারে নেমে পড়েন অক্ষমরা। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর পাগল মেহের আলির মতই রেকর্ড বাজিয়েই চলেন—'চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জ সব ফালতু হ্যায়', বলে এক নাগাড়ে।

সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার দায়-দায়িত্ব শুধুমাত্র যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী বা বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের নয়। এগিয়ে আসতে হবে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের দৃঢ় প্রত্যয়ে বুঝে নিতে হবে সত্যিই তাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসারে কী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সাধারণ মানুষদেল মধ্যে, অক্ষরজ্ঞানের সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা গড়ে তুলতে কী পথনির্দেশ দিতে পেরেছেন? শিক্ষক-অধ্যাপক, যাঁদের হাতে রয়েছে শিক্ষিত করে তোলার ভার, তাদের ওপর স্বভাবতই আমাদের কিছুটা বাড়তি প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক যে, তাঁর ছাত্রদের অন্ধ-বিশ্বাস, ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূর করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। শিক্ষা দেওয়ার অর্থ শুধু বইয়ের পড়া বোঝান নয়, কুসংস্কার দূর করাও শিক্ষা প্রসারেরই অঙ্গ। আমরা যারা আজ শিক্ষায় ও কর্মজীবনে কিছুটা অন্তত প্রতিষ্ঠিত, তাদের এ কথা মনে রাখা একান্তই প্রয়োজনীয় যে, আমাদের দেশের সংখ্যাগুরু শোষিত শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদের করের টাকায় গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি। সেই ঋণের কিছুটাও কি আমরা শোষিত মানুষদের শোধ দেওয়ার চেষ্টা করব না? সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাও কি আমরা করব না?

আমাদের দেশে কিছু নামী-দামী বিজ্ঞান সংস্থা রয়েছে—ছোট ছোট অসংখ্য বিজ্ঞান সংস্থা, যুক্তিবাদী সংস্থা ও অসংখ্য মানুষ ওইসব জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোর দিকে সঠিক পথনির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। জ্যেষ্ঠদের পথনির্দেশ যদি ভুল পথে বা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হয় তবে কনিষ্ঠদের এবং সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্তির পথে পা বাড়াবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোর সদস্যদের উচিত সংস্থার নেতৃত্ব এমন হাতে ন্যস্ত করা, যাঁরা কথায় ও কাজে বিপরীত মেরুতে বিচরণ করেন না।

'৮৭-তে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছাব্বিশটি বিজ্ঞান সংগঠন একসঙ্গে মাসাধিককালব্যাপী সারা ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠার আয়োজন করেছিলেন। দেশের পাঁচটি ভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচটি আঞ্চলিক জাঠা মোট প্রায় পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে, বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে যে সব বিষয় জাঠা বেছে নিয়েছিল সেগুলো হলো: স্বনির্ভরতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্র, বিজ্ঞান ও ভারতবর্ষ, স্বাস্থ্য ও ঔষধ, পরিবেশ দূষণ, জল, গৃহ, শিল্পক্ষেত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শান্তি।

না, মানুষের কুসংস্কার বিষয়ের কোনও স্থান ছিল না জাঠার বিষয়গুলোর মধ্যে। বিপুল অর্থব্যয়ের এই জন-বিজ্ঞান জাঠা তাদের কাছে এগিয়ে আসা শোষিত

অন্ধ-সংস্কাবে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে বিজ্ঞানমনস্ক কবাব চেষ্টা থেকে নিজেদেব বিবত বেখেছিল। পশ্চিমবাংলাব কিছু কিছু জাযগায অবতাবদেব কিছু কিছু কৌশল সাধাবণ মানুষদেব কাছে ফাঁস কবাব অনুষ্ঠান হযেছে বটে, কিন্তু সেগুলো হযেছিল নেহাৎই হালকা চালে, সাধাবণ মানুষকে ম্যাজিক দেখাবাব মত কবে, অবসব বিনোদনেব অনুষ্ঠানেব মত কবে। পশ্চিমবঙ্গে এই জাঠা ছিল ধর্ম ও জ্যোতিষ বিশ্বাসেব সঙ্গে হাত ধবাধবি কবে। ২ অক্টোবব মালদায জাঠা উদ্বোধন কবলেন এমন এক বিজ্ঞানী যাঁব নাম আমবা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায দেখেছি ধর্মানুষ্ঠান, ভাগবতপাঠেব আসব, অবতাবেব জন্মদিন, ইত্যাদি অনুষ্ঠানেব উদ্বোধক হিসেবে। ৭ অক্টোবব কলকাতাব টালাপার্কে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-জাঠাব এক অনুষ্ঠানে একটি পত্রিকাব প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 'শক্তি' বিষযে বক্তব্য বাখতে গিযে শুরুতেই বললেন, 'যবে থেকে ঈশ্বব মানুষ সৃষ্টি ।' বাক্যটা শেষ হবাব আগেই সভাব গুঞ্জনে সচেতন হযে উঠলেন। বক্তব্য পাল্টে বললেন , 'অবশ্য আমবা বিবর্তনবাদে পড়েছি কেমন কবে মানুষ এলো ।' জাঠাব উত্তব কলকাতা আঞ্চলিক কমিটিব সভাপতি দাপটে বিজ্ঞান সভাব পবিচালনা কবলেন, দু'হাতেব আঙুলে গোটা চাব-পাঁচেক গ্রহবত্নেব আংটি ধাবণ কবে।

এমন দ্বিচাবিতাব উদাহবণ এখানে শেষ নয়। এবাব আপনাদেব যাঁব কথা বলছি, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত বামবুদ্ধিজীবী লেখক। বস্তুবাদ প্রসঙ্গ-টসঙ্গ নিযে অনেক বইও লিখেছেন। এই বুদ্ধিজীবী 'জন-বিজ্ঞান' আন্দোলনেব নেতাদেব আমন্ত্রণে বক্তব্য বাখতে গিযে সোচ্চাবে জানালেন, বিজ্ঞান আন্দোলনেব নামে ধর্মকে কোনও আঘাত নয়।

মাস কযেক পবে তিনিই আবাব 'গণ-বিজ্ঞান' মঞ্চে উঠে ঘোষণা কবলেন, সাধাবণেব কাছে ধর্মেব বিজ্ঞান-মনস্কতা বিবোধিতাব স্বৰূপকে তুলে ধবতে হবে, চিনিযে দিতে হবে, আঘাত হানতে হবে।

পরজীবী এইসব বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিবাদী আন্দোলনের পক্ষে নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বিশাল বাধা হয়ে উঠতে পারেন। কারণ পরিচিত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ, অপরিচিত শত্রু চিরকালই ভয়াবহ।

অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাব ও জ্যোতিষীদেব বিবোধিতাব স্বৰূপ আমাদেব জানা, তাই তাদেব বিরুদ্ধে লড়াই কবাও তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু এইসব ভণ্ড যুক্তিবাদীদেব মুখোসেব আড়াল সবাতে না পাবলে তাদেব অজ্ঞাত শত্রুতা, গোপন আঘাত আমাদেব আন্দোলনকে বহুগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কবতে পাবে।

'৮৯-ব পিপলস্ সাইন্স কংগ্রেসেব অধিবেশনে যোগদানেব জন্য আমি এবং

আমাদেব সমিতি আমন্ত্রণ পেযেছিলাম। অধিবেশনে আমাদেব সমিতিব বক্তব্য ছিল—বিজ্ঞান আন্দোলনেব ক্ষেত্রে স্বনির্ভবতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পবিবেশ দূষণ, জল সমস্যা, বাসগৃহ ইত্যাদি সমস্যাব প্রযোজনীযতা স্বীকাব কবে নিযেও আমাদেব সমিতি মনে কবে এব সঙ্গে কুসংস্কাব বিবোধী আন্দোলনেব প্রযোজনীযতা ও গুরুত্ব স্বীকাব করা উচিত। বিজ্ঞান আন্দোলনে যদি বিজ্ঞান-মনস্কতা গডাব আন্দোলনেব, কুসংস্কাব মুক্তিব আন্দোলনেব স্থান না থাকে, তবে সেটা আব যাই হোক, বিজ্ঞান আন্দোলন নয। পিপলস্ সাইন্স কংগ্রেস আন্দোলনেব বিষয হিসেবে 'ধর্মনিবপেক্ষতা'কে স্থান দিযেছেন। কিন্তু যুক্তিবাদী চেতনা গডাব আন্দোলনকে পাশে সবিযে বেখে ধর্মনিবপেক্ষ চেতনা গডাব আন্দোলন, গাছেব গোডা কেটে আগায জল দেওযাব মতই বাতুলতা। 'কুসংস্কাব মুক্তি' এবং 'বিজ্ঞান-মনস্ক চেতনা'কে স্থান না দিযে আপনাবা যদি আন্দোলন চালিযে যেতে চান, তবে সেটা হবে মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞান আন্দোলনেব বিরুদ্ধে বিজ্ঞান আন্দোলন।

আমাদেব বক্তব্যেবই জেব টেনে বক্তব্য বাখলেন কেবলেব 'শাস্ত্রীয সাহিত্য পবিষদ'-এব প্রতিনিধি। কেবল শাস্ত্রীয সাহিত্য পবিষদ কাগজে-কলমে ভাবতবর্ষেব বৃহত্তম বিজ্ঞান সংগঠন। তাঁদেব প্রতিনিধি সোচ্চাবে জানালেন—আমবা আপনাদেব সমিতিব কর্মধাবা সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি। আমাদেব পক্ষে এখুনি কুসংস্কাব বিবোধী কোনও কর্মসূচী গ্রহণ কবা অসম্ভব। কাবণ এব দ্বাবা মানুষেব ধর্মীয বিশ্বাসে আঘাত হানাব সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আমাদেব পক্ষে কাবও ধর্মীয বিশ্বাসকে আঘাত কবাব কথা অচিন্তনীয। আমাদেব পবিষদকে হিন্দু মুসলমান, ক্রিশ্চান সব ধর্মেব সভ্যদেব নিযেই চলতে হয এবং হবে।

পবিষদেব প্রতিনিধি বুঝিযে দিলেন, তাঁবা বিজ্ঞান আন্দোলনেব নামে অনেক কিছু কবলেও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গডাব বিষযটা, সাধাবণ মানুষেব চেতনাকে এগিযে নিযে যাওযাব বিষযটা সন্তর্পণে এডিযে যেতে চান।

বিজ্ঞান আন্দোলনকে
ঘোলা করে অনেক স্বার্থান্বেষী
ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন। এইসব
স্বার্থান্বেষী বহুরূপীদের চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব
বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মী এবং
সমাজ সচেতন সংস্থা ও মানুষদেরই শক্ত হাতে
পালন করতে হবে। কারণ এইসব বহুরূপীরা
অবতার ও জ্যোতিষীদের চেয়েও
অনেক বেশি বিপদ্‌জনক।

আন্দোলন গডাব স্বার্থে, এগিযে নিযে যাওযাব স্বার্থে আমাদেব অনেক বেশি সৎ,

সতর্ক, আপোশহীন এবং নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে—এর কোনও বিকল্প নেই।

আজ হাজারে হাজারে দামাল ছেলে-মেয়েরা শহরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষদের সামনে ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন অনেক তথাকথিত অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। ফাঁস করছেন অলৌকিক-বাবাদের বুজরুকি। এইসব অলৌকিক বিরোধী প্রদর্শনীগুলো 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে আমাদের সমিতি, সহযোদ্ধা সহযোগী সংস্থাগুলো এবং খাতায় কলমে সহযোগী না হলেও সহমত পোষণকারী বহু সংস্থা পরিবেশন করে থাকেন। 'অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক' শিরোনামেও কিছু কিছু সংগঠন কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করে থাকেন। কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে 'অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক' স্লোগান থেকে আমাদের বিরত থাকতেই হবে। 'ভূতে ধরা', 'ঈশ্বরে ভর', 'বিশ্বাসে রোগ আরোগ্য', 'সম্মোহন' ইত্যাদি কী ম্যাজিক? অলৌকিক সব কিছুর ব্যাখ্যা কি বাস্তবিকই শুধুমাত্র ম্যাজিকের সাহায্যেই দেওয়া যায়? কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী যদি এমনটা ভেবে থাকেন তবে সেটা তার জানার অসম্পূর্ণতা।

আমার সম্পর্কে এক দিদি প্রাইভেট বাসকে বলেন, 'পাবলিক বাস'। তাঁকে প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর নিয়ে অনেক বোঝানোর পরও দেখেছি, তিনি নিজের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করেননি। কারণটা দিদির চোখে ছিল এই—ভুল সংশোধন করা মানে ছোট ভাইয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। তাঁর এই মিথ্যে অহমিকা বোধ এখনও তাঁকে ভুল বলিয়েই চলেছে।

এই ঘটনাটা বলার কারণ, আমাদের ভয় হয়, আমার সেই দিদিটির মত এঁরাও না অহং বোধে প্রতিনিয়ত ভুল করে যেতেই থাকেন। ভয় হয়, কারণ বিজ্ঞানকর্মীদের এমন মারাত্মক ভুলে সাধারণ মানুষরা বিভ্রান্ত হবেন। আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে অলৌকিক বিরোধী আলোচনাচক্র প্রদর্শনী ও শিক্ষাচক্র পরিচালনা করি। শিরোনামেই বক্তব্য স্পষ্ট। প্রতিটি আপাত-অলৌকিকই বাস্তবে লৌকিক অর্থাৎ আপাত-অলৌকিকের পিছনে কোনও কৌশল থাকতে পারে, অথবা থাকতে পারে শরীর ধর্মের কোনও বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবাংলার একটি নামী বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত এক গণ-জাদুকরের মতে অবতার ও জ্যোতিষীদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ নাকি নেহাৎই 'সস্তা চমক' আমাদের নাকি চ্যালেঞ্জের 'নেশা' পেয়ে বসেছে।

ওই গণ-জাদুকরের প্রতি আমার ও আমাদের সমিতির একটিই জিজ্ঞাসা আপনি যখন কুসংস্কার বিরোধী কোনও অনুষ্ঠানে সোচ্চারে ঘোষণা করতে থাকেন, 'অলৌকিক বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব ছিল না নেই, থাকবেও না' তখন যদি কোনও বে-রসিক ব্যক্তি আপনারই সভায় বুক ঠুকে ঘোষণা করেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং প্রমাণ দিতে প্রস্তুত তখন হে মহান আন্দোলনের নেতা আপনি কী করবেন? চ্যালেঞ্জের মত 'সস্তা চমক' ও 'অশোভন' ব্যাপার থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন?

একটি অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হচ্ছি,

‘অক্ষম’ ও ‘ঈর্ষাকাতর’দের কাছে ‘চ্যালেঞ্জকে ‘অশোভন’ বলে প্রচার চালানোই অক্ষমতাকে আড়াল করার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

চ্যালেঞ্জ আমাদের সমিতির কর্মধারার বিভিন্ন পর্যায়ের একটি পর্যায় মাত্র। ‘চ্যালেঞ্জ’ অক্ষমদের কাছে ‘সস্তা চমক’ অবশ্যই, তবে আমাদের কাছে আন্দোলনের ‘হাতিয়ার’। ‘চ্যালেঞ্জ’কে যে সব ধান্দাবাজরা ‘নেশা’ বলে প্রচার করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই—সাধারণ মানুষকে অবতার ও জ্যোতিষীদের ‘নেশা’ মুক্ত করতেই আমাদের চ্যালেঞ্জ। যতদিন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতার ও জ্যোতিষীদের ‘নেশা’ থাকবে, ততদিন ‘নেশা’ কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জের নেশাও থাকবে।

তাঁদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁদের প্রতিটি চিঠি, প্রতিটি যোগাযোগ, প্রতিটি উষ্ণ অভিনন্দন, প্রতিটি গঠনমূলক সমালোচনা, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি সহযোগিতা আমাকে এবং আমাদের সমিতিকে প্রেরণা দিয়েছে, সঠিক পথে এগোতে সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, গতিশীল রেখেছে। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রতিবেশী বাংলাদেশের লড়াকু সাচ্চা যুক্তিবাদী মানুষদের উদ্দেশ্যে যাঁদের লড়াইয়ের অদম্য শক্তি, যাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাকে দিয়েছে প্রেরণার চেয়েও বেশি কিছু। তবুও এর পরও অকৃতজ্ঞের মত যাঁদের কাছ থেকে শুধু নিয়েইছি, দিতে পারিনি চিঠির উত্তরটুকুও, তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। পত্র লেখক-লেখিকাদের কাছে বিনীত অনুরোধ চিঠির সঙ্গে অনুগ্রহ করে একটি জবাবী খামও পাঠাবেন।

এমন কিছু চিঠির উত্তর দিতে পারিনি—যার উত্তরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল, যা চিঠির স্বল্প পরিসরে সম্ভব ছিল না। বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এবং পরবর্তী খণ্ডগুলোতে তাঁদের সকলের জিজ্ঞাসা নিয়েই আলোচনা করেছি এবং করব।

আমার সংগ্রামের সাথী, প্রেরণার উৎস প্রত্যেককে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০ ০৭৪

এক

ভূতেব ভর

ভূতেব ভব বিভিন্ন ধবন ও ব্যাখ্যা

ভূত আছে, কি নেই, এই নিযে তর্কেবও শেষ নেই। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ভূত নিযে আলোচনা ও বিতর্কে মেতেছে। একদল মানুষ আছেন, যাঁবা ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ ও অবতাবদেব অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। আব একদল আছেন যাঁবা প্রমাণ ছাডা কোনও কিছুকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস কবতে নাবাজ এবং স্বভাবতই ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ শাস্ত্রে অবিশ্বাসী। আবাব এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁবা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, সাধু-সন্তদেব অলৌকিক ক্ষমতায আস্থাশীল নন, ঈশ্বরেব অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দিহান, কিন্তু ভূতেব অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কাবণ এঁবা নিজেব চোখে ভূতে পাওযা মানুষেব অদ্ভুত সব কাণ্ড কাবখানা দেখেছেন।

এমনই একজন গোবিন্দ ঘোষ। কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা কবে বর্তমানে ব্যাঙ্কে পদস্থ কর্মী। ঈশ্বরেব অস্তিত্বে ও অবতাবদেব অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী। জ্যোতিষীদেব বলেন বুজরুক। কিন্তু ভূতেব অস্তিত্বকে অস্বীকাব কবতে পাবেন না। কাবণ, তবে তো নিজেব চোখে দেখা কাকীমাকে ভূতে পাওযাব ঘটনাকেই অস্বীকাব কবতে হয। ব্যাখ্যা পাওযাব আশায় গোবিন্দবাবুই আমাকে ঘটনাটা বলেন।

সালটা সম্ভবত '৫৬। স্থান—হাসনাবাদেব হিঙ্গলগঞ্জ। গোবিন্দবাবু তখন সদ্য-কিশোব। একান্নবর্তী পবিবাব। গোবিন্দবাবুব কাকাব বিযে হয়েছে বছব দেডেক। কাকীমা সদ্য তরুণী এবং অতি সুন্দবী। অনেকখানি জাযগা নিযে নিযে ছডিযে ছিটিযে অনেক ঘব, ঠাকুবঘব, বান্নাঘব, আতুবঘব নিযে বাডির চৌহদ্দি। বাডিব সীমানা ছাডিযে কিছুটা দূবে পুকুব পাডে পাযখানা। পাযখানার পাশেই একটা বিশাল পেয়াবা গাছ। গাছটায ভূত থাকত বলে বাডিব অনেকেই বিশ্বাস কবতেন। তাই সন্ধ্যেব পব সাধাবণত কেউই, বিশেষত ছোটবা আব মেযেরা প্রযোজনেও পাযখানায যেতে চাইত না। এক সন্ধ্যেব ঘটনা। কাকীমা পাযখানা থেকে ফেবাব পব অস্বাভাবিক ব্যবহাব কবতে লাগলেন। ছোটদেব দেখে ঘোমটা টানতে লাগলেন। কথা বলছিলেন নাকী

গলায়। বাড়ির বড়রা সন্দেহ করলেন কাকীমাকে ভূতে পেয়েছে। অনেকেই কাকীমাকে জেরা করতে লাগলেন, 'তুই কে ? কেন ধরেছিস বল ?' ইত্যাদি বলে। একসময় কাকীমা বিকৃত মোটা নাকী গলায় বললেন, 'আমি নীলকান্তের ভূত। পেয়ারা গাছে থাকতাম। অনেক দিন থেকেই তোদের বাড়ির ছোট বউয়ের উপর আমার নজর ছিল। আজ সন্ধ্যে রাতে খোলা চুলে পেয়ারা তলা দিয়ে যাওয়ার সময় ধরেছি। ওকে কিছুতেই ছাড়ব না।'

পরদিন সকালে এক ওঝাকে খবর দেওয়া হল। ওঝা আসবে শুনে কাকীমা প্রচণ্ড রেগে সকলকে গাল-মন্দ করতে লাগলেন, জিনিস-পত্তর ভাঙতে লাগলেন। শেষে বড়রা কাকীমাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

ওঝা এসে মন্ত্রপড়া সরষে কাকীমার গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন, সেই সঙ্গে বেতের প্রহার। কাকীমার তখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ক্লান্ত নীলকান্তের ভূত কাকীমাকে ছেড়ে যেতে রাজী হল। ওঝা ভূতকে আদেশ করল, ছেড়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে একটা পেয়ারা ডাল ভাঙতে হবে, আর একটা জল ভরা কলসী দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে যেতে হবে।

সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে বিশাল একটা লাফ দিয়ে কাকীমা একটা পেয়ারা ডাল ভেঙে ফেললেন। একটা জলভরা কলসী দাঁতে করে পাঁচ হাত নিয়ে গেলেন। তারপর পড়ে গিয়ে অজ্ঞান। যখন জ্ঞান এল তখন কাকীমা আবার অন্য মানুষ। চিঁ চিঁ করে কথা বলছেন, দাঁড়াবার সাধ্য নেই।

এরপর অবশ্য কাকীমার শরীর ভেঙে পড়েছিল। বেশিদিন বাঁচেননি।

এই ধরনের ভূতে পাওয়ার কিছু ঘটনা আমি নিজেই দেখেছি। আপনাদের মধ্যেও অনেকেই নিশ্চয়ই এই ধরনের এবং আরও নানা ধরনের ভূতে পাওয়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন বা শুনেছেন। এ সব ঘটনাগুলোর পিছনে সত্যিই কি ভূত রয়েছে ? না, অন্য কিছু ? বিজ্ঞান কি বলে ? এই আলোচনায় আসছি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভূতে পাওয়া কী ?

**আপনারা যাঁদের দেখে
মনে করেন, এঁদের বুঝি ভূতে পেয়েছে,
আসলে সেইসব তথাকথিত ভূতে পাওয়া মানুষগুলো
প্রত্যেকেই রোগী, মানসিক রোগী। এই সব মানসিক
রোগীরা এমন অনেক কিছু অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে
ফেলেন, যে সব ঘটনা সাধারণভাবে
স্বাভাবিক একজন মানুষের
পক্ষে ঘটান অসম্ভব।**

যে হেতু সাধারণভাবে আমরা বিভিন্ন মানসিক রোগ এবং মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তাই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিশৃঙ্খলার জন্য ঘটা অদ্ভুত সব ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা নিজেদের কাছে হাজির করতে পারি না। কিছু কিছু মানসিক রোগীদের ব্যাপার-স্যাপার তাই আমাদের চোখে যুক্তিহীন ঠেকে। আমরা ভেবে বসি—আমি যে হেতু এর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না, তাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এর ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিটি ভূত পাওয়া ঘটনারই ব্যাখ্যা আছে। বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা হল, আগ্রহ, ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার আগ্রহ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান 'ভূত পাওয়া' বলে পরিচিত মনের রোগকে তিনটি ভাগ ভাগ করেছে। এক : হিস্টিরিয়া (Hysteria), দুই : স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia), তিন : ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac depressive)।

হিস্টিরিয়া থেকে যখন ভূতে পায়

প্রাচীন কাল থেকেই হিস্টিরিয়া নামের মানসিক রোগটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখনকার দিনের ওঝা, গুনীন বা জাদুচিকিৎসকরা সঠিক শরীর বিজ্ঞানের ধারণার অভাবে এই রোগকে কখনও ভূতে পাওয়া কখনও বা ঈশ্বরের ভর বলে মনে করেছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চোখে হিস্টিরিয়া বিষয়টাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে সংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত বা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে এইসব মানুষের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার চেয়ে বহুজনের বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ক কোষে সহনশীলতা যাদের কম তারা নাগাড়ে একই কথা শুনলে, ভাবলে বা বললে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে থাকে, আলোড়িত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় উত্তেজিত কোষগুলো অকেজো হয়ে পড়ে, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে, ফলে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। গোবিন্দবাবুর কাকীমার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটেছিল।

কাকীমা পরিবেশগতভাবে মনের মধ্যে এই বিশ্বাস লালন করতেন ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। মানুষ মরে ভূত হয়। ভূতেরা সাধারণত গাছে থাকে। সুন্দরী যুবতীদের

প্রতি পুরুষ-ভূতেবা খুবই আকর্ষিত হয। সন্ধ্যেব সময খোলা-চুলেব কোনও সুন্দবীকে নাগালেন মধ্যে পেলে ভূতেবা সাধাবণত তাদেব শবীবে ঢুকে পড়ে। ভূতেবা নাকী গলায কথা বলে। পুরুষ ভূত ধবলে গলাব স্বব হ্য কর্কশ। মন্ত্র-তন্ত্রে ভূত ছাড়ান যায। যাবা এ সব মন্ত্রতন্ত্র জানে তাদেব বলে ওঝা। ভূতেব সঙ্গে ওঝাব সম্পর্কে—সাপে নেউলে। ওঝা এসে ভূতে পাওযা মানুষটিকে খুব মাব-ধোব কবে তাই ওঝা দেখলেই ভূত পাওযা মানুষ প্রচন্ড গালাগাল কবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয অনেক কথাই কাকীমা তাঁব কাছেব মানুষদেব কাছ থেকে শুনেছেন এবং বিশ্বাসও কবেছেন। শ্বশুব বাড়িতে এসে শুনেছেন পেযাবা গাছে ভূত আছে। ঘটনাব দিন সন্ধ্যায ভুল কবে অথবা তাড়াতাড়ি পাযখানা যাওযাব তাগিদে কাকীমা চুল না বেঁধেই পেযাবা গাছেব তলা দিযে গেছেন। যাওযাব সময তাঁব একমাত্র চিন্তা ছিল তাড়াতাড়ি পাযখানায যেতে হবে। তাবপব হয তো পেট কিছুটা হালকা হতেই চিন্তা এসেছে—আমি তো চুল না বেঁধেই পেযাবা তলা দিযে এসেছি। গাছে তো ভূত আছে। আমি তো সুন্দবী, আমাব উপব ভূতটা ভব কবেনি তো? তবপবই চিন্তা এসেছে—নিশ্চয ভূতটা এমন সুযোগ হাতছাড়া কবেনি। আমাকে ধবেছে। ভূতেব পবিচয কী, ভূতটা কে? কাকীমা নিশ্চযই নীলকান্ত নামেব একজনেব অপঘাতে মৃত্যুব কথা শুনেছিলেন, ধবে নিলেন নীলকান্তেব ভূত তাঁকে ধবেছে। তাবপব ভূতে পাওযা মেযেবা যে ধবনেব ব্যবহাব কবেন বলে শুনেছিলেন, সেই ধবনেব ব্যবহাবই তিনি কবতে শুরু কবলেন।

গোবিন্দবাবু আমাকে প্রশ্ন কবেছিলেন, 'কাকীমা অতি ভদ্র পবিবাবেব মেযে। ভূতে পাওযা অবস্থায তিনি ওঝাকে যে সব গালাগাল দিযেছিলেন সে-সব শেখাব কোনও সম্ভাবনাই তাঁব ছিল না। তবে সে সব গালাগাল তিনি দিযেছিলেন কি ভাবে?'

আমাব উত্তব ছিল—শেখাব সম্ভাবনা না থাকলেও শোনাব সম্ভাবনা কাকীমাব ক্ষেত্রে আব দশজনেব মতই অবশ্যই ছিল। ভদ্র মানুষেবা নোংরা গালাগাল কবেন না। এটা যেমন ঠিক, তেমনই সত্যি, ভদ্র মানুষও তাঁদেব জীবনের চলাব পথে কাককে না কাককে নোংরা গালাগাল দিতে শুনেছেন।

**কলসী দাঁতে করে
তোলা বা লজ্জা ভুলে প্রচণ্ড
লাফ দেওয়ার মত প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ
হিস্টিরিয়া রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। মানসিক
অবস্থায় রোগী নিজেকে অর্থাৎ নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ ভুলে
যান। গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে—তাঁকে ভূতে ভর
করেছে। তাঁর মধ্যে রয়েছে ভূতের অসাধারণ
ক্ষমতা ও বিশাল শক্তি। ফলে সামান্য সময়েব
জন্য শরীরেব চূড়ান্ত শক্তি বা সহ্য**

শক্তিকে ব্যবহার করে স্বাভাবিক অবস্থায় যা অসাধ্য, তেমন অনেক কাজ করে ফেলেন।

হিস্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে ভালমত জানা না থাকায় হিস্টিরিয়া রোগীদের নানা আচরণ ও কাজকর্ম সাধারণ মানুষদের চোখে অদ্ভুত ঠেকে। তাঁরা এগুলোকে ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা বলে ধরে নেন।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এমন কিছু সৈনিক চিকিৎসিত হতে আসে যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে অথবা ডান হাত পক্ষাঘাতে অবশ কিংবা অতীত স্মৃতি হারিয়েছে। এদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা একমত হন এরা কোনও শারীরিক আঘাত বা অন্য কোনও শারীরিক কারণে এইসব রোগের শিকার হয়নি। রোগের কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। এরা হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। অনবরত রক্তপাত, হত্যা গোলা-গুলির শব্দ রোগীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিছুতেই তারা এত রক্তপাত, এত হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পারছিল না। মন চাইছিল যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে। বাস্তবে যা আদৌ সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছেড়ে পালানো মানেই দেশদ্রোহিতা, ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি। পালাবার ইচ্ছা ও পালাতে ভয়—দুয়ের সংঘাত রূপান্তরিত হয়েছে হিস্টিরিয়ায়।

যে কোনও সমস্যায় দুই বিপরীতধর্মী চিন্তার সংঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের অসাড়তা ঘটতে পারে। প্রতি বছরই প্রধানতঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক-জাতীয় পরীক্ষার আগে মনোরোগ চিকিৎসকদের কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিৎসিত হতে আসে যারা স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বা যাদের ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে। পরীক্ষার সময় অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখার চাপের মধ্যে রাখে। চাপ অত্যধিক হলে শরীরে আর সয় না। মন বিশ্রাম নিতে চায়। আবার একই সঙ্গে ভাল ফলের জন্য মন বিশ্রামের দরুন সময় নষ্ট করতে চায় না। অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই হিস্টিরিয়াজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হয়। হিস্টিরিয়াজনিত কারণে বাক্‌রোধের সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকারেরা ভোগেন।

যে সব জায়গায় গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ কৃষি নির্ভরতা ছেড়ে খনির কাজে ও শিল্পের কাজে লেগে পড়তে গিয়ে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই মানসিক দ্বন্দ্বের পরিণতিতে ঘটছে তীব্র আলোড়ন। এমন পরিস্থিতিতেই মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা কম থাকার দরুন, যুক্তি-বুদ্ধি কম থাকার দরুন এইসব মানুষদের মধ্যে ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার আধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা।

নাম-গান করতে করতে আবেগে চেতনা হারিয়ে অদ্ভুত আচরণ করাও হিস্টিরিয়ারই অভিব্যক্তি। সভ্যতার আলো ব্যক্তি-হিস্টিরিয়ার প্রকোপ কমায়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টিরিয়াজনিত কারণে দলে দলে অদ্ভুত সব

আচবণ কবে।

শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধীব মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে মাত্র বাহাত্তব ঘণ্টায দিল্লিতে কযেক হাজাব শিখকে মধ্যযুগীয বর্ববতায যাবা হত্যা কবেছিল, তাবা কিছুটা সমযেব জন্য অবশ্যই হিস্টিবিযাগ্রস্ত হযে পডেছিল।

ধর্মান্ধতা থেকে অন্য ধর্মের মানুষদের হত্যাব পিছনেও থাকে হিস্টিরিয়া, গণ-হিস্টিরিয়া সৃষ্টিকারকের ভূমিকায় থাকে ধর্ম, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

'৮৭-ব জানুযাবিতে কলকাতাব টেলিফোন অপাবেটাবদেব মধ্যে তডিতাহতেব ঘটনা এমনই ব্যাপকতা পায যে, অটোম্যানুযেল এক্সচেঞ্জ, অন্তর্দেশীয ও আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জেব টেলিফোন অপাবেটববা আন্দোলনে নেমে পডেন। কানেব টেলিফোন বিসিভাব থেকে তাঁবা এমনভাবে তডিতাহত হতে থাকেন যে অনেককে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি কবা হয। পবে মেডিকেল বিপোর্টে তডিতাহতেব কোনও সমর্থন মেলেনি। ববং জানা যায তডিতাহতেব ঘটনাগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভযজনিত। এটা গণ-হিস্টিবিযাব একটি উদাহবণ।

এই প্রসঙ্গে আবও একটি উদাহবণ হাজিব কবাব লোভ সামলাতে পাবলাম না। কযেক বছব আগে কলকাতা ও তাব আশেপাশে এক অদ্ভুত ধবনেব বোগেব আবির্ভাব ঘটেছিল। জনতা নাম দিযেছিল 'ঝিন্‌ঝিনিযা' বোগ। কযেক সপ্তাহেব মধ্যে বেশ কিছু লোক এই বোগে আক্রান্ত হয। বোগী হঠাৎ কাঁপতে শুরু কবত অথবা সাবা শবীবে ব্যথা শুরু কবত। সেই সঙ্গে আব এক উপসর্গ বোগী নাকি অনুভব কবত তাব লিঙ্গ শবীবেব ভিতবে ঢুকে যাচ্ছে। গণ-হিস্টিবিযাব থেকেই এই উপসর্গগুলো বোগীবা নিজেব মধ্যে সৃষ্টি কবেছিল।

এক ধবনেব ভূতে পাওযা বোগ স্কিটসোফ্রেনিযা

স্কিটসোফ্রেনিযা বোগেব বিষযে বোঝাব সুবিধেব জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনাব প্রযোজন। গতিমযতা মস্তিষ্ককোষেব একটি বিশেষ ধর্ম। সবাব মস্তিষ্ককোষেব গতিমযতা সমান নয। যাদেব গতিমযতা বেশী, তাবা যে কোনও বিষয চটপট্‌ বুঝতে পাবে। বহু বিষযে জানাব ও বোঝাব আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধবনেব কাজকর্মে নিজেকে ডুবিযে বাখতে পাবে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গেব চিন্তায বা আলোচনায নিজেব মস্তিষ্ককোষকে নিযোজিত কবতে পাবে।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা বেশি। এই ধরনের মস্তিষ্ককোষের অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণীর মানুষরা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। এরা আত্মস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারী।

স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগের শিকার হন সাধারণভাবে আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা। তারা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও সমাধানের পথ না পেলে অথবা কোনও রহস্যময়তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন রহস্যময়তার মধ্যে থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাদের মস্তিষ্ককোষের গতিময়তা আরও কমে যায়। তারা আরও বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করে। মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensorium) ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে এরা প্রথমে বাইরের কর্মজগৎ থেকে, তারপর নিজের পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর এক সময় এরা নিজেদের সত্তা থেকেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, রোগীর মস্তিষ্ককোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন করতে পারছে না বা ছড়িয়ে দিতে পারছে না। ফলে একটি কোষের সঙ্গে আর একটি কোষের সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাহত হতে থাকে। মস্তিষ্ক কোষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন রোগীর ব্যবহারে বাস্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায়। রোগীরা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসের শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে অলীক বিশ্বাসও (Hallucination) পাঁচ রকমের হতে পারে। ১ দর্শনানুভূতির অলীক বিশ্বাস (optical hallucination), ২ শ্রবণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (auditory hallucination), ৩ স্পর্শানুভূতির অলীক বিশ্বাস (tactile hallucination), ৪ ঘ্রাণানুভূতির অলীক বিশ্বাস (olfactory hallucination) ও ৫ স্বাদ গ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির অলীক বিশ্বাস (taste hallucination)।

গুরুর আত্মার খপ্পরে জনৈকা শিক্ষিকা

সম্প্রতি ভূতে পাওয়া একটি পুরো পরিবার এসেছিলেন আমাদের কাছে। গৃহকর্তা ইকনমিক্সে এম-এ, মফস্বল শহরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বয়স পঞ্চান্নর আশে-পাশে। গৃহকর্ত্রী বাংলা সাহিত্যের ডক্টরেট। কলকাতার একটি মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। দুই ছেলে। বড় ছেলে চাকরী করেন। ছোট এখনও চাকরীতে ঢোকেনি। বেশ কিছু ভাষা জানেন। একাধিকবার বিদেশ গিয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভূতের (?) খপ্পরে পড়ে এমনই নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিলেন যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৭-র ৭ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেন।

বিজ্ঞাপনেব বক্তব্য ছিল—এক অশবীবী আত্মাব দ্বাবা আমাদের পাবিবাবিক শান্তি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। কোন সহৃদয ব্যক্তি এই বিপদ থেকে উদ্ধাব কবলে আমবা চিবকৃতজ্ঞ থাকবো।

বিজ্ঞাপনটি দেখে আমাদেব সংগঠনেব জনৈক সদস্য নেহাতই কৌতূহলেব বশে একটি চিঠি লিখে জানায—বিস্তৃতভাবে ঘটনাটি জানান। হযতো সাহায্য কবা সম্ভব হবে।

ইনল্যান্ডে উত্তব এলো। পত্র-লেখিকা ও তাঁব পবিবাবেব সকলেবই নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায আমবা আমাদেব বোঝাব সুবিধেব জন্য ধবে নিলাম পত্র-লেখিকাব নাম মঞ্জু, বড ছেলে চন্দ্র, ছোট ছেলে নীলাদ্রী, স্বামী অমবেন্দ্র।

মঞ্জু দেবী জানালেন—'প্ল্যানচেট' নামে একটা বই পড়ে ১৯৮৪ সনেব ২৫ আগস্ট শনিবাব তিনি, স্বামী ও দুই ছেলে প্ল্যানচেট কবতে বসেন। প্রথমে একটি বৃত্ত এঁকে বেখাব বাইবেব দিকে A থেকে Z পর্যন্ত এবং বেখাব ভিতবেব দিকে ১ থেকে ৯ এবং ০ লিখে বৃত্তেব কেন্দ্রে একটা ধূপদানীতে ধূপ জ্বেলে সবাই মিলে ধূপদানীকে ছুঁযে থেকে এক মনে কোনও আত্মাব কথা ভাবতে শুক কবতেন। এক সময দেখা যেত ধূপদানীটা চলতে শুক কবেছে এবং একটি অক্ষবেব কাছে যাচ্ছে। অক্ষবগুলো পব পব সাজালে তৈবি হচ্ছে শব্দ। শব্দ সাজিয়ে বাক্য। একটি বাক্য হতে এত দীর্ঘ সময় লাগছিল যে ধৈর্য্য বাখা অসম্ভব হযে পড়েছিল।

তাই প্ল্যানচেট বইযেব নির্দেশমতো একদিন ওঁবা বসলেন বাইটিং প্যাড ও কলম নিযে। প্রথম কলম ধবেছিলেন মঞ্জু দেবী। প্রথম দিন বেশ কিছুক্ষণ বসাব পব এক সময হাতেব কলম একটু একটু কবে কাঁপতে শুক করল। মঞ্জু দেবীই প্রশ্ন কবলেন, 'আপনি কে ? উত্তবে লেখা হল ববীন্দ্রনাথ। আবও কিছু প্রশ্নোত্তবেব পব একে একে প্রত্যেকেই কলম ধবেন। প্রত্যেকেব ক্ষেত্রে বিভিন্ন আত্মাবা এসে বাইটিং প্যাডে লিখে তাদেব উপস্থিতিব কথা জানিযে যায়। আত্মা আনাব জন্য বেশ কিছুক্ষণ গভীবভাবে চিন্তা কবতে হত বটে, কিন্তু একবাব আত্মা এসে গেলে হুডমুড কবে লেখা বেব হত। প্রথম দিন ভোব বাত পর্যন্ত কলম চলতে থাকে তাবপব থেকে প্রতিদিনই গভীব বাত পর্যন্ত চলতো আত্মা আনাব খেলা। এ এক অদ্ভুত নেশা।

এমনিভাবে যখন আত্মা আনাব ব্যাপাব প্রচণ্ড নেশাব মত পেযে বসেছে সেই সময '৮৫-ব জানুযাবীব এক বাতে ছোট ছেলে নীলাদ্রী নিজেব ভিতব বিভিন্ন আত্মাব কথা শুনতে পান। '৮৫-ব ৫ মার্চ থেকে মঞ্জু দেবীও একটি আত্মাব কথা শুনতে পান। আত্মাটি নিজেকে তাব গুরুদেব বলে পবিচয দেয। সেই আত্মাব বিভিন্ন কথা ও নির্দেশ আজ পর্যন্ত প্রায প্রতিটি মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী, সেই সঙ্গে আত্মাব স্পষ্ট স্পর্শও অনুভব কবছেন, আত্মাটি তাঁব সঙ্গে চূডান্ত অশ্লীলতাও কবছে। মঞ্জু দেবী এক অতি বিখ্যাত ধর্মগুরুব শিষ্যা। গুরুদেব মাবা যান ১৯৮৪-ব ২১ এপ্রিল। মঞ্জু দেবী আমাদেব সদস্যটিকে চিঠিটি লিখেছিলেন ২ জুলাই '৮৭।

চিঠিটি আমাব কাছে সদস্যই নিযে আসে। আমাকে অনুবোধ কবে এই বিষযে কিছু কবতে।

আমাব কথা মতে ১৯ জুলাই ববিবাব সন্ধ্যায পবিবাবেব সকলকে নিযে মঞ্জু

দেবীকে আসতে অনুবোধ কবেন সদস্যটি।

এলেন মঞ্জু দেবী ও তাঁব স্বামী। তাঁদেব সঙ্গে কথা বলে জানতে পাবলাম প্ল্যানচেটেব আসবে চাবজনেব কলমেই কোনও না কোনও সময় বিভিন্ন আত্মাবা এসেছেন। আত্মাদেব মধ্যে নেপোলিযন, ববীন্দ্রনাথ, শেক্সপীযাব, আলেকজান্ডাব থেকে স্বৰূপানন্দ অনেকেই এসেছেন, মঞ্জু দেবীব স্বামীব সঙ্গে বা বড ছেলে চন্দ্রব সঙ্গে কোনদিনই কোন আত্মাই কথা বলেনি। অর্থাৎ তাঁবা আত্মাব কথা শুনতে পাননি। আত্মাব কথা শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী ও তাঁব ছোট ছেলে নীলাদ্রী, আত্মাব স্পর্শ পেযেছেন শুধু মঞ্জু দেবী। বডই অশ্লীল সে স্পর্শ।

পরেব দিনই আমাব সঙ্গে দুই ছেলে দেখা কবলেন। কথা বললাম। সকলেব সঙেগ কথা বলাব পব বুঝলাম, চাবজনই 'প্ল্যানচেট' বইটা পডে প্ল্যানচেটেব সাহায্যে সত্যিই মৃতেব আত্মাকে টেনে আনা সম্ভব এ কথা বিশ্বাস কবতে শুরু কবেছিলেন। তাবই ফলে অবচেতন মন সচেতন মনেব অজ্ঞাতে চাবজনকে দিযেই বিভিন্ন মৃতেব নাম ও নানা কথা লিখিযেছে। ছোট ছেলে নীলাদ্রী সবচেয়ে বেশিবাব মিডিযাম হিসেবে কলম ধরাব জন্য প্ল্যানচেট নিযে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু কবেন—আমার হাত দিযে কেন আত্মাদের লেখা বেব হচ্ছে? এই রহস্যেব সমাধানের চেষ্টা কবতে গিয়ে বাব বাবই চিন্তাগুলো এক সময তালগোল পাকিয়ে গেছে। বহস্যেব জাল খোলেনি। বুদ্ধিমান নীলাদ্রী নিজেই নিজের অজ্ঞান্তে স্কিটসোফ্রেনিযাব বোগী হয়ে পডেছেন। ফলে শ্রবণানুভূতিব অলীক বিশ্বাসেব শিকার হযে অলীক সব কথাবার্তা শুনতে শুরু কবেছেন।

মঞ্জুদেবী সাহিত্যে ডক্টবেট, ভক্তিমতী আবেগপ্রবণ মহিলা। দীক্ষা নেওয়ার পরবর্তীকালে কিছু কিছু নারীব প্রতি গুরুদেবের আসক্তির কথা শুনেছিলেন। গুরুদেবে ছিলেন অতি সুদর্শন। মঞ্জুদেবীও এককালে সুন্দরী ছিলেন। প্ল্যানচেটেব আসবে ধূপদানীর চলা দেখে মঞ্জুদেবী ধরে নিযেছিলেন, দেহাতীত আত্মাই এমনটা ঘটাচ্ছে। এক সময় ধূপদানী ছেডে কলমেব ডগাতেও বিভিন্ন আত্মাকে বিচবণ কবতে দেখেছেন। গুরুদেবেব আত্মা হাজিব হতেই অনেক গোলমাল দেখা দিযেছে। গুরুদেবের নাবী আসক্তিব যে সব কাহিনী শুনেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, সেই বিশ্বাস থেকেই এক সময মঞ্জুদেবীব মনে হযেছিল—গুরুদেবের আত্মা আমাব আহ্বানে হাজিব হওযাব পব আমাব প্রতি আকর্ষিত হযে পডবেন না তো? তাঁব নাবী পিপাসা মিটে না থাকলে এমন সুযোগ কী ছেড়ে দেবেন? আমাকেই ভোগ কবতে চাইবেন না তো?

এই সব চিন্তাই এক সময স্থিব বিশ্বাস হয়ে গেডে বসেছে—গুরুদেব এই সুযোগে নিজেব কদর্য ইচ্ছেগুলোকে চবিতার্থ কবে চলেছেন, আমার শবীবকে ভোগ কবে চলেছেন।

প্ল্যানচেটেব আসবে অংশ নেওযাব অতি আবেগপ্রবণতা ও বিশ্বাস থেকেই এক সময় মঞ্জুদেবীব মধ্যে এসেছে শ্রবণানুভূতি ও স্পর্শানুভূতিব অলীক বিশ্বাস।

২৬ জুলাই মঞ্জুদেবী ও ছোট ছেলেকে আসতে বললাম। ওঁবা এলেন। ওঁবা যেমন ভাবে কাগজ-কলম নিযে প্ল্যানচেটেব আসবে বসতেন তেমনি ভাবেই একটা আসব বসালাম। দুজনেব অনুমতি নিয়ে সে দিনের আসরে ছিলেন একজন সাংবাদিক,

মঞ্জুদেবী তাঁর সন্দেহের কথাটি স্বভাবতঃই প্রকাশ করলেন। বললেন, আপনি ওকে সম্মোহন করে লিখতে বাধ্য করছেন না তো?

মা'যের এমনতর কথা নীলাদ্রীর ইগোতে আঘাত করল। নীলাদ্রী খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। কিছু তপ্ত কথা বলে ক্ষিপ্ত নীলাদ্রী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জুদেবীর মস্তিষ্ক কোষে আত্মা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি গেঁথে দেওয়ার জন্য নীলাদ্রীকে ঠাণ্ডা করে আবার এনে তথাকথিত প্ল্যানচেটের আসরে বসালাম। আমাদের অনুরোধে নীলাদ্রী কলমও ধরলেন। এবার মঞ্জুদেবী আত্মার উপস্থিতির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হতে এমন অনেক প্রশ্ন করলেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কলমের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন মঞ্জু। বিশ্বাস করলেন এ সব সত্যিই আত্মারই লেখা। গুরুদেবের আত্মাই কথা দিচ্ছেন, মঞ্জুদেবীর পরিবারকে আর বিরক্ত করবেন না।

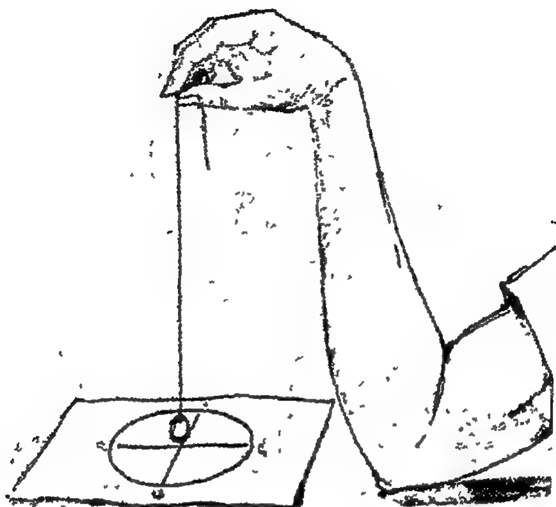
মৃতের আত্মার কোনও অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অবচেতন মনের যে বিশ্বাস সচেতন মনকে চালিত করে অলীক কিছু লিখিয়েছে, অলীক কিছু শুনিয়েছে, অলীক কিছুর স্পর্শ অনুভব করিয়েছে, আমি আমার কথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই অবচেতন মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলতে বা ধারণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, গুরুদেবের আত্মা আজই তাঁদের ছেড়ে যাবেন।

গত দু'দিন আমার সঙ্গে গুরুদেবের আত্মার এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ফলে নীলাদ্রীর মস্তিষ্ক কোষে আমার দ্বারা সঞ্চারিত দৃঢ় ধারণাই নীলাদ্রীকে দিয়ে লিখিয়েছে—'হ্যাঁ, বেশ চলে যাব' এই সব কথাগুলো।

সচেতন মনের উপর অচেতন মনের প্রভাবের জন্য যে লেখাগুলো এতদিন আত্মা এসেছে বিশ্বাসে লেখা হয়েছে, যে কথাগুলো এতদিন আত্মা বলছে বিশ্বাসে শোনা গেছে, সেই সচেতন মনের উপর অবচেতন মনের প্রভাবকে কাজে লাগানোর ফলেই আজকের নীলাদ্রী আত্মার বিদায় নেওয়ার কথা লিখলেন।

অবচেতন মনের প্রভাবের একটা পরীক্ষা হয়েই যাক

সচেতন মনের ওপর অবচেতন মনের প্রভাব হাতে কলমে পরীক্ষা করতে চাইলে আসুন আমার সঙ্গে। একটা সাদা খাতা যোগাড় করে ফেলুন। খাতাটা বাঁধানো হলে ভালো হয়। খাতা না পেলে একটা সাদা কাগজ নিয়েই না হয় আমরা কাজটা শুরু করি। এবার একটা কলম, একটা আংটি ও সুতো। খাতায় বা কাগজে ইঞ্চি চারেক ব্যাসের একটা মোটামুটি বৃত্ত এঁকে ফেলুন। ব্যাস অবশ্য চারের বদলে দুই বা ছয় ইঞ্চি হলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। এবার গোটা বৃত্ত জুড়ে পরিধি ছুঁয়ে এঁকে ফেলুন একটা যোগ চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন। সরল রেখা দুটির নাম দেওয়া যাক A B ও C D। এখন আসুন, আমরা আংটিতে বেঁধে ফেলি সুতো। আংটিটায় কোনও পাথর বসান থাকলে সুতো আমরা বাঁধবো পাথরের বিপরীত দিকে।



অবচেতন মনের পরীক্ষা

এবার আমরা বৃত্ত আঁকা খাতা বা কাগজটা টেবিলে পেতে নিজেরা চেয়ার টেনে বসে পড়ি আসুন। কনুইটা টেবিলে রেখে তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে আংটি বাঁধা সুতোটাকে এমনভাবে ধরুন যাতে আংটিটা ঝুলে থাকে যোগ-চিহ্নের কেন্দ্রে।

এবার শুরু হবে আসল মজা। আর মজাটা জমাতে প্ল্যানচেটের আসরের মতই চাই একটা শান্ত পরিবেশ। এমন শান্ত পরিবেশ পেতে প্রথম দিন শুধু আপনি একাই বসুন না একটা ঘরে, দরজা বন্ধ করে।

আপনি গভীরভাবে ভাবতে থাকুন আংটিটা A B রেখা ধরে A ও B-র দিকে দোল খাচ্ছে। ভাবতে থাকুন, গভীরভাবে ভাবতে থাকুন। ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হতে প্রয়োজনে দৃষ্টিকে A B সরলরেখা ধরে A ও B লেখার দিকে নিয়ে যান, মনে মনে বলতে থাকুন—আংটিটা A B ধরে দুলছে, পেণ্ডুলামের মত দুলছে। না বেশিক্ষণ আপনাকে ভাবতে হবে না। দু-চার মিনিটের মধ্যেই দেখতে পাবেন স্থির আংটি গতি পাচ্ছে, A B রেখা ধরে আংটি পেণ্ডুলামের মত দুলে চলেছে।

আপনি এক সময় ভাবতে শুরু করুন—আংটি আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে, আবার গতি

ভূতের কাণ্ড-কারখানাগুলো বড়ই অদ্ভুত রকমের। শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া নিজে থেকে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে আঁচড়ের দাগ। চুলগুলো নিজের থেকেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। যখন তখন ঘরের মধ্যে ঢিল এসে পড়ছে। খাবার খেতে গেলেই খাবারে এসে পড়ছে চুল, ইটের টুকরো ইত্যাদি। এমনকি জল খেতে গেলেও পরিষ্কার গ্লাসে রহস্যময়ভাবে হাজির হচ্ছে চুল।

ভুতুড়ে উপদ্রবের শুরু '৮৭-র জানুয়ারিতে। ইতিমধ্যে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক অনেকেই কাছেই টিংকুকে নিয়ে গেছেন চন্দন। কোনও ফল হয়নি।

কদমতলার ঠাকুরবাড়িতে টিংকুকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠাকুরবাড়ি থেকে জানান হয়—একটি ছেলের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারই আত্মা টিংকুকে ধরেছে। কারও সাধ্য নেই টিংকুকে সেই আত্মার হাত থেকে রক্ষা করে।

কদমতলা থেকে ফিরে আসার দিন থেকে শুরু হয় আর এক নতুন উপসর্গ। সেইদিনই হাত থেকে চুড়ি, আংটি অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর থেকে বাড়ির বহু জিনিসই এমনি হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য টিংকুর ভিতর থেকে ভূতটি বলে দিত কোথায় সে জিনিসগুলো ফেলেছে।

চন্দনের সমস্যা সমাধানের জন্য তার পরের রবিবার সকালেই গেলাম তাদের বাড়ি। না বাড়ি নয়, রেল লাইনের পাশে জবর-দখল করা জায়গায় সারি সারি ছাপড়ার বেড়ার কুঁড়ে। তারই একটায় চন্দনরা থাকেন। চন্দনরা বলতে—চন্দন, টিংকু, মা, বাবা, তিন বোন, দাদা ও দুই ভাই নিয়ে দশজন।

সেদিন আমার সঙ্গী ছিল আমার ছেলে পিনাকী ও আমাদের সমিতির সদস্য মানিক মৈত্র। চন্দনদের কুঁড়ের কাছে এক ঝাঁক তরুণ অপেক্ষা করছিলেন। প্রত্যেকেই চন্দনের বন্ধু বা পরিচিত। আমাকে দেখে প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। তাঁরা প্রত্যেককেই নাকি টিংকুর অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। ওদের সকলের সামনেই নাকি টিংকুর শাড়ি আপনা থেকেই সশব্দে ছিঁড়ে গেছে। গায়ের গহনা অদৃশ্য হয়েছে।

কুঁড়ের সামনে একটা সজনে গাছ। তার উপর একটা কাক এসে বসতেই কয়েকজন তরুণ গভীরতর সন্দেহ প্রকাশ করলেন—এটা আদৌ কাক নয়। কাকের রূপ ধরে টিংকুর উপর ভর করা অতৃপ্ত আত্মা। আমি কেন এসেছি, এটা অতৃপ্ত সর্বত্রগামী আত্মার অজানা নয়। তাই কৌতূহল মেটাতে আমাকে দেখতেই টিংকুকে ছেড়ে বর্তমানে কাকরূপে আবির্ভূত হয়েছে।

ঘরে ঢুকলাম। টিংকু ও চন্দনের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বললাম। জানলাম কিছু কথা। চার বছর আগে নিজেদের আলাপেই দুজনের বিয়ে। চন্দন সে সময় এ-পাড়ায়, ও-পাড়া আবৃত্তি করতেন। টিংকু ওঁর আবৃত্তি ও সুন্দর কথাবার্তায় আকর্ষিত হয়েছিলেন।

টিংকুর বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল। বাবা ব্যবসায়ী। ব্যবসার কল্যাণে গাড়ি-বাড়ি সবই আছে। দু'মেয়ের মধ্যে টিংকুই ছোট। বড় বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। টিংকু লেখা পড়ায় কোনওদিনই উৎসাহ বোধ করে না। তাই স্কুলের গণ্ডিটা পার হওয়ার আগেই গোটা আঠারো বসন্ত বিদায় নিয়েছে। বাড়ির তীব্র অমতে বিয়ে, তবু বাবা

গযনা, খাট ও কিছু নগদ অর্থ দিযেছিলেন।

চন্দন বেশিদূব পডাশুনো কবেননি। হাওডাব একটা কাবখানায কাজ কবেন। বছবখানেক হল কাবখানা বন্ধ। কাবখানায তালা ঝুলবাব পব থেকে প্রতিদিনই আর্থিক সমস্যা তীব্রতব আকাব ধাবণ কবছে। নগদ টাকাব পুঁজি শেষ। স্ত্রীব গযনায হাত দিতে হযেছে। ইতিমধ্যে ভূতেব সমস্যা। ভূত তাডাতে তান্ত্রিকদেব পিছনেই এ পর্যন্ত খবচ হযেছে হাজাব সাতেক। বর্তমানে জমি-বাডি বিক্রিব দালালী কবাব চেষ্টা কবছেন। বাজনৈতিক ছাপ না থাকায এ লাইনেও তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

গত বছব টিংকুব গর্ভস্থ প্রথম সন্তান আকস্মিকভাবে নষ্ট হযে যায। টিংকু আবাব গর্ভবতী। চাব মাস চলছে। ভূতেব উপদ্রবও শুরু হযেছে টিংকু দ্বিতীযবাব গর্ভবতী হওযাব পব।

এই দাবিদ্র্যতাব মধ্যেও টিংকুব চেহাবাব ভিতব যথেষ্ট চটক বযেছে। আড্ডাব মেজাজে গল্প-সল্প কবতে কবতে জেনে নিলাম, টিংকু তাঁব বাপেব বাডি থাকলে ভূতেব উপদ্রবও বন্ধ থাকে।

টিংকুব ভূতেব কাণ্ড দেখতে বেশ কিছুটা সময ওব সঙ্গে ছিলাম। ঘবে শুধু আমি আব টিংকু। এবই মধ্যে ফ্যা-স্ কবে শাডি ছেঁডাব আওযাজ পেলাম। শাডিব ছেঁডা জাযগাটা দেখালেন টিংকু। কিন্তু টিংকুব হাতগুলো পুবো সময আমাব সামনে ছিল না। তাই টিংকুব হাত যে তাঁব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাবে শাডি ছেঁডেনি, অলৌকিকভাবে ছিঁডেছে—এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা আমাব পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবপব অনেকটা সময টিংকুব হাত দুটো আমাব দৃষ্টিব সামনে ছডিযে বেখে বসলাম। শাডি আব ছিঁডলো না। আব শাডি না ছেঁডায টিংকু অস্বস্তি পাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমাব ননদকে খাবাব জল আনতে বলুন। আমি জল খেতে গেলেই দেখবেন জলে চুল পডে আমাকে জল খেতেও দেবে না।'

আমাব কৌতূহল হলো। বললাম, 'বেশ তো, আপনাব ননদকে খাবাব জল আনতে বলুন।'

টিংকু ননদকে ডাকতেই পাশেব ঘব থেকে উঁকি দিল একটি কিশোবী। এক গ্লাস খাবাব জল চাইতে স্টিলেব গ্লাসে জল নিযে এলো। আমি গ্লাসেব জলটা পবীক্ষা কবে এগিযে দিলাম টিংকুব দিকে। জলে চুমুক দিতে গিযেই 'থু-থু' কবে উঠলেন টিংকু। গ্লাসেব জল থেকে গোটা দু-চাব চুল তুলে ধবলেন ডান হাতেব দু-আঙুলে।

'এই দেখুন চুল'। টিংকু আমাব দিকে বহস্যময হাসলেন।

আবাব কিশোবীটিকে দিযে জল আনালাম। জল পবীক্ষা কবলাম। টিংকুব হাতে তুলে দিলাম। টিংকু খেতে গিযে একই ভাবে 'থু-থু' কবে দু-আঙুলে তুলে ধবলেন চুল।

এইভাবে বাব বাব কিশোবীটিকে দিযে জল আনাচ্ছিলাম আব তুলে দিচ্ছিলাম টিংকুব হাতে। মোট দশ দফা জল তুলে দিযেছিলাম টিংকুব হাতে সাতবাবই জলে পাওযা গিযেছিল চুল। তিনবাব পাওযা যাযনি। সাতবাব কিশোবীটিব হাত থেকে জল নেবাব সময টিংকুব দিকে পিছন ফিবতে হযেছিল। ওই সমযটুকুব টিংকুব সুযোগ ছিল নিজেব চুল ছিঁডে আঙুলেব ফাঁকে লুকিযে বাখাব। তিনবাব আমি জলেব গ্লাস

নিয়েছিলাম টিংকুর দিকে পিছন না ফিরে। এই তিনবার টিংকুর পক্ষে আমার চোখ এড়িয়ে চুল ছেঁড়া সম্ভব ছিল না। এবং ওই তিনবারই জলে চুল পড়েনি।

ভূতের রহস্যটা পরিষ্কার হলো। মানসিক রোগটাও নির্ণয় করা গেল—ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ বা অবদমিত বিষণ্ণতা। টিংকু অতি গরীব পরিবার থেকে বিবাহ সূত্রে এই পরিবারে এলে বর্তমান দারিদ্র্যে নিশ্চয়ই তাঁকে অবদমিত বিষণ্ণতার শিকার হতে হতো না। টিংকু বিয়ের আগে পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও বিয়ের পরে ভালবাসার মানুষটির জন্য নিম্ন আয়ের পরিবারের সকলের সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর বন্ধ কারখানা করে খুলবে সেই বিষয়ে অনিশ্চয়তা, আগত সন্তানের আর্থিক দায়িত্বের চিন্তা এবং প্রতিদিনের খাওয়া পরা জোটানোর তীব্র সমস্যা একসঙ্গে মিলে-মিশে টিংকুর চিন্তাকে অহরহ জর্জরিত করছিল। পরিণামে অবদমিত বিষণ্ণতার রোগী হয়ে নিজের অজান্তে অদ্ভুত সব আচরণ করে প্রতিদিনের সমস্যা ও চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছে।

শাড়ি-ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলা, গায়ে আঁচড় দেওয়া, খাবারে চুল ফেলা সব কিছু নিজেই করেছে নিজের অজ্ঞাতে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

জীবন-ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন না মেটার ব্যর্থতাই যেখানে রোগের আসল কারণ, সেখানে শুধুমাত্র মানসিক চিকিৎসার সাহায্যে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া অসম্ভব। আমাদের সমিতির এক সভ্যের সহৃদয় সাহায্যে মেয়েটির স্বামীকে একটা কাজে লাগাবার পর মেয়েটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম সামান্য চেষ্টাতেই।

অবদমিত বিষণ্ণতা নানা কারণে একটু একটু করে গড়ে ওঠে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্বচ্ছতা পাবে আশা করি।

গ্রামে ফিরলেই ফিরে আসে ভূতটা

আমাদের অফিসেরই এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর বাড়ি উড়িষ্যার এক গ্রামে। একদিন সে আমাকে এসে জানাল, কিছু দিন হলো ওর স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। অনেক ওঝা, তান্ত্রিক, গুণিন দেখিয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই এরা দেখার পর খুব সামান্য সময়ের জন্য ভাল থাকে, অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল হয়নি। সহকর্মীটিকে বললাম, স্ত্রীকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে। নিয়েও এলো।

ওর স্ত্রীকে দেখে মনে হল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য কুড়ি বছরের কম নয়। বউটির বয়স বছর পঁচিশ। ফর্সা রঙ, দেখতে স্বামীর তুলনায় অনেক ভাল। দেশের বাড়িতে আর থাকে ওর দুই ভাসুর, এক দেওর, তাদের তিন বউ, তাদের ছেলে-মেয়ে ও নিজের দুই মেয়ে, এক ননদ ও শাশুড়ী। বিরাট সংসারে প্রধান আয় ক্ষেতের চাষ-বাস। স্বামী বছরে দুবার ফসল তোলার সময় যায়। তখন যা স্বামীর সঙ্গ পায়। হাত-খরচ হিসেবে স্বামী কিছু দেয় না। টাকার প্রয়োজন হলে যৌথ-পরিবারের কর্ত্রী মা অথবা বড় জায়েদের কাছে হাত পাততে হয়।

প্রথম ভূত দেখার ঘটনাটা এই রকম একদিন সন্ধ্যের সময় ননদের সঙ্গে মাঠ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এল। অথচ আশে-পাশে দুর্গন্ধ ছড়াবার মতো কিছুই চোখে পড়েনি। সেই রাতে খেতে বসে ভাতে গোরুর মাংসের গন্ধ পায় বউটি। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে হল। গা-গুলিয়ে বমি। সেই রাতেই এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। জানলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে। বীভৎস একটা প্রেতমূর্তি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ওকেই দেখছিল। পরের দিনই ওঝা আসে। মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে। কিন্তু কাজ হয় না। এখন সব সময় একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছে। খেতে বসলেই পাচ্ছে গোরুর মাংসের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে প্রেতমূর্তিটি দর্শন দিয়ে যাচ্ছে।

বউটির মুখ থেকেই জানতে পারি তার মা ও বোনকেও এক সময় ভূতে ধরেছিল। ওঝারাই সারিয়েছে। বউটির অক্ষর জ্ঞান নেই। গোরুর মাংসের গন্ধ কোনও দিনও শুঁকে দেখেনি। প্রতিদিন অন্য তিন বউয়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় ওকে। তাদের স্বামীরা দেশেই থাকে, দেখাশুনা করে পরিবারের। অথচ বেচারী বউটিকে কোন সাহায্য করারই কেউ নেই। বরং মাঝে মধ্যে অন্য কোনও বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে কর্তামাও আমার সহকর্মীর বউটির বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দেন।

সব মিলিয়ে বউটির কথার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় অন্য জায়ের স্বামীরা যে চাষ করে ঘরে ফসল তোলে। আমার বর কী করে ? টাকা না ঢাললে সবাই পর হয়। তা আমার উনি একটি টাকাও কস্মিনকালে উপুড়হস্ত করেন না। কিছু বললেই বলেন, দুই মেয়ের বিয়ের জন্য জমাচ্ছি।

বুঝলাম, অবদমিত বিষণ্ণতাই মহিলাটির মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে মহিলাটি অলীক বীভৎস মূর্তি দেখছেন, পাচ্ছেন অলীক গন্ধ। মহিলাটি গোরুর মাংসের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস করে নিয়েছেন তাঁর নাকে আসা গন্ধটি গোরুরই।

সহকর্মীটিকে তাঁর স্ত্রীর এই অবস্থার কারণগুলো বোঝালাম। জানালাম চিরকালের জন্য স্ত্রীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখতে চাইলে স্ত্রী-কন্যাদের কাছে এনে রাখতে হবে, তাদের দেখাশুনো করতে হবে, স্ত্রীর সুবিধে-অসুবিধেয় তার পাশে দাঁড়াতে হবে।

সহকর্মীটির টাকার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ। মধ্য কলকাতার নিষিদ্ধ এলাকা সোনাগাছিতে ওড়িশা থেকে আসা কিছু লোকেদের নিয়ে সামান্য টাকায় মেস করে থাকে। চড়া সুদে সহকর্মী ও পরিচিতদের টাকা ধার দেয়। দেশের সংসারে সাধারণত টাকা পাঠায় না। কারণ হিসেবে আমাকে বলেছিল, দেশের চাষের জমিতে আমারও ভাগ আছে। চাষ করে যা আসে তাতেই আমার পরিবারের তিনটে প্রাণীর ভাল মতই চলে যাওয়া উচিৎ। মেয়েমানুষের হাতে কাঁচা টাকা থাকা ভাল নয়, আর দরকারই বা কী ? শাশুড়ি, ননদ, জায়েদের সঙ্গে থাকতে গেলে একটু ঠোকা-ঠুকি হবেই। ও সব কিছু নয়। মেয়েদের ও-সব কথায় কান দিতে নেই।

হয় তো সহকর্মীটি এই মানসিকতার মধ্যেই মানুষ হয়েছে, অথবা অর্থ জমানোর নেশাতেই আমার যুক্তিগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। জানে আমার যুক্তিকে মেনে নেওয়ার অর্থই খরচ বাড়ানো।

তবু শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে বউকে কলকাতায় মাস চারেকের জন্য এনে

বেখেছিল। বউটিকে সম্মোহিত কবে তাব মস্তিষ্ক কোষে ধাবণা সঞ্চাবেব মাধ্যমে অলীক গন্ধ ও অলীক দর্শনেব হাত থেকে মুক্তি দিযেছিলাম দু-মাসে, দুটি সিটিং-এ। স্ত্রী ভাল হতেই সহকর্মী তাকে গ্রামে পাঠাতে ব্যস্ত হযে উঠল। বউটি আমাকেও অনুবোধ কবেছিল, আমি যেন ওব স্বামীকে বলে অন্য পাডায বাডি ভাডা নিতে বলি। পাডাটা বড খাবাপ। নষ্ট মেযেবা খিস্তি-খেউড কবে, ওদেব এভাতে দিন-বাত ঘবেই বন্দী থাকতে হয।

অনুবোধ কবেছিলাম। খবচেব কথা বলে সহকর্মীটি এক ফুঁযে আমাব অনুবোধ উডিযে দিল। পবিণতিতে বউটিকে গ্রামে পাঠাবাব দেডমাসেব মধ্যেই বউটি আবাব অবদমিত বিষণ্ণতাব শিকাব হযেছিল। সহকর্মীটিই আমাকে খবব দেয, 'বউকে আবাব ভূতে ধবেছে চিঠি এসেছে। কবে আপনি ওকে দেখতে পাববেন জানালে, বউকে সেই সময নিযে আসবো।'

বলেছিলাম, 'আমাকে মাপ কবতে হবে ভাই। আমাব অত নষ্ট কবাব মত সময নেই যে, তুমি দফায দফায বউটিকে অসুস্থ কবাবে, আব আমি ঠিক কবব। তুমি যদি তোমাব বউ ও মেযেদেব এখানে এনে স্থাযীভাবে বাখ, তবেই শুধু ওকে স্থাযীভাবে সুস্থ কবা সম্ভব এবং তা কববও।'

'সহকর্মীটি আমাব কথায অর্থ-খবচেব গন্ধ পেযেছিল, স্ত্রীকে আব আনেনি।

যে ভূত দমদম কাঁপিযে ছিল

অতৃপ্ত বাসনা থেকেও আসে অবদমিত বিষণ্ণতা। কোনও অদম্য বাসনা যখন অপূর্ণ থেকে যায, তখন সেই বাসনাব তীব্রতা প্রতিনিযত মস্তিষ্ককোষকে উত্তেজিত কবতে থাকে , এই মস্তিষ্ককোষগুলোব উপব অতিপীডন চলতে থাকাব ফলে এক সময মস্তিষ্ক কোষেব ক্রিযাকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে।

অতৃপ্ত প্রেম অনেক সমযই যে অবদমিত বিষণ্ণতাব সৃষ্টি কবে, তাব থেকেও ভূতে ধবাব তথাকথিত অনেক ঘটনা ঘটে থাকে।

এমনই একটা সত্যি ঘটনা আপনাদেব সামনে তুলে দিচ্ছি, শুধু পাত্র-পাত্রীদেব নাম গোপন কবে।

১২ জানুযাবি '৯০-এব সন্ধ্যায আমাদেব সমিতিব এক সদস্য মৈনাক খবব দিলেন—সত্য গাঙ্গুলীব বাডিতে কযেক দিন ধবে অদ্ভুত সব ভুতুডে ব্যাপাব ঘটে চলেছে। সত্য গতকাল বাতে মৈনাকেব সঙ্গে দেখা কবে এই বিপদ থেকে উদ্ধাবেব জন্য আমাব সাহায্য প্রার্থনা কবেন।

সত্য এক বিখ্যাত মনোবোগ চিকিৎসকেবই ভাইপো, আমাব সঙ্গে তেমন কোন পূর্ব পবিচয না থাকলেও ওই মনোবোগ চিকিৎসক আমাব পবিচিত ও শ্রদ্ধেয।

ঘটনাব যে বিববণ মৈনাকেব কাছ থেকে শুনলাম তা হল এই বকম—

ঘবে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এসে জিনিস-পত্তব পডছে। হঠাৎ হঠাৎ সবাব সামনে থেকে জিনিসপত্র অদৃশ্য হযে যাচ্ছে। বাডিব অনেকেবই পোশাক-আষাকে

হঠাৎই দেখা যাচ্ছে কিছুটা অংশ খাব্‌লা দিয়ে কাটা। ঘটনাগুলোব শুরু গত মঙ্গলবাব অর্থাৎ ৯ তাবিখ থেকে। পবিবাবেব সকলেবই শিক্ষিত এবং মার্কসবাদী হিসেবে সুপবিচিত। গতকাল রাতে বাড়ির কাজেব মেয়ে বেণু হঠাৎ চেতনা হাবিযে বাড়ি থেকে বেডিযে যাচ্ছিল। সত্যব বউদি দেখে দৌড়ে গিযে পিঠে একটা চড মাবতে মেযেটি চেতনা ফিবে পায। তাবপবই কেমন যেন একটা ঘোবেব মধ্যে ফ্যালফ্যাল কবে তাকিয়ে থাকে। সত্য ওঁদেব পাবিবাবিক চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। প্রতিষ্ঠিত ওই চিকিৎসকই নাকি সত্যকে বলেন 'এটা ঠিক আমাব কেস নয, আপনি ববং প্রবীবদাকে ডাকুন।' তাবপবই সত্য আমাকে আনাব জন্য মৈনাকেব স্মবণাপন্ন হন।

সে বাতেই গেলাম সত্যদেব বাড়িতে। সত্যবা থাকেন দোতলায।

বাড়িব প্রত্যেকেব সঙ্গে কথা বললাম। বাড়িতে থাকেন সত্য, দাদা নিত্য, বউদি মালা, ভাই চিত্ত, দুই বোন বেখা ও ছন্দা, মা অলকা ও কাজেব মেযে বেণু।

মা'ব বযেস ৬৫-ব কাছাকাছি। ভুতুড়ে কাণ্ডেব বিষযে অনেক কিছুই বললেন, স্পষ্টতই জানালেন, 'না, কাকব দুষ্টুমি বা কেউ মানসিক ভাবে নিজেব অজান্তে এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে বিশ্বাস কবি না।' জানালেন, নিজেব চোখে দেখেছেন ঠোঙায বেখে দেওয়া জযনগবেব মোযাব মধ্য থেকে মুহূর্তে একটা মোযাকে অদৃশ্য হতে। সেই মোযাই আবাব ফিবে এসেছে সকলেব চোখেব সামনে শূন্য থেকে। গত পবশু ওঁবা পবিবাবেব অনেকে টেলিভিশন দেখছিলেন, হঠাৎই ছাদ থেকে আমাদেব সকলেব চোখেব সামনে মোযাটা এসে পডলো। মোযাটাব কিছুটা অংশই দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয না, ধাবাল দাঁত দিযে মোযাটা কাটা হযেছে।

আজই সন্ধ্যায ঘটে যাওযা ঘটনাব যা বর্ণনা দিলেন, সে আবও আকর্ষণীয। ঘবে টেলিভিশন দেখছিলেন অলকা, ছন্দা, চিত্ত, বেণু ও মালা। হঠাৎই বেণুব হাত থেকে লোহাব বালাটা নিজে থেকে খুলে এসে পডলো মেঝেতে। লোহাব বালাটা কালই বেণুকে পবানো হযেছিল ভূতেব হাত থেকে বাঁচাতে। এই ঘটনা দেখাব পব প্রত্যেকেই এতই ভয পেযে গিযেছিলেন যে চাব মহিলাই চিত্তব পইতে ধবে বসেছিলেন এবং পইতে ধবেই চিত্ত কবছিলেন গাযত্রী জপ। আজই তিনবাব বেণুব কানেব দুল আপনা থেকে খুলে পড়ে গিযেছে।

বউদি মালা জানালেন অনেক ঘটনা। তাব মধ্যে আকর্ষণীয হলো, বাথকম বন্ধ কবে স্নান কবছেন, হঠাৎ মাথাব উপব এসে পডলো কিছু ব্যবহৃত চাযেব পাতা ও ডিমেব খোসা। কাল সন্ধ্যায দবজা ভেজিযে দিযে ছেলেকে পডাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কিছু এসে প্রচণ্ড জোবে তাঁব পিঠে আছড়ে পডলো। তাকিযে দেখেন শ্যাম্পুব শিশি। শিশিটা থাকে বাইবেব বাবান্দাব ব্যাকে। সেখান থেকে কী কবে বন্ধ ঘবে এটা এসে আছড়ে পডলো, তাব যুক্তিগ্রাহ্য কোনও ব্যাখ্যা তিনি পাননি।

বেখাব বযস পঁচিশেব কাছাকাছি। তিনিও অনেক ঘটনাব প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানালেন। তাব মধ্যে আমাব কাছে যেটা আকর্ষণীয মনে হযেছিল, সেটা হলো, বান্নাঘবে আটা মেখে বেখেছেন, উঠে দাঁড়িযেছেন গ্যাসটা জ্বালিযে চাটুটা চাপাবেন বলে, হঠাৎ দেখলেন আটাব তালটা নিজেব থেকে ছিটকে এসে পডলো বান্নাঘবেব দেওযালে। না, সে সময বান্নাঘবে আব কেউই ছিলেন না। বান্নাঘবেব বাইবে, কিছুটা

তফাতে বাবান্দায বসে কাঁচা-আনাজ কাটছিল বেণু। না, বেণুব পক্ষে কোনও ভাবেই নাকি বেখাব চোখ এড়িযে বান্নাঘবে ঢুকে আটা ছুঁড়ে মাবা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া আবও একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছেন বেখা। সেখানে বেখা ছাড়া বেণু কেন, কাবোবই উপস্থিতি ছিল না।

এবাবও ঘটনাস্থল বান্নাঘব। গ্যাসেব টেবিলেব ওপব একটা ঠোঙায বাখা ছিল কযেকটা বিস্কুট। হঠাৎ চোখেব সামনে ঠোঙাব মুখ খুলে গেল। একটা বিস্কুট ঠোঙা থেকে বেড়িযে এসে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে রান্নাঘবেব জানালাব শিক গলে বেড়িযে গেল।

ছন্দা'ব বযস বছব ষোল। ওব দেখা ঘটনাগুলোব মধ্যে যে ঘটনাটা আমাকে সবচেযে বেশি টেনেছিল, সেটা আজই সন্ধ্যায ঘটেছে। ববীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল হারমোনিযম বাজিযে। হারমোনিযমেব উপব ছিল কযেকটা স্বববিতান। ঘবে আব কেউ নেই। হঠাৎ লোড্‌শেডিং। সেই মুহূর্তে তাব গাযেব উপব আছড়ে পড়লো হারমনিযামেব উপব বাখা স্ববিতানগুলো। আতঙ্কে ছন্দা চেঁচিযে উঠলো, 'কে-বে ?' অমনি গালেব উপব এসে পড়লো একটা বিশাল চড়।

বেণু'ব বযস বছব ষোল। ওব কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলোব মধ্যে যে ঘটনাগুলোব আকর্ষণীয মনে হযেছিল সেগুলো হলো, নিজেব হাতেব থেকে লোহাব চুড়ি একটু একটু কবে বেবিযে আসছে—দেখেছে, কানেব দুল হঠাৎ অদৃশ্য হযেছে—অনুভব কবেছে। গত পবশু এক সময জামা পাল্টাতে গিযে দেখে অন্তর্বাসেব বাম স্তনবৃন্তেব কাছটা গোল কবে কাটা। অথচ অন্তর্বাসটা পড়াব সমযও ছিল গোটা।

বেখাব এক বান্ধবী গীতা থাকেন, মধ্যমগ্রামে। বেখাদেব সঙ্গে সম্পর্ক পবিবাবেব একজনেব মতই। মাসেব অর্ধেক দিনই কাটে বেখাদেব বাড়িতে। গীতা'ব সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। তিনি গত পবশুব একটা ঘটনা বললেন। একটা 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েছিল মেঝেতে। হঠাৎ দেশ পত্রিকা মেঝেতে চলতে শুরু কবলো। থামল অন্তত হাত চাবেক গিযে। না, হাওযায উড়ে যাওযাব কোনও প্রশ্নই আসে না। শীতেব সন্ধ্যা। ঘবেব প্রতিটি জানলা বন্ধ, বাইবেব প্রকৃতি স্তব্ধ। ঘবে ফ্যানও চলছিল না। গত কালকেব ঘটনাও কম বোমাঞ্চকব নয। কাল সন্ধ্যায ঘবে ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখতে পেলেন একটা ধোঁযাব কুণ্ডলী ঘবেব মেঝেতে তৈবি হতে শুরু কবলো। আতঙ্কিত চোখে দেখলেন কুণ্ডলীটা একটা বেড়াল হযে গিযে ঘব থেকে বেবিযে গেল।

ভূতেব একটা বৈশিষ্ট ছিল কাপড় কাটা, বাড়িব প্রায সকলেবই পোশাক, গবম-পোশাক ভূতের কোপে পড়ে কাটা পড়েছে। আমি গোটা চল্লিশেক পোশাক পবীক্ষা কবেছি। প্রত্যেকটাই প্রায এক স্কোযাব ইঞ্চিব মত জাযগা নিযে ধাবালো কিছু দিযে গোল বা ডিম্বাকৃতিতে কাটা। কাটাগুলোবও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবলাম। ব্লাউজ, ফ্রোক, টপ্ মেযেদেব কামিজেব স্তনবৃন্তেব কাছে কাটা। চিন্তেব পাজামাব লিঙ্গস্থানেব কাছে কাটা, তবে এই কাটাটা একটু বড়—চাব স্কোযাব ইঞ্চিব মত জাযগা জুড়ে।

ওঁদের সঙ্গেই কথা বলে জানতে পারলাম গীতা গতকাল সকালে সত্য ও রেখাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছে, গুরুদেব জানিয়েছেন—বাড়িওয়ালা এক তান্ত্রিকের সাহায্যে ওঁদের পিছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছে। ভূত তাড়ানো যাবে। তবে যাগযজ্ঞের খরচ খুব একটা কম হবে না। এই বিষয়ে কথা বলার জন্য মা ও বড়দাকে নিয়ে আগামী শনিবার যেতে বলেছেন। বাড়িওয়ালা এ বাড়িতে থাকেন না। থাকেন বৃহত্তর কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে। আর এ বাড়িটা বৃহত্তর কলকাতার উত্তর প্রান্তে, দমদমে।

বাড়ির তিন ছেলের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, তাঁরা প্রত্যেকেই অনেক ভুতুড়ে ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটার সময় তাঁরা ছাড়াও বাড়ির কেউ না কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল বা ছিলেন।

পুরো বিষয়টা নিয়ে ভালোমত আবার নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাচ্ছি, পাঁচ জন মহিলা স্পষ্টতই দাবি করছেন, তাঁরা এক বা একাধিক ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটতে দেখেছেন, যেখানে তাঁরা প্রত্যেকেই একাই উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাগুলো ঘটার সময় আর কেউই সেখানে ছিলেন না। অর্থাৎ কি না, বাস্তবিকই ভুতুড়ে ঘটনা।

এবার এঁদের কথাগুলোর ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। এঁদের মধ্যে সম্ভবত একজন ইচ্ছে করে অথবা নিজের অজান্তে ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছেন। বাকি চারজন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে নিয়েছেন—এ বাড়িতে ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে। এই একান্ত বিশ্বাস থেকে তাঁরা হয়তো ধোঁয়ার কুণ্ডলী জাতীয় কিছু দেখেছেন, 'দেশ' সাপ্তাহিক যেন নড়েছে বলে মনে করেছেন, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই নিজেকেই ভুতুড়ে ঘটনার একক প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার লোভে কাল্পনিক গপ্পো ফেঁদেছেন। সাধারণভাবে মানুষের কোনও বিশেষ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার মধ্য দিয়ে লোকেদের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার একটা লোভ থাকে। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত তেমনই কিছু ঘটেছে।

অবশ্য এমনটাও অসম্ভব নয়, গুরুতে একজন মস্তিষ্ক কোষের বিশৃঙ্খলার দরুন নিজের অজান্তে ভুতুড়ে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং এই মানসিক রোগই সংক্রামিত হয়েছে আরো এক বা একাধিক মহিলার মধ্যে।

উপায় একটা আছে, তবে সময়সাপেক্ষ। যে পাঁচজন মহিলা এককভাবে ভুতুড়ে কাণ্ডের দর্শক ছিলেন বলে দাবি করছে ও করছেন তাঁদের প্রত্যেককে দিয়ে সত্যি বলান।

নিত্য ও সত্যকে বললাম, "আপনারা সহযোগিতা করলে আজ থেকেই কাজ শুরু করতে পারি। তবে আজই ভূতের অত্যাচার বন্ধ হবে, এমন কথা বলছি না। মালা, রেখা, ছন্দা, রেণু ও গীতাকে সম্মোহন করে বাস্তববিকই ভুতুড়ে ব্যাপারগুলো কিভাবে ঘটছে সেটা জেনে নিতে চাই। আশা রাখি, অবশ্যই আসল-সত্যটুকু ওঁদের কাছ থেকেই জেনে নিতে পারব। কী করে ঘটছে জানতে পারলে, ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে আর যেন না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হবে না। আজ আমি একজনকে সম্মোহন করবো। এমন হতে পারে বাকি চারজনকে সম্মোহন করতে আরও চারটে দিন আমাকে আসতে হবে।"

প্রথম যাকে সম্মোহন করার জন্য বেছে নিলাম, সে বেণু। বেণুর গায়ের রঙ মাজা, মোটামুটি দেখতে, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, বেণুকে সম্মোহন করতে বেণুর সহযোগিতাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বেণুর অনুমতি নিয়েই ঘরে রাখলাম আমাদের সমিতির সদস্য মৈনাক, রঘু ও পিনাকীকে। উদ্দেশ্য, ওদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি।

বেণুকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সাজেশন দিতে লাগলাম বা ওর চিন্তায় ধারণা সঞ্চার করতে লাগলাম। শুরু করেছিলাম এই বলে, "তোমার ঘুম আসছে। একটু একটু করে চোখের পাতাগুলো ভারি হয়ে আসছে। ঘুম আসছে।" সম্মোহন প্রসঙ্গে 'অলৌকিক নয় লৌকিক' বইয়ের প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। তাই এখানে সম্মোহন বিষয়ে আবার বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না। এক সময় বেণুর বন্ধ চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও এখন সম্মোহিত। চোখের পাতার নিচে মণি দুটো এখন স্থির।

টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিলাম। শুরু করলাম প্রশ্ন। উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল বেণু।

আমি—তোমাকে বাড়ির সকলে ভালবাসে? নাকি কেউ কেউ তোমাকে মোটেই পছন্দ করে না?

বেণু—বাড়ির সকলেই ভালবাসে।

আমি—আমি তোমাকে একটা করে নাম বলছি, তুমি বলে যাবে তারা ভালবাসে কি না? দিদা?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—নিত্যদা?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—বউদি?

বেণু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। আবার জিজ্ঞেস করলাম—বউদি?

বেণু—হ্যাঁ, ভালইবাসে।

বুঝলাম, বেণু বউদিকে তেমন পছন্দ করে না।

আমি—রেখাদি?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—ছন্দা?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—সত্যদা?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—চিত্তদা?

বেণু—চিত্তদা, চিত্তদা, চিত্তদা সুজাতাকে ভালবাসে।

আমি—তুমি চিত্তদাকে ভালবাস?

বেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিত্তদাকে খুব ভালবাস?

বেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিত্তদার পাজামাটার ওই রকম জায়গাটা কাটলে কেন?

বেণু—বেশ করেছি।

আমি—বেশ মজাই হয়েছে। চিত্তদার উপর একচোট শোধ তুলে নিয়েছে। তুমি কি দিয়ে ওদের সব জামা-কাপড়গুলো কেটেছো? ব্লেড দিয়ে?

বেণু—না, কাঁচি দিয়ে।

আমি—ওরা কেউ তোমাকে সন্দেহ করেনি?

বেণু—না।

আমি—তুমি আজ সন্ধ্যায় লোডশেডিং-এর সময় ছন্দাকে চড় মেরেছিলে?

বেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমিই মোয়া সরিয়ে পরে খাওয়া মোয়াটা ফেলেছিলে?

হ্যাঁ, মাখা আটা রান্না ঘরের দেওয়ালে কে ছুঁড়েছিল?

বেণু—আমি।

আমি—বাথরুমে বউদির মাথায় চায়ের পাতা ছুঁড়ে মেরেছিলে?

বেণু—না।

আমি—তবে, কি করে বন্ধ বাথরুমে বউদির মাথায় চায়ের পাতা পড়লো?

বেণু—আমার মনে হয় বউদি নিজেই করেছে। ও খুব মিথ্যেবাদী।

বেণু—আর বউদিকে শ্যাম্পুর কৌটো ছুঁড়ে মারা?

বেণু—ওটা আমিই করেছিলাম।

আমি—বউদি বলছিলেন ঘর বন্ধ ছিল।

রেণু—মিথ্যে কথা।

আমি—তোমার হাত থেকে লোহার চুড়ি একটু একটু করে নিজে থেকেই বেরিয়ে আসছিল, অনেকে নাকি দেখেছেন? ব্যাপারটা কী বলতো।

বেণু—আমিই চুড়িটা খুলে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম—আরে আরে চুড়িটা নিজে থেকেই হাত থেকে খুলে বেড়িয়ে এলো। ওরা সকলেই টিভি দেখছিল। আমার কথায় মেঝের দিকে তাকায়। চুড়ি পড়ে থাকতে সকলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আমি—ওদের ভয় দেখাতে তোমার ভালো লাগছে?

বেণু—মজা লাগছে।

বেণুর সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছিল। বুঝতে অসুবিধে হয়নি চিত্তকে ওর ভালো লাগে। চিত্তকে ঘিরে ও অনেক কথাই বলেছিল, যার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে সেটা শুধু চিত্ত ও বেণুই জানে। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি বেণুর অতৃপ্ত প্রেম, তার অবদমিত যৌন আবেগ মস্তিষ্ককোষের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, তারই পরিণতিতে বিভিন্নজনের এবং নিজের পোশাকের যৌনস্থান ঢাকা পড়ার জায়গাগুলোয় কাঁচি চালিয়েছিল।

এটুকু জানান বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বেণুকে সামাল দিতেই ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার বন্ধ হয়ে যায়। এই একই সঙ্গে আরো জানাই, ওই পরিবারের যাঁরা এককভাবে ভূতদর্শী ছিলেন, তাঁরাও পরবর্তী পর্যায়ের আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আগের ভূত দেখার দাবিগুলোকে হয় এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন, নয় স্বীকার করেছেন বলার সময় কিছু রঙ চড়িয়ে ফেলেছিলেন।

বহু ভূতুড়ে ঘটনার অনুসন্ধান করেছি। বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি, অনেকের মিথ্যা ভাষণে, অতি সাধারণ ব্যাপার পল্লবিত হয়ে বিশাল ভুতুড়ে ঘটনার রূপ নিয়েছে। এই জাতীয় প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে দেখেছি, প্রত্যক্ষদর্শীর দাবিদারেরা হয় অন্যের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গুরুত্ব পাওয়ার মানসিকতায় মিথ্যে বলেছে, নতুবা নিজেদের বিশ্বাসকে অন্যের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে মিথ্যে বলেছে। আজ পর্যন্ত পাওয়া কয়েক শো ভুতুড়ে ঘটনার প্রতিটি সমাধান করেই এ কথা বলছি।

অদ্ভুত জল ভূত

এগারো বছরের ঝক্‌ঝকে চোখের চট্‌পটে ছেলে অমিতকে (প্রয়োজনের তাগিদে নামটা পাল্টালাম) ঘিরে ৬ মার্চ ১৯৮৯ থেকে ঘটে চলেছিল কতকগুলো অদ্ভুত ভুতুড়ে ঘটনা।

অমিত গুপ্ত কলকাতার এক অতি বিখ্যাত স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। থাকে উত্তর কলকাতায়। কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতাবাসী। নিজেদের বাড়ি। বনেদী পরিবার। বাপ-ঠাকুরদার খেলার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবসা। এক নামে খেলার জগতের সকলেই দোকান ও দোকানের মালিককে চেনেন।

অমিতকে ঘিরে ভুতুড়ে রহস্যের কাণ্ডটা জানতে পারি ১৫ মার্চ। 'আজকাল' পত্রিকার দপ্তরে গিয়েছিলাম। যেতেই আমার হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন পূষণ গুপ্ত। চিঠিটাই এখানে তুলে দিচ্ছি।

শ্রী অশোক দাশগুপ্ত সমীপেষু,
সম্পাদক, আজকাল পত্রিকা,
সবিনয় নিবেদন,

আমার পুত্র (নামটা দিলাম না) স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। তাকে কেন্দ্র করে কিছু অলৌকিক (?) কাণ্ড ঘটে চলেছে—যা আমার স্ত্রীর বয়ানে লিপিবদ্ধ। বয়ানটি

আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সঙ্গে দিলাম। ঘটনাগুলোকে আমার যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে পারছে না। আবার তাকে অস্বীকার করে সত্য প্রতিষ্ঠা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বাড়িতে এ নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই অশান্তি। এই পরিস্থিতিতে আমি ও আমার স্ত্রী যুক্তিবাদী শ্রী প্রবীর ঘোষের শরণাপন্ন হতে চাই। এ বিষয়ে আপনার অনুমতি ও সাহায্য আমার পরিবারে শান্তি আনবে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার ও প্রবীরবাবুর সাহায্য পেলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। নমস্কার।

ঠিকানা স্বাক্ষর

আমাদের সুবিধের জন্য ধরে নিচ্ছি অমিতের বাবার নাম সুদীপ, মা অনিতা। অনিতার তিন পৃষ্ঠার বয়ান পড়ে যা জানতে পারলাম, তার সংক্ষিপ্তসার—৬ থেকে ৯ মার্চ চারদিন রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ভিতরের উঠোনে, দরজার ঠিক সামনেই দেখা যেতে লাগল কিছুটা করে জল পড়ে থাকছে। ১০ তারিখ রাত ৮টা নাগাদ ঘরের আলো নিভিয়ে পর্দা সরিয়ে খাটে বসেছিলেন সৈকতের মা অনিতা ও বাবা সুদীপ। সামান্য সময়ের জন্য নিজেরা কথা বলতে বলতে বাইরে নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন বারান্দায় চোখ পড়ল তখন ওঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন উঠোনে পড়ে আছে কিছুটা পায়খানা। ১১ তারিখ সকাল ৯টা থেকেই শুরু হলো ভূতের (?) তীব্র অত্যাচার। অমিতের ঠাকুমা পুজো করছিলেন। হঠাৎ ভিতরের উঠোনে চোখ পড়তেই দেখলেন উঠোনে এক গাদা জল। তারপর থেকে সারা দিন রাতে প্রায় চল্লিশবার জল পড়ে থাকতে দেখা গেছে বিভিন্ন ঘরে, বিছানায়, টেলিভিশনের ওপরে। এই শুরু, এরপর প্রতিটি দিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলতেই থাকে ভূতের তাণ্ডব।

অনিতার জবানবন্দীতে, "চেয়ারে বসে অমিত পড়ছে, পাশেই বিছানা। কলমের ঢাকনাটা তুলতে বিছানার দিকে হাত বাড়াতেই দেখা গেল, বিছানা থেকে কলের জলের মত জল পড়ে অমিতের জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে দিল।"

অমিতদের ঠিক পাশেই অমিতের মামার বাড়ি। ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে অমিতকে মামার বাড়িতে রাখা হয়। সেখানেও ভূত অমিতকে রেহাই দেয়নি। সেখানেও শুরু হয় ভূতের উপদ্রব। নানা জায়গায় রহস্যজনকভাবে জলের আবির্ভাব হতে থাকে। অমিত বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করেছে সবে, হঠাৎ ওর মাথার উপর কে যেন হুড়-হুড় করে জল ঢেলে দিল। অথচ বাথরুমের একটি মাত্র জানলাও তখন ছিল বন্ধ।

এরপর অমিতকে আবার নিজের বাড়িতেই ফিরিয়ে আনা হয়। বাড়িতে অনবরত চলতেই থাকে ভূতের জল নিয়ে নানা রহস্যময় খেলা। সেদিনই রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা নাগাদ গৃহ-শিক্ষক অমিতকে পড়াচ্ছিলেন। গৃহ-শিক্ষকের সামনেই অমিতের চেয়ারে হঠাৎ একগাদা জলের আবির্ভাব। সেই রাতেই বাড়ির ও পাড়ার লোকজন অমিতদের ভিতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে জল-ভূতের বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে বাড়িতে দু'জন তান্ত্রিক দিয়ে তন্ত্র-মন্ত্র পুজো হয়েছে। এক ব্রাহ্মণ আট ঘণ্টা ধরে যজ্ঞও করেছেন ভূত তাড়াতে। খরচ হয়েছে প্রচুর; কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। এই আলোচনায় সুদীপবাবু জানান, বাড়িটাই বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন। এতদিনের বাস তুলে চলে যাবেন, সিদ্ধান্তটা প্রতিবেশীদের পছন্দ হয়নি। কয়েকজন শেষ চেষ্টা হিসেবে আমার সাহায্য নেওয়ার কথা জানান। অমিত আলোচনা শুনছিল। ও শারীরিকভাবে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। ঘটনাটা সুদীপবাবুর নজরে পড়ে। অমিতকে এক মগ জল এগিয়ে দিয়ে বলেন, "শরীর খারাপ লাগছে ? চোখে মুখে জলের ছিটে দে, ভাল লাগবে।" অমিত জলের ছিটে দিয়ে সবে ঘুরেছে, অমনি কে যেন ওর মাথায় ওপর ঝপ্‌ঝপ্ করে জল ঢেলে দিল। সারা শরীর ভিজে একশা। অবাক কাণ্ড ! অথচ ওপরেও কেউ ছিলেন না। সেই মুহূর্তে সুদীপ ও অনিতা একমত হলেন—আর নয়, প্রবীরবাবু যদি কিছু করতে পারেন ভাল, নতুবা যে কোনও দামে বাড়িটা বিক্রি করে অন্য কোথাও একটা ফ্ল্যাটই নয় কিনে নেবেন। উপস্থিত প্রত্যেকেই ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। সুদীপ, অনিতার মতামতের বিরোধিতা করতে একজনও এগিয়ে এলেন না।

সুদীপের চিঠি ও অনিতার লিপিবদ্ধ বয়ান পড়ে ঠিক করলাম আজ এবং এখনই অমিতদের বাড়ি যাব। 'আজকাল'-এর গাড়িতেই বেড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গী হলেন দুই চিত্র-সাংবাদিক ভাস্কর পাল, অশোক চন্দ এবং আমার দেহরক্ষী বঙ্কিম বৈরাগী।

অমিত, ওর মা, বাবা জেঠু, ঠাকুমা, দাদু ও কিছু পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললাম। ওদের ধারণা, ঘটনাগুলোর পিছনে রয়েছে ভূতের হাত। গত কাল গীতা ও চণ্ডীপাঠ করে গেছেন হাওড়ার দুই পণ্ডিত। তাতে অবস্থার কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি। ভূতের আক্রমণ সমানে চলেছে। দেখলাম দু-বাড়ির জল-পড়া চেয়ার, বিছানা, মেঝে, টেলিভিশন, উঠোন, এমনকি মামার বাড়ির বাথরুমটি পর্যন্ত। বাথরুমের চার দেওয়াল, ছাদ ও দরজা জানালা দেখে নিশ্চিত হলাম, বন্ধ বাথরুমে বাইরে থেকে জল ছুঁড়ে দেওয়া অসম্ভব। অতএব ?

ঠিক করলাম অমিতকে সম্মোহিত করব। তার আগে অমিতের সঙ্গে এটা এটা নিয়ে গল্প শুরু করে দিলাম। অমিত আমার নাম শুনেছে। আমার সম্বন্ধে অনেক খবর জানে। এও জানতে পারলাম আমার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি পড়ে ফেলেছে। গল্পের বই পড়তে ভালবাসে, বিশেষ করে গোয়েন্দা কাহিনী ও অ্যাডভেঞ্চার। নিজেরও অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাসে।

আমিও আমার ওই বয়েসের গল্প শোনাচ্ছিলাম। কেমনভাবে মায়ের চোখ এড়িয়ে গল্পের বই পড়তে নানা ধরনের পরিকল্পনা করতাম, মা কেমন সব সময় 'পড়-পড়' করে আমার পিছনে টিক্ টিক্ করে লেগে থাকতেন, সেই সব গল্প। পরীক্ষার রেজাল্ট তেমন জুতসই হত না, আর তাই নিয়ে মা এমন বকাঝকা করতেন যে কি বলবো। একবার মাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। মা মারছিলেন, আমি হঠাৎ একটা চিৎকার করে এমন নেতিয়ে পড়েছিলাম যে মা ভেবেছিলেন মারতে মারতে আমাকে বুঝিবা মেরেই ফেলেছেন। তখন মা'র সেকি কান্না।

আমরা দুজনে গল্প করছিলাম। শ্রোতা আমার তিন সঙ্গী। ইতিমধ্যে ছবি তোলার কাজও চলছিল। যখন বুঝলাম আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তখন বললাম, "সম্মোহন তো আমার বইয়ে পড়েছ, নিজের চোখে কখনও দেখেছ ?"

অমিত লাফিয়ে উঠলো, "আমাকে সম্মোহন করবে ?"

বললাম, "বেশ তো, তুমি বিছানাতে শুয়ে পড় ।" অমিত শুয়ে পড়লো । বললাম, "এক মনে আমার কথাগুলো শোন।" আমি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'suggestion' দিচ্ছিলাম, সহজ কথায় বলতে পারি, ওর মস্তিষ্কোষে কিছু ধারণা সঞ্চার করছিলাম । মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে অমিত সম্মোহিত হল । ঘরে দর্শক বলতে আমার তিন সঙ্গী । সম্মোহিত অমিত আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল । আমার বিশ্বস্ত টেপ-রেকর্ডারটা অমিতের বালিশের পাশে শুয়ে এক মনে নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিল । প্রশ্নগুলোর কয়েকটা নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি ।

আমি—কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন ?

অমিত—বাবা ।

আমি—জেঠু ভালবাসেন ?

অমিত—হুঁ ।

আমি—ঠাকুমা ।

অমিত—হু ।

আমি—দাদু ?

অমিত—হুঁ ।

আমি—মা ?

অমিত—মাও ভালবাসে, তবে খুব বকে, খুব মারে ।

আমি—তোমার স্কুলের রেজাল্ট কেমন হচ্ছে ?

অমিত—মোটামুটি ।

আমি—আগে আরও ভাল হতো ?

অমিত—হ্যাঁ ।

আমি—তোমার মা যে এত বকেন, মারেন, তোমার রাগ হয় না ?

অমিত—হয় ।

আমি—প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় না ?

অমিত—হয় ।

আমি—আমার মত দুষ্টুমি করে মাকে ভয় পাইয়ে দাও না কেন ?

অমিত—তাই তো দিচ্ছি ।

আমি—কেমন করে ?

অমিত—জল ভূত তৈরি করে ।

আমি—জল লুকিয়ে রাখছ কোথায় ?

অমিত—বেলুনে ।

আমি—আর ফাটাচ্ছো বুঝি সেপটিপিন দিয়ে ?

অমিত—ঠিক ধরেছেন ।

আমি—বেলুন লুকোতে শিখলে কী করে ? তুমি তো দেখছি দারুণ ম্যাজিসিয়ান ।

অমিত—আমাদের স্কুলে সাইন্স ক্লাব আছে। সিনিয়ার স্টুডেন্টরা অলৌকিক-বাবাদের বুজরুকি ফাঁস করে দেখায় বিভিন্ন জায়গায়, নানা অনুষ্ঠানে ।

ওদেব কাছ থেকে আমবা জুনিযাব স্টুডেন্টবাও অনেক খেলা শিখেছি।

জল ভূতেব বহস্য ফাঁস হওযাব পবেও একটু কাজ বাকি ছিল। ছেলেটিকে সামযিকভাবে তাব মানসিক বিষণ্ণতা থেকে ফিবিযে এনেছিলাম। অনিতাকে বোঝাতে সক্ষম হযেছিলাম—স্নেহশীল মাযেব সন্তানেব ভবিষ্যৎ গডাব ব্যাপাবে অতি উৎকণ্ঠা বা অতি আগ্রহেব ফল সব সময ভাল হয না, যেমনটি হযনি অমিতেব ক্ষেত্রে।

সুদীপ ও অনিতাব কাছে জল-ভূতেব বহস্য উন্মোচন কবে বুঝিযে ছিলাম, কেন অমিত এমনটা কবল, তাব কাবণগুলো। স্থাযীভাবে অমিতকে স্বাভাবিক অবস্থায ফিবিযে আনতে অমিতেব প্রযোজন মাযেব সহানুভূতি, ভালবাসা। সেই সঙ্গে সুদীপ ও অনিতাকে বলেছিলাম, জল ভূতেব বহস্যেব কথা তাঁবা যে জেনে ফেলেছেন, এ কথা যেন অমিতকে জানতে না দেন, কাবও কাছেই যেন অমিতেব এই দুষ্টুমিব বিষযে মুখ খুলে অমিতকে তীব্র সমালোচনাব মুখে ঠেলে না দেন।

অমিতেব মা, বাবাব অনুবোধেই 'আজকাল'-এব পাতায জল ভূতেব বহস্য প্রকাশ কবা হয নি, কাবণ পত্রিকাব প্রতিবেদন অমিতেব নাম গোপন কবা সম্ভব ছিল না, অমিতেব নাম প্রকাশ কবে ওকে মানসিক চাপেব মধ্যেও ফেলা ছিল একান্তই অমানবিক।

গুরুদেবেব আত্মা

এবাবেব ঘটনাব নাযিকা এক বেতাব সঙ্গীত-শিল্পী। '৮৮-ব শীতেব এক সন্ধ্যায স্বামীব সঙ্গে এলেন। স্বামী একটি আধা-সবকাবী প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদে কাজ কবেন। নাম ধবা যাক চঞ্চল আদিত্য। স্ত্রী অপর্ণা। চঞ্চল ছোট্ট-খাট্ট চেহাবাব, বিবল দাডি-গোঁফেব, শান্ত-শিষ্ট মানুষ। গাযেব বঙ ফর্সা। চুল আঁচডানো সুবোধ-বালক ধাঁচেব। বযস বছব পঞ্চাশ। যে চুলগুলো সাদা হযে আছে, সেগুলোতে কলপ দিলে সম্ভবত তিবিশ বলেও চালান যায। অপর্ণা পাঁচ ফুট চাব ইঞ্চিব সুঠাম চেহাবাব বমণীয বমণী। দৃষ্টিতে ও চোখেব কোলে বিষণ্ণতাব ছাপ লক্ষ্য কবলেই ধবা পবে। দেহ-সৌন্দর্যে বহু সদ্য-যুবতীদেবও ঈর্ষা জাগাবাব ক্ষমতা বাখেন। দুই সন্তানেব মা। বড ছেলে বি এস সি দ্বিতীয বর্ষেব ছাত্র। ছোট উচ্চমাধ্যমিক দেবে।

দুজনেব সঙ্গে আলাদা কবে কথা বললাম। চঞ্চল কথা-প্রসঙ্গে জানালেন, পুজো-আর্চা, জ্যোতিষ-বিশ্বাস, , সৎ-সঙ্গ, সৎ-চিন্তা, সৎ-জীবন, সংযম ইত্যাদিকে তিনি বিশেষ মূল্য দেন। স্ত্রীব সঙ্গে যৌন সম্পর্ক খাবাপ নয। তবে যৌন জীবনকে তিনি গুরুত্ব দিতে নাবাজ। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হওযা উচিত আত্মিক, শাবীবিক নয। বছব তিনেক আগে চঞ্চল স্ত্রীকে নিযে যান তাঁব গুরুদেবেব কাছে। অপর্ণাব সেই প্রথম চঞ্চলেব গুরু দর্শন। গুরু জ্যোতিষ চর্চাও কবেন। গুরুদেবেব ইচ্ছেতেই অপর্ণা দীক্ষা নেন। চঞ্চল ছাডাও অপর্ণা মাঝে-মাঝে গুরুদেবেব আশ্রমে যেতেন, গান শোনাতেন। দু'বছব আগে গুরুদেব দেহ বাখেন। তাবপব থেকেই অপর্ণা প্রায গুরুদেবেব আত্মাকে দেখতে পাচ্ছেন। গুরুদেবেব আত্মাব কথা শুনতে পাচ্ছেন। গত এক বছব তিন মাসে

দুজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে অপর্ণার চিকিৎসা করিয়েছেন। সামান্যতম উন্নতিও লক্ষ্য করা যায়নি। বরং আত্মার আবির্ভাব বর্তমানে অত্যাচারে দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণা কথায় কথায়, গল্পে গল্পে অনেক কথাই জানালেন। চঞ্চলের পুজো-আর্চা, জ্যোতিষ-বিশ্বাস, সংযম ইত্যাদি পুরুষত্বহীনতা থেকেই এসেছে। অতিমাত্রায় কামশীতল এবং সংগমকালে বীর্য ধরে রাখার ক্ষমতা অতিমাত্রায় ক্ষণস্থায়ী। নিজের অক্ষমতার জন্যই অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ। ওঁর সন্দেহ থেকে সংসার বাঁচাতে জলসায় গাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে। রেওয়াজের সঙ্গে সংগত করার তবলচী পর্যন্ত নিজের ইচ্ছেয় ঠিক করতে পারিনি। ষাটের ঊর্ধ্বে এক বৃদ্ধকে বিপদ সম্ভাবনা নেই বিবেচনা করে চঞ্চল তবলচী রেখেছেন।

চঞ্চলের কাছে বেশ কয়েকবার গুরুদেবের কথা শুনেছেন অপর্ণা। কিন্তু একবারের জন্যেও আগ্রহ প্রকাশ করেননি, বরং সত্যি বলতে কি পূজা-আর্চা জ্যোতিষী, গুরু, এ সবের উপর এক বিতৃষ্ণাই তীব্রতর হচ্ছিল চঞ্চলের কাপুরুষতা ও হীনমন্যতা দেখে দেখে। তবু সংসারে সুখ ও শান্তি বজায় রাখতে এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী, পুত্রদের সেবার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নিজের সঙ্গেই নিজে সংগ্রাম করছিলেন অপর্ণা। কিন্তু যে দিন চঞ্চলের গুরুদেব আনন্দময়কে দেখন, সেদিন কিছুটা চমকে গিয়েছিলেন অপর্ণা। এঁকেই এত শ্রদ্ধা করেন চঞ্চল ? আনন্দময় অপর্ণার চেয়ে দু-চার বছরের ছোটই হবেন। আনন্দময় চালাক-চতুর সুদর্শন যুবক। মেয়েরা নাকি ছেলেদের চাউনি দেখলেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন। অপর্ণাও পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন আনন্দময় অপর্ণায় মজেছেন, অপর্ণাকেও মজাতে চান। কিছুটা বেপরোয়া আনন্দ পেতে কিছুটা চঞ্চলের উপর প্রতিশোধ তুলতে চঞ্চলকে না জানিয়েই অপর্ণা গুরুদেবের আশ্রমে গিয়েছেন। গুরুদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন একটু একটু করে বাড়ছে সেই সময়ই তিনি দেহ রাখলেন। না, চূড়ান্ত দেহ মিলনের ইচ্ছে থাকলেও তেমন সুযোগ ঘটার আগেই আনন্দময়ের জীবনে শেষদিন ঘনিয়ে আসে। তারপর থেকেই আনন্দময়ের অতৃপ্ত আত্মা অপর্ণার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছায় ঘোরাঘুরি করে। অপর্ণার শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দেয়। ঘুমের মধ্যে অনেক দিন নাকি মৈথুনের চেষ্টা করেছে।

অতৃপ্ত যৌন-বাসনার থেকেই অপর্ণার বিষণ্ণতা। অপর্ণার আকর্ষণীয় সৌন্দর্যে যখন পুরুষরা স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষিত, তখন অপর্ণার জীবনে এসেছেন এক নীতিবাগীশ যৌনসুখদানে অক্ষম সন্দিগ্ধ পুরুষ। অপর্ণা যখন নিজের জীবনকে গুটিয়ে নিয়ে সংসারের কাজেই নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার চিন্তাগুলোকে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছে, তখনই জীবনে এসেছে চঞ্চলের গুরুদেব। গুরুদেব অপর্ণার সুপ্ত কামনা-বাসনাগুলোকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন। অপর্ণার অতৃপ্ত বাসনা যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, তখনই বাসনার আগুনে জল ঢেলে দিল গুরুদেবের মৃত্যু। এই মৃত্যু অপর্ণার জীবনে নিয়ে এসেছে হতাশা ও বিষণ্ণতার জমাট অন্ধকার। অপর্ণার জীবনে গুরুদেব মরীচিকার মতই এসেছেন, অপর্ণার পিপাসাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সন্দেহপ্রবণ স্বামীর দৃষ্টি এড়িয়ে জীবনকে ভোগ করার একমাত্র উপায়, একমাত্র নায়ক ছিলেন গুরুদেব। এখন কী হবে ? আবার সেই স্বামী নামক এক মেরুদণ্ডহীন মানুষের

ইচ্ছেব কাছে নিজেকে তুলে দিতে হবে ? বলি দিতে হবে নিজেব সদ্য নতুন কবে জেগে ওঠা যৌবনকে ? গুরুদেবেব মৃত্যু অপর্ণাব হতাশাকে, বিষণ্ণতাকে বাড়িযেই তুলেছে, জাগিযে তুলেছে এইসব প্রশ্নকে। ঘুবে ফিবে এসেছে গুরুদেবেব চিন্তা। গুরুদেবেব চিন্তা মস্তিষ্ককে এমনভাবে আচ্ছন্ন কবে বেখেছে যে, অন্য কোনও জীবনধর্মী চিন্তা সেখানে স্থান পাযনি। একটু একটু কবে জীবনেব সঙ্গে সম্পর্কিত অপবাপব শর্তাধীন প্রতিফলনগুলো বা conditioned reflexগুলো স্তিমিত হতে থাকে, দুর্বল হতে থাকে। অপর্ণা বিষণ্ণতা বোগেব শিকাব হযে পবেন। উপসর্গ হিসেবে অলীক শ্রবণ, অলীক দর্শন ইত্যাদি মাথা চাড়া দিযে উঠেছে।

স্থাযীভাবে অপর্ণাকে সুস্থ কবে তোলাব জন্য অপর্ণাব স্বামী চঞ্চলেব সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা কবে বোঝাতে চেষ্টা কবেছিলাম, কেন এব আগে চিকিৎসকবা অপর্ণাকে সুস্থ কবে তুলতে ব্যর্থ হযেছিলেন। স্বামী হিসেবে তিনি চিকিৎসকের ও ওষুধেব হাতে স্ত্রীকে সমর্পণ কবে নিজেব দাযিত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন। কিন্তু এভাবে স্ত্রীকে সুস্থ কবে তোলা বা অব্যাহতি পাওযা অসম্ভব। সহবাসে বীর্যক্ষযেব জন্য দেহ-মনেব ক্ষতি হয এমন ভাবাটা যে একান্তভাবেই ভুল ও বিজ্ঞান-বিবোধী এই সত্যটুকু বোঝাতেই তাঁব সঙ্গে দুটি দিন বসতে হযেছিল। বুঝিযে ছিলাম, একটা বিড়াল পুষলে, তাকেও খেতে দিতে হয। না দিলে এব-ওব হেঁসেলে মুখ দেবে, এটাই স্বাভাবিক। যাকে জীবনসঙ্গিনী কবে এনেছেন, তিনি পুতুল নন, বক্ত-মাংসেব মানবী। তাঁকে যৌবনেব স্বাভাবিক খোবাকটুকু না দিলে তিনি যদি অন্যেব হেঁসেলে নজব দেন, তবে তাব সম্পূর্ণ দায আপনাবই। আপনাব ভিক্টোবিযান যুগেব যৌনশুচিতাব ধ্যান-ধ্যাবণাগুলো পাল্টান। যদি আপনি নিজেকে পাল্টাতে সচেষ্ট হন, শুধুমাত্র তবেই আমি আপনাব স্ত্রীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিবিযে আনাব চেষ্টা কবতে পাবি। নতুবা কযেকদিনেব জন্য তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায আনতে আমি শ্রম দিতে নাবাজ।

চঞ্চল আন্তবিকভাবে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা কবেছিলেন। আমি সাহায্য কবেছিলাম মাত্র। চঞ্চল স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীব দৈহিক সম্পর্কেব জীবনে ফিবেছিলেন। আমিও আমাব কথা বেখেছিলাম। অপর্ণা বর্তমানে সুখী স্ত্রী।

একটি আত্মাব অভিশাপ ও ক্যাবাটে মাস্টার

'৮৭-ব ১ জুলাই, প্রচণ্ড গবমে ক্লান্ত শবীবটা নিযে সন্ধে সাতটা নাগদ বাড়ি ফিবে দেখি লোডশেডিং-যেব মধ্যে বৈঠকখানায চাব তরুণ আমাবই অপেক্ষায বসে। দুজন এসেছেন একটি সাইন্স ক্লাব থেকে, ওঁদেব একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে। তৃতীয তরুণ ববীন্দ্রনাথ পাইন জানালেন, তিনি এসেছেন একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিযে। চতুর্থজন ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গী। দুই তরুণেব সঙ্গে প্রযোজনীয কথা সেবে বিদায দেওযাব পব ববীন্দ্রনাথেব দিকে মন দিলাম। ববীন্দ্রনাথেব ডাক-নাম ববি। বযেস জানাল একুশ। অনুমান কবলাম লম্বায পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চিব মধ্যে, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন

কে জি। পরনে সাদা টেরিকটনের ট্রাউজার ও কালো গেঞ্জি। ট্রাউজারের ফ্যাসানে আধুনিকতার ছোঁয়া, উরুর পাশে কালো সুতোয় মোটা করে লেখা Ashihara Kai-Kan (Karate)। হাফ-হাতা গেঞ্জির জন্য বাহুর যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে হাউন্ডের মত পেশীর আভাস। রবির চোখের দৃষ্টি ও ফাঁক হয়ে থাকা এক জোড়া ঠোঁট স্পষ্টতই ওর মানসিক ভারসাম্যের অভাবের ইঙ্গিত বহন করছিল।

রবি কথা শুরু করল এইভাবে, "আপনি আমাকে বাঁচান, নইলে মরে যাব। আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই।"

বললাম, "আমার দ্বারা তোমাকে যদি বাঁচান সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই বাঁচাব। তোমার সব কথাই শুনব, তার আগে বলতো, আমার ঠিকানা কোথা থেকে পেলে? কেউ তোমাকে পাঠিয়েছেন?"

"জুন সংখ্যা 'অপরাধ' পত্রিকায় আপনার একটা ইন্টারভিউ পড়ি গতকাল। লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়, কেউ যদি আমাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারেন, তবে সে আপনি। আমি অপরাধ পত্রিকার অফিস থেকেই আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি।"

ইতিমধ্যে আমাদের জন্য লেবু-চা এসে গেল। দুটো কাপ রবি ও রবির বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "বাঃ, তুমি তো খুব তৎপর ছেলে।"

রবি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, না, তা নয়, আপনি যদি আমার বর্তমান মানসিক অবস্থাটা বুঝতেন, মানে আমি যদি আমার মানসিক অবস্থা আপনার সামনে খুলে দেখাতে পারতাম, তাহলে বুঝতেন একান্ত বাঁচার তাগিদেই আমি আপনার ঠিকানার জন্য কালই লেখাটা পড়ে পত্রিকার অফিসে দৌড়েছি।"

"যাই হোক তুমি যখন আমার কাছে এসেছ, তোমার সব কথাই শুনবো এবং সাধ্যমত সমস্ত রকমের সাহায্য করব। ততক্ষণ ররং আমরা চা খেতে খেতে তোমাদের বাড়ির কথা শুনি।"

একটু একটু করে ওর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। মা, বাবা, সাড়ে চার বছরের ভাই পুকাই ও রবিকে নিয়ে ছোট সংসার। বাবা ঘনশ্যাম পাইন আপনভোলা মানুষ, গুণী যন্ত্রসংগীত শিল্পী। বহু ধরনের বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়েছেন বাংলা ও বোম্বাইয়ের বহু জনপ্রিয় লঘু-সংগীত শিল্পীর সঙ্গে। অনেক সিনেমা এবং নাটকেও যন্ত্রসংগীত শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন। স্থায়ী আবাস তৈরি করে উঠতে পারেননি। থাকেন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে 'আলোছায়া' সিনেমা হলের কাছে ভাড়া বাড়িতে।

রবি 'আসিহারা কাইকান ক্যারাটে অরগানাইজেশন'-এর ফুলবাগান ব্রাঞ্চের নিষ্ঠাবান প্রশিক্ষক। পার্ক সার্কাসে অরগানাইজেশনের প্রধান কার্যালয়। প্রধান পরিচালক ভারতীয় ক্যারাটের জীবন্ত প্রবাদ পুরুষ দাদি বালসারা। ফুলবাগান ব্রাঞ্চটা এল' পার্কে। এখানে রবি ক্যারাটে শেখায় সপ্তাহে তিন দিন, রবি, বুধ ও শুক্র, সকাল ৬টা থেকে ৮-৩০। নিজে সিনিয়ার ব্রাউন বেল্ট। এবারই ব্ল্যাক বেল্ট পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। বর্তমান অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি।

কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে এমনকি বাংলার বাইরেও বহু ক্যারাটে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে রবি। কখনও দাদি বালসারার সঙ্গে, কখনও ব্যক্তিগতভাবে। শেষ প্রদর্শনী '৮৬-র সরস্বতী পুজোর দিন বেলেঘাটা কর্মী সংঘের মাঠে। সেদিন কনুইয়ের

আঘাতে ববি আটটা ববফেব স্ল্যাব ভেঙে দর্শকদেব মুগ্ধ কবেছিল, ভালবাসা আদায় কবেছিল। দুটো বিশাল ববফেব চাঁই কেটে তৈবি হযেছিল ওই আটটা স্ল্যাব।

ববি এবাব আসল ঘটনায ফিবল। বলতে শুরু কবল, 'মাস'দুযেক আগেব ঘটনা, সে দিনটা ছিল এপ্রিলেব ২৫, শনিবাব। খবব পেলাম ববি নামে একটা ছেলে ট্রেনেব তলায মাথা দিযে আত্মহত্যা কবেছে। খববটা পেযে যখন দেখতে হাজিব হলাম তখন দেরী হযে গেছে, পুলিশ লাশ নিযে চলে গেছে।

"পবদিন ববিবাব, সকালে ক্লাবে ক্যাবাটে ট্রেনিং দিযে বাড়ি এলাম ন'টা নাগাদ। আমাদেব বাড়িতে এক উঠোন ঘিবে কযেক ঘব ভাড়াটে। ক্যাবাটেব ব্যাগ নিযে ঢুকলাম পাশেব কার্তিক কাকুব ঘবে। এটা-সেটা নিযে গল্প কবতে কবতে এক বাটি মুড়ি এসে গেল। হঠাৎ গতকালেব বেলে কাটা পড়াব কথা উঠল। কাকুকে বললাম, গতকাল যে ছেলেটা কাটা পড়েছে সে নাকি আত্মহত্যা কবেছে, নাম ছিল ববি। ওই ববিব বদলে আমি ববি গেলেই ভাল হত।

"ওই ববিব বদলে আমি ববি মবলে ভাল হত, এই কথাটা ঘুবে ফিবে বাব কযেক প্রকাশ কবতে হঠাৎই কাকু আমাব চোখেব দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিযে বললেন, খুব মবাব শখ হযেছে, নাবে?

"কাকুব ওই কথাটা কেমন একটা অদ্ভুত শিহবণ জাগিযে কেটে কেটে আমাব মাথায ঢুকে গেল। মাথাব সমস্ত চিন্তাগুলো তালগোল পাকিযে গেল। কাকুব চোখে দিকে তাকিযে গা শিবশিব কবে উঠল। মুহূর্তে আমাব সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিল। থবথব কবে কাঁপছিলাম। দু-পাযেব উপব নিজেব শবীবকে ধরে বাখতে পাবছিলাম না। এক সময দেখলাম হাতেব বাটি থেকে মুড়িগুলো ঝরঝব কবে পড়ে যাচ্ছে। গা গুলিযে উঠল। ঘবেব চৌকাঠ পেকলেই এক চিলতে বাবান্দা। কোনও মতে বাবান্দায গিযে হাজিব হতেই হড় হড় কবে বমি কবে ফেললাম। আমাব চোখেব সামনে ছয-সাত বছব আগে দেখা একটা দৃশ্য ছাযাছবিব মত ভেসে উঠল।

"আশি বা একাশি সালেব বর্ষাকালেব সকাল। আনন্দ পালিত বোডেব ব্রিজটাব ওপব দিযে আসছিলাম বাজাব করে। অনেক তলায বেল লাইনেব মিছিল, যথেষ্ট ব্যস্ত লাইন। দু-পাঁচ মিনিট পবপবই ট্রেন চলাচল কবে, একটু দূবে লাইনেব ধাবে একটা লোককে দাঁড়িযে থাকতে দেখে আমিও দাঁড়িযে পড়লাম। লোকটা আত্মহত্যা কববে না তো?

"মিনিটখানেক অপেক্ষা কবতেই একটা ট্রেন আসতে দেখলাম। লোকটা চঞ্চল হল। ট্রেনটা কাছাকাছি হতেই লোকটা লাইনেব উপব গলা দিযে দু'হাত দিয়ে লাইন আঁকড়ে বইল।

"তীব্র সিটি বাজিযে ব্রেক কসল ট্রেনটা। দু-পাশেব চাকা থেকে আগুনেব ফুলকি ছিটোতে ছিটোতে ট্রেনটা লোকটাব উপব দিয়ে চলে গেল। গলাহীন শবীরটা পাথবেব টুকবোব ঢাল বেযে নেমে এল। গাড়িটা যখন থামল তখন শেষ কামবাটাও লোকটাব দেহ অতিক্রম করে গেছে। গার্ড নেমে দেহটা দেখে খাতায কী নোট করে সিটি বাজিযে দিল। বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টেব দবজা জানলা দিযে উঁকি মারা অনেক উৎকণ্ঠিত মাথা নিযে ট্রেনটা চলে গেল। এবাব আমি কাটা মুণ্ডুটাকে দেখতে পেলাম। দু-পাশেব

এমন একটা বোমাঞ্চকব ভুতুড়ে ব্যাপাব নেহাৎই মাঠে মাবা যাবে ?

শেষ চেষ্টা হিসেবে জলে ডোবার আগে খড়কুটো ধবাব মত ধবলাম কলকাতা পুলিশেব গোয়েন্দা দপ্তবেব ডেপুটি কমিশনাব নম্বব ওয়ান শ্রী সুবিমল দাশগুপ্তকে। স্মার্ট চেহারাব অসাধাবণ ঝকঝকে চোখেব অধিকাবী সুবিমলবাবুকে পুলিশ ভূতেব বিষয়ে জিজ্ঞেস কবলাম, "আপনাদেব গোয়েন্দাবা নাকি হাজাব মাথা ঘামিয়েও এই ভৌতিক বহস্যেব কিনাবা কবতে পাবেননি ? এখন একটা শান্তি-স্বস্ত্যযনেব কথা ভাবছেন ?"

সপ্রতিভ কণ্ঠে শ্রী দাশগুপ্ত উত্তব দিলেন, "ওই ভূতের ব্যাপাবটা পুবোপুবি মিথ্যে। এমন কোন ঘটনাই আদপে ঘটেনি, সুতবাং আমাদেব দপ্তবেব মাথা ঘামাবাবও কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

এবপব যোগাযোগ কবি ট্যাক্সি-ড্রাইভাবস ইউনিযনেব সঙ্গে। সাধাবণ সম্পাদক শিশিব বায জানান, তাঁরা অনেকেই ঘটনাটা শুনেছেন, কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষদর্শী নন। অনেকে অবশ্য ঐ পথ বর্জন কবে চলেছেন।

আমাব কাছে যেটা বিস্ময়কব মনে হয়েছে সেটা হল, এমন একটা বিদ্ঘুটে মিথ্যে খবব আনন্দবাজাবেব মত নামী-দামী পত্রিকা এত গুরুত্ব দিযে প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপাল কী কবে ? অদ্ভুতুড়ে খববটি দেখে বার্তা-সম্পাদক বা সম্পাদকেব কাবোও কি একবাবেব জন্যেও মনে হযনি, খববটিব সত্যতা যাচাইযেব প্রযোজন আছে ?

এক সত্যি ভূতেব কাহিনী ও এক বিজ্ঞানী

ভূত নেই নেই কবে যাঁবা চেঁচাচ্ছেন, যাঁবা বিজ্ঞানেব দোহাই দিযে বলছেন, "মৃত্যুব পবেই মানুষের সব শেষ", "আত্মা মোটেই অমব নয়," তাঁদেব চ্যালেঞ্জ জানিযেই একটি ভূতেব "সত্যি কাহিনী" প্রকাশিত হলো "পুলিশ ফাইল" নামেব একটি মাসিক পত্রিকায। পুলিশ ফাইল পত্রিকাব সম্পাদক মোটেই এলে-বেলে লোক নন, দস্তুব মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনীশ দেব। ভৌতিক ঘটনাটির নাযক দেবেন, নাযিকা অনুবাধাব ছবিও সম্পাদক প্রকাশ কবেছিলেন, সেই সঙ্গে দিযেছিলেন দেবেনেব পুবো ঠিকানা।

ঘটনাটা ছোট্ট কবে জানাচ্ছি।

দেবেন থাকেন 'কলকাতাব কাশীপুবেব ২৬ নং শ্যামল মুখার্জী লেনে। দেবেনেব বাবা বামদেববাবু পুবসভার কেরানী। দেবেন বযসে তরুণ। বিয়ে কবে ১২ জুন ১৯৮৫। স্ত্রীব অনুবাধা ভুবনেশ্ববেব কাজী লেনেব বাসিন্দা ছিলেন। বাবাব নাম জগদেব নাবাযণ।

বিযেব পর দিন ১৩ জুন প্রথম ভৌতিক ঘটনাটা ঘটল। ফুলশয্যাব বাতে দেবেন অনুবাধাকে একা পেয়ে অনুবাধার গলা এবং শবীবের নানা অংশে প্রচণ্ড জোরে কামড়ে বক্তাক্ত কবে তুলল। সেই সঙ্গে ভয দেখিযে বলল, "তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন বাঁচতে পাববে না। আমি তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাব।" আবও একটা অদ্ভুত ব্যাপাব

হল, দেবেন যখন এই কথাগুলো বলছিল তখন তা দেবেনের গলার স্বর ছিল না, মেয়ের কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছিল।

অনুরাধা ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। চিৎকারে অনুরাধার শাশুড়ী ও ননদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

শাশুড়ীর কাছে এসে ঘটনাটুকু সংক্ষেপে বলে অনুরাধা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অনুরাধাকে শুইয়ে দিয়ে দেবেনের মা বাবা ও দুই বোন ফুলশয্যার ঘরে ঢুকে দেখেন দেবেন ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে তুলে দেবেনকে কামড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করায় দেবেন বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, এমন কিছু সে করেইনি। সকলে এবার এলেন অনুরাধার কাছে। ঘুমন্ত অনুরাধার ক্ষত থেকে আবরণ সরাতেই আর এক বিস্ময় ? কোথায়ই বা ক্ষত ? কোথায়ই বা রক্ত ?

দ্বিতীয় রাতে অনুরাধাকে একা পেয়ে দেবেন আবার আক্রমণ চালাল। কামড়ে নাক আর দুটো কান কেটে নিল।

অনুরাধার চিৎকারে এ রাতে দেবেনের বাড়ির লোক ছাড়া প্রতিবেশীরাও ছুটে এলেন। অনুরাধাকে নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি করা হল। কাশীপুর থানায় খবর গেল। পরদিন সকালে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর পঙ্কজকুমার লাহা তদন্ত করতে হাসপাতালে গেলেন। সেই সময় অনুরাধার নাক কান আর বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য জানালেন বেশি রক্তপাতের জন্য অনুরাধার বাঁচার আশা নেই।

শ্রীলাহা এবার এলেন কাশীপুরে দেবেনের বাড়িতে। দেবেন জানালেন, তিনি এইসব ঘটনার কিছুই জানেন না। শ্রীলাহা দেবেনকে নিয়ে গেলেন মৃত্যুর প্রহর গোনা অনুরাধার কাছে। কিন্তু কী আশ্চর্য ? হাসপাতালে অনুরাধাকে পাওয়া গেল সম্পূর্ণ সুস্থ এবং অক্ষত অবস্থায়। নাক কানের অংশ যে কয়েক ঘণ্টা আগে কামড়ে কেটে নেওয়া হয়েছিল, তার সামান্যতম প্রমাণও পাওয়া গেল না অনুরাধার শরীরে।

খবর পেয়ে অনুরাধার বাবা এসেছিলেন ভুবনেশ্বর থেকে। সন্দেহ প্রকাশ করলেন দেবেনের উপর ভূতে ভর করেছে। পরের দিন সকালে তিনি উত্তরপাড়া থেকে তান্ত্রিক অঘোর স্যানালকে নিয়ে এলেন। দেবেনের বাড়িতে ঢোকার মুখে বিশাল ভীড়। পুলিশ এসেছেন। এসেছেন ডাক্তারও। জানতে পারলেন গতরাতে অনুরাধা শুয়েছিলেন শাশুড়ীর ঘরে। শ্বাশুড়ী নাকি গলা টিপে মেরে ফেলেছেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়েছেন অনুরাধা মৃত।

অঘোর তান্ত্রিক জানালেন এসবই এক ভূতের কারসাজি। পুলিশ 'লাশ' না নিয়ে গিয়ে যদি তাঁকে পুজো করার জন্য কিছুটা সময় দেন, তবে তিনি অনুরাধাকে বাঁচিয়ে দিতে পারবেন; সেই সঙ্গে এই পরিবারের সকলকে চিরকালের জন্য ঐ ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন।

পুলিশের অনুমতি মিলল। দ্রুত পুজোর আয়োজন করা হল। অঘোর তান্ত্রিক যজ্ঞ শুরু করতেই দেবেন মেয়ের গলায় চিৎকার করতে লাগল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে মের না।" শেষ পর্যন্ত জানা গেল শাকিলা নামের একটি মেয়ে '৮৫-র ৮ জানুয়ারি আত্মহত্যা করেছিল। তারই আত্মা এইসব কাণ্ড ঘটিয়েছিল। একসময় মৃত অনুরাধা সবাইকে আশ্চর্য করে উঠে বসল।

অনুরাধাকে মৃত ঘোষণা করা ডাক্তার অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, অলৌকিক আজও

ঘটে। মন্ত্রশক্তিতে মৃতকেও বাঁচান যায়।

কাহিনীর শেষে লেখা রয়েছে "এ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী হলেও সত্য।"

কাহিনীর শুরুতেই লেখা ছিল "পুলিশ ফাইল থেকে", অর্থাৎ, পুলিশ ফাইল থেকেই এইসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

লেখাটি সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, বেশ কিছু চিঠি এই প্রসঙ্গে আমি পেয়েছিলাম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পত্র লেখক-লেখিকারা জানতে চেয়েছিলেন আমি এই "সত্য ঘটনা"কে স্বীকার করি কি না এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করি কিনা ভূতের অস্তিত্বকে। যুক্তিবাদী বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেও লেখাটি পড়ে, বিভ্রান্ত হয়ে এই বিষয়ে আমার মতামত ও ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। যুক্তিবাদীদের মনেও বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ার কারণ ১। পত্রিকাটির সম্পাদক পরিচিত বিজ্ঞান পেশার মানুষ। ২। ঘটনাটি পুলিশ ফাইল থেকেই নেওয়া বলে ঘোষণায় জানান হয়েছে। ৩। কাহিনীর শেষাংশে বলা হয়েছে—"ঘটনাটি অবিশ্বাস্য কাহিনী হলেও সত্যি।" ৪। ঘটনার প্রধান চরিত্র দেবেন এবং অনুরাধার ফটোও ছাপা হয়েছে।

ভূতে পাওয়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই হয় মানসিক রোগ, নয় তো অভিনয়। মস্তিষ্ক-কোষ থেকেই আমাদের চিন্তার উৎপত্তি। একনাগাড়ে ভূতের কথা ভাবতে ভাবতে অথবা কোনও বিশেষ মুহূর্তে ভূতে ভর করেছে ভেবে কোনও কোনও আবেগপ্রবণ মানুষের মস্তিষ্ক-কোষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যাকে চলতি কথায় বলতে পারি মাথার গোলমাল। এই সময় মানসিক রোগী 'তার উপর ভূতে ভর করেছে' এই একান্ত বিশ্বাসে অদ্ভুত সব ব্যবহার করে। ভূতে পাওয়া যদি মানসিক রোগ না হয় তবে অবশ্যই ধরে নেওয়া যায় রোগী বা রোগিণী ভূতে পাওয়ার অভিনয় করছে। এখানে অনীশ দেবের পত্রিকায় লেখক অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের 'সত্যি কাহিনী'টিতে এমন অনেক কিছু ঘটেছে, বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা মেলে না। কাটা নাক কান জুড়ে যাচ্ছে, ক্ষত চিহ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে, মৃত জীবিত হচ্ছে ইত্যাদি।

আমার মনে হয়েছিল-এর একটাই ব্যাখ্যা হয়, সম্পাদক ও লেখক আমাদের প্রত্যেককে প্রতারিত করেছেন। সত্যি কাহিনীর নামে আগাগোড়া মিথ্যে কাহিনী বলে গেছেন। কিছু বিজ্ঞানকর্মীর তাও সন্দেহ ছিল এমন একজন পরিচিত বিজ্ঞান পেশার মানুষ ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক কি পাত্র-পাত্রীর নাম ঠিকানা ছবি ছাপিয়ে থানার সাব-ইন্সপেক্টরের নাম, হাসপাতালের নাম, ঘটনার তারিখ উল্লেখ করে পুরোপুরি মিথ্যে লিখবেন? রহস্য থাকলে তা হয় তো অন্য কোনও জায়গায়।

স্ট্রিট ডাইরেক্টরিতে শ্যামল মুখার্জি লেনের নাম খুঁজতে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেলাম। এমন নাম কোথাও নেই। ঠিক করলাম ঠিকানা যখন পেলাম না, এবার কাশীপুর থানা থেকে খোঁজ করা শুরু করি। দেখি তাঁরা এই ঘটনা সম্পর্কে কতটা আলোকপাত করতে পারেন। ঠিকানাটার হদিশও ওদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভার তুলে দিলাম আমাদের সমিতির এক তরুণ বিজ্ঞান কর্মীর হাতে। তার হাত দিয়েই 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র রাইটিং প্যাডে কাশীপুর পুলিশ স্টেশনের অফিসার ইনচার্জকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠি

পাঠাই। সঙ্গে পুলিশ ফাইলেব তথাকথিত সত্যি ভূতেব কাহিনীটিব ফটো কপিও। চিঠিতে জানাই 'পুলিশ ফাইল' পত্রিকাব জুন ১৯৮৮ সংখ্যায একটি ভুতুড়ে ঘটনা প্রকাশিত হযেছে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২৬ নং শ্যামল মুখার্জী লেন কাশীপুব পুলিশ স্টেশনেব নিযন্ত্রণাধীন বলে বলা হযেছে। পত্রিকাটিব ফটো কপি আপনাব পডাব জন্য পাঠালাম।

আমাদেব সমিতি নানা অলৌকিক ঘটনাব সত্যানুসন্ধান কবে থাকে। আপনাব এলাকায ঘটে যাওযা ঘটনাব বিষযে আমবা অনুসন্ধানে উৎসাহী। বিষযটি নিযে আলোচনাব জন্য আমাদেব সমিতিব সদস্যকে পাঠান হলো। তাঁকে সর্বপ্রকাব সহযোগিতা ও সহাযতা কবলে বাধিত হবো। চিঠিব তাবিখ ছিল ৫।৬।৮৮।

পবেব দিনই বিজ্ঞানকর্মীটি কাশীপুব থানায যোগযোগ কবে, চিঠিটি দেয এবং প্রধানত তিনটি বিষযে জানতে চায ১। শ্যামল মুখার্জী লেন নামেব কোনও ঠিকানা আদৌ এই থানা এলাকায আছে কি না ? ২। ঘটনাকাল ১৯৮৫ সালে পঙ্কজকুমাব লাহা নামেব কোনও সাব-ইন্সপেক্টব আদৌ কাশীপুব পুলিশ স্টেশনে কাজ কবতেন কি না ? ৩। জুন ১৯৮৫-তে এই ধবনেব কোনও ঘটনা থানাব ডাইবিতে বা অন্য কোনও নথিতে আছে কি না ?

৯ জুন আমাকে লেখা এক চিঠিতে থানাব অফিসাব ইন-চার্জ স্পষ্ট ভাষায যা জানালেন, তাব সংক্ষেপ-সাব—১। কাশীপুব পুলিশ স্টেশনেব অধীনে এমন কোনও ঠিকানা নেই। ২। ১৯৮৫ সালে পঙ্কজকুমাব লাহা নামেব কোনও সাব-ইন্সপেক্টব ছিলেন না। ৩। এই ঘটনাব কোনও তথ্য আমাদেব পুলিশ স্টেশনেব নথিতে নেই।

আমি বিস্মিত হলাম। কী চূড়ান্ত মিথ্যেকে সত্যি বলে চালবাব চেষ্টা কবেছেন সম্পাদক ও লেখক। এব পবও কি আমাব দেখা উচিত, সম্পাদকেব ও লেখকেব তাঁদেব বক্তব্যেব সমর্থনে কিছু বলাব আছে কি না ? একাধিক দিন আমি এবং ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব একাধিক সদস্য সম্পাদক অনীশ দেবেব বাডি গিযেছি। ওই বাডিই পুলিশ ফাইল পত্রিকাব অফিস। কোনও দিনই অনীশ দেবেব দেখা পাইনি। আমাদেব আসাব উদ্দেশ্য প্রতিবাবই অফিসেব জনৈক কর্মীকে জানান হযেছে। জানিযে ছিলাম, দেবেন-অনুবাধাব 'সত্যি কাহিনী'ব ওপব আমাদেব প্রাথমিক অনুসন্ধান এবং কাশীপুব থানাব লিখিত উত্তব বলছে লেখাটিব সঙ্গে বাস্তব সত্যেব কোনও সম্পর্ক নেই। এটা স্রেফ গল্পকথা। এই বিষযে অনীশবাবুব কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও প্রমাণ থাকলে তিনি প্রমাণ সহ যত তাডাতাডি সম্ভব আমাব সঙ্গে যোগাযোগ কবলে বাধিত হবো।

অনীশ দেব আমাব সঙ্গে দেখা কবেননি। পবিবর্তে ১৮ জুন তাবিখে লেখা তাঁব একটি পোস্ট কার্ড পাই। তাতে শুরুতে লেখা, "আপনাব সঙ্গে দেখা কবতে পাবিনি বলে দুঃখিত।" মাঝখানে এক জাযগায লেখা, "আমবা লেখাটি গল্পকথা হিসেবেই প্রকাশ কবেছি।" শেষ অংশে লেখা, " 'পুলিশ ফাইল' আপাতত আমবা বন্ধ কবে দিযেছি। ফলে আগামী সংখ্যাতে যে কোনও ত্রুটি স্বীকাব কবব সে সুযোগও নেই। সুতবাং এজন্য দুঃখপ্রকাশ কবছি। আপনাব পবিচালনায যুক্তিবাদী আন্দোলনেব

সাফল্য কামনা করে শেষ করছি।।”

চিঠিটা অনীশ দেবের ডিগবাজীর সাক্ষ্য হিসেবে সযত্নে রেখে দিয়েছি। এর পরেও অনীশবাবুর কাছে কয়েকটি জিজ্ঞাসা আমার থেকেই গেল। অনীশবাবু, সত্যিই কি 'গল্পকথা' হিসেবেই লেখাটি প্রকাশ করেছিলেন ? তবে আবার 'সত্যি কাহিনী' প্রমাণের জন্য ভূরি ভূরি বাক্যি খরচ করলেন কেন ? কেনই বা কাল্পনিক দুটি চরিত্রের ফটোগ্রাফ প্রকাশ করলেন ? ফটোগ্রাফ দুটি তবে কার ? অনীশবাবু, আপনার কথাই যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ কাহিনীটা 'গল্পকথা'ই হয়, তবে ত্রুটি স্বীকারের প্রশ্ন আসছে কেন ? আপনার কথাই আপনার মিথ্যাচারিতাকে ধরিয়ে দিচ্ছে না কি ?

অনীশবাবু, আপনাকে শেষ প্রশ্ন, সত্যিই কি আপনি যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন ? যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাফল্য মানেই আপনার মতো অপ-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক ও মিথ্যাচারীদের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা।

বেলঘরিয়ার গ্রীন পার্কে ভুতুড়ে বাড়িতে ঘড়ি ভেসে বেড়ায় শূন্যে

'৮৭-র আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে বেলঘরিয়ার গ্রীন পার্কের একটি বাড়ি ঘিরে রহস্যজনক অনেক কাণ্ড-কারখানা নাকি ঘটতে থাকে। খাবার-দাবার উল্টে যাচ্ছে, হাতা, খুন্তি, থালা, বাসন এমনকি বাড়ির দেওয়াল ঘড়িটি পর্যন্ত নাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। ভুতুড়ে কাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী মেলা। প্রতিদিন ভূতের নাচন দেখতে শয়ে শয়ে মানুষ ভীড় জমাতে লাগলেন।

আমাদের সমিতির সেই সময়কার সহ-সম্পাদক বিজয় সেনগুপ্ত ১৭ আগস্ট গেলেন একটি নিরীহ প্রস্তাব নিয়ে। পাড়ার ছেলেরা তখন বাড়ি ঘিরে ব্যারিকেড তৈরি করেছেন। তার বাইরে বিশাল জনতা ভুতুড়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে। আমাদের সমিতির নাম করে ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেলেন বিজয়। বাড়ির মালিক দিলীপ ঘোষ বাড়িতেই ছিলেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। বাড়ির প্ল্যান তৈরি করেন। দুই বিয়ে। সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি চলছে।

বিজয় ভূতের কাণ্ড-কারখানার কথা দিলীপবাবুর কাছ থেকে যা শুনলেন, তা আগে শোনা ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। ইতিমধ্যে তান্ত্রিকের পিছনে অনেক টাকাও নাকি বেকার খরচা করেছেন দিলীপবাবু।

বিজয় আমাদের সমিতির তরফ থেকে প্রস্তাব দিলেন, সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ এখানে একনাগাড়ে তিন দিন তিন রাত থাকবেন, এরমধ্যে কোনও ভৌতিক ঘটনা ঘটলে আমাদের সমিতির তরফ থেকে প্রবীর ঘোষ দেবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। ভূতের উপদ্রব না হলে বাড়ি ভূত মুক্ত করার জন্য আপনি আমাদের সমিতিকে দেবেন মাত্র পাঁচ হাজার। যুক্তিবাদী সমিতির তিনজন সদস্য প্রবীরবাবুর সঙ্গী হবেন।

প্রস্তাবে দিলীপবাবু চম্‌কালেন, বললেন, “না, না, আজ থেকে ভূতের উপদ্রব বন্ধ হয়ে গেছে তো।'

অগত্যা বিজয়কে বিদায় নিতে হলো, নীচে নামতে উৎসুক দর্শকরা জানতে

চাইলেন, যুক্তিবাদী সমিতির এ বাড়ির ভূত তাড়াতে নামছে না কি ? বিজয় জানালেন, যুক্তিবাদী সমিতির নামেই ভূতের উপদ্রব বন্ধ হওয়ার কাহিনী। দিলীপবাবুর উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ জনতার গালাগাল ও ধিক্কার শুনতে শুনতে বিজয় বিদায় নিয়েছিলেন।

নিউ জলপাইগুড়িতে ভূতের হানা

মাসকয়েক আগের ঘটনা, নিউ জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কলোনীর যুবতী রূপাকে ভূতে ধরেছে, অতিপ্রাকৃতিক যত ঘটনা ঘটে চলেছে রূপাদের বাড়িতে। মুহূর্তে খবর এতই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে ঘটনাটার রহস্য অনুসন্ধানে নিউ জলপাইগুড়ি ফাঁড়িকে নামতে হয়। শোনা যায় বাল্ব, কৌটো, শিশি এবং অন্যান্য জিনিসপত্তর আপনা থেকেই ছিটকে ছিটকে যেখানে সেখানে এসে পড়ছিল।

আমাদের সমিতির সহযোগী সংস্থা শিলিগুড়ির নবোদয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে প্রলয় চৌধুরী, পঙ্কজ বসু, বিশ্বদীপ রায় মুহুরী সত্যানুসন্ধানে নেমে পড়েন। ঘটনার বিবরণ জানতে রূপার বাবা এ কে ব্যানার্জি, মা রেখা, রূপা, রূপার বন্ধু কমলেশ রায়, পাশের কোয়ার্টারের পরিমল চন্দ্র পাল এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলেন ও সি রাজকুমার ঘোষের সঙ্গেও।

ঘটনার সকলের বিবরণগুলো পরপর সাজানোতে যে চিত্রটা ভেসে উঠল সেটা হল এই—রূপাদের বাড়িতে কমলেশ ও তার বন্ধু-বান্ধবীদের হৈ-হুল্লোড়ে বিরক্ত পরিমলবাবু প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। সে চুরাশি সালের ঘটনা। প্রতিবাদ জানাবার পর থেকে পরিমল বাবুর কোয়ার্টারের উঠোনে বোতল, টিন ইত্যাদি পড়তে থাকে। পরিমলবাবু কাউকে হাতে-নাতে ধরতে না পারলেও এগুলোকে মানুষেরই কীর্তি অনুমান করে ৬ এপ্রিল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেন। আশে-পাশের কিছু মানুষজন রূপা-কমলেশদের সন্দেহ করতে থাকেন। ব্যানার্জি পরিবার অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ব্যাপারটা হয় তো কোনও মানুষেরই কাজ নয়।

ভূতের উপদ্রব বন্ধ হয়। '৮৮-এর সেপ্টেম্বরের শুরুতেই পরিমলবাবুর সঙ্গে ব্যানার্জি পরিবারের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ভূতের উপদ্রবও শুরু হয়। ৪ সেপ্টেম্বর পরিমলবাবু পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। ভূত তার পরে পরেই উপদ্রব বন্ধ রাখে। আবার শুরু '৮৯-এর সেপ্টেম্বরে। ২৫ সেপ্টেম্বর পরিমলবাবু আবার ফাঁড়িতে দৌড়লেন। আশে-পাশের জনমতও পরিমলবাবুর বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পিছনে ভূতের বদলে মানুষেরই হাত আছে বলে সন্দিগ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকেন। অবস্থা ঘোরাল হচ্ছে দেখে পুলিশ অনুসন্ধানে নামে। আর এই সময়ই শুরু হয় ব্যানার্জি বাবুদের বাড়িতেও ভূতের নানা উপদ্রব। সঙ্গে বাড়তি বোঝা—রূপার উপর ভূতের ভর। ভূত তাড়াতে ওঝা আসে, ঝাড়ফুঁকও চলে। ভূত বিদায় নেয়।

স্থানীয় মানুষ ও নবোদয় বিজ্ঞান পরিষদ কিন্তু অনুমান করে জনরোষ ও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতেই ব্যানার্জিবাবুর বাড়িতে এবং রূপার উপর ভূতের অত্যাচার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

দমদমের কাচ-ভাঙা হানাবাজ-ভূত

তামাম পাঠকদের অবাক করে দিয়ে ২৭ নভেম্বর '৯০ 'গণশক্তি'র প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলম জুড়ে বিশাল ছবি সহ এক অদ্ভুত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এই বিশাল জায়গা খরচ করার পরও সপ্তম পৃষ্ঠার পাঁচ কলম জুড়ে প্রকাশিত হলো শেষাংশ। পাঠকদের অবগতির জন্য খবরটি তুলে দিলাম।

প্রতিবেশীরা অবাক, গৃহস্বামী চিন্তিত

দমদমের একটি বাড়িতে আপনা থেকেই ভাঙছে কাচের সামগ্রী

কলকাতা, ২৬শে নভেম্বর—দমদম এলাকার এক বাড়িতে বাল্ব, টিউব, আয়না সহ যাবতীয় কাচের সামগ্রী আপনা থেকেই ভাঙতে শুরু করেছে। ঐ তিনতলা বাড়িটির দোতলার একটি ছোট্ট ঘরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে প্রায় দেড়মাস ধরে। এই আশ্চর্য ঘটনার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ ইতিমধ্যেই সত্তরটি বাল্ব, ষোলটি টিউবলাইট, তিনটি চিমনি ও অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। বাড়ির গৃহকর্তা নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক। তাই কেবল ঘটনাটিরই বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

এই অদ্ভুত ঘটনাটির সূত্রপাত গত ১৮ই অক্টোবর রাতে। সেদিন প্রথম ওই ঘরটির বাসিন্দা স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র খেয়েদেয়ে শুয়েছেন। হঠাৎ দুম করে আওয়াজ। ঘর অন্ধকার। আর টুকরো কাচের মাটিতে পড়ার শব্দ। দেশলাই ঘষে আলো জ্বালিয়ে ভদ্রলোক অবাক। নাইট ল্যাম্পটি ভেঙে টুকরো হয়ে পড়ে গেছে। শুধু হোল্ডারে বাল্বের ক্যাপ ও ফিলামেন্টটি আটকে আছে। যাই হোক এটি নানা কারণে ঘটে থাকে তাই কেউই বিশেষ আমল দেননি। পরদিন নতুন একটি বাল্ব কিনে লাগানো হয়। সেদিন রাতেও কিছুক্ষণ জ্বলার পর হঠাৎই একই রকমভাবে বিস্ফোরিত হয়ে বাল্বটি ভেঙে গেল। পরপর দু'দিন একই ঘটনা ঘটতে দেখে পরদিন ভদ্রলোক একজন স্থানীয় ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে ডাকলেন। ঘরে ডি সি বিদ্যুৎ সররবাহ হয়। মিস্ত্রীর পরামর্শে সুইচ বক্স পালটানো হলো কারণ বক্সটি নাকি আলগা হয়ে গেছে এবং সেকারণেই যত বিপত্তি। বক্স পালটানোর পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতেই লাগলো। অর্থাৎ দুটো তিনটি করে ছোট বাল্ব প্রতিদিন ফেটে যায়। এভাবে দিন দশেকের মধ্যে প্রায় কুড়িটি বাল্ব ভেঙে যাওয়ার পর তিনি বাল্ব লাগানোই বন্ধ করে দিলেন। এবারে

আক্রমণ শুরু হল টিউব লাইটের ওপর। পর পর তিনটি টিউবলাইট ভেঙে যাওয়ার পর ডি সি লাইনের একজন দক্ষ মিস্ত্রিকে ডেকে আনা হয়। তাঁর পরামর্শে টিউবের চোক বদলানো হয়। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। এর মধ্যে পাড়ার কিছু লোকজন ভুতুড়ে বাড়ি বলে বাড়িটিকে চিহ্নিত করে ফেলতে শুরু করলেন এবং তাঁদের ও বাড়িওয়ালার চাপে ভদ্রলোক জনৈক ওঝাকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে বাধ্য হন। ওঝা প্রচুর মন্ত্র পড়ে কিছু লেবু ও লঙ্কা ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু ঘটনা থেমে থাকলো না। বরং পরবর্তী ঘটনাগুলি বিচার করলে বলা যায় যে ওঝার মন্ত্র পড়ার পর তাণ্ডব আরও বৃদ্ধি পেল। এরপর একদিন লোডশেডিং চলাকালীন বাড়িতে ডিমলাইট বা কেরোসিনের বাতি জ্বলছিলো। হঠাৎ চিমনীর কাঁচটি শব্দ করে ফেটে গেল। দেওয়ালের একটি ছোট বুক-শেলফ্ শক্ত করে লাগানো ছিল। শেলফ্‌টিতে দুটি কাচের ঢাকনা ছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় দুটি কাচের ঢাকনাই কিছু সময়ের ব্যবধানে ভেঙে গেল। ঘরের মেঝেতে একটি কাচের কাপ-ডিস বোঝাই ছোট আলমারি ছিল। একদিন রাত্রিবেলা গোটা আলমারিটা আছাড় খেয়ে পড়ে গেল এবং তার ভেতরের সমস্ত কাচের জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কাচের উপর এই অদৃশ্য শক্তির আক্রমণ ইদানীং চরম আকার ধারণ করেছে। সেই ঘরে তিনটি বড় আলমারি আছে। দুটি কাচবিহীন। একটিতে কাচের আয়না ছিল। গোটা আলমারিই জিনিসপত্রে ঠাসা। এই ভারি আলমারিতে হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় দেখা গেল আলমারির কাচে, ভেতরদিক থেকে গোল হয়ে একটি গর্ত হয়ে গেল এবং কাচ গুঁড়ো হয়ে পড়তে শুরু করলো। এর কিছুক্ষণ পরে গোটা আলমারি মাটি থেকে উঠে উলটে পড়ে গেল। কাচের আয়নাটির উপরদিকটি ভেঙে গেলো। যাই হোক আলমারিটিকে যথাস্থানে আবার বসানো হলো। এরপর দু'দিন আলমারিটি পড়ে গেছে এবং শেষবারে সমস্ত কাচের অংশটিই গুঁড়িয়ে গেছে। যদিও আলমারিটি প্রায় দশ বছর ধরে ওই জায়গাতেই রয়েছে এবং কোনভাবেই সেটিকে ভারসাম্যবিহীন অবস্থা বলা যায় না। এখন ঘরটির মধ্যে আর কোন কাচের সামগ্রী অক্ষত অবস্থায় নেই। অবশ্য চশমার কাচ এখনও ভাঙেনি। প্রায় দেড়মাসব্যাপী এই অদ্ভুত ঘটনায় সত্তরটি বাল্ব, ষোলটি টিউব, তিনটি চিমনি ও অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এবং প্রথম দিকের ঘটনার থেকে এখনকার ঘটনার সংখ্যা এবং জোর অনেক বেশি। যেমন প্রথম দিকে বাল্বগুলি ফুটো হয়ে যাচ্ছিল এখন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে হঠাৎ ঘরের পাখাটি অস্বাভাবিক ভাবে দুলতে শুরু করে। যদিও সেসময় কোন হাওয়া বইছিলো না এবং পাখাটিও চলছিলো না। দুর্ঘটনা এড়াতে এরপর পাখাটি খুলে রাখা হয়। এর মধ্যে অনেক দক্ষ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ঘরটি দেখে গেছেন। গোটা ঘরে ওয়্যারিং বা সরবরাহ লাইনের পরিবর্তন করে নতুন তার লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বৈদ্যুতিক সংযোগে কোন আপাত-গণ্ডগোল নেই। ঘরে রেডিও বা টেপরেকর্ডারে কোন সমস্যা নেই। বাসিন্দা তিনজনের শরীরেও কোনো অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নেই। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো একসাথে কোন জিনিস ভাঙছে না। একটি একটি করে কাচের জিনিস ফেটে যাচ্ছে। বাল্ব ভাঙার ক্ষেত্রে আলোর জোরটা প্রথমে বেড়ে যাচ্ছে এবং তারপরে বাল্ব ফেটে যাচ্ছে। প্রথম দিকে

কাচগুলি খণ্ডে খণ্ডে ভাঙছিলো। এখন মিহি গুঁড়ো হয়ে ভাঙছে।

ঘরটি দোতলায় অবস্থিত। এর নিচে ও উপরে দুটি একই আয়তনের ঘর রয়েছে। ঘরটির দু'পাশেও ঘর রয়েছে। এই সমস্ত ঘরগুলিতে এই ধরনের কোন অসুবিধার নেই। ঘরটির সুইচ বোর্ড থেকে লাইন টেনে বারান্দায় আলো জ্বালানো হচ্ছে, সে আলো একবারও ভেঙে যায়নি। এমনকি ঘরের দরজায় পরীক্ষামূলক ভাবে একটি বাল্ব জ্বলানো হয়েছিলো সেটিও এখন পর্যন্ত অক্ষত। প্রকৃতপক্ষে এই আলোটিই বাসিন্দাদের রাত্রিবেলার একমাত্র সহায়। এযাবৎ এই ধরনের কোন ঘটনাই শুধু সে বাড়ি কেন গোটা অঞ্চলের কোন বাড়িতেই দেখা যায়নি। ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য একটি বাল্ব এবং একখণ্ড কাচ সে ঘরে রাখা হয় এবং দেড়ঘণ্টার মধ্যে সেগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই অদ্ভুত রহস্যের খবর ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী মহলেই কিছু পরিমাণে পৌঁছেছে এবং সকলেই এই রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিতে বিভিন্ন পরীক্ষাও শুরু করেছেন। কিছুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের তৎপরতায় এই ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এই দেড়মাস ধরে ঘরটির তিন বাসিন্দা এক অদ্ভুত উত্তেজনা ও মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কিছু ব্যক্তি ঘটনাটিকে ভুতুড়ে বলে চিহ্নিত করে তাঁদের উপর নানা রকম চাপ সৃষ্টি করছেন। কিন্তু তাঁরা একমুহূর্তের জন্যও মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করেননি এবং তাঁরা স্থিরনিশ্চিত যে, ঘটনাটির সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই বের হবে।"

'গণশক্তি'র সংবাদ সূত্র ধরে পরের দিনই দমদমের ভুতুড়ে বাড়ির বড়সড় এক খবর ছাপল 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা। এতে দু-চারটি নতুন তথ্য পরিবেশিত হলো। অমিয়শংকর রায় একজন সক্রিয় সি পি আই (এম) সদস্য। থাকেন দক্ষিণ দমদমের একটি ত্রিতল বাড়ির এক ঘরের ফ্ল্যাটে। গত ১৮ অক্টোবর ঘটনার শুরু। অমিয়বাবু গিয়েছিলেন নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে সম্বর্ধনা জানাতে। সে রাতে বাল্ব ফাটা দিয়ে কাচ ভাঙার শুরু।

ইতিমধ্যে ২৮, ২৯ এবং ৩০ তারিখেও গণশক্তি পত্রিকায় এই ঘটনা ছবিসহ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হলো। ডঃ এস· পি গণচৌধুরী, ডঃ দিলীপ বসু, ডঃ মধুসূদন ভট্টাচার্য, ডঃ তারাশঙ্কর ব্যানার্জির মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার রহস্য ভেদ করতে কাচ-হন্তা ঘরটিতে পরীক্ষা চালিয়েছেন বলে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে কখনও প্রকাশিত হলো—তাঁরা কারণ খুঁজে বের করতে পারেননি, কখনও প্রকাশিত হলো—ঘরে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন।

ইতিমধ্যে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতা রহস্য উন্মোচনে আমার সাহায্য চাইলেন। ২৭ নভেম্বর আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে ঘরটি দেখতে যাব জানাই। সেদিন সন্ধ্যায় ঘরটি ও তার আশপাশের পরিবেশের উপর পরীক্ষা চালাই।

কাচ ভাঙে কিসে? অবধারিতভাবে এটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কাচ ভাঙতে পারে অনেক কারণে। কারণগুলো একটু দেখা যাক: (১) উচ্চ শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে। (২) বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ কাচে লাগিয়ে রাখলে। (৩) কাচের তাপমাত্রার হঠাৎ প্রচণ্ড রকম পরিবর্তন ঘটলে। (৪) আঘাত করলে। (৫) কোয়ার্জ

(কাচ-কাটা পাথব) দিযে আঁচড কাটলে।

কাচেব বাল্ব ভাঙতে পাবে কী কী কাবণে, একটু দেখা যাক (১) কোন কাবণে যদি বৈদ্যুতিক লাইনে বেশি ভোল্টেজ প্রবাহিত হতে থাকে তবে অনেক সময বাল্ব ফেটে যায়। (২) জ্বলন্ত গবম বাল্বে ঠাণ্ডা জলেব ছিটে দিলে বাল্ব ফাটবে। (৩) আঘাত কবে বাল্ব ফাটানো সম্ভব। তবে ওভাব-ভোল্টেজে বা অনেকক্ষণ ধবে জ্বলে থাকা নিযনে ঠাণ্ডা জল ছিটোলে নিযন ফাটবে না।

কাচগুলো কেমনভাবে ভাঙছে, এটা বোঝাব জন্য ভাঙা কাচেব টুকবোগুলো পবীক্ষা কবা প্রযোজন। কাচ ভেঙে যাওযাব আগে-পবে কাচগুলো যাঁবা দেখেছেন তাঁদেব সঙ্গে কথা বলাও একইভাবে প্রযোজনীয।

অমিযশঙ্কববাবু দমদম স্টেশনেব লাগোযা কালীকৃষ্ণ শেঠ লেনেব ৯১/৬ নম্বব বাড়িব দোতলাব একটি ঘব নিযে থাকেন। ঘবে ঢুকতে গিযে দেখলাম দবজাব ওপবে তথাকথিত 'লাকি নাম্বাব' ৭৮৬ লেখা। আনুমানিক ১০ ফুট বাই ৮ ফুট ঘবেব মধ্যেই অমিযবাবুব পুবো সংসাব।

অমিযবাবু সকালেই খবব পেযেছিলেন সন্ধ্যায যাবো। পবিচয দিতেই আপ্যাযিত



কবলেন। অমিযবাবু দক্ষিণ দমদম পুবসভাব হিসেববক্ষকেব চাকবি কবেন। স্ত্রী তৃপ্তি বায দমদমেব প্রাচ্য বাণীমন্দিব প্রাথমিক বিদ্যালযে পডান। ছেলে সৌম্য দমদমেব কে কে হিন্দু আকাডেমীব ছাত্র, এবাব মাধ্যমিক পবীক্ষা দেবে। অমিযবাবু সক্রিয বাজনৈতিক কর্মী। সি পি আই (এম)-এব স্থানীয কমিটিব সদস্য। তৃপ্তি দেবীব হাতে গ্রহবত্নেব আংটি। দেখলেই বোঝা যায দীর্ঘদিন ধবেই ব্যবহাব কবছেন। ছেলে সৌম্য বাডি ছিল না। শুনলাম, পডাশুনোব অসুবিধে হচ্ছিল বলে তাকে এক আত্মীযেব বাডিতে বাখা হযেছে কাল বিকেল থেকে।

অমিযবাবুব বাডিব অবস্থান দেখে নিশ্চিত ছিলাম—কাচ ভাঙাব ক্ষেত্রে শব্দতবঙ্গেব কোনও ভূমিকা নেই। অনেক সময বিমানবন্দবেব খুব কাছেব বাডিব কাচেব শার্সি বা জিনিস-পত্তব ভাঙে বিমানেব তীব্র শব্দ-তবঙ্গেব আঘাতে। অমিযশঙ্কববাবুব এই ঘবটি বিমান বন্দবেব কাছে নয। বিমানেব শব্দ এখানে বাসেব শব্দেব চেযেও মৃদু। কাছেই বেললাইন। কিন্তু ট্রেনেব শব্দে ঘব কাঁপে না, কাঁপে না সূক্ষ্ম ভাবসাম্যেব ওপব দাঁড় কবিযে দেওযা পাতলা কাচেব শিশি—পবীক্ষা কবে দেখেছি। বাডিব ধাবে-কাছে কোনও কাবখানা নেই, যেখান থেকে তীব্র শব্দতবঙ্গ তৈবি হতে পাবে। অতএব শব্দতবঙ্গকে ভাঙাব কাবণ হিসেবে বাদ দিতেই হয।

বাসাযনিক পদার্থ যেমন হাইড্রোক্লোবিক অ্যাসিড কাচে দিলে কিছু সময পবে কাচ ফাটতে পাবে। এ-ক্ষেত্রে অ্যাসিড প্রযোগেব জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি মানুষেব উদ্যোগ একান্ত প্রযোজন।

অমিযশঙ্কববাবুব ঘবের বাল্বেব কাচ ওভাব-ভোল্টেজেব দরুন ভাঙতে পাবে। কিন্তু ৭১ বাব ওভাব ভোল্টেজে ভাঙা সম্ভব নয। কাবণ ইতিমধ্যে ভোল্টেজ বহুবাব মাপা হযেছে। বহু বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি, সংস্থা ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভোল্টেজেব বিষযে পবীক্ষা কবেছেন। লাইন-লিকেজ কি না, সে বিষযেও পবীক্ষা চালান হযেছে। ভোল্টেজে কোনও অস্বাভাবিকতা বা লাইনে কোনও লিকেজ পাওযা যাযনি। গোটা ঘবেব ওয্যাবিং কবা হযেছে নতুন কবে। ভোল্টেজ পবীক্ষা কবে দেখেছি, ১৭৫। অতএব অমিযবাবুব ঘবেব ওয্যাবিং নতুন কবাব পবও কাচেব বাল্ব ফাটাব জন্য বাডতি ভোল্টেজকে আদৌ দাযী কবা চলে না। কিন্তু অমিযবাবুব দাবি মত নতুন ওয্যাবিং-এব পবও বাল্ব ফেটেছে। আবও একটা তথ্য অমিযবাবু জানালেন, এই ঘবেব লাইন থেকে তাব টেনে বাইবেব বাবান্দায বাল্ব জ্বালালে তা ভাঙছে না। বৈদ্যুতিক লাইনেব ত্রুটিতে বাল্ব ফাটলে সেই ত্রুটিপূর্ণ লাইন থেকে টানা বাইবেব বাল্বও ফাটবে। একই লাইন থেকে টানা সত্ত্বেও ঘবেব বাল্ব ফাটছে, বাইবেব বাল্ব নয, এমনটা হতে পাবে বাল্ব ফাটানোব পিছনে মানুষেব হাত থাকলে। ঘব স্যাঁত-স্যাঁতে বা দূষিত গ্যাসে পূর্ণ নয। যথেষ্ট খোলামেলা।

বিদ্যুতেব গোলমালে বাল্ব ফাটতে পাবে, কিন্তু বুক-কেস, আলমাবিব কাচ বিদ্যুতেব গোলমালে ফাটাব কোনও সম্ভাবনা নেই। চিমনি, আযনা এবং অন্যান্য কাচেব জিনিস ফাটাব ক্ষেত্রেও বিদ্যুতেব ত্রুটিকে কোনওভাবেই দাযী কবা যায না। কাঠেব আলমাবি নাকি আপনা থেকেই চাববাব পডে গেছে। সিলিং ফ্যান আপনা থেকে দুলেছে। ঘবে তখন কোনও জোবালো হাওযা ছিল না। ফ্যানও ঘুবছিল না। বিদ্যুতেব গোলমালে

এমন কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। কাঠেব আলমাবিতে ভাবসাম্যেব কোনও অভাব ছিল না। পরীক্ষা কবে দেখেছি। আবও লক্ষ্যণীয়, ঘবে একটি বড় স্টিলেব আলমাবি ছিল। স্টিলেব আলমাবি কিন্তু একবাবও পড়েনি। কাবণ একজনেব পক্ষে স্টিলেব আলমাবি ঠেলে ফেলে দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। ছোট কাঠেব আলমাবি ফেলা যথেষ্ট সহজসাধ্য। ফ্যান দোলাতে, আলমাবি ফেলতে একান্তভাবে প্রযোজন মানুষেব। যে ফ্যান দোলাবে, আলমাবি ফেলে দেবে।

আলমাবিব কাচ ভেঙেছে অদ্ভুতভাবে। একদিকেব পাল্লা কাঠেব। অন্য দিকের পাল্লায় ওপবে-নীচে দুটি কাচ। হঠাৎ একদিন বাড়িব লোকদেব চোখে পড়লো, ওপবেব কাচে একটা বৃত্তাকাব দাগ। দাগেব আশেপাশে কযেকটা আঁচড়। দিনদুয়েক পবেই তলাব কাচেও গোল দাগ দেখা গেল। দাগেব আশেপাশে কিছু আঁচড়। তাবপব হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওপবেব কাচটা ভেঙে পড়েছে। দু-একদিন পবেই ভাঙলো নীচেব কাচটা। এ-কথাগুলো অমিযবাবু ও তৃপ্তি দেবীব কাছ থেকেই শোনা।

আলমাবিব কাচেব কয়েকটা টুকবো হাতে নিযে সামান্য নজব দিতেই বুঝলাম আলমাবিব কাচ সবাসবি আঘাত কবে ভাঙা নয়। প্রথমে কোযার্জ (কাচ-কাটা পাথব) দিযে গোল দাগ ফেলা হযেছে এবং আঁচড় কাটা হযেছে। তাবপব একসময সুযোগ বুঝে সামান্য আঘাত কবা হযেছে। ফলে কাচ টুকবো টুকবো হযে ছড়িযে পড়েছে। টুকবোগুলোব ভাঙা অংশেব কিছুটায কোযার্জে কাটাব চিহ্ন স্পষ্ট। বাকি অংশ আঘাত কবে ভাঙাব ফলে চল্‌টা উঠে গেছে।

ওপরে দেওযালে টাঙানো ছোট্ট বুক-কেসটাব পাশাপাশি দুটো কাচ লাগান ছিল। কাচগুলো দু'দিকে সবান যায। ওগুলোব ভাঙা টুকবো দেখিনি। শুনেছি প্রথমে একপাশেব কাচ ভেঙে পড়েছিল। তাবপব অন্য পাশেব। দেখিনি, তাই বোঝা সম্ভব ছিল না ওই কাচ ভাঙাব ক্ষেত্রেও 'কাচ-কাটা পাথব' ব্যবহাব কবা হযেছিল অথবা সবাসবি আঘাত কবা হযেছিল অথবা বাসাযনিক পদার্থ ব্যবহাব কবা হযেছিল।

অমিযবাবু ও তৃপ্তি দেবীব সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ১৮ অক্টোবব বাতে প্রথম বাল্বটা ফাটাব ক্ষেত্রেই শুধু তাঁবা প্রত্যক্ষদর্শী। ঘবে ঢোকাব মুহূর্তে বাল্বটা বিবাট শব্দ কবে ফেটে গিযেছিল। আব কোনও একটি দুর্ঘটনাবও তাঁবা প্রত্যক্ষদর্শী নন। সিলিং ফ্যান দুলেছে—অমিযবাবু ও তৃপ্তি দেবী দেখেছেন। কিন্তু ছেলেব চিৎকাবে ঘবে ঢুকে দেখেছেন। আলমাবি পড়তে তাঁবা দু'জনেব কেউই দেখেননি। দেখেছেন পড়াব পব। ঘবে তখন ছিল ছেলে সৌম্য।

দু'জনে ঘটনাগুলো নিজেব চোখে ঘটতে দেখেছেন বললেও অবশ্য তাঁদেব কথাকে অভ্রান্ত সত্যি ধবে নিযে বিচাব কবতে বসতাম না। কাবণ মানুষেব বাড়িযে বলাব প্রবণতা, প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহিব কবাব প্রবণতা থেকে মিথ্যে বলাব বিষযে যথেষ্ট অবগত। আমি জেবা কবাব মত কবে প্রশ্নেব ঝড় তুলিনি। নানা কথাব ফাঁকে ফাঁকে আমাব প্রযোজনীয উত্তবগুলো বেব কবে নিচ্ছিলাম। সম্ভবত অমিযবাবু ও তৃপ্তি দেবী সচেতন ছিলেন না, আমি ঠিক কী জানতে চাইছি।

ঘবে বর্তমানে কোনও কাচেব জিনিস নেই বাল্ব ছাড়া। পবীক্ষা কবতে কোনও কাচেব জিনিস নিযে যাইনি। শুনলাম, কাচেব জিনিস বাখলে নাকি আধ ঘণ্টা থেকে

দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভেঙে যায়। একটি বাল্ব অবশ্য গতকাল বিকেল থেকে অক্ষত অবস্থায় ঘরে বিরাজ করছে। বাল্বটি নাকি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হয়েছে। এও শুনলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বেই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু বিজ্ঞানী কাচ ভাঙার রহস্য অনুসন্ধানে নেমেছেন। কিন্তু এ কথার মধ্য দিয়েও একটা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ পেল—কাল সন্ধে থেকে সৌম্য বাড়িতে নেই, কাল সন্ধে থেকে আজ রাত পর্যন্ত বাল্বটি ভাঙেনি।

অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবীকে ভরসা দিলাম, কোনও চিন্তা নেই। ভাঙার কারণ ধরতে পেরেছি বলে আশা করছি। আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে আগামী রবিবার থেকেই কাচ ভাঙা বন্ধ করতে পারবো।

পরিপূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস পেলাম। বললাম, রবিবার সকাল দশটায় আসবো। আলমারি ও বুক-শেল্‌ফের সমস্ত কাচ সেদিন আবার লাগাবার ব্যবস্থা করুন। ঘণ্টা-ছয়েক থাকব। নিশ্চিন্তে থাকুন, সে-সময়ের মধ্যে কিছুই ভাঙবে না।

কেন ভাঙছে? দু'জনের প্রশ্নের উত্তরেই জানালাম, সে-দিনই ছ-ঘণ্টা পার করে দিয়ে তারপর জানাবো।

অমিয়বাবু জানালেন, শনিবারই সব কাচ লাগিয়ে রাখবেন। বললাম, তেমনটি করবেন না। শনিবার কাচ ভাঙতেই পারে। এমনকি সব কাচই। কাচের মিস্ত্রিকে এনে মাপ দিয়ে কাচ কাটিয়ে রাখুন। রবিবার আমার সামনে লাগান হবে। মিস্ত্রিকে বলবেন দশটায় আসতে।

ঘর থেকে বেরতেই উপস্থিত সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলেন। জানতে চাইলেন, ভাঙার কারণ ধরতে পেরেছি কি না। জানালাম, আগামী রবিবার সকাল দশটায়-আমাদের সমিতির তরফ থেকে কয়েকজন আসছি। আমাদের সামনে আবার নতুন করে ভেঙে যাওয়া সব কাচ লাগানো হবে। ছ'ঘণ্টা থাকবো। এতদিন পর্যন্ত ঘরের কাচ আধ ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভাঙছিল। কিন্তু আশা করছি সে-দিন ওই দীর্ঘ ছ'ঘণ্টার মধ্যেও কোনও কাচই ভাঙবে না। বিকেল চারটের সময় জানাব কেন ভাঙছিল। এর আগে আর কিছু জানাচ্ছি না। সাংবাদিকরা এ প্রশ্নও করছেন, রবিবার কেন? কেন এই চারদিন সময় চেয়ে নিচ্ছেন? কেন কালই বন্ধ করতে আসবেন না?

বললাম, আগামীকাল রবিবার হলে আগামী কালই আসতাম। ছুটির দিন ছাড়া আমার এবং আমাদের সমিতির অনেকের পক্ষেই দীর্ঘ ছ-আট ঘণ্টা সময় বের করা খুবই অসুবিধেজনক।

পরের দিন গণশক্তির প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমাদের সমিতির পক্ষে আমার 'কাচ ভাঙা রহস্যময় বাড়িতে যাওয়ার কথা' এবং 'কয়েক দিনের মধ্যেই রহস্য উন্মোচিত হবে' বলে আশা প্রকাশ করার কথা প্রকাশিত হলো।

ইতিমধ্যে আমাদের সমিতির কিছু সদস্য অমিয়বাবুর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললো। কথা বললো সৌম্যের স্কুলের কিছু ছাত্রের সঙ্গে। গণশক্তির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—প্রতিবেশীদের চাপেই অমিয়বাবু ওঝা ডেকেছিলেন। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, এমন চাপ তাদের দিক থেকে কখনই দেওয়া হয়নি। সৌম্যের বিষয়েও প্রতিবেশী বা ছাত্রদের ধারণা 'মোটেই ভাল নয়।

শনিবার সন্ধ্যায় অমিযবাবুর বাড়ি হাজির হলাম, কাচ লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে কি না জানতে। বাড়িতে ছিলেন শুধু তৃপ্তি দেবী। জানালেন, মিস্ত্রি মাপ নিয়ে গেছে। কাল দশটার মধ্যে ওরা চলে আসবে। আপনার সামনেই কাচ লাগান হবে। আপনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন এবং রবিবার আসবেন শুনে সৌম্য আপনাকে দেখবে বলে দারুণ বায়না ধরেছে। আসলে আপনার কথা তো অনেক পড়েছে, তাই আপনাকে দেখতে চায়। আপনি কিভাবে কাচ ভাঙা বন্ধ করবেন, সেটা নিজের চোখে দেখার লোভ সামলাতে পারছে না। বললাম, বেশ তো, ওকে নিয়েই আসুন।

তৃপ্তি দেবী জানালেন, দূরদর্শন থেকে একজন এসেছিলেন। রবিবার কিছু ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে জানিয়েছি, সে-দিন প্রবীরবাবু সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এ-বাড়িতে একটা পরীক্ষা চালাবেন। অতএব প্রবীরবাবুর সঙ্গে কথা না বলে, তাঁর অসুবিধে হবে কিনা না জেনে ওইদিন আপনাদের ছবি তোলার অনুমতি দিতে পারছি না।

১ ডিসেম্বর শনিবার বসুমতী পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবর পরিবেশিত হয় ২ ডিসেম্বর কাচভাঙা ঘরে কাচের জিনিসপত্র রাখা হবে এবং সেই সঙ্গে আলমারির ভেঙে যাওয়া কাচও নতুনভাবে লাগান হবে। সমিতির প্রতিনিধিরা ঐদিন ঘরে ৬ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করবেন, ইত্যাদি।

২ ডিসেম্বর রবিবার সকালে The Telegraph পত্রিকার প্রায় আধ পৃষ্ঠা ধরে প্রকাশিত হলো একটি সচিত্র প্রতিবেদন "POLTERGEIST"। প্রতিবেদক প্রণয় শর্মা প্রতিবেদনটিতে জানালেন, "ইতিমধ্যে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংস্থার তরফ থেকে বিজ্ঞানীরা ঘরটি দেখতে গিয়েছিল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

"কিন্তু গত কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, সাইন্স অ্যাণ্ড র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীর ঘোষের দৃশ্যপটে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এই যুক্তিবাদী ওই পরিবারের সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি ২ ডিসেম্বরের মধ্যে রহস্যভেদ করবেন। তিনি শ্রীরায়কে বাল্ব টিউবলাইটসহ সমস্ত কাচের সামগ্রী তাঁর উপস্থিতির দিন লাগাতে বলেছেন।"

২ ডিসেম্বর রবিবার সকাল দশটায় অমিযবাবুর ফ্ল্যাটে হাজির হলাম আমি ও আমাদের সমিতির কিছু সদস্য। আজই প্রথম দিনের আলোয় ঘরটি দেখলাম। অমিযবাবুর ঘরের দরজায় পাশেই কালো কালি দিয়ে কাঁচা হাতের কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে আলমারি ও বুক-কেসের সব কাচ লাগান হলো। তবে কাচ লাগাবার আগে প্রতিটি কাচ ভালোমত স্পিরিট দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম। ঘরের বাল্ব ও টিউবলাইট জ্বেলে দেওয়া হল। ঘরের বাল্বের হোল্ডার থেকে দড়ি দিয়ে একটা আয়না ঝুলিয়ে রাখা হয়। যে আলমারি উল্টে পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, সেই আলমারির মাথায় রাখা হয় কেরসিন ল্যাম্পের একটি চিমনি। তারপর চলে অপেক্ষা। ঘরে সাংবাদিকরা, অমিয়বাবু ও সৌম্য ছাড়া মাঝে-মধ্যে ছিলেন তৃপ্তি দেবী ও অমিযবাবুর পরিচিত কেউ কেউ। ভি ডি ও-তে ছবি তোলা

হয়েছে 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে। সৌম্যের ডান বাহুতে একগাদা তাগা-তাবিজ ঝোলান। শেকড় ঝোলান ছিল বারবার উল্টে পড়া কাঠের আলমারিতে। অমিয়বাবু আন্তরিক আতিথেয়তা দেখিয়ে আমাদের দফায় দফায় চা, সিগারেট ও রসগোল্লা খাইয়েছেন। ঘরে আমাদের সমিতির পক্ষে ছিলেন জ্যোতি মুখার্জি, কমল বিশ্বাস, আশিস মুখার্জি, দেবু হালদার ও জাদুকর শুভেন্দু পালিত। ওদের ওপর দায়িত্ব ছিল প্রতিটি কাচের জিনিসের ওপর লক্ষ্য রাখা। সমিতির সভ্য ছাড়া যাঁরাই ঘরে উপস্থিত থাকবেন তাঁদের কারো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ধাক্কায় বা আঘাতে যেন কোনও কাচের জিনিস ভেঙে না যায় অথবা কোনও আসবাব উল্টে না পড়ে, এ-দিকে নজর রাখার দায়িত্বও ছিল ওদের ওপর। সারা ঘরে ছড়িয়ে রাখা কাচের সামগ্রীর কোনও একটিকে ঠাসা ভিড়ের সুযোগে স্রেফ আঘাত হেনে ভেঙে ফেলা বা কোনও জিনিস উল্টে ফেলে দেওয়া এমন কোন কঠিন কাজ নয়। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন নজর রাখা। এই ঘটনার পিছনে মানুষের হাত থাকলে, সেই হাতের মালিক কে হতে পারেন, এ বিষয়ে যুক্তিগুলো সাজালেই অনুমান করা যায়, এটা যেমন সত্য, তেমনই সত্য অনুমানের হদিশ পেয়ে ঘটনার নায়ককে বাঁচাতে আমাদের ধোঁকা দিতে আজ অন্য কেউ কাচ ভঙ্গকারীর ভূমিকা নিতে পারে। আর এটা মাথায় রেখেই দু'দিন আগে নজরদারির দায়িত্ব যাঁদের দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের নিয়ে ক্লাস করেছি। ব্ল্যাক-বোর্ডে রহস্যময় ঘরটির কোথায় কি আছে এবং কোথায় কোথায় কাচ লাগান হবে, কাচের সামগ্রী রাখা হবে তার ছবি এঁকে কে কেমনভাবে নজর রাখবেন, তা বুঝিয়েছি। নজরদারদের কেউ কিছু সময়ের জন্য বাইরে গেলে পরিবর্ত হিসেবে দায়িত্ব নেবার জন্য কয়েকজনকে 'রিজার্ভ' রেখেছি। বাইরে দর্শকদের মধ্যে মিশে থাকা সমিতির সদস্যদের পরিচলনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শশাংক মণ্ডলকে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে সমিতির পক্ষ থেকে কাচ ভাঙার রহস্যের আবরণ সরালাম। বললাম কাচ ভাঙে কী কী কারণে। জানালাম, এ ঘরের কাচ শব্দ-তরঙ্গে ভাঙছিল না। এমন সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে যুক্তিগুলো হাজির করলাম। ওভার-ভোল্টেজে ঘরের যে কোনও কাচের জিনিস ভাঙা, আলমারি বারবার উল্টে দেওয়া, চালু না হওয়া সিলিং ফ্যান দোল খাওয়ানো অসম্ভব। ওভার-ভোল্টেজের দরুন কাচের বাল্ব প্রথম দু-একবার ভাঙলেও ভাঙতে পারে। কিন্তু প্রতিটি বাল্ব ও টিউবলাইট যে ওভার-ভোল্টেজে ভাঙছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভোল্টেজ পরীক্ষা করা হয়েছে, লাইন পাল্টান হয়েছে। অথচ লাইন পাল্টানোর পরও বাল্ব ও নিয়ন ফেটেছে। অথচ লক্ষ্য করুন, এই একই লাইন থেকে তার টেনে বাল্ব বাইরে সবার চোখের সামনে রাখলে ও জ্বালালে ফাটছে না। বিদ্যুৎ লাইনে গোলমাল থাকলে, এক্ষেত্রে বাইরের বাল্বও ফাটতো।

তীব্র শব্দের প্রভাবে কাচ ভাঙার সম্ভাবনা এখানে শূন্য। আশে-পাশে কল-কারখানা রেল ও বিমানের এমন কোনও তীব্র শব্দ সৃষ্টি হয় না, যার দরুন কাচ ভাঙতে পারে। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কাচ ভাঙা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আপনারা ভাঙা-কাচের টুকরোগুলো একটু লক্ষ্য করুন।

'বর্তমান' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক রূপকুমার বসুর হাত থেকে তাঁর সংগৃহীত

দু'টুকরো কাচ নিয়ে সাংবাদিকদের দেখালাম। কাচগুলো দেখলেই বোঝা যায় এই কাচগুলো ভাঙার আগে কিছু দিয়ে অনেকটা কেটে রাখা হয়েছিল। বাকিটা ভেঙেছে আঘাতে, চল্‌টা ওঠা দেখলেই বোঝা যায়। এই যে টুকরোগুলো দেখালাম, এগুলো কাঠের আলমারির ভাঙা কাচের টুকরো। আলমারির কাচ ভেঙেছে একটু অদ্ভুত ভাবে। আলমারির এক দিকের পাল্লায় ওপরে-নীচে কাচ লাগান দেখতে পাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওপরের কাচে একটা স্পষ্ট গোল দাগ কাটা, তার আশে-পাশে কয়েকটা আঁচড়। তারপর একদিন তলার কাচেও একই ধরনের দাগ দেখা গেল। একদিন দেখা গেল ওপরের গোল দাগের অংশটা ভেঙে পড়েছে। তলার কাচটাও একদিন ওভাবেই ভাঙলো—কাচের মাঝখানে একটা বড় গোল ফুটো। কাচের ওপর কী দিয়ে দাগ কাটা যায়? কোয়ার্জ (কাচকাটা পাথর) পাথর দিয়ে কাটা যায়। এই শহরে অনেক জায়গাতেই কাচকাটা পাথর বিক্রি করেন কিছু ভিন্ প্রদেশী মহিলারা। এক টাকা থেকে দু-টাকা দাম। এমনকি দমদম স্টেশন চত্বরেই ওই পাথর বিক্রি হয়। ফটোর দোকানে কাচ কাটার জন্য ছোট একটুকরো কাঠের আগায় হীরে লাগান থাকে। অমন একটা কাঁচ-কাটার যন্ত্র যোগাড় করা এমন কিছুই কঠিন নয়। কোয়ার্জ জাতীয় কোনও কিছু দিয়ে কাচে গোল করে দাগ কেটে রাখলে কাচের অনেকটাই কেটে যাবে। তারপর সুযোগ বুঝে বৃত্তের মাঝে একটি আঘাত করলেই কাচ ভেঙে যাবে বৃত্তের আকারে। আলমারির কাচ ভাঙার ক্ষেত্রে কোয়ার্জ জাতীয় পাথরই ব্যবহৃত হয়েছিল।

কথার মাঝখানে প্রতিবাদ করলেন উত্তেজিত অমিয়বাবু, আপনি এভাবে কাচ কেটে দেখাতে পারবেন?

বললাম, নিশ্চয়ই পারবো। আপনি অনুমতি দিলে করে দেখাতে পারি।

না, অনুমতি দেননি অমিয়বাবু। বরং বললেন, বুক কেসের কাচ তো গোল হয়ে ভাঙছিল না। ওটার কী ব্যাখ্যা দেবেন?

বলেছিলাম, ভাঙা কাচগুলোর একটা অংশ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। জোরালো আঘাত করলে আঘাতস্থলের কাচ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে।

অমিয়বাবুর আত্মীয় বলে পরিচিত এক ভদ্রলোক জোরালোভাবে আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, কাচগুলো কেউ আঘাত দিয়ে ভাঙার সময় তার পক্ষে আদৌ কি এমন ক্যালকুলেশন করে আঘাত করা সম্ভব যার দরুন গুঁড়ো হয়ে যাবে? আপনার এই থিয়োরি আদৌ মানতে পারছি না।

অমিয়বাবু মুখ খুললেন, আপনি এই রকম গুঁড়ো করে ভেঙে দেখাতে পারবেন?

বললাম, আমি আপনাদের দু'জনের কথারই উত্তর দেব। অমিয়বাবুর আত্মীয়কে বললাম, আঘাতে কাচটা সাত টুকরো হয়ে ভাঙলে আপনি প্রশ্ন করতেন, কাচটা ঠিক সাতটুকরো হয়ে ভাঙলো কেন? কেন দু'টুকরো বা পাঁচ টুকরো নয়? এ-ভাবে ক্যালকুলেশন করে কি ভাঙা সম্ভব? ভাঙার সময় কেউ ক্যালকুলেশন করে ভাঙে না, এক্ষেত্রেও ক্যালকুলেশন করে ভাঙেনি। মেরেছে এবং ভেঙেছে। আর অমিয়বাবুর উত্তরে জানাচ্ছি, উনি অনুমতি দিলে ওইভাবে গুঁড়ো-গুঁড়ো করেই ভেঙে দেখিয়ে দিতে পারি।

অমিয়বাবু আর এগোলেন না। তবে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আর আলমারিটা

পড়ল কী করে ?

ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাই পড়েছে।

একজনের পক্ষে ঠেলে ফেলে দেওয়া আদৌ সম্ভব ? আপনি ফেলতে পারবেন ?

বললাম, আমি তো পারবোই, এখানে উপস্থিত আমাদের সমিতির যাকে সবচেয়ে দুর্বল বলে আপনার মনে হয়, তাকেই ডেকে নিন, দেখবেন সেও ফেলে দেবে।

আর বাল্বগুলো ফাটছিল কী করে ? অমিয়বাবু প্রশ্ন করলেন।

এখানেও মানুষের হাত ছিল। ফাটান হচ্ছিল বলেই ফাটছিল।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অমিয়বাবু জানালেন তাঁর ধারণা বাল্ব থেকে কোনও একটা অজ্ঞাত রশ্মি বেরিয়ে এসে আলমারি উল্টে দিয়েছে, কাচগুলো ভেঙেছে। সৌম্যেরও বক্তব্য ছিল ওই ধরনের। সৌম্যের কথা মত ও দেখেছে বাল্ব থেকে একটা হলদে রশ্মি বেরিয়ে এসে আলমারিতে আঘাত করেছে।

ফ্যান দোলার ব্যাখ্যাও চেয়েছিল অমিয়বাবুর ঘনিষ্ঠ একজন। জানিয়েছি ফ্যান দোলালেই দোলে। কেউ দুলিয়ে দিয়েছিল।

কে এমনটা করেছে ? আমাদের এ ঘরে থাকি মাত্র তিনজন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমরাই। সুতরাং আপনার কথা মেনে নিলে এটাই দাঁড়ায় আমার স্ত্রী বা ছেলে কেউ এ-সব করেছে। আমার স্ত্রী কী পাগল যে ধুম্-ধুম্ করে জিনিস-পত্তর ভাঙবে। আমার ছেলেও যদি ভেঙে থাকে, তবে একবারও কি আমরা দেখতাম না। অমিয়বাবু বললেন।

বললাম, গত বুধবার প্রথম সাক্ষাৎকারে আপনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন ম্যাণ্ডেলাকে সম্বর্ধনা দেবার দিন সন্ধ্যায় ঘরে ঢোকার সময় বাল্বটা দুম্ করে ফেটে যেতে দেখেছিলেন, তারপর আর একটি ঘটনাও আপনি নিজের সামনে ঘটতে দেখেননি। দেখেছেন ঘটে যাওয়ার পর। আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাদা করে কথা বলেছি। উনিও কোনও ঘটনা নিজের চোখে ঘটতে দেখেননি, দেখেছেন ঘটে যাওয়ার পর। ঘটনাগুলো ঘটার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু আপনার ছেলে। আজও সাংবাদিকদের সামনে বহুবার বলেছেন, কাচের জিনিস ঘরে রাখলে আধ-ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে। গতকাল সন্ধেয় এসে বউদির (তৃপ্তি দেবী) কাছ থেকে জানতে পারি, কোনও এক জ্যোতিষী না বাবাজী কি একটা জিনিস দিয়ে বলেছেন, সৌম্যের ওপর কার্ একটা কোপদৃষ্টি পড়েছে। তাইতেই এইসব অঘটন। কিছুটা ওঁর কথা মতই এ-বাড়ি থেকে সৌম্যকে দূরে রাখতে গত মঙ্গলবার বিকেলে সাতগাছি এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। তৃপ্তি দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সৌম্যকে পাঠাবার পর আর কোনও কাচের জিনিস কি ভেঙেছিল ? তিনি জানিয়েছিলেন, ঘরে বর্তমানে ভাঙার মত কোনও কাচের জিনিস নেই, তাই ভাঙারই প্রশ্ন নেই। কাচের জিনিস রাখলে ভাঙবে, এতদিন ধরে যা ঘটছে, তাতে এটা ধরে নেওয়াই যায়। আবার সত্যি এমনও হতে পারে, এই জ্যোতিষী যা বলেছেন, তাই সত্যি। সৌম্য এ-ঘরে উপস্থিত হলে ওর শরীর থেকে কোনও রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে আবার অঘটন ঘটতে থাকবে। তৃপ্তি দেবীরও ইচ্ছে ছিল, আমাদের এই ছ'ঘণ্টা পরীক্ষা চালাবার সময় সৌম্য উপস্থিত থাকুক। সৌম্যকে আনতে বলেছিলেন। ও এই ছ'ঘণ্টা ছিল, কিন্তু তবু কাচ ভাঙেনি।

আসলে কাচগুলো মানুষই ভাঙছিল। আজ সে ভাঙার সুযোগ পায়নি। ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে যুক্তি এ-কথাই বলে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছেন অমিয়বাবুর পরিবারেই কেউ। প্রশ্ন উঠেছে, কেন ভাঙবে? আপনাদের দুটি তথাকথিত ভুতুড়ে ঘটনা বলছি। শুনলে ভাঙার কারণেই কিছুটা হদিশ পেতে পারেন।

'জল-ভূত' ও 'পোশাককাটা-ভূত'-এর ঘটনা দুটির উল্লেখ করে বললাম, জলভূতের সৃষ্টি করে বালকটি তার মায়ের কড়া শাসনের প্রতিশোধ তুলতে চেয়েছিল, শাস্তি দিতে চেয়েছিল। আর পোশাককাটা ভূতের সৃষ্টি হয়েছিল বাড়ির কাজের কিশোরী মেয়েটির হতাশা থেকে। কিশোরীটির কথা মত বাড়ির ছোট ছেলেকে সে ভালবাসে। ছোটছেলে তাকে আদর-টাদর করে বটে, কিন্তু ভালবাসে অন্য একটি মেয়েকে। কিশোরীটির ইচ্ছে হয়, ছোটছেলের মুখোশ খুলে দেয় তার প্রেমিকার কাছে। কিশোরীটি বিশ্বাস করে, মুখোশ খুলতে গেলে লাভ হবে না কিছুই। বড়জোর ছোটছেলের সঙ্গে তাঁর প্রেমিকার বিচ্ছেদ হবে। কিন্তু তাতে ছোটছেলে তাকে আদৌ বিয়ে করবে না। বরং ঘটনাটা জানাজানি হলে যে কোনও একটা অপবাদ দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিশোরীটি মেয়েদের পোশাক আর ছোটছেলের পাজামার ওপর আক্রোশ মিটিয়েছে তার অবদমিত যৌন আবেগ, ক্রোধ, ঈর্ষা ও হতাশা থেকে। অনেক সময়ই কিশোর-কিশোরীদের ক্ষোভ, হতাশা, অবদমিত আবেগই রূপ পেতে পারে এই ধরনের নানা কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে বড়দের উত্যক্ত করার মধ্যে।

এখানে কে নিশ্চিতভাবে ঘটনা ঘটাচ্ছে, তা বলার মত কোনও অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই বটে, কিন্তু যুক্তিগুলো পরপর সাজালে মনে হয় ঘটনাগুলো ঘটানোর সম্ভাবনা কিশোরটিরই সবচেয়ে বেশি। কিশোর বয়সে বা যৌবন সন্ধিক্ষণে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, একাকিত্বের সমস্যাও এর মধ্যে অন্যতম। কিশোরটি সেই সমস্যাতে পীড়িত হতেই পারে। তারই হয়তো বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বড়দের পীড়িত করার চেষ্টায়।

এ-ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনাও রয়েছে। অমিয়বাবু রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মা তাঁর স্কুল নিয়ে। বাবা মা'র স্নেহ থেকে, তাঁদের কাছে পাওয়া থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। যখন বাবা ঘরে থাকেন, তখনও তাঁকে ঘিরে থাকে অন্য মানুষেরাই। ব্যস্ত রাজনীতিবিদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক জীবন, এ-কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি এক ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাটে মা-বাবার অনুপস্থিতির একাকিত্ব যেমন সৌম্যকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলতে পারে, তেমনই বহুজনের ভিড়ে বড় বেশি একা করেই বার বার নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে সৌম্য। ঘরে পড়াশুনোর মত পরিবেশের অভাব তাকে একটু একটু করে লেখাপড়ার জগৎ থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে। অনুষঙ্গ হিসেবে পাল্টাতে পারে বন্ধুজগতের পরিবেশ। ওর ক্ষোভ, হতাশা থেকে বড়দের উত্যক্ত করার জন্য ও এমনটা করতেই পারে।

অমিয়বাবু সরাসরি প্রায় চ্যালেঞ্জ জানালেন, স্বীকার করছি কাচ আধ ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভাঙতো। আজ ছ'ঘণ্টা পর্যন্ত ভাঙেনি। কিন্তু আপনারা চলে যাবার পর আবারও ভাঙতে পারে। আমার ছেলেকে ঘরে রাখবো না। অন্য কোথায় পাঠিয়ে



আলমারির কাচ পরীক্ষা করছেন লেখক
খাটে বসে অমিয়শংকর রায়

দেবো। কিন্তু তাবপবও যে ভাঙবে না, সে গ্যাবান্টি আপনি দিতে পাববেন ?

বললাম, আপনাব চ্যালেঞ্জ আমাদেব সমিতি গ্রহণ কবছে। কিন্তু ঘবে কেউই থাকবে না। ঘব 'সিল্' কবে দেবো। ছ'দিন, ছ'সপ্তাহ, ছ'মাস—যতদিন সিল্ থাকবে কিছু ভাঙবে না, উল্টোবে না। আপনি কি এই সর্তে বাজী হবেন ?

না, বাজি উনি হননি।

পবেব দিন 'The Telegraph', 'আজকাল', 'বর্তমান', 'বসুমতী' পত্রিকায যথেষ্ট গুরুত্ব সহকাবে আমাদেব সমিতি কর্তৃক কাচ ভাঙা বহস্যভেদেব খবব প্রকাশিত হয।

খববটা কিন্তু এখানেই শেষ হযনি। ৫ ডিসেম্ববেব গণশক্তিতে আবাব একটি খবব প্রকাশিত হয। তাতে জানান হয অমিযশংকব বায জানিযেছেন "ববিবাব প্রায জোব কবেই প্রবীব ঘোষ নামে এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে পবীক্ষা কবতে ঘবে ঢোকেন। সঙ্গে কযেকটি সংবাদপত্রেব প্রতিনিধিদেবও ডেকে নিযে আসেন। পবেব দিন সংবাদপত্রে তাঁব ভাষ্য পড়ে বিস্মিত।"

অর্থাৎ আমি কিছু সংবাদপত্রেব প্রতিনিধিদেব নিযে প্রায জোব কবে তাঁব ঘবে ঢুকে দীর্ঘ ছ-সাত ঘণ্টা ধবে পবীক্ষা চালিযেছিলাম। এবং সাংবাদিকদেব কী বলেছি, তিনি জানতেন না। পবেব দিন সংবাদপত্র পাঠে প্রথম জানলেন এবং বিস্মিত হলেন। এত মিথ্যা ভাষণেব আগে অমিযবাবুব খেযাল কবা উচিত ছিল, ওইদিন 'আজকাল' পত্রিকা ভি ডি ও তে যতটা সময ধবে বেখেছে, তা অমিযবাবুব মিথ্যাচাবিতাব মুখোশ খোলাব পক্ষে যথেষ্টব চেযে বেশি। এটা অবশ্য অমিযবাবুব বোধহয জানা ছিল না, তাঁদেব সঙ্গে একাধিক দিন আমাব যে সব কথাবার্তা হযেছে, তাব অনেকটাই ক্যাসেটবন্দী কবে বেখেছি। জানা থাকলে এমন আদ্যন্ত মিথ্যাভাষণ থেকে নিশ্চযই সংযত হতেন—মুখোশ খুলে পড়াব ভযে।

জানি না, অমিযবাবুব এই ধবনেব মিথ্যাচাবিতাব সঙ্গে সৌম্য পবিচিত কি না ? দীর্ঘ বছব কাছাকাছি থেকে বাবাকে দেখাব দরুন বাবাব এই দুর্বলতাব কথা সৌম্যেব অজানা না থাকতেই পাবে। দেখা দিতে পাবে বাবাব প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, ক্ষুব্ধতা ইত্যাদি। পাশাপাশি বাবাব এই ধবনেব মিথ্যাচাবিতা ছেলেকে অন্যভাবেও প্রভাবিত কবতে পাবে।

হতাশা, ঈর্ষা, অবদমিত
আবেগ, ক্রোধ, শ্রদ্ধাহীনতা
ইত্যাদি থেকে এই ধরনের হল্লাবাজ ভূত
সৃষ্টির বহু ঘটনা মনোরোগ চিকিৎসকদের
অভিজ্ঞতার ঝুলিতে রয়েছে। এমন অবস্থায় মা-বাবার
উচিত ভালবাসা ও সহানুভূতি নিয়ে সন্তানের পাশে
দাঁড়ানো। ঠুনকো সম্মানবোধের দ্বারা

পরিচালিত হয়ে কেউ সন্তানের ভ্রান্তিকে, অন্যায়কে আড়াল করতে চাইলে সে তৈরি হয়ে উঠতে পারে আর এক 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'।

এটা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ৯ ডিসেম্বর '৯০ 'আজকাল' পত্রিকায় রবিবাসর'-এর দুটি রঙিন পৃষ্ঠা ছিল 'মানুষ ভূত' নিয়ে। অমিয়বাবুর মিথ্যাচারিতার মুখোশ খোলার পক্ষে পৃষ্ঠা দুটির ভূমিকা ছিল যথেষ্টর চেয়েও বেশি।



তিন

যে ভূতুড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে বিপদে পড়েছিলাম

ভূত আনলেন বিজয়া ঘোষ

এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় আর কোনও দিন পড়িনি। দর্শকদের একাংশ আমাদের সমিতির আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাকেই এমন তীব্র আক্রমণ চালাবে, এটা আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না। আমাদের বারাসত শাখার ছেলেদের যথেষ্ট লড়াকু বলেই জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের যথেষ্ট বিভ্রান্ত বলে মনে হলো। বারাসত শাখার সম্পাদক শুভাশিষ ইন্দু কয়েকজন সঙ্গীসহ দ্রুত পায়ে মঞ্চে উঠে এলেন। পরিস্থিতিকে সামাল দিতে মাইকের মাউথপিস নিজের হাতে তুলে নিলেন। মেঘের মতো ভারী গলায় বলে চললেন, "আপনারা এত উত্তেজিত হবেন না। যাঁরা যুক্তিবাদী সমিতির অনুষ্ঠানে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা নিশ্চয়ই ন্যূনতম যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রত্যাশা করতে পারি। আপনারা দেখলেন, আপনারা শুনলেন একটু আগে বিজয়া দেবী প্রবীরবাবুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, তিনি প্ল্যানচেট করে আত্মা এনে সবার সামনে প্রমাণ করবেন প্ল্যানচেট, দেহাতীত আত্মা ও ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। বিজয়া দেবীর এই চ্যালেঞ্জের উত্তরে প্রবীরবাবু এখুনি আপনাদের সামনে স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন, তাঁর একটা চ্যালেঞ্জ আছে, পৃথিবীর যে কেউ অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারলে প্রবীরবাবু তাঁকে দেবেন ৫০ হাজার টাকা এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্র সহ প্রতিটি শাখা ভেঙে ফেলা হবে। কিন্তু কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে কয়েকটি পূর্বশর্ত পালন করতে হবে। শর্ত এক . চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে ৫ হাজার টাকা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কাছে অথবা প্রবীর ঘোষের কাছে জামানত হিসেবে দিতে হবে। শর্ত দুই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে অবশ্যই জানাতে হবে তিনি ঠিক কী ঘটনা অলৌকিক উপায়ে ঘটাতে চাইছেন। অতএব এখন চ্যালেঞ্জের বিষয়টা পুরোপুরি নির্ভর করছে বিজয়া দেবীর ওপর। তিনি জামানত হিসেবে ৫ হাজার টাকা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বারাসত শাখাতেও জমা দিতে পারেন। টাকা জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে আমরা

এই বিধান সিনেমা হলেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করবো।"

শুভাশিসের কথা অসাধারণ গোলমাল ভেদ করে সাধারণের মধ্যে কতখানি পৌঁছেছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছিল। আর কথাগুলো কানে ঢুকলেও সেগুলো মেনে নিতে যে গোলমালের নায়করা রাজি নন, তা তাদের ঘুসি পাকিয়ে হাত ছোঁড়া, স্টেজের দিকে ধেয়ে আসা এবং আমাকে ও আমার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ গালি-বর্ষণের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ওঁদের দাবি আমাকে এখুনি এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে।

এই ধরনের কোনও চ্যালেঞ্জের তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করতে যাওয়া নিঃসন্দেহে ঝুঁকির। অলৌকিক যে সব ঘটনা বিভিন্ন তথাকথিত অবতাররা ঘটিয়ে দেখান, সে গুলোকে দুভাগ ভাগ করা যায় ১। কৌশলের সাহায্যে ২। শরীর বৃত্তির সাহায্যে।

বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি। একজন অবতার বা ধর্মগুরু যখন নাড়ির গতি স্তব্ধ করেও বেঁচে থাকেন, জীবন্ত সমাধিতে থেকে প্রমাণ করতে চান যোগবলে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে শূন্যে ভেসে থাকেন, মন্ত্র শক্তিতে যজ্ঞের আগুন জ্বালান, শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করেন, মনের কথা পড়ে ফেলেন, তখন সেগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি করেন স্রেফ কৌশলের সাহায্যে। আবার একজন রোগী যখন কোনও ধর্মগুরুর পা ধোয়া জল খেয়ে বা তাবিজ-কবজ নিয়ে অথবা জল-পড়া তেল-পড়া খেয়ে রোগ মুক্ত হল, তখন কিন্তু সেগুলোর মধ্যে থাকে না কৌশলের সামান্যতম ছোঁয়া। এইসব ধর্মগুরু, অবতার বা ওঝারা রোগমুক্তির ক্ষেত্রে কোনও ম্যাজিক কৌশলের সাহায্য নেন না। শুধুমাত্র বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই যে কত রকম রোগ সারান যায় সে বিষয়ে ভালোমতো জানা না থাকলে মনে হতেই পারে অলৌকিক ক্ষমতাই রোগ মুক্তির কারণ। রোগ সৃষ্টি বা নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের বহু রোগের উৎপত্তি ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে। মানসিক কারণে যে সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, মাথার ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, স্পণ্ডালাইটিস, স্পন্ডালেসিস, অরথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, কাশি, ব্রোঙ্কাইটিস, অ্যাজমা, ব্লাডপ্রেসার, অবসাদ, ক্লান্তি ইত্যাদি। যখন এইসব রোগ মানসিক কারণে হয়, তখন রোগীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে মূল্যহীন ঔষধ, ক্যাপসুল ইনজেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করেই বহুক্ষেত্রে রোগীদের রোগ মুক্ত করা সম্ভব হয়। এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে প্ল্যাসিবো (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। উপরে বর্ণিত রোগে পীড়িত কেউ যদি পরম বিশ্বাসে কোনও ধর্মগুরু বা তান্ত্রিকজাতীয় কারো কাছে আরোগ্যের প্রার্থনা জানিয়ে পরম আশ্বাস লাভ করেন, "যা, তুই ভালো হয়ে যাবি" জাতীয় কথার মাধ্যমে, তবে অনেক সময় দেখা যায় রোগী রোগমুক্তও হয়ে যাচ্ছেন—এই একই কারণে জল-পড়া তেল-পড়া, তাবিজ কবজেও অনেক সময় দেখা যায় রোগ সারছে। এই জাতীয় রোগমুক্তির পিছনে কখনই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা কাজ করে না, কাজ করে ধর্মগুরু, তান্ত্রিক বা ওঝাদের প্রতি রোগীদের অন্ধ বিশ্বাস। প্রথম খণ্ডে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

আবার মস্তিষ্ক কোষের বিশেষ গঠন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বা হিস্টিরিয়া রোগীরা বিভিন্ন ধরনের অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও সংবেদনশীলতার জন্য এমন অনেক কিছু ঘটিয়ে দেন, যেগুলোকে সাধারণ মানুষ শারীরবৃত্তি বিষয়ে অজ্ঞতার দরুন ভূতে ভর বা ঈশ্বরে ভর বলে ধরে নেন, ফলে বহু ক্ষেত্রেই হিস্টিরিয়া রোগীরা পূজিত হয় বা নিন্দিত হয় ঈশ্বরের বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে। সাধারণভাবে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা প্রগতির আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই এই ধরনের হিস্টিরিয়া রোগীর সংখ্যা বেশি। সাধারণভাবে এই শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার ক্ষমতা অতি সীমিত। বহুজনের বিশ্বাসকে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা যাদের কম তারা এক নাগাড়ে একই ধরনের কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। একান্ত ঈশ্বর বিশ্বাস বা ভূতে বিশ্বাসের ফলে রোগী ভাবতে থাকে তার শরীরে ঈশ্বরের বা ভূতের আবির্ভাব হয়েছে, ফলে রোগী ঈশ্বরের বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব আচরণ করতে থাকে।

এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মস্তিষ্ক কোষের অধিকারীদের কেউ কেউ নিজের অজান্তে স্ব-নির্দেশ (auto-suggestion) পাঠিয়ে অন্যের ব্যথার চিহ্ন নিজের শরীরে গ্রহণ করেন। মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শরীর বৃত্তির এই অস্বাভাবিকতাকেই অনেকে অলৌকিক ঘটনা বলে ধরে নেন। এ বিষয়েও আগে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

তাই অনেক সময় তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা দেখার সঙ্গে সঙ্গে কৌশল ধরে ফেলা এবং একই ঘটনা ঘটিয়ে দেখান সম্ভব নাও হতে পারে। দু-পাঁচদিন দেরী হতেই পারে। শুধুমাত্র এই কারণে, কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে চাইলে তাঁকে জানাতে বলি তিনি কী ঘটিয়ে দেখাবেন। তিনি যদি বলেন, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন বা শূন্যে ভেসে থেকে দেখাবেন, সে ক্ষেত্রে বাস্তবিকই তিনি এ সব অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যেই যদি দেখান তবে আমার পক্ষে তাঁর লৌকিক কৌশল ধরে ফেলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কী ঘটিয়ে দেখাবেন জানা থাকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার সময়ের ব্যবধানের মধ্যে সম্ভাব্য কৌশলগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ আমি পেতে পারি এবং সেই ভাবনা-চিন্তার ফসল হিসেবেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের পরাজিত করা আমার পক্ষে সম্ভব।

এই মুহূর্তে দর্শকদের একাংশ যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপস্থিত দর্শকদের প্ররোচিত করছেন এবং সভায় একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছেন সেটা আমাদের সমিতির সভ্যদের দিয়ে জোর করে বন্ধ করতে চাইলে একটা অসুবিধে হতেই পারে। দর্শকদের মধ্যে অনেক মহিলা আছেন। গোলমালের সূচনা হলে তাঁদের অবস্থাটা কী হতে পারে সেটাও যেমন ভাবার বিষয়, তেমনই ভাবার বিষয় হলো বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে গণ্ডগোল শুরু হলে আমরা দ্রুত গণ্ডগোল বন্ধ করতে না পারলে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে? একটা দুর্ঘটনা আমাদের সমিতির সম্মানকে অনেকটাই নষ্ট করে দিতে পারে। আর বেশি ভাববার মত সময় ছিল না। ঘোষণা করলাম, "আপনাদের দাবীর প্রতি সম্মান জানাতে আমি এই মুহূর্তেই বিজয়া দেবীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।"

গোটা প্রেক্ষাগৃহ উল্লাসে যেন ফেটে পড়লো। এবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা বিজয়া ঘোষের দিকে ফিরলাম, "আপনি কী ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে চাইছেন ?"

মাউথপিস মুখে বন্দী করে বিজয়া দেবী শুরু করলেন, "এতক্ষণ আপনি আপনার বক্তব্যে বললেন, ধর্মশাস্ত্রগুলোতে আত্মার বিষয়ে বলা হয়েছে, আত্মা মানে চিন্তা, চৈতন্য বা মন। বিজ্ঞান বলছে মন বা চিন্তা হলো মস্তিষ্ক কোষেরই অ্যাকশন, মস্তিষ্ক কোষের অ্যাকশন্ ততো দিনই থাকবে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক কোষেরও অ্যাকশন শেষ হয়, অর্থাৎ আত্মাও মারা যায়। আপনি এতক্ষণ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন আত্মা মরণশীল। আমি উপস্থিত দর্শকদের সামনে আপনাকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবো আত্মা অমর। প্রমাণ করে দেবো



বিজয়া ঘোষ

বিজ্ঞানের যেখানে শেষ সেখান থেকেই আধ্যাত্মবাদের শুরু।"

বিজয়াদেবীর কথা শুনতে শুনতে আমি তাঁকেও লক্ষ্য করছিলাম। উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো। ওজন সম্ভবত পঁচাত্তর কেজির কম নয়। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, রঙ ফর্সা। গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। কথাবার্তায় আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ স্পষ্ট। সম্ভবত বারাসতের কাছাকাছিই থাকেন, তাই প্রেক্ষাগৃহে প্রচুর জঙ্গী ভক্ত সমাবেশ ঘটাতে পেরেছেন। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। বারাসত শাখার বিলি করা প্রচারপত্রের ও পোস্টারের দৌলতে জানতেন আমার কাছে পরাজিত অবতার ও জ্যোতিষীদের নাম। আজ ২৬ মার্চ '৮৯। গত মাসখানেক ধরে অবতার গৌতম ভারতীর সঙ্গে আমার গোলমালের খবরটা পেশাদার অলৌকিক মাতাজী বিজয়া দেবীর অজানা থাকার কথা নয়, বিশেষত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যখন এই নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈ চলছে। এত কিছু জানার পরেও তিনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর এই এগিয়ে আসার মধ্যে যথেষ্ট পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে। তিনি ভাল মতই জানেন, ভাববার মত যথেষ্ট সময় সুযোগ না দিলে পৃথিবীর সেরা জাদুকরকেও পরাজিত করা যায় জাদু-কৌশল দিয়েই। এটা জানেন বলেই তাঁর লোকজন দিয়ে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যাতে বাধ্য হই এই মুহূর্তে তাঁর মুখোমুখি হতে। স্বাভাবিক কারণেই আমি নিশ্চয়ই এমন একটা অসম্ভব ঝুঁকি নিতে রাজি হবো না, এটাও বিজয়া দেবীর জানা। রাজি না হলে গণ্ডগোল পাকিয়ে আমাদের আলোচনাচক্র ও অলৌকিক বিরোধী বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবিরের কাজ ভণ্ডুল করে দিতে পারলে এটাই বিশাল করে প্রচার করা যাবে—বিজয়া ঘোষের চ্যালেঞ্জের মুখে প্রবীর ঘোষের পলায়ন, ফলে ক্ষুব্ধ দর্শকদের হামলায় যুক্তিবাদী সভা পণ্ড।

বিজয়া দেবীর কথা শেষ হতেই প্রচুর হাততালি পড়লো। প্রশ্ন করলাম, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"বারাসতের বালুরিয়ায়।"

"আপনি এর আগে কখনও আত্মা এনেছেন?" প্রশ্ন করলাম।

বিজয়া দেবী তাঁর ডান হাতের মাউথপিসটা মুখের কাছে এনে শ্রোতা ও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি প্ল্যানচেট করে আত্মা আনি। অনেকেই আমার কাছে আসেন তাঁদের প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছেয়। মৃত্যুর আগে যে কথা জেনে নেওয়া হয়নি তেমন অনেক কথাই জেনে নিতে চান অনেকে। অনেকে জানতে চান, তাঁদের প্রিয়জনের আত্মা এখন কেমন আছে। অনেকে শুধুমাত্র প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগটুকু পেতেই আকুল হয়ে ছুটে আসেন।"

জিজ্ঞেস করলাম, "এর জন্য আপনি কি কোন পারিশ্রমিক নেন?"

"না, না, আমি কিছুই দাবী করি না। ভালবেসে যে যা দেন, তাই নিই।" বিজয়া দেবী জানালেন।

সম্প্রতি আনন্দবাজারে প্রকাশিত আচার্য গৌতম ভারতীর সাক্ষাৎকারটির কথা মনে পড়লো। গৌতম ভারতীও বিজয়া দেবীর মতোই বলেছিলেন ভক্তরা ভালোবেসে যে যা দেন, তাই গ্রহণ করেন। কেউ দু'হাজার টাকা দিলেও নেন, কেউ পঁচিশ হাজার দিলেও।

বললাম, "আপনি কি বাস্তবিকই এই হল ভর্তি দর্শকদেব সামনেই আত্মা এনে দেখাবেন ?

"নিশ্চযই।"

"শুনেছি ভূতেবা ভীড়-টিড পছন্দ কবে না। যাঁবা প্ল্যানচেটে আত্মা আনেন বলে দাবী কবেন, তাঁবাই আমাকে এ ধবনেব কথা বলেছেন। যাই হোক, প্ল্যানচেটে আত্মা না হয আনলেন, কিন্তু আত্মা যে বাস্তবিকই এসেছে, তা আমবা বুঝবো কী কবে ?"

"আপনাব যে কোনও প্রশ্নেব উত্তব আত্মা দেবে। আত্মা সূক্ষ্মদেহী, সর্বত্রগামী, তাই যে কোনও প্রশ্নেব উত্তব দিতে সক্ষম।"

"এই মঞ্চেই তো দেখাবেন, কী কী ব্যবস্থা কবতে হবে বলুন, আমাদেব সমিতিব ছেলেবা "

আমাকে কথাটা শেষ কবতে না দিযেই বিজযা দেবী বললেন, "যা যা প্রযোজন সবই নিযে এসেছি।"

একটুক্ষণেব মধ্যে মঞ্চে একটা ছোট এবং চওডা বেঞ্চ উঠে এলো। বেঞ্চটাকে সামনে বেখে চেযাবে বসলেন বিজযা দেবী। বেঞ্চেব উপব পাতলেন বিশাল একটা সাদা কাগজ ও তাব উপব তিন-কোনা প্ল্যানচেট টেবিল। ত্রিভুজ আকৃতিব প্ল্যানচেট টেবিলেব তিনটি দিকেব দৈর্ঘ্যই আনুমানিক ৬ ইঞ্চি কবে। তলায় পাযাব বদলে তিনটি লোহাব বল লাগানো। প্ল্যানচেট টেবিলেব এক কোণে একটা ফুটো। ফুটোয একটা ডট পেন গুঁজে দিলেন বিজযা দেবী। পেনেব মুখ বইল কাগজ ছুঁযে।

মাথাটাকে বাব কযেক জোবে জোবে নেডে বিজযা দেবী প্ল্যানচেট টেবিল দু'হাতে ছুঁযে স্থিব হযে বইলেন। মিনিট তিন চাব। প্ল্যানচেট টেবিল থবথব কবে বাব কযেক কেঁপে উঠেই গতি পেল, কাগজেব উপব দ্রুত ওঠানামা কবলো।

কাগজটা তাঁবই এক ভক্তেব হাতে তুলে দিযে বললেন, "আত্মাব লেখাটা সমস্ত দর্শকদেব দেখান।"

ভক্ত দু'হাতে কাগজটা মেলে ধবলেন দর্শকদেব দিকে। বড বড হবফে লেখা বযেছে, অববিন্দ বিশ্বাস। চিৎকাব ও হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভবে গেল। এক উৎসাহী দর্শক মঞ্চে উঠে এলেন। বিজযা দেবীকে প্রশ্ন কবলেন, "বলুন তো আমাব পেশা কী ?"

বিজযা দেবী তৎপব হলেন। নতুন একটা কাগজে অববিন্দেব আত্মা লিখলো "সাংবাদিক"। বিজযা দেবী এবাব প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন কবলেন, "উত্তব ঠিক হযেছে ?"

প্রশ্নকর্তা উত্তব দিলেন, "হ্যাঁ।"

আব এক প্রস্থ প্রচণ্ড হাততালিসহ চিৎকাব।

এবাব আবও কযেকজন মঞ্চে উঠে এলেন। উদ্দেশ্য প্রশ্ন কবা। আমাব সমিতিব সদস্যদেব দু-একজনও বিজযা দেবীব দিকে এগিযে এসেছে। তাঁদেবও উদ্দেশ্য সম্ভবত বিজযা দেবীকে কঠিন কিছু প্রশ্ন কবে আমাকে সাহায্য কবা। অবস্থা আযত্তেব বাইবে চলে যাচ্ছে দেখে আমাব মুঠোবন্দী মাউথপিসকে কাজে লাগালাম, "আপনাদেব প্রত্যেকেব কাছে অনুবোধ, আপনাবা কেউ মঞ্চে ওঠাব চেষ্টা কববেন না, বা বিজযা দেবীকে কোনও প্রশ্ন কবাব চেষ্টা কববেন না। আপনাদেব কাবও প্রশ্নেব সঠিক উত্তব

চার

ভুতুড়ে চিকিৎসা

ফিলিপিনো ফেইথ হিলার ও ভুতুড়ে অস্ত্রোপচার

৩১ আগস্ট, ৮৬, রবিবারের সকাল। আর পাঁচটা রবিবারের সকালের মতই বৈঠকখানায় তখন গাদা-গাদা চায়ের কাপ আর রাশি রাশি সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে আড্ডা জমে উঠেছে। এমন সময় আমার ভায়রা সুশোভন রায়চৌধুরী এসে কোনও ভণিতা না করেই একটা দারুণ উত্তেজক খবর দিল—অতি সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তার এসেছেন কলকাতায়, রোগীকে অজ্ঞান না করে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার করে রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। ওর পরিচিত একজন অস্ত্রোপ্রচার করিয়ে ভাল হয়ে গেছেন। অস্ত্রোপচারের দাগটি পর্যন্ত নেই। খরচ পড়েছে পাঁচ হাজার টাকা। সুশোভনের আমাকে খবরটা দেওয়ার কারণ, যদি এই অলৌকিক রহস্য উন্মোচন করতে পারি।

আমার কাছে কলকাতায় ম্যানিলার অলৌকিক চিকিৎসকের উপস্থিতির খবরটা অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয়। সুশোভন যাঁকে অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তার বলে অবহিত করল তিনি এবং তাঁর মত ক্ষমতাবান চিকিৎসকরা নিজেদের পরিচয় দেন 'ফেইথ হিলার' বলে। যে ফেইথ হিলারদের নিয়ে পৃথিবী জুড়ে হৈ-চৈ, তাঁদেরই একজন এই মুহূর্তে কলকাতার বুকে প্রতিদিন বহু রোগীর ওপর অলৌকিক (?) অস্ত্রোপচার করে চলেছেন—কথাগুলো আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। গোটা ব্যাপারটাই ব্যান্ডেজ ভূতের মতোই গুজব নয়তো? খবরটা আমার কাছে অভাবনীয় এই জন্যে, মাত্র সপ্তাহতিনেক আগে আমার কিছু বন্ধুর কাছে বলেছিলাম, "ফেইথ হিলারদের হিলিং ব্যাপারটা এখনও কিছুটা রহস্যময় রয়ে গেছে। তাঁদের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে কৌশলটা ঠিক কী ধরনের এটা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়। যদিও James Randi তাঁর 'Flim-Flam' বইতে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন, তবু তাঁর লেখাতে দুটি দুর্বল দিক রয়েছে। এক তিনি নিজে ফেইথ হিলারদের মুখোমুখি হননি, দুই তাঁর বর্ণিত কৌশলের সাহায্যে একজন ফেইথ হিলারের পক্ষে একটা অপারেশন টেবিলে দাঁড়িয়ে অন্যের চোখের সামনে পরপর একাধিক- অপারেশন অসম্ভব।

অথচ আমি ম্যানিলা থেকে অলৌকিক অস্ত্রোপচার করিয়ে আসা তিনজনের সঙ্গে কথা বলে যা জেনেছি, তাতে ফেইথ হিলাররা স্থান ত্যাগ না করে অপারেশন টেবিলে এক নাগাড়ে দশ থেকে কুড়ি জনের ওপর অস্ত্রোপচার করেন। যদি কিছু টাকা যোগাড় করতে পারতাম, ফেইথ হিলিং রহস্যভেদের একটা চেষ্টা করতাম, ম্যানিলায় গিয়ে নিজের ওপর ফেইথ হিলিং করিয়ে।"

সেখানে উপস্থিত এক বন্ধু তখনই জানায়, সে আমার ম্যানিলায় যাতায়াতের খরচ বহন করতে রাজি আছে। বাকি ছিল কয়েক দিন হোটেলে থাকা ও ফেইথ হিলিং-এর খরচ বহন করার ব্যাপার। গত তিন সপ্তাহ ধরে টাকা যোগাড় করা এবং ফিলিপিন-এ যাওয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছিল। ঠিক এই সময় কলকাতায় ফেইথ হিলারের উপস্থিতি—এ যেন 'মেঘ না চাইতেই জল'। খবরটা আমার কাছে অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত এবং উল্লসিত হবার মত।

সুশোভনকে অনুরোধ করলাম ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারে ভাল হওয়া ওর পরিচিত লোকটির কাছ থেকে অলৌকিক ডাক্তারের ঠিকানাটা অবশ্যই এক দিনের মধ্যে যোগাড় করে দিতে।

সুশোভন অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিকানা দেয়নি, তবে আমারই এক বন্ধু দেবু দাস-এর কাছে ২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার খবর পেলাম, ওর পরিচিত এক তরুণ তমনাশ দাস ফেইথ হিলারের রিসেপশনিস্ট-এর কাজ করছে।

দেবুর কাছ থেকে ঠিকানা ও একটা পরিচয়পত্র নিয়ে সেই রাতেই তমনাশের বাড়ি গিয়ে দেখা করলাম। স্মার্ট, ফর্সা, সুদর্শন তরুণ। হোটেল ম্যানেজমেন্টের পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে।

আমি দেবু'র বন্ধু, লেখালেখি করি এবং অলৌকিক বিষয়ে খুবই আগ্রহী জেনে আমার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন তমনাশ। জানালাম, "গলব্লাডার, হার্ট আর ফ্যারেনজাইটিস নিয়ে জেরবার হয়ে আছি। ফেইথ হিলারের সাহায্য চাই। সেই সঙ্গে এই অলৌকিক চিকিৎসা বিষয়ে পত্রিকায় কিছু লিখতে চাই।"

তমনাশ জানালেন, "কয়েকজন সাংবাদিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই হাত জোড় করে জানিয়েছি ক্ষমা করবেন। আমরা প্রচার চাই না। প্রচার ছাড়াই যে বিপুল সংখ্যক রোগী আসছেন, তার ভিড় সামাল দিতেই হিমসিম খাচ্ছি, অতএব মাপ করবেন। তবে আপনার চিকিৎসার বিষয়ে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। এ জন্য আপনাকে দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ।"

"যাঁরা চিকিৎসা করাতে আসছেন তাঁরা কেমন ফল পাচ্ছেন?"—জিজ্ঞেস করলাম।

"মিরাকল রেজাল্ট।" কয়েকজন রোগীর নাম ও তাদের আরোগ্যলাভের গল্প বলতে বলতে আমার মত একজন উৎসাহী শ্রোতাকে দেখাবার জন্য ঘরের ভিতরে গিয়ে নিয়ে এলেন কয়েকটা রঙিন ফটোগ্রাফ। তমনাশের উপর ফেইথ হিলিং চলাকালীন তোলা ছবি।

বললাম, "আপনার ছবি দিয়ে আপনার ফেইথ হিলিং-এর অভিজ্ঞতার কথাই



জোস মার্কাডো

ফেইথ হিলাব Jose Mercado এবাব যাঁব উপব অস্ত্রোপচাব কবলেন তিনি বেশ মোটাসোটা মানুষ। পেটে নাকি টিউমাব। কিছুটা তেল আর জল পেটে ছড়িয়ে কিছুক্ষণ ধবে মালিশ ও প্রার্থনা চলল। একসময় "বোগীব পেটেব উপব মার্কাডো নিজেব হাত দুটো পাশাপাশি বাখলেন। তাবপর মুহূর্তে বাঁ হাত দিয়ে পেটে চাপ দিয়ে ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন বোগীব পেটে। বেবিয়ে এল বক্ত। সহকাবী তুলো দিয়ে বক্তগুলো মুছতে লাগলেন। মার্কাডো পেট থেকে হাত বেব কবলেন। হাতে ধবা বয়েছে টিউমাব। সহকাবী বক্তধাবা মুছিয়ে দিতেই কোন্ জাদুবলে অস্ত্রোপচাবের চিহ্ন অদৃশ্য হল। পেট দেখলে বোঝাব উপায় নেই কখনও এখানে অস্ত্রোপচাব হয়েছিল।"

দূবদর্শনেব ভাষ্যকাব স্কট অতি তৎপবতাব সঙ্গে টিউমাবটি মার্কাডোব হাত থেকে তুলে নিলেন, সেই সঙ্গে কিছুটা বক্তাক্ত তুলো।

মেয়েটিব গ্রোথ এবং বক্তাক্ত তুলো পবীক্ষাব জন্য পাঠান হয় Guy's Hospital London-এব ডিপার্টমেন্ট অফ ফবেনসিক মেডিসিনে। মেয়েটিব গলাব গ্রোথ বাযপসি কবে জানা যায় দেহাংশটি একটি পূর্ণবয়স্ক যুবতীব স্তনেব অংশ এবং বক্তেব নমুনা মানুষেব নয়।

পুরুষ মানুষটিব টিউমাব ও বক্তাক্ত তুলো পবীক্ষাব জন্য পাঠান হয়েছিল লন্ডন হসপিটাল মেডিকেল কলেজেব বিশেষজ্ঞ ডাক্তাব P J. Lincoln-এব কাছে। পবীক্ষাব পর লিংকন মত দেন তথাকথিত টিউমাবটি আসলে মুরগীব দেহাংশ এবং বক্তেব নমুনা গরুব।

দেহাংশ ও বক্ত নমুনাব পবীক্ষাব ফল স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয় এগুলো রোগিণী ও

রোগীর দেহাংশ বা রক্ত আদৌ নয়। অর্থাৎ রোগীর দেহে কোনও অস্ত্রোপচারই করা হয়নি এবং অস্ত্রোপচার করে বার করে আনা হয়নি কোনও দেহাংশ। তবে এতগুলো অনুসন্ধিৎসু চোখ ও টি ভি ক্যামেরা যা দেখল সেটা কী? রোগীরা যা অনুভব করলেন তার কী কোনই গুরুত্ব নেই?

এ ক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না—ফেইথ হিলার প্রতারক। কারণ, পরীক্ষা গ্রহণকারীদের পক্ষে দেহাংশ ও রক্তের নমুনা পাল্টে দেবার সুযোগ ছিল। যেহেতু সরকারীভাবে কোনও ফরেনসিক বিভাগ অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ ও রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তা সিল করে পরীক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করেননি, তাই সুনিশ্চিতভাবে কোনও কিছুই প্রমাণিত হয় না।

ফেইথ হিলারদের কাছে যে সব রোগী চিকিৎসা করিয়েছেন তাঁদের কিছু ঠিকানা যোগাড় করেন গ্রানেডা টিভি প্রোডাকশন। ফেইথ হিলিং-এর পর বর্তমানে তাঁরা কেমন আছেন, এই তথ্য সংগ্রহই ছিল গ্রানেডার উদ্দেশ্য। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। যাঁদের মতামত সংগ্রহ করা গিয়েছিল তাঁদের বেশির ভাগই জানান ফেইথ হিলিং-এর পর অনেকটা সুস্থ অনুভব করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে আবার উপসর্গগুলো ফিরে এসেছে। বাকি রোগীরা জানান—এখন সামান্য ভাল অনুভব করছেন ("felt a little better")।

দুই ফেইথ হিলার David Elizalde এবং Helen Elizalde-এর অলৌকিক অস্ত্রোপচারের উপর B B C একটা অনুষ্ঠান প্রচার করে। অনুষ্ঠানটির পরিচালক ডেভিড ও হেলেনকে জালিযাত, ধোঁকাবাজ এবং প্রতারক বলে বর্ণনা করেন। কারণ, মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার করে তাঁরা যা বের করেছিলেন, পরীক্ষার ফলে তা শুয়োরের দেহাংশ বলে B B C জানান। এই ক্ষেত্রেও রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়—মানুষের রক্ত নয়। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি সংগৃহীত নমুনাই পরীক্ষিত হয়েছিল। কারণ এটাও আগের মতই সরকারি পরীক্ষা ছিল না। ছিল সম্পূর্ণ বে-সরকারী উদ্যোগে পরীক্ষা।

ফেইথ হিলিং ব্যাপারটার মধ্যে একটা ধোঁকাবাজি আছে এ কথা একাধিকবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও ওঁরা কী কৌশলে নিজেদের হাতের আঙুলগুলো রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেন এবং কী কৌশলেই বা তৎক্ষণাৎ রক্তের আমদানী করেন, কেমন করেই বা আসে অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্ন করা দেহাংশ, এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কেউই যুক্তিপূর্ণভাবে হাজির করতে পারেননি।

ফেইথ হিলারদের ফেইথ হিলিং-এর কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করে যিনি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছেন তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব James Randi। তিনি তাঁর 'FLIM FLAM' বইতে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ফেইথ হিলররা অস্ত্রোপচারের আগে নিজের বুড়ো আঙুলে একটা নকল বুড়ো আঙুলের খাপ পরে নেয়। নকল আঙুলের খাপে লুকোনো থাকে রক্ত এবং ফেইথ হিলারের সহকারীর তুলোয় জড়ানো থাকে মাংস।

র‍্যান্ডির লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল ফেইথ হিলিং-এর গোপন কৌশল বলে তিনি যা বর্ণনা করেছেন তাতে কিছু ফাঁক-ফোকর রয়েছে। এক এভাবে দর্শকদের

সামনে পরপর একাধিক রোগীর ওপর অস্ত্রোপচার করা অসম্ভব। কারণ বুড়ো আঙুলের খাপে লুকিয়ে রাখা রক্তের পরিমাণ অতি সীমিত হতে বাধ্য। দুই টিভি ক্যামেরার ক্লোজ-আপ এবং হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পরীক্ষক বা দর্শকদের নকল আঙুলের সাহায্যে ঠকান খুব একটা সহজসাধ্য বলে মনে হয় না।

জেমস র‍্যান্ডির অবশ্য এই বিষয়ে কিছু ভ্রান্তি হতেই পারে, কারণ তিনি নিজে ফেইথ হিলারদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাননি। র‍্যান্ডি ফিলিপাইনে গিয়ে ফেইথ হিলারদের উপর অনুসন্ধান চালাতে চেয়ে ফিলিপাইন সরকারের কাছে ভিসা প্রার্থনা করেন। ফেইথ হিলারদের উপর অনুসন্ধানের নামে তাঁদের কোনও রকমে অসম্মান জানালে ফিলিপিনবাসীদের কাছে তা ধর্মীয় আঘাত বলে বিবেচিত হতে পারে, এই অজুহাতে ফিলিপাইন সরকার জেমস র‍্যান্ডিকে ভিসা দেননি বলে র‍্যান্ডি স্বয়ং অভিযোগ তুলেছেন।

ফেইথ হিলারদের অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সব বই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বিশ্বের জনপ্রিয়তম বইটি সম্ভবত "Arigo Surgeon of the Rusty Knife"। লেখক John Fuller। Arigo ছদ্মনামের আড়ালে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান ফেইথ হিলারটির নাম Jose Pedro de Feitas।

অ্যারিগো আর দশজন ফেইথ হিলারের মতই সাদা পোশাক পরে গ্লাভস ছাড়াই রোগীদের উপর খালি হাতে দ্রুত অস্ত্রোপচার করেন, তবে অস্ত্রোপচারের আগে একটা ছুরির বাঁট দিয়ে রোগীর চামড়াটাকে একটু ঘষে নেন। অস্ত্রোপচার শেষে সেলাই না করেই একটু হাত ঘষে কাটাটা আবার জুড়ে দেন। তারপর অতি-জড়ান হাতের লেখায় যে প্রেসক্রিপশন লেখেন, সেটি নাকি তিনি তাঁর নিজের বিবেচনামাফিক লেখেন না। এক মৃত জার্মান ডাক্তার Dr Fritz-এর আত্মা নাকি অ্যারিগোর বাঁ কানে ফিসফিস করে যে ওষুধের কথা বলেন অ্যারিগো তাই লেখেন।

অ্যারিগোর প্রেসক্রিপশনের লেখা এতই জড়ানো যে শহরের একটি মাত্র ফার্মেসিই সেই লেখা পাঠোদ্ধার করতে পারে। ফার্মেসির মালিক অ্যারিগোর ভাই।

জন ফাউলার তাঁর বইটির তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ধনকুবের বিজ্ঞানী ও অলৌকিকবাদের ধারক-বাহক ডঃ আন্ড্রুজা পুহারিক প্রযোজিত অ্যারিগোর ওপর তোলা একটি ফিল্ম দেখে।

অ্যারিগোর ফেইথ হিলিং ছাড়া আর যে "impossibilities" দেখে ডঃ পুহারিক বিহ্বল হয়েছিলেন তা হলো অ্যারিগোর একটি মুদ্রাদোষ। অ্যারিগো কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই নিজের চোখে ছুরি ঢুকিয়ে দেন, যেটা ডঃ পুহারিকের মতে কোনও মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ এক অলৌকিক ক্ষমতারই প্রকাশ।

ডঃ পুহারিকের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইতালির Piero Angela এক পদ্ধতিতে বারবার চোখে ছুরি ঢুকিয়ে প্রমাণ করেছেন, এই ধরনের কোনও কিছু ঘটালে সেটা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে না। এটা একটা কষ্টসাধ্য অনুশীলনের ফল মাত্র।

আর যাই হোক, এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে 'ফেইথ হিলার' নামক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান (?) কিছু চিকিৎসক তাঁদের অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশে প্রচণ্ড রকমের হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী



অ্যাবিগো

পত্রিকায় এঁদের নিয়ে লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন ও ইতালীর মানুষ তাঁদের দেশের টিভিতে ফেইথ হিলারদের অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে শিহরিত হয়েছেন, এই তথ্যটা আমার জানা। জানি না আরও কতগুলো দেশ ফেইথ হিলারকে টিভি ক্যামেরায় বন্দী করেছেন।

সম্পূর্ণ কষ্টহীন ও ঝুঁকিহীন ভাবে আরোগ্যলাভের আশায় প্রতি বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান এবং ইউরোপ ও আরবের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নানা রকমের দুরারোগ্য রোগ সারাতে ম্যানিলায় যান। এইসব দেশের মত এত বিশাল সংখ্যায় না হলেও ভারতবর্ষ থেকে, এমনকি আমাদের কলকাতা শহর থেকেই প্রতি বছর কিছু লোক চিকিৎসিত হতে ম্যানিলায় যান। এই লক্ষ লক্ষ আরোগ্যকামী বিদেশীদের কল্যাণে ম্যানিলায় গড়ে উঠেছে জমজমাট হোটেল ব্যবসা। আমদানী হচ্ছে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা।

চিকিৎসার জন্য কোনও অর্থ গ্রহণ করেন না ফেইথ হিলাররা। শুধু নাম তালিকাভুক্ত করার সময় '৮৬-তে ভারতীয় টাকায় আড়াইশো টাকার মত জমা দিতে হতো। সাধারণভাবে চিকিৎসা চলে রোগের গুরুত্ব অনুসারে তিন থেকে সাত দিন। প্রতিদিনই রোগীর দূষিত রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বের করে দেন ফেইথ হিলার। চিকিৎসা শেষে রোগীর কাছে দেশের গরীবদের সাহায্যার্থে সাধারণত ৫০০ ডলার সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ফিলিপিনস্ ফেইথ হিলারদের লীলাক্ষেত্র হলেও, এরা মাঝে-মধ্যে অন্য কোনও দেশের ধনকুবেরের সঙ্গে আর্থিক চুক্তি করে সেই দেশে দু-এক মাসের জন্য পাড়ি দেন অলৌকিক চিকিৎসার পসরা নিয়ে।

তেমন রমরমা প্রতিষ্ঠা না পেলেও, ব্রাজিল এবং পেরুর কয়েকজন আধ্যাত্মিক নেতা অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে ফেইথ হিলিং শুরু করেছেন।

পাঁচ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই 'ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি'র (বর্তমান নাম—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) কয়েকজন সদস্য পালা করে হোটেল লিটনের উপর নজর রাখতে লাগলেন। সন্ধের মধ্যে খবর পেলাম ওই ৪৬ নম্বর ঘরে অসম, অ গ প -র জনৈক নেতাও নাকি প্রায় পুরো সময়ই ছিলেন। মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডো আছেন ৪৪ নম্বর ঘরে। এছাড়া আর এমন কিছু খবর পেলাম যার ফলে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আমাকে অস্ত্রোপচার করার পর সেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার চেষ্টা করাটা অত্যধিক ঝুঁকির ব্যাপারে হবে। কথাটা বোধহয় ভুল বললাম। বরং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে হোটেল লিটনের বাইরে আমাদের জীবিত দেহ আর কোন দিনই বের হবে না।

ছয় তারিখ বারোটা থেকে আমি লিটন থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত আর কয়েকজন অতিরিক্ত যুক্তিবাদী সদস্যকে লিটনে নজর রাখার জন্য নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এঁরা কেউই বিপদে খুব একটা ঘাবড়ে যাওয়ার মত নন।

সেদিন দুপুর সাড়ে এগারোটায় ফোন করলাম কলকাতা পুলিশের তৎকালীন যুগ্ম-কমিশনার সুবিমল দাশগুপ্তকে। ফেইথ হিলারদের রহস্যময় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে জানালাম, বর্তমানে আমাদের এই শহরের লিটন হোটেলে বিশ্বখ্যাত এক ফেইথ হিলার অবস্থান করছেন। আজ আড়াইটের সময় আমি তাঁর একটা সাক্ষাৎকার নেব, তারপর আমার উপর অপারেশন করার। ইনিই সম্ভবত প্রথম ফিলিপিনো ফেইথ হিলার যিনি ভারতে এলেন।

সুবিমলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই বিষয়ে তোমার মত কী? সত্যিই কি ওঁরা খালি হাতে অপারেশন করেন?"

বললাম, "আমার ধারণা পুরোটাই একটা বিশাল ধাপ্পা। আমি আশা রাখি ওদের কৌশলটা ধরতে পারব। এই বিষয়ে আপনার একটু সাহায্য চাই বলেই ফোন করা। আমাকে অপারেশন করার পর আমার শরীর থেকে যে রক্ত বের হবে তার নমুনা আপনি ফরেনসিক টেস্টের জন্য সংগ্রহ করলে বাধিত হবো। কারণ এই রিপোর্টই পারে ঐ দীর্ঘদিনের এক সন্দেহের ও বিতর্কের অবসান ঘটাতে।"

ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল, "মোস্ট ইন্টারেস্টিং। নিশ্চয়ই যাব। ক'টায় তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট?"

"দুটো তিরিশে, হোটেল লিটনে। একটি অনুরোধ, প্লেন ড্রেসে যাবেন।"

"তুমি ঠিক দুটোয় লালবাজারে চলে এসো।"

আড়াইটের আগেই হোটেল লিটনে পৌঁছলাম। সুবিমলবাবুর সরকারী অ্যামবাসেডার আর দেহরক্ষীদের আমরা ত্যাগ করলাম। গ্লোব সিনেমা হলের কাছে। হোটেলে ঢুকলাম আমরা পাঁচজন। আমি, সুবিমল দাশগুপ্ত, ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির দুই সভ্য প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জ্ঞান মল্লিক, চিত্র-সাংবাদিক সৌগত রায় বর্মন এবং দর্শক হিসেবে আমার অফিসের এক সহকর্মী।

প্রথমে হানা দিলাম ৪৪ নম্বর ঘরে। নক্ করতেই দরজা খুললেন মিস্টার গ্যালার্ডো। পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চাইলাম। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে মিস্টার গ্যালার্ডো জানালেন,

"আপনার কথা মিস্টার তমনাশের কাছে শুনেছি। আপনি আসায় খুশি হয়েছি, দয়া করে ৪৬ নম্বর রুমে মিস্টার আগরওয়ালের সঙ্গে আগে দেখা করুন। একটু পরেই আমি আসছি। মিস্টার আগরওয়ালের সামনে ছাড়া আমি কোনও ইন্টারভিউ দিতে অক্ষম।"

৪৬ নম্বর রুমে অনেককেই পেলাম। রামচন্দ্র আগরওয়াল, অলোক খৈতান, তমনাশ দাস এবং অসম অ গ প নেতা বলে পরিচয় দেওয়া জনৈক বসন্ত শর্মাকে। তমনাশই ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমার চার সঙ্গীর সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। শুধু সুবিমল দাশগুপ্তের বেলায় মিথ্যে বললাম, "মিস্টার দাশগুপ্ত, আমার কাজিন ব্রাদার।"

আমরা সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে খুব দ্রুত খোলামেলা আলোচনায় মেতে উঠলাম। আগরওয়াল এবং অলোক খৈতান দুজনেই ভালই বাংলা বলেন।

একসময় আমার প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার আগরওয়াল জানালেন, "আমার এক আত্মীয়ের একটা চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ম্যানিলায় গিয়ে ফেইথ হিলিং করিয়ে সে আবার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। তখনই আমার মাথায় একটা চিন্তা ঢোকে। বড়লোকেরা



শ্রী ও শ্রীমতী গ্যালার্ডোর দু'পাশে শ্রীআগরওয়ালা ও লেখক

না হয় রোগ সারাতে ম্যানিলায় যেতে পারে, কিন্তু গরীবদের কঠিন অসুখ হলে তারা কী করবে ? ভাবলাম দেশের সাধারণ মানুষদের জন্য না হয় কিছু খরচা করলামই। আমার আত্মীয়ের কাছ থেকে ডাক্তারের ঠিকানা নিয়ে 'ফেইথ হিলিং করতে যাচ্ছি' জানিয়ে ভিসা করে ম্যানিলায় চলে গেলাম। ওখানে মিস্টার গ্যালার্ডোর সঙ্গে দেখা করে আমার পরিকল্পনা জানাই। উনি খুবই ভাল লোক, আধ্যাত্মিক জগতের লোক তো। আমার কথায় ভারতে আসতে রাজি হলেন।

"৭ আগস্ট মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্যালার্ডো কলকাতায় আসেন। এই হোটেলেই ওঠেন। আমাদের চেনা-শুনা ও পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই ফেইথ হিলিং-এর সুযোগ নিতে শুরু করেন। এখানে বারো দিন থাকার পর ২০ আগস্ট আমি আর অশোক ওঁদের নিয়ে গৌহাটি যাই। ওখানে ওঁরা পাঁচ দিন ছিলেন। এত ভিড় হচ্ছিল যে, নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না। একদিন তো ২০০ রোগী নাম লিখিয়ে ছিলেন। টাকা রোজগারের ধান্দা থাকলে নিশ্চয়ই খুশি হতাম। তা যখন নয় তখন নিজেদের জান বাঁচাতে পালিয়ে এলাম। ২৭ তারিখ থেকে আবার কলকাতায়। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকার পরিকল্পনা রয়েছে। তারপর হয় তো ওঁদের নিয়ে দিল্লি যেতে পারি।"

আগরওয়াল এই কথার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চাইলেন মিস্টার গ্যালার্ডোকে এদেশে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার নয়, নেহাৎই সেবা। তাই আসামের বিশাল টাকার হাতছানিও তিনি অক্লেশে ছেড়ে আসতে পেরেছেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গ্যালার্ডোকে ১৮।৮।৮৬-তে ইস্যু করা পারমিটের একটি প্রতিলিপি আমার হাতে এসেছে যাতে দেখেছি তাঁদের ২০ আগস্ট '৮৬ থেকে ২৭ আগস্ট '৮৬ পর্যন্ত আসামে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব রোজগারের ধান্দা থাকলেও ২৭ আগস্টের পর মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডোর আসামে থাকা সম্ভব ছিল না।

আগরওয়ালকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি একটু আগে বলছিলেন দেশের গরীব মানুষদের সেবার জন্য মিস্টার গ্যালার্ডোকে নিয়ে এসেছেন। তবে রোগীদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নিচ্ছেন কেন ?"

আমার প্রশ্ন শুনে প্রথমটায় আগরওয়াল সামান্য গুটিয়ে গিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললেন, "যে বিশাল খরচ করে এঁদের এনেছি তাতে খরচের কিছুটা অংশ না তুলতে পারলে তো মরে যাব দাদা। হোটেল খরচই মেটাচ্ছি রোজ আট-হাজার টাকা। তার উপর এই হোটেলের মালিকের পাঠান দুজন করে রোগী প্রতিদিন বিনে পয়সায় দেখে দিচ্ছি।"

হাসলাম, বললাম, "আপনি তো প্রত্যেক রোগীকে দিয়েই একটা ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম ফিল-আপ করাচ্ছেন। আমাকে ফর্মের ফাইলটা একটু দেবেন। কিছু রোগীর ঠিকানা নেব। একটা সার্ভে করে দেখতে চাই তাঁরা ফেইথ হিলিং করিয়ে কেমন ফল পেয়েছেন।"

অলোক দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালেন, "ফাইলটা কালই হারিয়ে গেছে।"

কথায় কথায় মিনিট কুড়ি বোধহয় পার হয়েছে, একজন তরুণ ভেজান দরজা ঠেলে

ঘরে ঢুকে তমনাশকে ইশারায় ডেকে বেরিয়ে গেলেন। তমনাশও বেরোলেন। মিনিট দুয়েক পরেই তমনাশ ডাকলেন আগরওয়ালকে। তার মিনিট দুয়েক পরেই আগরওয়াল আমাকে বাইরে ডাকলেন। বাইরে এসে দেখি করিডোরে তমনাশ, আগরওয়াল ও যে ছেলেটি দরজা নক্ করেছিল সে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেই যেন কিছুটা অস্বস্তি ও চিন্তার মধ্যে রয়েছেন।

আগরওয়াল আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সঙ্গে কি সাদা পোশাকে পুলিশ কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনার রয়েছেন?"

"কেন বলুন তো?"

"না, খবর পেলাম কি, গ্রোব্ হলের কাছে ওই জাতীয় পদের কারো একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিফর্ম পরা বডিগার্ড গাড়িতেই রয়েছে। কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনার যিনিই এসে থাকুন তিনি যখন বডিগার্ড সঙ্গে নেননি তখন প্লেন ড্রেসেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। আমাদের মনে হচ্ছে তিনি আপনার সঙ্গে আছেন।"

"হ্যাঁ, মিস্টার দাশগুপ্তের সঙ্গে যে আলাপ করিয়ে দিলাম, তিনিই জয়েন্ট কমিশনার। তবে আপনার কোনও চিন্তার কারণ নেই। উনিও আমার মতই ফেইথ হিলারদের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে ও দেখতে উৎসাহী। আমি আজ ইন্টারভিউ নেব এবং অপারেশন করার শুনে সঙ্গী হয়েছেন।"

ইনফরমার ছেলেটি বিদায় নিল। আমি, আগরওয়াল ও তমনাশ ঘরে ঢুকলাম। যে ঘটনাটা একটু আগে ঘটল সেটা সবার সামনে বলে পরিবেশটাকে হালকা করতে চাইলাম।

সুবিমলবাবুও হাসতে হাসতে আগরওয়ালকে বললেন, "আমি কিন্তু এখানে এসেছি পৃথিবী বিখ্যাত ফেইথ হিলিং নিজের চোখে দেখব বলে। পুলিশের তকমা এঁটে কারো মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করতে চাই না বলেই এই পোশাকে আসা। সুযোগ পেলে আমার কপালের একটা ব্যথা আপনাদের হিলিং-এ সারে কিনা একটু পরীক্ষা করে দেখতে পারি।"

এরপর আমাদের আগের মত খোলামেলা কথাবার্তা আর জমল না। মিনিটদশেক পরে দরজা খুলে মিস্টার ও মিসেস গ্যালার্ডো আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, "আসুন।"

আমরা হোটেলের কনফারেন্স রুমে এলাম। রুমের একপাশে একটা লম্বা টেবিলে প্লাস্টিকের নীল চাদর বিছানো। টেব্রিলের কাছে দাঁড়ালেন মিস্টার গ্যালার্ডো, পাশে মিসেস। করমর্দন করে দু'জনকে শুভেচ্ছা জানালাম। দেখলাম মিস্টার গ্যালার্ডোর প্রতিটি আঙুলের নখই নিখুঁত কাটা।

আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল, "ফেইথ হিলিং-এর সাহায্যে যে কোনও রোগীকে কি রোগমুক্ত করা সম্ভব?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই," গ্যালার্ডো উত্তর দিলেন।

"প্রতিটি ফেইথ হিলিং-এর ক্ষেত্রেই কী অপারেশন করার প্রয়োজন হয়?"

"না, না। শরীরের ভিতর থেকে কোনও দেহাংশ বিচ্ছিন্ন করে বের করতে হলেই শুধু 'ওপন' করার প্রয়োজন হয়। অবশ্য হিলিং করার সময় যে কোনও রোগের ক্ষেত্রেই রোগীর শরীর থেকে 'ডেভিল ব্লাড' বের করে দিই। সেটাকেও যদি

অপারেশন বলতে চান, তো বলতে পারেন।”

“একজন রোগীকে হিলিং করতে কত সময় লাগে?”

“দেড় থেকে তিন মিনিট।”

“আপনি এই ফেইথ হিলিং কোথা থেকে শিখলেন?”

আমার প্রশ্ন শুনে হাসলেন মিস্টার গ্যালার্ডো। বললেন, “এ তো শেখা যায় না। আর আমিও তো চিকিৎসা করি না। ‘গড’ই রোগীদের চিকিৎসা করেন। আমি গডের হাতের যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বর যাঁদের মাধ্যমে রোগীদের নিরাময় করান তাঁদের নির্বাচন করেন তিনি নিজেই।”

“যাঁরা আপনার কাছে আরোগ্যের আশায় আসেন, তাঁরা সকলেই কি রোগ মুক্ত হন?”

“সারবেই, এমন গ্যারান্টি আমি কাউকেই দিচ্ছি না। আরোগ্য নির্ভর করে রোগীদের ওপর। রোগীর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, যদি ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস থাকে এবং এক মনে ঈশ্বরের কাছে নিজের আরোগ্য কামনা করে তবে নিশ্চয়ই সারবে। তবে এটা কয়েকদিনে সারবে, কি কয়েক সপ্তাহে অথবা কয়েক মাসে, তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে রোগীর বিশ্বাস ও প্রার্থনার ওপর।”

মিসেস গ্যালার্ডোকে এবার প্রশ্ন করলাম, “আপনিও ফেইথ হিলার?”

মিসেস গ্যালার্ডো দু’পাশে মাথা ঝাঁকালেন, “না, না, আমি ঈশ্বরের সেই কৃপা পাইনি। স্বামীকে সাহায্য করি মাত্র।”

মিস্টার গ্যালার্ডোকে এবার প্রশ্ন করলাম, “আপনি নিশ্চয়ই পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন?”

“হ্যাঁ।”

“বিদেশে কোথাও কি কোনও বিজ্ঞান-সংস্থা, বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চেয়েছেন? অথবা ফেইথ হিলিংকে বুজরুকী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন?”

“Psychic (অতীন্দ্রিয়) কোনও কিছুরই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ফেইথ হিলিং-এর বিষয়ে আমাকে কয়েক জায়গায় এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। যাঁরাই এই ধরনের প্রশ্ন করেছেন বলেছি, দুঃখিত, ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। তাঁদের অনুরোধ করেছি ব্যাখ্যা চেয়ে আমার মেডিটেশন ও কনসেনট্রেশনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না।

“আরও একটা কথা কী জানেন মিস্টার ঘোষ, বিজ্ঞান এগিয়েছে বলে ঈশ্বর মিথ্যে হয়ে যায়নি। পৃথিবীর বহু দেশের টেলিভিশন কোম্পানী ফেইথ হিলিং-এর উপর ছবি তুলেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক উল্টোপাল্টা অভিযোগও তুলেছে। ওদের অভিযোগ, অস্ত্রোপচারের সময় যে রক্ত ও দেহাংশ ওরা সংগ্রহ করেছিল সেগুলো পরীক্ষা করিয়ে নাকি দেখছে ওসব মানুষের দেহাংশ বা রক্ত নয়। কিন্তু পৃথিবীর কোনও যুক্তিবাদী মানুষের কাছেই অভিযোগগুলো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেনি। কারণ পরীক্ষার আগে সংগৃহীত নমুনা পাল্টে দেওয়ার সব রকম সুযোগই পরীক্ষকদের ছিল। এই সুযোগ যে তাঁরা গ্রহণ করেননি, তার গ্যারান্টি কে দেবে?

"একটু সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছি। আপনার ওপর অস্ত্রোপচার করলাম। আপনি সেই অস্ত্রোপচারের ছবি তুলে রাখলেন। আমাকে দিয়ে আজই যে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন, তার স্বপক্ষে আরও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করে রাখলেন। ধরুন, আপনি ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস করেন না। যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন না, তাই আপনি চান অন্যেরাও যাতে আমার হিলিংকে অবিশ্বাস করে, আমাকে প্রতারক ভাবে। আমাকে প্রতারক প্রমাণ করতে আপনি এক টুকরো তুলোয় মাছের রক্ত মাখিয়ে কোনও হাসপাতাল বা ল্যাব-এ পরীক্ষা করতে দিলেন। তাঁরা পরীক্ষা করে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন তুলোয় সংগৃহীত রক্ত মাছের। আপনি এর পর যদি কোনও নামী-দামী পত্রিকায় ঢাউস প্রবন্ধ লিখে আমাকে প্রতারক আখ্যা দেন এবং প্রমাণ হিসেবে আপনার শরীরে আমি অস্ত্রোপচার করছি এমন ছবি ছাপেন, রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ছাপেন, তাতে কিছু যুক্তিহীন মানুষ হয় তো বিভ্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু কোনও যুক্তিবাদী মানুষই আপনার কথাকে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে মেনে নেবেন না। কারণ এ ক্ষেত্রে নমুনা পাল্টাবার সুযোগ আপনার ছিল, এবং আপনার সততার বিষয়টি একেবারেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে।

"প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষ আপনার প্রমাণকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন, আপনার কথায় আস্থা রাখতেন, যদি রক্তের নমুনা পুলিশ দপ্তর থেকে সংগৃহীত ও সরকারি ফরেনসিক দপ্তর থেকে পরীক্ষিত হতো। যে সব টিভি কোম্পানী বা ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, আসলে তাঁরাই মিথ্যাচারী, সস্তায় বাজিমাৎ করতে চেয়েছেন। তাই সংগৃহীত নমুনা পাল্টে দেওয়ার সুযোগও নিজেদের হাতে রেখেছিলেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তিবাদী বলে বিজ্ঞাপিত জাদুকর জেমস ব্যান্ডি তাঁর লেখা একটা বইতে এক উদ্ভট তথ্য সরবরাহ করেছেন। বলেছেন—ফেইথ হিলাররা নাকি নিজেদের বুড়ো আঙুলে একটা নকল বুড়ো আঙুলের খাপ পরে থাকে। ওই খাপের মধ্যে লুকোনো থাকে রক্ত। তারপর তিনি আমাদের ঠগ, জালিয়াত ইত্যাদি বলে চেঁচিয়েছেন। আপনি আমার দু'হাত দেখুন। কোথাও বুড়ো আঙুলের খাপ দেখতে পাচ্ছেন?" হাত দুটো এগিয়ে দিলেন মিস্টার গ্যালার্ডো।

"এই মুহূর্তে আপনি শুয়ে পড়ুন, আপনার শরীর থেকে এখনই ডেভিল ব্লাড বার করে দিচ্ছি, দেখতে পাবেন কোনও কৌশল নেই।" বললেন মিস্টার গ্যালোর্ডো।

আমি আশ্বস্ত করলাম, "আপনাকে অবিশ্বাস করবার মত কোনও কিছুই ঘটেনি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, আপনারা সাংবাদিকদের এড়াতে চাইছেন কেন? এতে ফেইথ হিলিং-এর সত্যতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলোর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?"

"এই বিষয়ে বলতে পারবেন মিস্টার আগরওয়াল।"

আগরওয়ালকে প্রশ্নটা করতে বললেন, "যাঁরা সন্দেহ করতে চান করুন, তাঁদের মিথ্যে সন্দেহে আমাদের কিছুই আসে যায় না।"

"আমাকে কেন তবে সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুমতি দিলেন?"

"আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনার ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস আছে, নিজেরও চিকিৎসা করাবেন, তমনাশের রেফারেন্সের লোক, তাই আপনার অনুরোধ ঠেলতে

পাবিনি। সত্যি বলতে কি, আপনি যদি খববেব কাগজে আমাদেব সম্বন্ধে এক লাইনও না লেখেন তো খুবই উপকাব হয়। খবব পড়ে যখন ভিড় বাড়বে তখন ভিড় সামলাবে কে? সবাবই উপকাব কবতে ইচ্ছে তো হয়, কিন্তু আমাদেব খাটাব ক্ষমতাবও একটা সীমা আছে।" বললেন মিস্টাব আগরওয়াল।

"পেশেন্টদেব মধ্যে বাঙালী কেমন আসছেন?"

আগবওয়াল বললেন, "খুব কম। দিনে দু-একজন। কিছু মনে কববেন না, পাঁচ হাজাব টাকা খবচ কবাব মত বাঙালী খুব কমই আছেন।"

মিস্টাব গ্যালার্ডোকে এবাব জিজ্ঞেস কবলাম, "আপনাব বযেস কত?"

"আমি তেতাল্লিশ, মিসেস উনচল্লিশ।"

"ফিলিপিনস্-এ কতজন ফেইথ হিলাব আছেন?"

"প্রথম শ্রেণীব ফেইথ হিলাবেব সংখ্যা আমাকে নিয়ে দশ জন। এছাড়াও দ্বিতীয় শ্রেণীব জনা চল্লিশ ফেইথ হিলাব আছেন।"

বললাম, "শুনেছি প্রথম শ্রেণীব ফেইথ হিলাবদেব বাজনৈতিক ক্ষমতা অত্যধিক?"

"সব দেশেব স্পিবিচুযালিস্টবাই এই ক্ষমতা পেযে থাকেন। আপনাদেব দেশও



লেখকেব গলায় অস্ত্রোপচাব কবে গ্যালার্ডো বেব কবলেন কালচেলাল থকৃথকে কিছু

তার বাইরে নয়।" বললেন, মিস্টার গ্যালার্ডো।

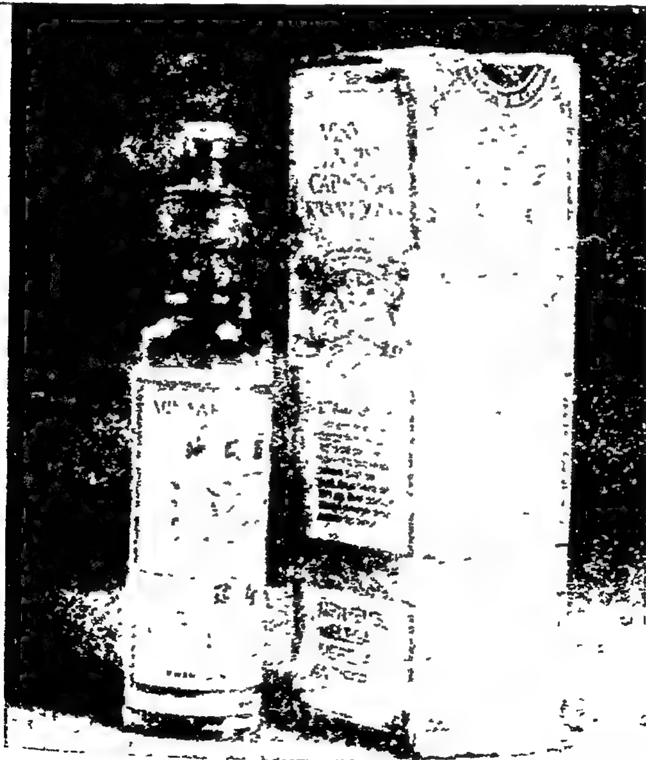
আমাদের কথাবার্তার মাঝে ছবি তুলে যাচ্ছিল স্টান ও সৌগত। মিস্টার গ্যালার্ডো বললেন, "লেখাটা প্রকাশিত হওয়ার পর একটা কপি মিস্টার আগরওয়ালকে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলেই আমি পেয়ে যাব।"

"নিশ্চয়ই দেব।"

"এবার আপনার শারীরিক সমস্যাটা বলুন।"

বললাম, "সমস্যা তিনটি। গলায় ফ্যারেনজাইটিস, হার্টেও কিছু অসুবিধে রয়েছে, একটা স্ট্রোক হয়েছিল, গলব্লাডারের আশেপাশে মাঝে-মধ্যে খুব ব্যথা হয়।"

গ্যালার্ডোর আহ্বানে অপারেশন টেবিলে খালি গায়ে শুয়ে পড়লাম। এখন আমার টেবিলের এক পাশে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে মিস্টার গ্যালার্ডো। মাথার দিকে এক গাদা তুলো হাতে মিসেস গ্যালার্ডো। মিস্টার গ্যালার্ডোর বাঁ পাশে একটা টুলের উপর



রামজাতীয় স্বচ্ছ তরল ওষুধ

রয়েছে এক বালতি জল আর একটা বড় সাদা তোয়ালে। ডানপাশে আর একটা খালি বালতি। আমার সামনে ছোট-খাট একটা ভিড়। এঁদের অনেকেই রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন। আমাদের সমিতির এক নজরদার সভ্যকেও দেখতে পেলাম।

মিস্টার গ্যালার্ডো আমার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কিছুটা মেলে দিয়ে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তারপর কিছুটা জল ও একটা বামজাতীয় স্বচ্ছ তরল ওষুধ নিয়ে আমার পেটে, বুকে ও গলার আধ-মিনিটের মত মালিশ করলেন। হাত দুটো এবার জলের বালতিতে ডুবিয়ে আমার গলার বাঁ পাশে গ্যালার্ডো তাঁর দু-হাতের আঙুল চেপে ধরে হঠাৎ আঙুলগুলো কচ্‌লাতে লাগলেন। চট্‌চট্‌ করে একরকম আওয়াজ হচ্ছিল। অনুভব করলাম আমার গলা বেয়ে তরল কিছু নেমে যাচ্ছে। বুঝলাম রক্ত। মিস্টার গ্যালার্ডো তাঁর ডান হাতটা আমার চোখের সামনে ধরলেন। কালচে লাল থকথকে কিছু। হাতের থকথকে ময়লা ডান পাশের বালতিতে ফেলে হাতটা জলের বালতিতে ডুবিয়ে ধুয়ে নিলেন। পাশের তোয়ালেতে হাতটা মুছে নিলেন। ইতিমধ্যে গড়িয়ে পড়া রক্তধারার কিছুটা মিসেস গ্যালার্ডো পরম মমতায় তাঁর হাতের তুলো দিয়ে মুছে দিলেন।



পেটে অস্ত্রোপচারের মুহূর্তে

এরপর একে একে খালি হাতে আমার গলব্লাডার ও হার্টে অস্ত্রোপচার করলেন গ্যালার্ডো। অস্ত্রোপচার শেষে একটা ঘটনা ঘটল। মিসেস গ্যালার্ডো তুলো হাতে এগিয়ে এলেন রক্ত মুছিয়ে দিতে। এটাই সঠিক মুহূর্ত। শোয়া অবস্থাতেই আমি ওঁর হাতের তুলো থেকে কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে পেট থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত নিলাম। দ্রুত এগিয়ে এলেন সুবিমল দাশগুপ্ত। আমার হাত থেকে তুলোটা নিয়ে একটা টেস্ট টিউবে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে টেস্ট টিউবটা পকেটে পুরলেন। সকলের দৃষ্টি যখন পুরোপুরি এই ঘটনার দিকে তখন সাধ্যমত তৎপরতার সঙ্গে প্যান্টের ডান পকেট থেকে রুমালটা বের করে পেট থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের কিছুটা মুছে নিয়ে রুমালটা আবার পকেটেই চালান করে দিলাম।

কিছুটা থতমত গ্যালার্ডো আমার গলায়, বুকে ও পেটের সামান্য উপরে জল ও বাম-জাতীয় স্বচ্ছ তেল আধ মিনিটের মত মালিশ করে ছেড়ে দিলেন।

উঠে বসে শার্ট গায়ে গলাতেই মিস্টার গ্যালার্ডো বললেন, "এখন কেমন লাগছে ?"

"ভাল, অনেকটা ভাল। এখন আমার শরীর ঘিরে বাম ঘষার মত একটা ঝাঁজালো ঝিরঝিরে ভাব।"



বুকে অস্ত্রোপচারের পর

"কাল আর পরশু আর দুদিন আসুন। বার-তিনেক হিলিং করালে আশা করি অনেক তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।" বললেন, মিস্টার গ্যালার্ডো।

আমি ঘড়ি দেখলাম। আমার উপর মোট তিনটে অস্ত্রোপচারে সময় লেগেছে পাঁচ মিনিট।

আমি ওঠার পর সুবিমলবাবু শুলেন। ওঁর কপালে ব্যথা। আরও দ্রুততর গতিতে হাত চালাতে লাগলেন বিশ্বখ্যাত ফিলিপিনো ফেইথ হিলার রোমেও পি গ্যালার্ডো। এরপর আমরা আরও চারজন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার দেখলাম ও ছবি তুললাম। কয়েকজন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম অলোক খৈতান সত্যিই এমন রহস্যময় চিকিৎসার যোগ্য ব্যবস্থাপক। প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে নিখুঁৎ টিমওয়ার্ক মারফৎ মুখ খুলতে বারণ করে দিয়েছেন। একজন মাত্র মহিলার কাছ থেকে বহু কষ্টে তাঁর ঠিকানা যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই ঠিকানাও সেদিন যোগাড় করেছিলাম লিটন হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে, হোটেলের চার দেওয়ালের ভিতর তিনিও কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাদের যথেষ্ট ভীতির চোখে দেখছিলেন। মহিলাটি তাঁর নাম বলেছিলেন অঞ্জলি সেন। রোগী তাঁরই ছেলে। দেখে মনে হল খুবই রুগ্ন এবং কিছুটা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।

আমরা বিদায় নেওয়ার আগে অলোক আমাকে বললেন, "কাজটা ঠিক করলেন না। মিস্টার গ্যালার্ডো আপনাদের বলতে বলেছিলেন, শয়তানের রক্ত্ পকেটে নিয়ে ঘোরা ঠিক নয়, এতে অপঘাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ডেভিল ব্লাড মিস্টার গ্যালার্ডোর হাতে তুলে দিলেই বোধহয় ভাল করবেন।"

বুঝলাম প্রচ্ছন্ন হুমকী। হেসে 'গুডবাই' জানিয়ে বিদায় নিলাম আমরা।

পরের দিন ৭ তারিখ রবিবার বিকেল চারটের সময় আবার হোটেল লিটনে গেলাম। এই সময় সুবিমলবাবুরও থাকার কথা। গিয়ে তাঁর দেখাও পেলাম। হোটেলের উপর নজর রাখা সমিতির কিছু সভ্যদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটা খবরের ভিত্তিতে বুঝেছিলাম জল অনেক দূর গড়িয়েছে। যে খবরগুলো জানান প্রয়োজনীয় মনে হলো সুবিমলবাবুকে সেগুলি দিলাম। গ্যালার্ডো আমার ও সুবিমলবাবুর উপর হিলিং করলেন। আজ গ্যালার্ডো, অলোক এবং আগরওয়াল আমাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই প্রশ্ন করলেন, "ফেইথ হিলিং সম্পর্কে আপনার মতামত কী?"

বললাম, "সত্যিই বিস্ময়কর।"

তৃতীয় দিন, সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর, সকাল থেকে পরপর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল।

সকাল ৭টা ৫০। এক তরুণ আমার ফ্ল্যাটে এলেন বিশাল এক মোটর-বাইকে আরোহী হয়ে। এঁকে আমি হোটেল লিটনের কনফারেন্স রুমে দেখেছি। বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ভাই?"

নিজের কোনও পরিচয় বা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তরুণটি সরাসরি আমাকেই প্রশ্ন করলেন, "ব্লাড টেস্টে কী পেলেন খুবই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"এই কথা জিজ্ঞেস করতে আমার কাছে এসেছেন? আপনার তৎপরতার প্রশংসা

না করে পারছি না। এত তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে আপনাদের আশা করিনি। ব্লাড স্যাম্পেল যাঁর কাছে, প্রশ্নটা সেই সুবিমল দাশগুপ্তকেই করা উচিত ছিল আপনার।"

অফিসে যেতেই আমার ঘরে দেখা করতে এলো জ্ঞান। জানাল, আজ অফিস আসতে গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামতেই একটা মোটর পিছন থেকে এসে ওকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। এ ধরনের ভাবার কারণ, মোটরটাকে দেখেই জ্ঞানের মনে পড়েছে সকাল থেকে বার কয়েক বাড়ির ঝুল

ভারত সরকার
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

PERMIT

No.15012/534/86-F.IV.
(Under paragraphs 3 and 4 of the Foreigners (Restricted areas) Order,1963).

Mr. Romeo P.Gallardo and his wife Mrs.Rosita J. Gallardo, Filipino nationals, holder of Passport Nos.C-954726 and D-3?8308 respectively are hereby permitted to enter the restricted areas via the shortest route and to reside in the said areas for purpose of meeting friends at Gauhati, Tinsukia and Dibrugarh in Assam from 20th August,1986 to 27th August,1986.

2. They shall, while residing in the said areas, comply with the conditions specified below.

3. Mr. Romeo P.Gallardo and Mrs.Rosita J.Gallardo shall not remain in the said areas after the 27th August,1986.

(T.O. KHAIGHA)
Under Secretary to the Govt. of Indi
T. O. KHAIGHA
अवर सचिव
Under Secretary
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

Place: New Delhi.
Dated: 13-8-1986.



গৌহাটি ও তিনশুকিয়ায় থাকার পারমিটের প্রতিলিপি

বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখার সময় এই গাড়িটাকে উল্টো ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল এবং গাড়িটা রং সাইডে ড্রাইভ করে জ্ঞানের ঠিক পিছনে নিয়ে আসা হয়। গাড়ি কোনও হর্ন দেয়নি। গাড়ির শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়েই ফুটপাতে লাফিয়ে পড়ে জ্ঞান। গাড়িটাও দ্রুত পালিয়ে যায়। নম্বর দেখার কোনও সুযোগ পায়নি।

সকালে আমার বাড়ির ঘটনা এবং জ্ঞান মল্লিকের ঘটনা ফোনে লালবাজারে সুবিমল দাশগুপ্তকে জানাই। সুবিমলবাবু আমাকে বললেন আজ যেন কোনও রকমভাবেই ফেইথ হিলিং না করাই। দুপুরের মধ্যে হোটেলে নজর রাখার দায়িত্বে থাকা সমিতির দুই সভ্য খবর দিলেন, আজ একটা বড় রকমের অঘটন ঘটতে পারে, আমি যেন সাবধান হই।

বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় হোটেলের বাইরে জ্ঞান আর সৌগত রায় বর্মনকে পেলাম। দুজন আমাকে দেখে স্বস্তি পেল। ওদের কাছে খবর পেলাম দুজনকেই নাকি আজ বিভিন্ন জায়গায় অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা তিনজনে হোটেলের কনফারেন্স রুমে ঢুকলাম। ভিতরে যথেষ্ট ভিড়। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন মিস্টার অলোক খৈতান। বললেন, "আজ একটু দেরি হচ্ছে। আপনি আজও হিলিং করাবেন তো?"

বললাম, "সেই জন্যেই তো আসা।"

অলোক বললেন, "একটু অপেক্ষা করতে হবে। মিস্টার গ্যালার্ডোর আজ মেডিটেশন ঠিক মত হচ্ছে না বলেই এই দেরি।"

ভিড়ের মধ্যে আমাদের সমিতির দু'জন সভ্যকেও দেখতে পেলাম।

আমরা তিনজন হোটেলের বাইরে এলাম। ঠিক করলাম ওয়াই এম সি এ-তে বসে কথা বলব। এখানেও আমাদের পিছনে টিকটিকি। ঝুলবারান্দায় বসে ওমলেট আর চা খেতে খেতে আমরা ঠিক করলাম আজ আর হিলিং করাব না, কারণ আজ হোটেলে যেন বড় বেশি সন্দেহজনক চরিত্রের আনাগোনা। শুধু বিদায় নিয়ে আসব ওদের কাছ থেকে। হোটেলে ঢোকার মুখেই অলোকের সঙ্গে দেখা, আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "দাদা, আজ দুপুরে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের সঙ্গে আপনি দেখা করেছেন খবর পেলাম। ডিরেক্টর সাহেবের ব্লাড রিপোর্ট কী বলছে?"

"আমার শরীর থেকে আমারই রক্ত বের হবে। সুতরাং তার রিপোর্ট কী, এ নিয়ে আপনাদের কেন এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হলো বুঝতে পারছি না। দেখা করেছি সে খবর জানতে পারলেন, আর তিনি কী বলেছেন, সে খবর জানতে পারলেন না?"

আমার কাছ থেকে এই ধরনের কিছু উত্তরই বোধহয় প্রত্যাশা করেছিলেন। আমার কথা শোনার পরেও বিনয়ী হাসি হেসে বললেন, "আজ মিস্টার গ্যালার্ডো কারো হিলিং করবেন না। আপনি বরং কাল আসুন।"

একটি পত্রিকা অফিস থেকে সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ যোগাযোগ করলাম সুবিলমবাবুর সঙ্গে। পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে রাখলাম। সব শুনে সুবিমলবাবু বললেন, "ফরেনসিক রিপোর্ট পেতে একটু দেরি হবে। তোমার রুমালের দাগ দেখে ব্লাড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সত্যেনবাবু কী বললেন?"

"বললেন, দাগ দেখে আমার মনে হচ্ছে এটা কোনও মানুষের রক্তের নয়। এই ধরনের রুমালের সামান্য দাগ পরীক্ষা করে বলার মত আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাদের



গ্রানাডা টেলিভিশন প্রোডাকশনেব তোলা ফেইথ হিলিং-এব ছবি

পিনাকীব শরীবে লেখকেব কবা ফেইথ হিলিং-এব ছবি





গ্রানাডা টেলিভিশন প্রোডাকশনের তোলা ফেইথ হিলিং-এর ছবি

পিনাকীর শরীরে লেখকের করা ফেইথ হিলিং-এর ছবি



এনেছিলাম আসলে সেটা ছিল তুলোর ভাঁজে লুকোন। গ্যালার্ডো অবশ্যই আমারই কায়দায় প্রতিবারই অস্ত্রোপচারের আগে কখনও পোশাকের আড়াল থেকে কখনও বা পাশের তোয়ালের ভাঁজ থেকে নকল রক্ত ঠাসা বেলুন তুলে নিয়েছেন এবং জাদুর পরিভাষায় যাকে বলে 'পামিং' সেই 'পামিং করেই বেলুন লুকিয়ে রেখেছেন দর্শকদের এবং ক্যামেরার চোখ এড়িয়ে তারপর যা করেছেন তার বর্ণনাতো আমার করা অস্ত্রোপচারের পদ্ধতিতেই দিয়েছি।

পোশাকের আড়ালে বিশেষ কৌশলে অনেক জাদুকরেরা অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখেন। একে ম্যাজিকের পরিভাষায় বলে 'লোড নেওয়া'। পোশাকের আড়ালে এ-ভাবেই জাদুকরেরা লুকিয়ে রাখেন পায়রা, খরগোশ, এমনি আরো কত না জিনিস-পত্তর।

ঘটনাটা এখানেই শেষ করা যেত, কিন্তু এরপর আরও দু-একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। প্রথম ঘটনাটি ঘটল ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ রবিবার দুপুর ২-১৫ মিনিটে। অলোক খৈতান আমার বাড়িতে এলেন। জানতে চাইলেন, ফেইথ হিলিং বিষয়ে আমার অভিমত কী।

বললাম, পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা। পিনাকীর ওপর আমার খালি হাতে অস্ত্রোপচারের (ফেইথ হিলিং-এর) ছবিও দেখালাম অলোককে। ধাপ্পাটা কেমনভাবে দেওয়া হয় সেটাও বোঝালাম।

সব শোনার পরে অলোক আমাকে জানালেন, এবার আমি গোলমাল পাকিয়ে দেওয়ায় পুরোপুরি পরিকল্পনা মাফিক চলতে না পারায় ওঁদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আমি সহযোগিতা করলে অলোক খৈতান ও রামচন্দ্র আগরওয়াল পরবর্তী পর্যায়ে ম্যানিলা থেকে দু-জন ফেইথ হিলার নিয়ে আসবেন এবং কলকাতায় এক মাস ধরে দু-জনকে দিয়ে ফেইথ হিলিং করাবেন। আমি সহযোগিতা করলে প্রতিদিন তিনজন রোগীর দেওয়া ফিস আমি পাব। অর্থাৎ প্রতিদিন ১৫ হাজার টাকা। এক মাসে ৪,৫০,০০০ টাকা। এছাড়া আমাকে ম্যানিলায় নিয়েও যাবেন যখন অলোক বা রামচন্দ্র ম্যানিলায় ফেইথ হিলারের সঙ্গে চুক্তি করতে যাবেন। আলোচনা চালিয়ে গেলাম—প্রস্তাবটা আর কত দূর পর্যন্ত ওঠে জানতে। শেষ পর্যন্ত অলোক আমাকে প্রতিদিন দশ জন রোগীর দেওয়া টাকা দেবেন বলে সর্বোচ্চ প্রস্তাব দিলেন, অর্থাৎ প্রতিদিন ৫০,০০০ টাকা। তিরিশ দিনে ১৫,০০,০০০ টাকা। আমার কথায়-বার্তায় অলোক যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েই অনেক খোলামেলা কথা বললেন, তিনি জানতেন না তাঁর ও আমার কথাগুলো টেপ রেকর্ডারে টেপ হয়ে যাচ্ছে।

২৯ তারিখ অলোক আমার অফিসে ফোন করেন আমার মতামত জানতে। তাঁকে জানাই, 'পৃথিবীতে চিরকালই কিছু বোকা লোক থাকে যাঁরা অর্থের কাছে নিজেদের বিক্রি করেন না। আমিও এই ধরনেরই একজন বোকা লোক বলেই ধরে নিন। আমি পত্রিকায় আপনাদের ফেইথ হিলিং নিয়ে লিখছি। আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেন না। গতকাল আপনার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল তা সবই টেপ করেছি। ইতিমধ্যে ক্যাসেটের কয়েকটা কপি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির হাতে চলে গেছে। আমার কোনও বিপদ হলে তাঁরা ক্যাসেটগুলো হাজির করবেন। টাকার জোরে এদের সকলকেই আপনি কিনে নেবেন ভেবে থাকলে ভুল করবেন, কারণ এঁদের পরিচয়



পিনাকীর দেহ অস্ত্রোপচার করে মাংসের টুকরো বের করছেন লেখক

রক্ত-ভরা বেলুন অস্ত্রোপচারের মুহূর্তে আঙুলের ফাঁকে যে-ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন লেখক



আপনি কোনও নিতেই পারেন না. আমি ছাড়া আর কেউই জানেন না কার কার কাছে ক্যাসেটের কপি আছে।"

ভদ্রলোক আমার উপর একটা চ্যালেঞ্জই ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, "আপনি কোন্ পত্রিকায় ছাপবেন? দেখুন আপনার লেখা ছাপান আমি বন্ধ করতে পারি কিনা।"

এর কয়েক দিন পরই সৌগতর তোলা ফেইথ হিলিং-এর কিছু নেগেটিভ 'পরিবর্তন' পত্রিকা অফিসের নেগেটিভ লাইব্রেরি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল।

১৪ নভেম্বর মহাজাতি সদনের দোতলায় 'বর্তমান ফিলিপাইন' বিষয়ক এক আলোচনা চক্রে এবং ২৪ নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফোরাম অফ সাইন্টিফিক ভ্যালুজ' আয়োজিত এক অলৌকিক-বিরোধী আলোচনা চক্রে ফিলিপিনো ফেইথ হিলারের রহস্য নেগেটিভ-এর রহস্যময় অন্তর্ধান বিষয়ে শ্রোতাদের অবগত করি। ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভদ্রলোক খৈতানের সহযোগিতা প্রার্থনার ঘটনা উপস্থিত শ্রোতাদের জানিয়ে এই সংগ্রামে প্রয়োজনে আমার ও আমাদের সমিতির পাশে তাঁদের দাঁড়াতে আহ্বান জানাই।

২৪ ডিসেম্বর '৮৬. বুধবার আমার শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় সংগ্রহ করা রক্তের ফরেনসিক রিপোর্ট দেখতে পেলাম। তাতে পরিষ্কার বলা আছে, রক্তের নমুনাটি পশুর। রিপোর্টটির কিছুটা অংশ তুলায় দিলাম—

Result of Examination

Ruminant animals blood was detected in the stains on 'A' (cotton) (Vide the enclosed original report No. 9053/MLR dt. 16 12.86 of the Serologist Govt. of India).

Sd/- S. K Basu
22.12.86

ফেইথ হিলার ও জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)

১৯৮৭-র ২৩ আগস্ট আজকাল পত্রিকায় 'টিটিং ফাঁক' সিরিজে 'ছুরি-কাঁচি ছাড়া অপারেশন' শিরোনামে জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মধ্যে তীব্র বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। শ্রীসরকার 'ফেইথ হিলার'কে 'স্পেশাল ডাক্তার' নামে অভিহিত করে তাঁর প্রতিবেদনে জানান, রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় স্পেশাল ডাক্তার তার নিজের আঙুলের ফাঁকে একটা আলপিন ঢুকিয়ে নিজের শরীর থেকে রক্ত বের করে। সাধারণ দর্শক স্পেশাল ডাক্তারের শরীর থেকে বের হওয়া রক্তকেই রোগীর শরীর থেকে অস্ত্রোপচারের জন্য বেরিয়ে আসা রক্ত বলে ভুল করেন। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাই রোগীর দেহে লেগে থাকা রক্তের নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষা করে স্পেশাল ডাক্তারের অস্ত্রোপচার ধাপ্পা কি না ধরতে গিয়ে ঠকে গেছেন। কারণ ফরেনসিক রিপোর্টে দেখা গেছে রক্তটা মানুষেরই।

শ্রীসরকারের এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার এক মাস আগে ২০ জুলাই '৮৭-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কলকাতার কড়চা' কলমে 'লৌকিক—অলৌকিক' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়, তাতে জানান হয়েছিল :

অজ্ঞান না করে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারে রোগ সারানোর কৌশল জানা আছে বলে দাবি করেন 'ফেইথ হিলার'রা। সেই ফেইথ হিলার'-দের নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে রীতিমতো হৈচৈ। সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় এসে রোমিও পি গ্যালার্ডো আর তাঁর স্ত্রী রোজিও গ্যালার্ডো অলৌকিক চিকিৎসক হিসেবে আসর জমিয়ে বসেছিলেন। ওঁরা দুজনে মিলে নাকি দিনে দুশজন পর্যন্ত রোগীর রোগমুক্তি ঘটাচ্ছিলেন। একেকজনের অস্ত্রোপচারে সময় লাগছিল মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিট। আর ফি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। অস্ত্রোপচার শেষে রোগীর দেহে সামান্যতম দাগও নাকি খুঁজে পাচ্ছিলেন না কেউ। বেশ চলছিল এসব অবিশ্বাস্য কাজকর্ম। এমন সময়ে আসরে এলেন 'র্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র সম্পাদক প্রবীর ঘোষ। নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে তিনি উঠলেন গ্যালার্ডোর অপারেশন টেবিলে। অপারেশনের পুরো দৃশ্যটা ভিডিও ক্যামেরায় ধরে রাখলেন তাঁর দুই সঙ্গী। আর অস্ত্রোপচারের পর প্রবীরবাবু নিজের শরীরে লেগে থাকা রক্ত তুলোয় মুছে, তা তুলে দিলেন দুঁদে পুলিস অফিসার সুবিমল দাশগুপ্তের জিম্মায়। রক্তাক্ত তুলো 'সীল' করা হল ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য। ব্যাপার-স্যাপার দেখে গ্যালার্ডো দম্পতি তড়িঘড়ি কলকাতা থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালালেন ম্যানিলায়। ইতিমধ্যে ফরেনসিক রিপোর্টে মিলেছে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। রক্তের নমুনা মানুষের নয়। পশুর। যুক্তিবাদী প্রবীরবাবু বিভিন্ন সমাবেশে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন অলৌকিক বলে প্রচারিত লোক ঠকানো 'ফেইথ হিলিং' বা 'সাইকিক সার্জারি'-র লৌকিক কৌশল। আর এ কাজে প্রবীর ঘোষকে চিঠিপত্রে প্রায়শই উৎসাহ জোগাচ্ছেন অলৌকিক-বিরোধী জনপ্রিয় মার্কিন লেখক জেমস র্যান্ডি।

বিভ্রান্তির কারণ তিনটি। প্রথমতঃ প্রতিদিন একশো থেকে দুশোজন রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করার ক্ষেত্রে নিজের শরীরের রক্তকে রোগীর শরীরের রক্ত বলে বিশ্বাস স্থাপন করাতে কম করেও যে পরিমাণ রক্ত নিজের শরীর থেকে বের করা প্রয়োজন সেই পরিমাণ রক্ত বের করার পরও স্পেশাল ডাক্তারের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না? বিশেষত স্পেশাল ডাক্তার যেহেতু প্রতিদিনই এই সংখ্যক রোগীদের শরীরে অস্ত্রোপচার করে চলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আঙুলের ফাঁকের অংশে শরীরের ভিতর আলপিন ফুটিয়ে অত বিপুল রক্ত বের করা আদৌ বাস্তবসম্মত চিন্তার ফসল নয়, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ কলকাতার গোয়েন্দা দপ্তর যে রক্তের নমুনা অস্ত্রোপচারকালীন সংগ্রহ করেছিল তার ফরেনসিক রিপোর্ট বিষয়ে শ্রীসরকার বলছেন—রক্তের নমুনা ছিল মানুষেরই। আমার বক্তব্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে—ফরেনসিক রিপোর্ট ছিল রক্তের নমুনা পশুর। আমাদের দুজনের পরস্পরবিরোধী কথায় উভয় পত্রিকার পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। ফরেনসিক রিপোর্ট বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে একজন কেউ নিশ্চয়ই ভুল বা মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করেছি।

জানতাম, আমার উপর মিথ্যা সন্দেহের বোঝা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়,

আমাদের সমিতির সততা বিষয়টিও আসতে বাধ্য, যা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, ব্যাহত করবে। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে নীরবতা পালন বিভ্রান্তিই বাড়াবে মাত্র। তাই বিজ্ঞান আন্দোলনের স্বার্থে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্বার্থেই শ্রীসরকারের প্রসঙ্গকে টেনে আনতে বাধ্য হলাম।

বিভ্রান্ত পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বেশ কিছু চিঠি এই প্রসঙ্গে পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকেরই মূল বক্তব্য ছিল—আমাদের দুজনের মধ্যে কে সত্য কথা বলছি। আমার বক্তব্য যদি সত্যিই হয়, তবে মুখ খুলছি না কেন? বহু চিঠির ভিতর থেকে এখানে দেবদর্শন চক্রবর্তী, তথাগত চট্টোপাধ্যায় ও আদৃতা মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত চিঠিটির উল্লেখ করছি। চিঠিতে তাঁরা জানিয়েছেন :

আমরা যৌথভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে এবং আজকাল পত্রিকার 'প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে দুটি চিঠি পাঠিয়েছি। চিঠি দুটির প্রতিলিপি আপনার কাছে পাঠালাম। এই বিষয়ে আপনার মতামত আমরা প্রকাশ্যে জানতে আগ্রহী, আপনি নীরব থাকলে আমরা অবশ্যই ধরে নেবো, আপনি মিথ্যা প্রচারের সুযোগ নিয়ে যশ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক একজন ধূর্ত ভণ্ড ও প্রতারক। এই একই ধরনের চিঠি আমরা জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)-কেও পাঠিয়েছি। আশা রাখি, আমাদের এই সত্যকে জানার যুক্তিনিষ্ঠ প্রচেষ্টাকে আপনারা দুজনেই স্বাগত জানিয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

যে দুটি চিঠি তাঁরা পাঠিয়েছিলেন, তার প্রতিলিপি এখানে তুলে দিচ্ছি—

'প্রিয় সম্পাদক' ৩১ আগস্ট ১৯৮৭
আজকাল
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৯

জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) 'চিটিং ফাঁক'-এর নামে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করছেন, সেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। যাদুকর সরকারকে বিনীত অনুরোধ, জাদু নিয়ে থাকুন, জাদু নিয়ে লিখুন, কিন্তু রাতারাতি বিজ্ঞানমনস্ক সাজতে যাবেন না। বিজ্ঞানমনস্ক সাজা যায় না, হতে হয়।

জাদুকর সরকার একজন অলৌকিকত্বের ধারক-বাহক। তাঁর কথায়—আমার মতে আত্মা জিনিষটা সম্পূর্ণ বাস্তব, কিন্তু চলতি বিজ্ঞান এখনও তাকে ঠিক মতো সমঝে উঠতে পারেনি। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, "ভূত সম্পর্কে আমরা জানি না বুঝি না বলে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা কেউই কিন্তু উড়িয়ে দেননি।" আরো সুন্দর কথাও তাঁর কলমে আমরা পড়েছি—"আজকে যেটাকে ভৌতিক ভাবছি,, আগামী দিনে সেটা হয়ত পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে।"

এই তিনটি উক্তি তোলা হয়েছে, 'কিশোর মন' পত্রিকায় "অমর আত্মার কাহিনী" রচনা থেকে।

জাদুকর সরকারের এইসব বিজ্ঞান-বিরোধী কথার এখানে শেষ নয়। তিনি নিজেও নাকি এক ভূতের কাছ থেকে উপকার পেয়েছেন।

জাদুকর সরকার ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী ; অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী । তারও বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁরই বহু লেখায় । তাঁর মত এমন একজন বিজ্ঞান-বিরোধী শিবিরের মানুষকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্কদের পক্ষে প্রচার চালাতে দেখলে শঙ্কিত হই ।

শঙ্কা আবো বাড়ে যখন দেখি ভেজাল ধবতে গিযে তিনি নিজেই ভেজাল দিচ্ছেন ।

২০শে আগস্টেব লেখায যাদেব তিনি "স্পেশাল ডাক্তাব" বলেছেন, তাঁদেব প্রকৃত টার্মটা তাঁব জানা ছিল না বলেই কি তাঁদেব ওই নামে অবহিত কবেছেন ? এনসাইক্লোপিডিযায চোখ বুলোলে তিনি 'ফেইথ হিলাব'দেব কথা নিশ্চযই পেতেন । তিনি কি জানেন পৃথিবীব বহু দেশ ফেইথ-হিলাবদেব নিযে তথ্যচিত্রও তুলেছে ? ফেইথ হিলাববা ঠিক সেই ধবনেব চিটিংবাজ নয, অতিসবলীকবণ কবে যে ভাবে জাদুকব সবকাব তাঁদেব চিত্রিত কবেছেন ।

জাদুকব সবকাবেব মতে, নিজেব আঙুলে আলপিন ফুটিযে স্পেশাল ডাক্তাব অপাবেশনেব বক্ত বাব কবেন । এই পদ্ধতিতে কোন বকমভাবেই এক নাগাড়ে মাত্র পাঁচজন বোগীব উপবও অস্ত্রোপচাব চালান সম্ভব নয ; অথচ ফেইথ হিলবাবা দিনে একশোব উপবও অপাবেশন কবে থাকেন । শ্রীসবকাবকে বিনীত অনুবোধ, কোন বিষয় না জেনে সে সম্পর্কে অন্যকে জানাবাব বাসনা সংযত করুন ।

জাদুকব পি সি সবকাবেব যে বক্তব্যেব সাব অনুসন্ধানেব জন্য মূলত আমাদেব এই চিঠি লেখা, তা হলো, শ্রীসবকাব তাঁব লেখাটিতে জানিযেছেন, কলকাতা পুলিশেব গোয়েন্দা বিভাগ বোগীর দেহে লেগে থাকা বক্তেব নমুনাব ফরেনসিক পবীক্ষা করে দেখেছেন, এটি মানুষেব রক্ত ।

২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায 'কলকাতাব কড়চা'য 'লৌকিক-অলৌকিক' নামে একটি ফিচাব প্রকাশিত হযেছিল । তাতে বলা হযেছিল, ব্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিযেশন অফ ইন্ডিযাব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ নিজেব পবিচয গোপন কবে, খালি হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচাবেব জন্য ফেইথ হিলাব গাল্যার্ডোব অপাবেশন টেবিলে ওঠেন । অস্ত্রোপচাবেব পব প্রবীববাবুব শবীব থেকে বেবিযে আসা বক্ত সংগ্রহ করেন পুলিশ অফিসাব সুবিমল দাশগুপ্ত । ফবেনসিক পবীক্ষায দেখা যায বক্তেব নমুনা পশুব । ব্যাপাব দেখে গ্রেপ্তাব এড়াতে গ্যালার্ডো দম্পতি কাববাব গুটিযে পালিযেছেন ম্যানিলায ।

ফেইথ হিলাবদেব ফবেনসিক বিপোর্ট নিযে যুক্তিবাদী প্রবীব ঘোষ ও জাদুকব পি সি সরকাব (জুনিযব)-এব মধ্যে যে কেউ একজন ভুল বা মিথ্যে খবব পবিবেশন কবেছেন । যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক লক্ষ লক্ষ মানুষেব কাছে শ্রীঘোষেব বিজ্ঞানসম্মত

যুক্তিগুলি জাদুকর সরকারের অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলির ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে আমরা প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হতে চাই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলে সহযোগিতা করলে বাধিত হবো।

স্বাক্ষর : দেবদর্শন চক্রবর্তী
(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

স্বাক্ষর . তথাগত চট্টোপাধ্যায়
(অর্থনীতি বিভাগ)

স্বাক্ষর আদৃতা মুখোপাধ্যায়
(ইংরাজী বিভাগ)

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা।

সম্পাদক সমীপেষু ৩১ আগস্ট ১৯৮৭

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

২০ শে জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কলকাতার' কড়চা'য় 'লৌকিক-অলৌকিক' নামে একটি ফিচার প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক প্রবীর ঘোষ নিজের পরিচয় গোপন করে খালি হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারের জন্য ফেইথ হিলার গ্যালার্ডোর অপারেশন টেবিলে ওঠেন। অস্ত্রোপচারের পর প্রবীর ঘোষের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত সংগ্রহ করে ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠান পুলিশ অফিসার সুবিমল দাশগুপ্ত। ফরেনসিক পরীক্ষায় দেখা যায় রক্তের নমুনা মানুষের নয়, পশুর।

২০ আগস্ট 'আজকাল' পত্রিকার 'চিটিং-ফাঁক' কলমে ফেইথ হিলারের উপরে 'ছুরি কাঁচি ছাড়া অপারেশন' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখক জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)। শ্রীসরকার জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ রোগীর দেহে লেগে থাকা রক্তের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষা করে দেখেছেন, এটি মানুষের রক্ত।

দুই পত্রিকার দুই বিপরীত বক্তব্যে আমরা বিভ্রান্ত। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা দুটি এবং শ্রী ঘোষ ও শ্রী সরকারের সহযোগিতা কামনা করি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে
আদৃতা মুখোপাধ্যায় (ইংরাজী বিভাগ)
তথাগত চট্টোপাধ্যায় (অর্থনীতি বিভাগ)
দেবদর্শন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

আবারও বলি এই জাতীয় বক্তব্যের প্রচুর চিঠি আমি পেয়েছি। এর উত্তরে অতি স্পষ্ট করে বক্তব্য রাখার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জানাচ্ছি

১। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর কলকাতায় আসা ফিলিপিনো ফেইথ হিলার বা 'স্পেশাল ডাক্তার'-এর অস্ত্রোপচার করার সময় একবারই মাত্র রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন।
২। রক্ত সংগ্রহ করেছিলেন সেই সময়কার কলকাতা পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার সুবিমল দাশগুপ্ত।
৩। আমার শরীরে অস্ত্রোপচারকালে বেরিয়ে আসা রক্তই সুবিমল দাশগুপ্ত সংগ্রহ করেছিলেন।
৪। রক্তের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষার ফল আগেই তুলে দিয়েছি। তাতে স্পষ্টতই জানান হয়েছে রক্তের নমুনা ছিল পশুর।
৫। পি সি সরকার (জুনিয়র)-এর 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত ফেইথ হিলার সম্পর্কিত লেখাটির বিষয়ে সুবিমল দাশগুপ্ত অবহিত হয়েছিলেন। এবং শ্রীসরকারের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত জানাই, ফিলিপিন বেতার ও দূরদর্শন থেকে ফেইথ হিলার প্রসঙ্গে আমাকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় ১৯৯০ সালে।

পরলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার

'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯৮৪ সালের ১৮ জানুয়ারি সংখ্যায় যে প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশিত হয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল সেটির শিরোনাম হলো—পরলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকেও বাঁচিয়ে তুলছেন। লেখক—আনন্দস্বরূপ ভাটনাগর। মূল প্রতিবেদনটি সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকে অনুবাদ করে লেখাটি প্রকাশ করে 'পরিবর্তন'। অনুবাদক রমা শর্মা।

প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছিল এইভাবে .

যিনি রোগাক্রান্ত হন, তিনি সাধারণত চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যান। কেউ পছন্দ করেন অ্যালোপ্যাথি। কেউ হোমিওপ্যাথি কেউবা কবিরাজি। ইদানীং শোনা যাচ্ছে আকুপাংচার করে রোগ উপশমের কথা।

কিন্তু পরলোক থেকে ডাক্তার এসে রোগ নিরাময় করছেন এ খবর নতুন। বিদেশেও হ্যারি এডওয়ার্ড একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে হাজার হাজার মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে বাঁচিয়েছেন।

কী তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি ? রোগী রোগিণীদেরই বা প্রতিক্রিয়া কী ? তারই বিস্তৃত প্রতিবেদন।

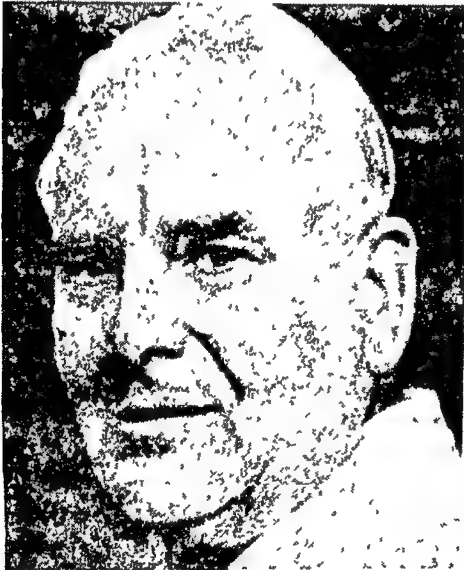
প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল -

"পরলোক সম্বন্ধে ধারণা"

বাস্তবে যে ব্যক্তি ইহলোকে সারা জীবন ডাক্তারী করে গেছেন পরলোকে গিয়েও তাঁর সে ইচ্ছা থেকে যায়। আমাদের চিন্তাই আমাদের ব্যক্তিত্বের আধার এবং ঠিক সেভাবেই আমরা নিজস্ব কার্যকলাপ অনুধাবন করি। সে চিন্তাচ্ছন্নতাই মৃত্যুর পরও

আমাদেব সঙ্গে থেকে যায় । অধিকাংশ লোকেব পবলোক সম্বন্ধে ভুল ধাবণা বযেছে । তাঁবা ভাবেন সূক্ষ্মলোকে হযত ভূত-প্রেত বযেছে বা মৃত্যুব পব আত্মা খুব তাডাতাডি অন্যত্র দেহধাবণ কবে । কিন্তু বাস্তবে তা নয । সূক্ষ্মলোকতত্ত্ব এবং তাতে জীবনেব গতিবিধি একটি স্বতন্ত্র বিষয । মূলত একথা বলা যেতে পাবে যে এ জগতেব শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র আত্মাগণ যাঁবা সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকাব, যোগী, কলাকাব প্রভৃতি আপন সাধনায নিমগ্ন থাকেন তাঁদেবই ভেতব থাকেন সে সব পবোপকাবী আত্মা, যাঁবা ভূ-পৃথিবীতে নেমে এসে নানাবকম ভাবে মানুষেব সাহায্য কবেন । পবলোকপ্রাপ্ত ডাক্তাববাও বোগীব সেবায বত থাকতে চান । উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য তাঁবা কোন সুপাত্রেব মাধ্যমে লোক সেবা কবেন । যাবা উদাব হৃদয ও ধার্মিক স্বভাবসম্পন্ন তাদেবই মাধ্যমে তাঁবা বোগীব অসাধ্য বোগ উপশম কবেন ।

১৯৩৫-এব কথা । হ্যাবি এডওযার্ডকে তাঁব এক বন্ধু একটি চার্চে নিযে যান । সেখানে এক আত্মাব মাধ্যমে তাঁকে বলা হয যে, তাঁব মধ্যে বোগ উপশম কবাব প্রতিভা বযেছে । একই ভাবে অন্য চার্চেও সেই মাধ্যম দ্বাবা তাঁকে একই কথা বলা হয । তাই তিনি ভাবলেন, একটু চেষ্টা কবে দেখাই যাক না । সে সময তাঁবই এক বান্ধবীব বন্ধু ইংলন্ডেব ক্রম্পটন হাসপাতালে মবণাপন্ন অবস্থায শয্যাশাযী ছিলেন ।



হ্যাবি এডওযার্ড

তিনি ক্ষয় রোগাক্রান্ত ছিলেন। হৃদপিণ্ডের স্ফীতি হওয়াতে ভেতরের নাড়ি ফেটে রক্তস্রাব হচ্ছিল। সেখানেই হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁর সম্পূর্ণ নীরোগ হওয়ার কামনা করে মন একাগ্র করলেন। এক সপ্তাহ পর যখন তিনি তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি বললেন, তাঁর বন্ধুর হৃদপিণ্ডের স্ফীতি এখন আর নেই। রক্তস্রাবও বন্ধ হয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন এবং সেইভাবেই রোগীর রোগ উপশম করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিছুদিন পর সেই রোগী সুস্থ হয়ে পুনরায় নিজের কাজে যোগ দেন।

একদিন হ্যারি এডওয়ার্ড নিজের ছাপাই ও স্টেশনারি দোকানে অন্যান্য দিনের মত কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা দোকানের ভেতরে এসে বললেন, কে যেন তাকে এই দোকানে ঢোকার জন্য প্রেরণা দিচ্ছে। তাই তিনি এসেছেন। তিনি বললেন, তাঁর স্বামী লন্ডনে একটি হাসপাতালে বক্ষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাঁর নীরোগ হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যেকটা দিন তিনি বেঁচে আছেন, সে কটা দিন তিনি বাড়িতে ফিরে গিয়ে যেন হাসিখুশিতে বাকী জীবনটা কাটান—এ উপদেশ দিয়েছেন।

বিদেহী আত্মার দ্বারা প্রতিকার

সেই মহিলার মনোকষ্টে হ্যারি এডওয়ার্ড অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর স্বামীর চিকিৎসা তিনি বিদেহী ডাক্তারের মাধ্যমে করবেন। কিন্তু এ কথা বলা যত সহজ ছিল, বক্ষ ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর রোগ উপশম করা ততই সন্দেহজনক মনে হতে লাগল। রাতে তিনি মন একাগ্র করে সেই বিদেহী আত্মার কাছে তাঁর নীরোগ হওয়ার প্রার্থনা করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করে কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিছুদিন পর মহিলাটি তাঁর স্বামীকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে পরীক্ষা করাবার জন্য এবং তিনি ডাক্তারদের জানালেন, যে দিন থেকে তিনি হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি ফিরেছেন সেদিন থেকেই কোন প্রকার পথ্য গ্রহণ করেননি। ডাক্তাররা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, তাঁদের নির্ধারিত ওষুধের গুণেই তিনি সুস্থতা লাভ করেছেন।

এইভাবে হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁর জীবনের প্রথম দুটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত অচিন্ত্যনীয় ভাবে সফলতা পেয়ে গেলেন তাঁর স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর মাধ্যমে। একে অ্যাবসেন্ট হিলিং বলা হয়। অতঃপর তিনি নিজের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন যে তাঁর ভেতর রোগ উপশম করার ক্ষমতা রয়েছে। একদিন একটি মেয়ে মধ্যরাত্রে তাঁর ঘরে এসে জানালেন যে তার বোন জ্বরাক্রান্ত হয়ে বেঘোরে পড়ে আছে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য কিছু উপসর্গও দেখা দিয়েছে। ডাক্তারেরা জবাব দিয়েছেন। তিনি এক পরাশক্তি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধ ব্যক্তির আদেশে হ্যারি এডওয়ার্ডের কাছে এসেছেন। সে রাত্রেই তাকে অ্যাবসেন্ট হিলিং দেওয়া হল। দ্বিতীয় দিন সকালে হ্যারি এডওয়ার্ড তাদের বাড়িতে গিয়ে বোনটির মাথায় হাত রেখে মঙ্গল কামনা করলেন। সে দিনটা বৃহস্পতিবার ছিল।

হ্যারি এডওয়ার্ড জানালেন যে মেয়েটি সপ্তাহখানেক পরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। পরিবার পরিজনেরা তার দিকে অবিশ্বাস্যভবে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু দেখা গেল রবিবার সকালে সে মেয়েটি বিছানায় বসে চা পান করছে এবং তার জ্বরও একদম ছেড়ে গেছে। অতঃপর দেখা গেল যে, সে মেয়েটি ক্ষয় রোগাক্রান্ত এবং পনের দিন অন্তর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান হত এবং বায়ু সেবন করা হত। হ্যারি তাঁর এই নবার্জিত প্রয়াসকে অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করে চললেন। ক্ষয় রোগ থেকে' মুক্তি পেল মেয়েটি। হাসপাতালের ডাক্তাররা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করলেন। পরবর্তীকালে মেয়েটি সেই হাসপাতালে নার্সের কাজ পেয়েছে এবং এখন সেই কাজেই আছে। এভাবে শরীর স্পর্শ করে চিকিৎসার পদ্ধতিটিতে এই প্রথমবার তিনি সফলতা লাভ করলেন। এটি কনটাক্ট হিলিং-এর দৃষ্টান্ত।

অতঃপর হ্যারি এডওয়ার্ডের বাড়িতে রোগীরা ভিড় করে আসতে লাগলেন। স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর মাধ্যমে তারা নিরাময় লাভ করে রীতিমত উপকৃত হলেন। এখানে এই মহান মানুষ ও অপার্থিব চিকিৎসাটি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

২৯ মে, ১৮৯৩ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি বিদেহী আত্মার মাধ্যমে রোগ উপশম চর্চা শুরু করেন। এবং ১৯৭৬-এর ৯ ডিসেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁর পার্থিব দেহ পরলোকে লীন হয়। মরদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মলোকে গমন করেন তিনি, সেখানে বিদেহী ডাক্তারদের মধ্যে স্থিত হন অতঃপর। ৪১ বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক অসাধ্য রোগীর রোগ উপশম করে তাদের রোগ মুক্ত করেছেন এই প্রযাত মানুষটি। তাঁর বিদেহী আত্মার আরোগ্য-মন্দিরে প্রত্যেক সপ্তাহে কয়েক হাজার চিঠি আসত এবং প্রত্যেকটি চিঠির তিনি উত্তর দিতেন। ১৯৫৫ সন পর্যন্ত তিনি দশ লক্ষ চিঠির জবাব দেন। তাঁর স্বর্গ প্রাপ্তির পর আজও হ্যারি এডওয়ার্ড সেনচুরির কাজকর্ম সে প্রকারই করা হয়।

অসাধ্য রোগের চিকিৎসা

ভারতবর্ষে এখনও অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা হ্যারি এডওয়ার্ডের অ্যাবসেনট হিলিং-এর মাধ্যমে রোগ উপশম করে আরোগ্যলাভ করেছেন। ১৯৭০-এর আগস্ট মাসে ২৭ বৎসর বয়স্কা কুমারী ছায়ার পায়ে ফোটক হয়। কয়েক বৎসর বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই তাকে সারান যাচ্ছিল না। অতঃপর সে হ্যারি এডওয়ার্ডের কাছে তিন মাস ধরে চিঠিপত্র লেখালেখি করতে লাগল এবং আশ্চর্যের ব্যাপার সব কটি চিঠির উত্তরও পেল। একদিন সকালে সে উঠে দেখে কোন দৈববলে যেন তার ফোটক একেবারে উধাও হয়ে গেছে।

হ্যারি এডওয়ার্ড ইংলন্ডের একটি জাঁকজমকপূর্ণ আলো ঝলমলে বিশাল সভাকক্ষে হাজার হাজার দর্শকের সামনে বিদেহীরূপে এসে তাঁর অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে আরোগ্যলাভ হওয়ার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতেন। রয়েল অ্যালবার্ট হলে একবার তাঁর এরকম একটি ঘটনার সময় দিল্লির স্পিরিচুয়ার হিলার শ্রীমতী স্বর্ণনারঙ্গ উপস্থিত

ছিলেন। এই প্রদর্শন কক্ষে জনৈক জটিল বোগাক্রান্ত বোগীকে একটি মঞ্চেব ওপব এসে দাঁড়াতে বলা হল। এক যুবক তাব অতি বৃদ্ধা মাকে কোলে কবে নিযে এসে সেই মঞ্চেব ওপব দাঁড় কবাল কোনক্রমে। সেই বৃদ্ধাব সম্পূর্ণ শবীব বাতে আক্রান্ত ছিল। মাইকে এসে তিনি অস্ফুট শব্দে বললেন, 'বাছা তুই আমাব শবীবেব আব কী ভালো কববি। কিন্তু এতটুকু উপকাব কব যাতে আমাব আঙুলগুলো অন্তত সোজা হযে যায, আমি যেন নিজেব হাত দিযে নিজেব খাবাবটুকু খেতে পাবি। আমাব ছেলে, নাতিব হাত দিযে তুলে দেওযা খাবাব মুখে নিতে বড লজ্জা কবে।' দর্শকবা হেসে উঠলেন হো হো কবে। এব কিছুক্ষণ পবেই সেই বৃদ্ধা নিজেব চেষ্টায আস্তে আস্তে মঞ্চেব উপব সোজা হযে উঠে দাঁড়ালেন। খুব খানিকটা হাত পা ছোঁড়াছুড়ি কবতে শুরু কবলেন, আবাব একটু দৌড়েও নিলেন আনন্দে। এভাবে হ্যাবি এডওযার্ড তাঁব বোগ নিবাময ক্ষমতা দেখিযে দিলেন পৃথিবীব মানুষেব চোখেব সামনে।

বিদেশী ডাক্তাব দ্বাবা আবোগ্যলাভ

বোম্বেব হাসপাতালে বহু বিদেশি ডিগবিধাবী এক প্রতিভাবান ডাক্তাব বযেছেন, বমাকান্ত কোনি। তিনি বৃদ্ধ-অবস্থাব যে কোন ধবনেব বোগ নিবাবণে বিশেষজ্ঞ। প্রথম জীবনে অ্যালোপ্যাথি পদ্ধতিতেই চিকিৎসা শুরু কবেছেন। ডাঃ বমাকান্ত কোনি সাবস্বত ব্রাহ্মণ হলেও বিবাহ কবেছেন অন্ধ্রেব প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বম্ভাকে, যিনি ছিলেন গৌড়-ব্রাহ্মণ।

১৯৭২ সনে ডাঃ কোনি কোমবেব স্পনডিলোসিস-এ আক্রান্ত হযে অত্যন্ত অসুস্থ হযে পড়েন। মেরুদণ্ডেব অসহ্য ব্যথাব দরুন তিনি শয্যাগত হন। ভাবলেন, বাকি জীবনটা বোধহয বিছানায শুযেই কাটাতে হবে। সে সময তাঁব জনৈক বযস্ক বন্ধু তাঁকে হ্যাবি এডওযার্ডেব কাছে আবোগ্য কামনা কবে চিঠি লেখাব জন্য উৎসাহিত কবলেন। আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং সুশিক্ষিত হওযাব দরুন তিনি এ বিষযটি প্রথমে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে কবতে পাবেন নি। কিন্তু বন্ধুব কথা বাখবাব জন্য তিনি তাঁকে চিঠি লিখলেন। নিজেব এবং অন্যান্য ডাক্তাবদেব এ বিষয আশ্চর্য ভাবান্তব দেখা দিল এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হযে উঠলেন।

বিচিত্র ঘটনা

১৯৭২ সনে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এতে ডাক্তাব বমাকান্ত কোনিব জীবনে নতুন এক অধ্যায শুরু হয। এ অবস্থায তাঁব একটি 'সিযানস' দেখাব সুযোগ হল। ঘব অল্প অন্ধকাব ছিল। লোকেবা চেযাবে গোল হযে বসে ছিলেন। মধ্যস্থলে যে মিডিযাম,



ডাঃ রমাকান্ত কেনি

সে ঘুরে ঘুরে এক একটি লোকের কাছে এসে তাঁদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের সম্বন্ধে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় ঘুরে এসে ডাঃ কেনির সামনে দাঁড়ালেন। এবং বললেন 'আমার বিদেহী মার্গদর্শক জানাচ্ছেন যে আপনাকে রোগ উপশম করার প্রতিনিধি (যন্ত্র) সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে আপনার মাধ্যমে বিদেহী ডাক্তার দ্বারা রোগীর রোগ উপশম করা যায়।' বারবার তাঁকে এ কথা বলা হল। তিনি বললেন 'আপনি নিজের মন হতে সমস্ত সন্দেহ, শঙ্কা ও দ্বন্দ্ব দূর করে ফেলুন।'

এই বৈঠকের পর আমার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। মনে হল কেউ যেন আমার অন্তরে অফুরন্ত শক্তি জুগিয়ে দিয়েছে। আমি যেন মাইলের পর মাইল দৌড়ে চলে যেতে পারি। আমার পিঠে যেন দুটো ডানা লাগান হয়েছে। আমার মনের এই বিচিত্র আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ উপলব্ধি করে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলাম। আমার হাতের ছোঁয়া মাত্র রোগী নীরোগ হয়ে উঠবে বলে মনে হতে লাগল। করতল উষ্ণ হয়ে উঠল। আঙুলের প্রান্তগুলোতে যেন তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগল। চোখ বুজতেই জ্যোতির্ময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডতে স্ফুলিঙ্গের ছটা দেখা দিতে লাগল। এই বিচিত্র অনুভূতির কথা তিনি তাঁর নিজের লেখা বই 'সাইকো হিলিং'-এ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি

বোম্বের একজন সুবিখ্যাত মিডিযামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর সহযোগিতায় নিজের বিদেহী মার্গদর্শক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন। সূক্ষ্মলোক নিবাসী তিনি দুশো বৎসর আগে এ লোকে থাকাকালীন অবস্থায় সার্জারি ও ডাক্তারি করে গেছেন এবং এখনও তিনি পরলোকে অবস্থান করে নানা প্রকার অনুসন্ধান করে চলেছেন। তিনি এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন যশস্বী ডাক্তার ছিলেন যে জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা মাত্র বুঝতে পারতেন রোগী কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তার কোনিকে মাধ্যমে হিসেবে উপযোগী করে তাঁর ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে তিনি রোগ উপশম করেন। ডাঃ কোনি যখন রোগীর শরীর স্পর্শ করেন তাঁর আঙুলগুলো রোগীর রোগাক্রান্ত স্থানটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় করে ফেলেন। ওষুধ লেখবার সময়ও তিনি অনুভব করেন যেন কেউ তাঁর হাত ধরে ওষুধগুলোর নাম লিখিয়ে নিচ্ছেন যেমন 'অটোমেটিক রাইটিং'-এ লেখা হয়। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রি বিভূষিত এই আধুনিক ডাক্তার ভদ্রলোক না জানি কত দুরূহ রোগীর রোগ নিরাময় করে তাদের সুস্থ সবল করেছেন। অনেক কঠিন রোগ নিরাময় করার সম্বন্ধে বর্ণনা তাঁর ফাইলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মাত্র অ্যাবসেন্ট হিলিং দ্বারাই তিনি ১৯৮১ সন পর্যন্ত ২৭০০ রোগীর রোগ উপশম করেছেন। ভাবতে শুধু বোম্বের হাসপাতালেই এই স্পিরিচুয়াল হিলিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

কনট্যাক্ট হিলিং

যে সব রোগী নানা পদ্ধতিতে নিজেদের চিকিৎসা করিয়ে শ্রান্ত ও নিরাশ হয়ে পড়েন তাঁরাই অবশেষে ডাঃ কোনির কাছে আসেন বিদেহী চিকিৎসার জন্য। বিশ্বাসের অভাব তো রয়েছেই তাদের মনে, তবু তাঁরা শঙ্কিত হৃদযে এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিকেও যাচাই করে নিতে চান। অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁরা ধৈর্য সহকারে সুস্থ হওয়ার আশা রাখেন। তবে বিদেহী আত্মার দ্বারা চিকিৎসা করাতে এসে মনে করেন যেন তাঁদের অসুস্থতা জাদুমন্ত্রে উড়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ নীরোগ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতাল হতে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যে কোন রোগ যতদিনকারই হোক সারার কথা তাতে ধৈর্য হারালে চলে না।

প্রতিবেদন প্রসঙ্গে কিছু কথা

প্রতিবেদনটির শুরুতে প্রতিবেদক মৃত্যুর পর আত্মা বাস্তবিকই কী করে—বলতে গিয়ে যা বলেছেন তা একান্তভাবেই প্রতিবেদকের নিজস্ব বিশ্বাসের কথা। তাঁর এই বিশ্বাসের পিছনে কোনও পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ কাজ করেনি। যুক্তি বা বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে

পৌঁছায পবীক্ষা, পর্যবেক্ষণেব পথ ধবে। বিশ্বাস চলে আপন খেযাল-খুশিতে। কখনও বহু লোকে বিশ্বাস কবে, বিখ্যাত ব্যক্তিবা বিশ্বাস কবেন, এই কু-যুক্তিতে মানুষ অন্ধভাবে কোনও কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন কবেন। কখনও শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ইত্যাদিকে অভ্রান্ত বলে ধবে নেওযা থেকে সৃষ্টি হয অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাসেব সঙ্গে যুক্তিব লডাই জন্মলগ্ন থেকেই। কাবও একান্ত ব্যক্তি বিশ্বাস কখনই বিজ্ঞানেব সত্য হযে উঠতে পাবে না, তা সেই বিশ্বাস আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ বায যাঁবই হোক না কেন। যুক্তিব সত্য, বিজ্ঞানেব সত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসবে পবীক্ষা পর্যবেক্ষণেব মাধ্যমেই।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলিকাতা পুস্তকমেলা '৯০-এ আমাদেব সমিতিও আসব জাঁকিযে বসেছিল এক বঙিন ছাতাব তলায। প্রতিদিনই আমবা নানা অনুষ্ঠান ও প্রশ্নোত্তবেব মাধ্যমে জনসাধাবণেব কাছে পৌঁছতে চেষ্টা কবছিলাম।। এক সন্ধ্যায এক বিশপ আমাদেব সামনে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই ধবনেব প্রশ্ন আবও বহু ভাববাদীদেব কাছ থেকে আসাব সম্ভাবনা আছে বলেই প্রসঙ্গটিব অবতাবণা কবছি।

বিশপ আমাকে বলেছিলেন, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাস বাখতেই হয, এমনই একটি ক্ষেত্র ঈশ্বব। ঈশ্ববকে বিশ্বাসেই পাওযা যায যুক্তিতে নয। যুক্তিতে সব কিছু প্রমাণ কবা যায় না। আপনাব বাবাবই যে আপনি ছেলে তা কি আপনি প্রমাণ কবতে পাবেন ? পাবেন না। এখানে আপনাকে বিশ্বাসেব উপবই নির্ভব কবতে হয।"

বলেছিলাম, গর্ভধাবণ যিনি কবেছেন তিনিই আমাব মা। এবং তাঁব স্বামীকেই আইনত আমি ও সমাজ বাবা বলে স্বীকাব কবে নিযেছে। নিশ্চযই যুক্তিব দিক থেকে যে কোনও সন্তানেবই জন্ম হতে পাবে সাধাবণভাবে সক্ষম নাবী-পুরুষেব মিলনে। সেই মিলন বিবাহিত স্বামীব সঙ্গে না হতেও পাবে। এই সম্ভাবনা আপনাব আমাব সবাব ক্ষেত্রেই থাকতে পাবে। কিন্তু আমবা আমাদেব জন্মদাতা নন, আমাদেব পিতাকেই নির্দেশ কবি পবিচযদানেব ক্ষেত্রে। আব পিতা সব সময মাযেব বিবাহিত স্বামী। আমাব জন্মদাতা আমাবই পিতা কি না, এই ধবনেব চিন্তাব দ্বাবা বা অনুসন্ধানে নেমে সত্যকে আবিষ্কাব কবতে পাবা বা না পাবাব মধ্যে কী আসে যায ?

ডাঃ বমাকান্ত কোনি প্রসঙ্গে ববং এবাব আসা যাক। ডাঃ কোনিব দাবিব সমর্থনে প্রমাণ চেযে '৮৪-ব ২৪ ফেব্রুযাবি, ২৮ মার্চ দুটি চিঠি দিই। প্রথম চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

ডাঃ বমাকান্ত কোনি
বোম্বে হাসপাতাল
মেডিকেল বিসার্চ সেন্টাব
৩য তল, বোম্বে-৪০০ ০২০

প্রবীব ঘোষ
৭২/৮, দেবীনিবাস বোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

প্রিয ডাঃ কোনি,

সম্প্রতি আপনি ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায প্রচুব প্রচাব পাওযা এক 'ফেইথ হিলাব'। আপনিও ফিলিপিনো ফেইথ হিলাবদেব মতই দাবি কবেন অলৌকিক ক্ষমতাব দ্বাবা বিদেহী ডাক্তাবদেব সাহায্যে বোগীদেব বোগমুক্ত কবেন।

আমার ধারণা, যে সব রোগীদের Placebo চিকিৎসার দ্বারা অর্থাৎ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে রোগমুক্ত করা সম্ভব আপনি কেবলমাত্র তাঁদেরই বিনা ওষুধে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং হবেন। অথবা 'বিদেহী ডাক্তার রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধের নাম লিখেছে', দাবি করলেও বাস্তবে চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই আপনি ব্যবস্থাপত্র লিখছেন। যে ব্যবস্থাপত্র অনুসারে চিকিৎসা করিয়ে রোগীরা রোগমুক্ত হচ্ছেন।

আপনি কি বাস্তবিকই দাবি করেন—বিদেহী ডাক্তারের আত্মাকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করতে আপনি সক্ষম?

আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে জানতে আগ্রহী সত্যানুসন্ধানী। তথাকথিত অলৌকিকতার পিছনে লৌকিক রহস্য কী, এই বিষয়ে কিছু পত্র-পত্রিকায় লিখেও থাকি। দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীর সন্ধান পাইনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি ওইসব তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রত্যেকেরই ক্ষমতার পিছনে কোনও অলৌকিকত্ব ছিল না, ছিল লৌকিক কৌশল।

আমার এই ধরনের সত্যকে জানার সদিচ্ছা ও শ্রমকে নিশ্চয়ই আপনি একজন সৎ মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বাগত জানাবেন। আপনার অলৌকিক চিকিৎসা ক্ষমতার বিষয়ে আমি একটি অনুসন্ধান চালাতে চাই। আশা রাখি সত্য প্রকাশের স্বার্থে আপনি আমার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

আমি আপনার কাছে তিনজন রোগীকে হাজির করতে চাই। আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় ওই তিনজনকে ছয় মাসের মধ্যে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে আপনাকে দেব দশ হাজার টাকা।

আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করলে বা চিঠি পাঠাবার এক মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করলে অবশ্যই ধরে নেব, আপনার দাবি একান্তই মিথ্যা। আপনি লৌকিক উপায়েই কিছু কিছু রোগীর রোগমুক্তি ঘটিয়ে থাকেন মাত্র।

শুভেচ্ছাসহ
প্রবীর ঘোষ

কোনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেননি। কারণ এগিয়ে এসে পরাজিত হওয়ার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন, যেমন আরও অনেক 'ক্ষমতাধরেরাই' করেন।

ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতার ভুতুড়ে চিকিৎসা

১৯৮৮ সালটা যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণীকে নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রিকাগুলো হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল তাঁর নাম ঈপ্সিতা রায় চক্রবর্তী, ডাইনি সম্রাজ্ঞী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় রঙিন ও সাদা-কালো ছবির সঙ্গে যে সব

প্রচ্ছদ কাহিনী ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল সে সব পড়ে পাঠক-পাঠিকাবা শিহরিত হলেন। শিহবিত হলাম আমিও। জানলাম, বহস্যবিদ্যা ঈপ্সিতাব মুঠো-বন্দী। থট্ বিডিং বা মানুষেব মন বোঝাব ক্ষমতাব প্রমাণ দিযেছেন সাক্ষাৎকাব গ্রহণকাবী সাংবাদিকদেব। নিখুঁৎ ভবিষ্যৎবাণী কবতে সক্ষম। মাবণ-উচাটন, তুকতাক সবই আযত্তে। ডাকিনী বিদ্যাব সাহায্যে যে কোনও বোগীকে ইচ্ছে কবলেই সুস্থ কবে তুলতে পাবেন, যে কোনও সুস্থ মানুষকে পাবেন মাবতে। ঈপ্সিতাব দাবি, ডাইনীব এইসব অলৌকিক ক্ষমতা বিজ্ঞানসম্মত সাধনাব ফল। অলৌকিক ঘটনাব প্রতি চিবকালই আমাব আকর্ষণটা বড বেশি। এই ধবনেব কোনও ঘটনা শুনলে সত্যানুসন্ধানে নেমে পড়াব ইচ্ছেটা প্রবলতব হযে ওঠে। তাব মধ্যে আবাব, অলৌকিক ব্যাপাব-স্যাপাব যদি 'বিজ্ঞানসাধনাব ফল' হয তবে তো কথাই নেই। ঈপ্সিতাব ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিককে অনুবোধ কবলাম আমাব সঙ্গে ঈপ্সিতাব পবিচয কবিযে দিতে। কযেক দিনেব মধ্যে খবব পেলাম, ঈপ্সিতা আমাব মুখোমুখি হতে অনিচ্ছুক।

৮৮-ব জুনেব শেষ সপ্তাহে পডন্ত বিকেলে ঈপ্সিতাব দক্ষিণ কলকাতাব লেক বোডেব ছবিব মত সাজান ফ্ল্যাটে গিযেছিলাম 'আজকাল' পত্রিকাব তবফ থেকে সাক্ষাৎকাব নিতে। ঘবেব দু'পাশে দুই বেড-ল্যাম্প সৃষ্ট আলো-আঁধাবেব মাঝে এক সময ঈপ্সিতাব আবির্ভাব ঘটলো। যথেষ্ট সময ও যত্ন নিযে নিজেকে সাজিযেছিলেন। আমি ও আমাব সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক তাপস দেব পবিচয দিলাম। ঈপ্সিতা বসলেন। আমাব মিথ্যে পবিচযকেই সত্যি বলে ধবে নিযে আলোচনা শুরু কবলেন। সত্যানুসন্ধানে এসে প্রথম সত্যটি আমাব সামনে প্রকাশিত হল, ঈপ্সিতাব থট্ রিডিং ক্ষমতাব দাবি নেহাতেই বাত্‌কে-বাত্।

মন্ত্রিযলে শিক্ষা ও ডাইনি দীক্ষা পাওযা ঈপ্সিতা ইংবেজিব সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা মিশেল দিযে জানালেন, তাঁদেব সংস্থাব নাম "ওযার্ল্ড উইচ ফেডাবেশন"। কেন্দ্রীয কার্যালয মন্ত্রিযলে। সংস্থাব তবফ থেকে পৃথিবীকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ কবে তাব দাযিত্ব দেওযা হযেছে তিন প্রধানকে। এঁবাই সংস্থাব সর্বোচ্চ পদাধিকাবী। পূর্বাঞ্চলেব কার্যালয নিউ দিল্লি, প্রধানা স্বযং ঈপ্সিতা। তবে ঈপ্সিতা যখন তাঁব কলকাতাব ফ্ল্যাটে থাকেন তখন সেটাই হযে ওঠে অস্থাযী কার্যালয। ডাইনিপীঠেব কেন্দ্রীয সদস্য সংখ্যা মাত্র ৭৫ এবং সকলেই মহিলা। অনেক পুরুষই সদস্য হওযাব ব্যর্থ আবেদন বেখেছিলেন।

আলোচনাব মাঝে চা ও বিস্কুট এল। চাযেব কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, "কৈশোব থেকেই ওকাল্ট বা বহস্যবিদ্যাব প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব কবেছি। এ-জন্য ডাইনি, ডাইন, ওঝা, গুনিন, জানগুরু, তান্ত্রিক, ভৈববী, অবতাবদেব পিছনে কম ঘুবিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গাদা সময আব গুচ্ছেব অর্থনাশই সাব হযেছে। যখন বাস্তবিকই সন্দেহ কবতে শুরু কবেছিলাম, এ জীবনে আব বোধহয বহস্যবিদ্যাব হদিশ দেওযাব মত কাবও দেখা পেলাম না, এমনি সময আপনাব খোঁজ পেলাম। আপনাকে নিযে অন্তত গোটা আটেক লেখা আমাব চোখে পডেছে। সবই গোগ্রাসে গিলেছি। সব পড়ে সব জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস কবতে মন চাইছে না, তাই আমি নিজে আপনাব কাছ থেকে শুনতে চাই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলোতে আপনাব সম্বন্ধে যে সব আপাত

অদ্ভুত খবর ছাপা হয়েছে তা সবই কি সত্যি ?”

ঈপ্সিতা পরম অবহেলায় আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো অবজ্ঞার হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, “বাস্তবিকই প্রতিটি প্রকাশিত ঘটনাই সত্যি। এই তো গত ৬ জুন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এসেছিলেন। নাম তারাকুমার মল্লিক। থাকেন এই কলকাতারই ৪৪ বি, রাণী হর্ষমুখী রোডে। সমস্যাটি তারাকুমারবাবুর ভাগ্নী মঞ্জু চ্যাটার্জিকে নিয়ে। মঞ্জু বাতে এবং শয্যাক্ষতে শয্যাশায়ী। ডাক্তার ও হাসপাতাল ঘুরে এখন বাড়িতেই আছেন। এঁরা প্রত্যেকেই জবাব দিয়েছেন। শয্যাক্ষতের তীব্র

ঈপ্সিতা ও কন্যা দীপ্তা



যন্ত্রণা সহ্য করবার ক্ষমতাও হারাতে বসেছেন মঞ্জু। সঙ্গে উপসর্গ অনিদ্রা। কসমিক-রে চার্জ করা জলে ডাইনি শক্তি মিশিয়ে এক শিশি তারাকুমারকে দিয়ে মঞ্জুর শরীরে লাগাতে বলেছিলাম। এক সপ্তাহেই দারুণ ফল পাওয়া গেল। ১৩ তারিখ তারাকুমার জানালেন মঞ্জুর শরীরের শয্যাক্ষতের জ্বালা-যন্ত্রণা অনেক কম।"

না বুঝেও 'বুঝেছি' ভান করা আমার ধাতে সয় না। তাই অকপটে ঈপ্সিতাকে জানালাম, কসমিক-রে চার্জের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি।

ঈপ্সিতার যথেষ্ট যত্ন-সহকারে বিষয়টা বোঝালেন। জানালেন, তাঁদের সংস্থার তিন প্রধানের কাছে তিনটি ক্রিস্টাল-বাটি আছে। ক্রিস্টালের বাটিতে জল, লাল গোলাপের পাপড়ি, কিছু বিভিন্ন ধরনের বিশেষ রত্ন পাথর, রূপোর টুকরো এবং সেন্ট ঢেলে বাটিটি রোদে রাখেন। বাটির এমনই গুণ, সেটা সূর্য রশ্মি থেকে কসমিক-রে শোষণ করে জলে জমা করে। ঈপ্সিতার কথায়, এটা ম্যাগনেটাইজড় জল। এই ম্যাগনেটাইজড় জলে হাত ডুবিয়ে ঈপ্সিতা তাঁর মানসিক শক্তি জলে মিশিয়ে দেন।

আবার ধাক্কা খেলাম, ঈপ্সিতার বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানটুকুরও অভাব দেখে। কসমিক-রে বা মহাজাগতিক রশ্মি শক্তিশালী তড়িৎকণার বিকিরণ। এই অদৃশ্য তড়িৎকণার বিকিরণ সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত। সেই সন্ধ্যায় ঈপ্সিতা আমার হাতে যে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়েছিলেন, তাতেও ছিল কসমিক-রে। আসলে অজ্ঞানতার দরুন ঈপ্সিতা সূর্য-রশ্মি ও মহাজাগতিক-রশ্মিকে গুলিয়ে ফেলে নিজের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এক অদ্ভুত তথ্য তৈরি করেছিলেন। ঈপ্সিতার দৌড় আরও যতটুকু সম্ভব বোঝার তাগিদে কসমিক-রে নিয়ে তাঁর ভ্রান্ত ধারণার প্রসঙ্গ না তুলে ঈপ্সিতাকে বক্‌বক্‌ করে যাওয়ার সুযোগ দিলাম।

ঈপ্সিতা বলে চললেন, ডাইনি বিদ্যাকে বলা হয় রহস্যবিদ্যা বা অপরসায়ন। মজা হল, আমাদের এই অলৌকিক রহস্যবিদ্যা বা অপরসায়নের তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক কাণ্ড-কারখানাগুলো আমরা ঘটিয়ে চলেছি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই। এই যে ৪৯-টি মহাজাগতিক রশ্মি সূর্যের আলো থেকে আমরা গ্রহণ করছি, এই ৪৯-টি মহাজাগতিক রশ্মির কথা তথাকথিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনেক অনেক আগে ঋকবেদেই লেখা রয়েছে। এমনিভাবেই আমরা অপরসায়নের জ্ঞান অর্জন করেছি ইহুদিদের কোবলা, মিশরীয়দের অপদেবী আইসিসের আরাধনা সংক্রান্ত বই, 'দ্য কিং অফ্ সলোমন', তিব্বতের তন্ত্র ইত্যাদি পড়ে।

পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে পাঁচটি মৌল শক্তি—মাটি, জল, আগুন, হাওয়া ও আকাশ বা মহাশূন্য। এই মৌল শক্তিগুলো থেকেই আমরা বিশেষ ডাইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করি। তারপর তার সঙ্গে যখন আমাদের মানসিক শক্তিকে মিলিয়ে দিই, তখন যে ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আসে, সেটাকেই সাধারণ মানুষে বলেন অলৌকিক ক্ষমতা।

অজ্ঞানের কাছে বিজ্ঞানের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত লাগছিল। বললাম, "আপনাদের ডাইনিবিদ্যা কেমনভাবে শেখান হয় এই প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য বলে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষাক্রমের প্রথম চার বছর বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিপত্র পড়ে অপরসায়ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। পরবর্তী দু'বছর আপনারা

শেখেন মনকে শক্ত করে তৈরি করতে। এই সময় আপনারা বহু পুরুষকে ভালোবাসেন, কিন্তু হৃদয় অর্পণ করেন না, বহু পুরুষদের সঙ্গ দেন আবার যখন ইচ্ছে তাঁদের ছেঁড়া কাগজের মতই ছুঁড়ে ফেলে দেন। এসব কি বাস্তবিকই আপনাদের ডাইনি হওয়ার শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ, না কি এই ধরনের নীতিহীন, মূল্যবোধহীন, অফ্ বিট্ কিছু বলে প্রচারের মধ্যে আসতে চেয়েছিলেন?"

ঈপ্সিতার চোখ সরু হল, সম্ভবত ঘাড়টা শক্ত হল। "যা সত্য, সেটুকুই বলেছি। কার কাছে আমার বক্তব্য অফ্ বিট্ মনে হবে, কার কাছে হবে না, সেটা আমার বিবেচ্য নয়।"

"আপনার মেয়ে দীপ্তার বয়স এখন বছর দশেক। তাকে আপনি না কি ডাইনি করে তুলছেন। আপনার কিশোরী কন্যা যখন আপনারই চোখের সামনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে তখন কি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন?"

"না পারার কী আছে? ওটা তো মনকে শক্ত করে তৈরি করার একটা পরীক্ষা মাত্র," বললেন ঈপ্সিতা।

ঈপ্সিতার মানসিক স্বাভাবিকত্ব নিয়ে একটা সন্দেহ তীব্র হল।

বললাম, "সানন্দা'র শংকরলাল ভট্টাচার্যকে আপনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিলেন বলে পড়েছি। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা নিজের চোখে দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছে নিয়ে এসেছি। একান্ত অনুরোধ, বিফল করবেন না।"

ঈপ্সিতা আমার অনুরোধে আফ্রিকার ভুডু মন্ত্রের সাহায্যে একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে রাজি হলেন। জানালেন, এই ধরনের অনুরোধ রেখেছিলেন টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়ার শিখা বসু। তাঁকে ভুডু মন্ত্রে যা ঘটিয়ে দেখিয়েছিলেন তাই দেখে শিখা ও তাঁর চিত্রসাংবাদিক সঙ্গী মোনা চৌধুরী প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ঈপ্সিতা আরও বললেন, "দেখি আপনার এবং আপনার সঙ্গীর নার্ভ কত শক্ত।"

ঈপ্সিতা উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। এলেন একটি পুতুল নিয়ে। পুতুলের উচ্চতা দেড় ফুটের মত। পরনে প্যান্ট, শার্ট, টাই, কোট, হ্যাট। মুখটা কাঠের, কালো রঙের পালিশ করা। ঈপ্সিতার সঙ্গী এবার মেয়ে দীপ্তা। ওর হাতে একটা ট্রে। তাতে তিনটি বেগুন। আমার সঙ্গী তাপস ছবি তোলা শুরু করল। ঈপ্সিতা তাঁর হাতের পুতুলটা তুলে ধরে বললেন "এটাই ভুডু। জীবন্ত প্রেতাত্মা।"

ঘরের লাগোয়া ঘেরা বারান্দায় একটা টেবিল। দু'পাশে দুটো চেয়ার। টেবিলের পাশেই একটা দামী টুল। তার উপর ভুডু মূর্তিটিকে নামিয়ে রাখলেন ঈপ্সিতা। দীপ্তা তার হাতের ট্রেটা নামাল টেবিলে। ঈপ্সিতা তাঁর দু'হাতের দশ আঙুলকে কাজে লাগিয়ে চুলগুলোকে এলো করে ছড়িয়ে দিলেন। দু'হাতের তালুতে গোলা সিঁদুর ঘসলেন। কপালেও লাগালেন গোলা সিঁদুরের টিপ। দীপ্তা ঘরের ভিতরে গিয়ে নিয়ে এলো দুটো মাটির ভাঁড়।

ঈপ্সিতা ভুডু মূর্তিটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিড়-বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন। এক সময় আমাকে অনুরোধ করলেন ট্রে থেকে একটা বেগুন তুলে ওঁর হাতে দিতে। দিলাম। ঈপ্সিতা একটা চেয়ারে বসলেন। ঈপ্সিতার কথা মত মুখোমুখি চেয়ারটায় বসলাম আমি। টেবিলের উপর একটা মাটির

ভাঁড় বসিয়ে তার উপর বেগুনটাকে বসালেন। আর একটা মাটির ভাঁড় উপুড় করলেন বেগুনটার মাথায়। এ-বার ঈপ্সিতা আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, "আপনার কোনও শত্রু আছে?"

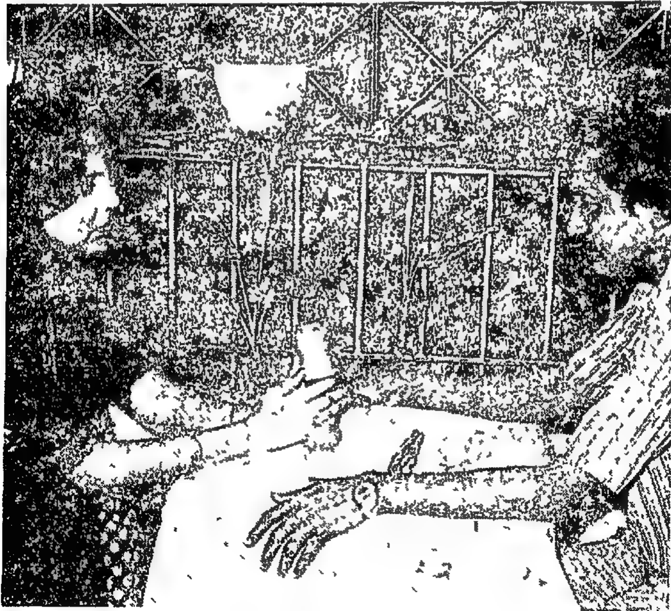
বললাম, "থাকতে পারেন, আবার নাও থাকতে পারেন।"

ঈপ্সিতা বললেন, "এখন আমরা ভুডু মন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছি। আপনার কোনও শত্রু থাকলে তার নাম বলুন। জীবন্ত প্রেতাত্মাকে স্মরণ করে বেলুনটা কেটে ফেলবো, অমনি দেখতে পাবেন বেগুনের কাটা অংশে রক্তের দাগ। রক্তের দাগ যত তীব্র হবে, শত্রুর শারীরিক ক্ষতিও ততই তীব্র হবে। ভুডু মন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেগুনের পরিবর্তে চিচিঙা বা পাতিলেবুও ব্যবহৃত হয়।"

বললাম, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আমার কোনও শত্রু নেই। আমি নির্বিরোধী ছাপোশা কলমচী মাত্র।"

"বেশ তো আমরা বরং একটা মানসিক শক্তির পরীক্ষা করে দেখি। আপনি আপনার সমস্ত মানসিক শক্তি দিয়ে ভাবতে থাকুন বেগুনটার ভেতর যেন সাদাই থাকে। আমি আমার মানসিক শক্তিকে অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বেগুনটার ভেতর মানুষের রক্ত নিয়ে আসতে চেষ্টা করব।" বললেন ঈপ্সিতা।

দু'জনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে বেগুনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এক সময়



ডাইনী সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা ও লেখক 'মন্ত্র-শক্তি' পরীক্ষায় মুখোমুখি

ঈপ্সিতা বললেন, "দেখি আপনার নাড়ির গতি।"

আমার নাড়ির গতি পরীক্ষা করে বললেন, "স্বাভাবিকই আছে দেখছি। আপনার নার্ভের তারিফ করতেই হবে। আপনি এক মনে ভাবতে থাকুন বেগুনের ভেতরটা সাদাই আছে। যখন আপনার মনে হবে বাস্তবিকই বেগুনটা সাদাই আছে, তখন আমাকে বলবেন। বেগুনটা কাটবো।"

আমি প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই বললাম, "এবার কাটুন।"

ঈপ্সিতা তাঁর ডাইনি ছুরি 'ড্যাগার অফ জাস্টিস' তুলে বেগুনটা কেটে ফেললেন। বেগুনের ভিতরের সাদা অংশের খানিকটা জায়গা টক্‌টকে লাল রক্তে ভেজা।

ঈপ্সিতা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "দেখছেন রক্ত। এটা আপনার অজ্ঞাত শত্রুর রক্ত।"

বেগুনের টুকরো দুটো হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত পরীক্ষা করে বিনীতভাবে জানতে চাইলাম, "আপনি কী ভাবে ঘটালেন?"

"ভুডু মন্ত্রে। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের শত্রুকেই বধ করতে পারি আমরা।"

বললাম, "ঈপ্সিতা, ট্রে থেকে যে কোনও একটা বেগুন আমার হাতে তুলে দিন। তারপর আপনি আপনার সমস্ত ইচ্ছে শক্তি দিয়ে চেষ্টা করুন বেগুনটার ভেতরটা সাদা রাখতে। আমি কোনও মন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই বেগুনটা কেটে রক্ত বের করে দেবো, যেমনটি আপনি করলেন।"

আমার কথা শুনে ঈপ্সিতার মুখের চেহারা গেল পাল্টে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে শক্ত মাটিতে শেষ বারের মত দাঁড় করাতে চাইলেন। বললেন, "ওইসব ছেলে-মানুষী চিন্তা মাথায় রাখবেন না। ভুডু মন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাবার ফল প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভয়াবহ।"

বললাম, "কোনও ভয় নেই আপনার। আমার কোনও ক্ষতির জন্য আপনাকে সামান্যতম দোষারোপ করব না। আপনি আমার হাতে একটা বেগুন তুলে দিন।"

উত্তেজিত, শঙ্কিত ঈপ্সিতা দীপ্তার হাতে ট্রেটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা ভেতরে নিয়ে যাও।"

দীপ্তাকেও যথেষ্ট নার্ভাস মনে হচ্ছিল। ও দ্রুত আদেশ পালন করলো। আমি নিশ্চিত ছিলাম, প্রতিটি বেগুনেই লাল তরল ঢোকানো আছে। অথবা ছুরিতে মাখানো আছে রসায়ন। ঈপ্সিতাকে আরও একটা চমক দিতে বললাম, "আমারও কিছু ক্ষমতা আছে।"

ঈপ্সিতা সন্দেহজনক চোখে তাকালেন। লৌকিক কৌশলে তথাকথিত কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখানোতে ঈপ্সিতা ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন, উচ্ছ্বসিত হলেন। বললেন, "আপনি জানেন না, ঠিক বুঝতে পারছেন না, আপনার কী প্রচণ্ড রকম অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতাকে ঠিক মত ব্যবহার করতে পারলে দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড উইচ একজিকিউটিভ কমিটির সভ্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনিই হলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি এই আমন্ত্রণ পেলেন। আপনাকে এই দুর্লভ সম্মান জানাবার কারণ, আপনার কাছ থেকে আমাদেরও অনেক কিছু শেখার আছে।"

ঈপ্সিতার উচ্ছ্বাস আমার মধ্যে সংক্রামিত না হওয়ায়, তাঁর মত রমণীয় রমণীর আমন্ত্রণ গ্রহণ না করায় তিনি যেমন অবাক হয়েছিলেন তেমনই নিরাশ। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন শনিবার দুপুরের আগে আসার। আরও কিছু না কি বলার আছে। শনিবার গিয়েছিলাম তাপসকে নিয়েই। নিষ্ফল কিছু কথাবার্তার মধ্যে আমার সফলতা ছিল একটিই। ঈপ্সিতা পরম ভালোবেসে একটি সুন্দর আধারে দিলেন ম্যাগনেটাইজড জল।

৮ জুলাই বিকেলে গিয়েছিলাম মঞ্জু চ্যাটার্জির বাড়িতে। মধ্য-বয়সী মঞ্জুকে দেখলাম শয্যাক্ষতে শয্যাশায়ী। শয্যাক্ষত্রের তীব্র গন্ধে বাতাস ভারি। কথা বললাম মঞ্জুর মা শান্তি সেন এবং সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত মীরা দাসের সঙ্গে। তিনজনই জানালেন, বাস্তবিকই দীর্ঘ চিকিৎসার পর ঈপ্সিতার কসমিক-রে চার্জ করা অলৌকিক জল প্রতিদিন শরীরে বুলিয়ে ভালই ফল পাচ্ছিলেন। শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুটা কম ছিল। শেষ শনিবার মন্ত্রপূতঃ জল না নিয়েই ফিরেছিলেন। তারপর থেকে যন্ত্রণাটা আবার তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঘুম আসছে না। মঞ্জু কথা বলতে বলতে কাঁদছিলেন। আমি ঈপ্সিতার কাছ থেকে আসছি শুনে মঞ্জু অনুরোধ করলেন, "আপনি একটা কিছু করুন। এই যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

মঞ্জুর উপর একটা পরীক্ষা চালাতে চাইলাম। মঞ্জুকে বললাম, "আমি কিছু কথা বলবো, কথাগুলো আপনি চোখ বুজে মন দিয়ে শুনুন। আপনার যন্ত্রণা কমে যাবে, ভালো লাগবে, ঘুম হবে।" শান্তি দেবী ও মীরার উপস্থিতিতেই 'হিপনটিক সাজেশন' দিলাম। মিনিট দশ-পনেরো সাজেশন দেওয়ার পর মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন লাগছে?"

মঞ্জু বললেন, "ভাল লাগছে। ব্যথা-যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

বললাম, "ঘুমোন। আমি আবার পরশু সকালে এগারোটা নাগাদ এসে খবর নেব, কেমন ছিলেন।"

রবিবার সাড়ে বারোটা নাগাদ গিয়েছিলাম। গিয়েই একটা আশ্চর্য খবর শুনলাম। ঈপ্সিতা এসেছিলেন। সাড়ে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মঞ্জুর ঘরে ছিলেন। ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা হঠাৎ প্রথা ভেঙে বৈভব ছেড়ে গরীবের ভাঙা ঘরে এসেছিলেন কি শুধুই আর্তের সেবায়? তারাকুমারের কথাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। শনিবার তারাকুমারের কাছে আমার আগমন বার্তা ও মঞ্জুর অবস্থার পরিবর্তনের কথা ঈপ্সিতা শুনেছেন। আরও জেনেছিলেন আমি রবিবার এগারোটা নাগাদ আবার আসবো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

মঞ্জু, শান্তি দেবী, মীরা এবং তারাকুমারবাবুর সঙ্গে মঞ্জুর বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা হল। চারজনই জানালেন আমার কথাগুলো শোনার পর মঞ্জু দেবীর যন্ত্রণা অনেক কম অনুভূত হচ্ছে। ঘুমও ভালো হচ্ছে। এ-বাড়ির প্রত্যেকের কথাগুলো ধরে রাখলাম টেপ রেকর্ডারে। বিদায় নেওয়ার সময় ওঁরা আবার আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

মঞ্জুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, তা জানতে পেরে খুশি হলাম। ঈপ্সিতা মঞ্জুর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়েই মঞ্জুর যন্ত্রণা সাময়িকভাবে কিছুটা



ঈপ্সিতা, দীপ্তা ও লেখক

কমাতে পারেন। এই ধরনের যন্ত্রণা কমার কারণ কখনই ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতা নয়, এর কারণ রয়ে গেছে লৌকিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে। বিশ্বাস-নির্ভর এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। এ বিষয়ে আগে বিস্তৃতই আলোচনা করেছি। যাঁরা এইসব অলৌকিক উপায়ে রোগমুক্ত হয়েছেন খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন তাঁরা প্রত্যেকেই সেইসব অসুখেই ভুগছিলেন, যেসব অসুখ বিশ্বাসে সারে। ঈপ্সিতা কাদের রোগমুক্ত করবেন তা ছিল সম্পূর্ণই ঈপ্সিতার ইচ্ছাধীন। নিজের ইচ্ছেমত রোগী নির্বাচনের দায়িত্ব রাখার কারণ তিনি সেইসব রোগীদেরই বাছতেন যাদের প্ল্যাসিবো চিকিৎসায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঈপ্সিতার কাছ থেকে আমি যে অলৌকিক জল সংগ্রহ করেছিলাম, তা পরীক্ষার জন্য তুলে দিয়েছিলাম রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরীর হাতে। ডঃ রায়চৌধুরী কিন্তু ওই অপার্থিব জলে পার্থিব স্টেরয়েড-এর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। এরপর এই সত্যটুকু আবিষ্কার করে আরও এক দফা বিস্মিত হলাম। ঈপ্সিতার নিজের ওপরই

নিজেব ভবসা নেই, তাই তাঁকে নির্ভব কবতে হযেছে স্টেবযেডেব উপব।

১২ আগস্ট 'আজকাল' পত্রিকায ঈপ্সিতাকে নিযে আমাব একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হযেছিল। তাতে এই ঘটনাবই সংক্ষিপ্তসাব প্রকাশিত হযেছিল। শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলাম, "ঈপ্সিতা কি তাঁব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ বাখতে আমাব হাজিব কবা পাঁচজন বোগীকে সুস্থ কবে তুলতে বাজি আছেন ? তিনি জিতলে আমি দেব পঞ্চাশ হাজাব টাকাব প্রণামী, সেই সঙ্গে থাকব চিবকাল তাঁব গোলাম হযে।"

১৩ আগস্টেব আব একটি ঘটনাব উল্লেখ কবাব লোভ সংববণ কবতে পাবলাম না। সে-বাতেব লালগোলা প্যাসেঞ্জাবে বহবমপুব যেতে হযেছিল পুলিশ দেহবক্ষী নিযে। কাবণ—'আজকাল' পত্রিকাব সম্পাদক শ্রী অলোক দাশগুপ্তেব কাছে একটি খবব এসেছিল—সে বাতে আমাব কম্পার্টমেন্টে ডাকাত পডবে। ডাকাতিব আসল উদ্দেশ্য আমাকে হত্যা কবা। অর্থাৎ, হত্যাব উদ্দেশ্য গোপন বাখতে ডাকাতিব অভিনয হবে। খবব ছিল ডেপুটি ইন্সপেক্টব জেনাবেল অফ পুলিশ প্রেসিডেন্সি বেঞ্জ মিস্টাব সুফিব কাছেও। তাবই পবিপ্রেক্ষিতে দেহবক্ষীব ব্যবস্থা।

১১ ডিসেম্বব ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতাকে তাঁব অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ কবাব জন্য সবাসবি চ্যালেঞ্জ জানিযেছিলাম ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব পক্ষে। ঈপ্সিতা চিঠিটা স্বযং গ্রহণ কবলেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব মত সততা, সাহসিকতা বা ধৃষ্টতা দেখাননি। যদি দেখাতেন তবে অবশ্যই তাঁব মাথা যুক্তিবাদী আন্দোলনেব কাছে, বিজ্ঞানেব কাছে নতজানু হতই। তিনি অবশ্যই সম্মেলনে উপস্থিত হযে চূডান্তভাবে বিধ্বস্ত হওযাব চেযে উপস্থিত না হওযাকেই শ্রেয ও কম-অপমানজনক মনে কবেছিলেন।

ডাইনি সম্রাজ্ঞীব কাছে সমিতিব পক্ষ থেকে সমিতিব প্যাডে যে চিঠি পাঠিযেছিলাম আপনাদেব কৌতূহল মেটাতে তা এখানে তুলে দিলাম

ঈপ্সিতা বায চক্রবর্তী
৬৪, লেক বোড,
ফ্ল্যাট ২ এম, ডব্লিউ, 'বলাকা বিল্ডিং', ৫ ১২ ৮৮
কলকাতা-৭০০ ০২৯

মহাশযা,

সাম্প্রতিককালে আপনিই সম্ভবত ভাবতেব সবচেযে প্রচাব পাওযা মানুষ। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী পত্র-পত্রিকায আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষযে পডেছি। কযেক মাস আগেব এক সন্ধ্যায আপনাবই ফ্ল্যাটে বসে আপনি আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষযে অনেক কিছুই আমাকে বলেছিলেন। পডেছি এবং শুনেছি, আপনি যে কোনও বোগীকে আপনাব অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতাব দ্বাবা বোগ মুক্ত কবতে পাবেন। যে কোনও অপবিচিত মানুষেব অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে দিতে পাবেন।

আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষযে জানতে আগ্রহী এক সত্যানুসন্ধানী। দীর্ঘ দিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিযেও আজ পর্যন্ত একজনও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা একটিও

অলৌকিক ঘটনার সন্ধান পাইনি। আমার এই ধরনের সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতই আপনিও স্বাগত জানাবেন আশা রাখি। সেই সঙ্গে এও আশা রাখি, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবেন।

আগামী এক মাসের মধ্যে আপনার সঙ্গে ঠিক করে নেওয়া কোনও একটি দিনে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে আপনার সামনে হাজির করব পাঁচজন মানুষ ও পাঁচজন রোগীকে। পাঁচজন মানুষের অতীত সম্পর্কে সে-দিনই আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পাঁচজন রোগীকে আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় রোগ মুক্ত করার জন্য দেব ছয়মাস সময়। পরীক্ষা দুটিতে আপনি কৃতকার্য হলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নেব আমি এবং 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রইলাম, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ পেলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা।

আমার সঙ্গে এই অনুসন্ধান বিষয়ে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেব, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যা।

আগামী ১১ ডিসেম্বর '৮৮ রবিবার বিকেল চারটের সময় আমাদের ময়দান তাঁবুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান করেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সে-দিন আপনাকে ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ—
প্রবীর ঘোষ।

ঈপ্সিতার এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে পরাজয়েরই নামান্তর ধরে নিয়ে শহর কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রতিটি নামী-দামী, বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে বিশাল আকারে খবরটি পরিবেশন করেন। একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত হয় দীর্ঘ সম্পাদকীয়। বহু পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির দামাল ছেলেদের ঘটানো অনেক অলৌকিক ঘটনার ছবি।

১১ ডিসেম্বর '৮৮-র ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনী সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা ছাড়াও আহ্বান জানান হয়েছিল আরো দু'জনকে। তাঁরা হলেন, 'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর সাঁই শিষ্য উপাচার্য ও হস্তরেখাবিদ নরেন্দ্রনাথ মাহাতোকে।

উপাচার্য ও শ্রীমাহাতো সরাসরি আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে সেই চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করে চিঠি দিই ও তাঁদের ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাই।

উপাচার্যের চ্যালেঞ্জটি ছিল খুবই কৌতূহল জাগানো। তিনি জানিয়েছিলেন, স্রেফ সাঁইবাবার বিভূতি খাইয়ে সাঁইবাবার অপার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেবেন। বিভূতি খাওয়ার তিন দিনের মধ্যে আমার পেটে তৈরি হবে ছয় থেকে এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা। চতুর্থ দিন অপারেশন করলেই ওগুলো পেট থেকে হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

তারপর যা যা ঘটেছিল, সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। কিন্তু সে কাহিনী এখানে আনলে 'ধান ভানতে শিবের গান' গাওয়া হয়ে যাবে। এমনি আরো অনেক

চ্যালেঞ্জারদের চ্যালেঞ্জে বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, হয়েই চলেছি। কিন্তু সে-সব অভিজ্ঞতার কাহিনী 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইতে আনা প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। যে-গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথম খণ্ডে হয়তো আসতে পারত, সে সব চ্যালেঞ্জারদের অনেকেরই মুখোমুখি হয়েছি প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের পিপাসা মেটাতে তাঁদেরই জন্য 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' শিরোনামে একটা বই লেখায় মন দিয়েছি।



পাঁচ

ভূতুড়ে তান্ত্রিক

গৌতম ভাবতী ও তাঁব ভূতুড়ে ফটোসম্মোহন

'৮৭-ব ১ আগস্ট-এব সন্ধ্যা। 'আলোকপাত' পত্রিকাব প্রতিনিধি অমিতবিক্রম বাণা এলেন। উদ্দেশ্য আমাব একটি সাক্ষাৎকাব নেওযা। বিষয—সম্মোহন। কথা প্রসঙ্গে অমিত জানালেন, কযেকজন মনোবোগ চিকিৎসকদেবও সাক্ষাৎকাব নেবেন, যাঁবা বোগীদেব বোগমুক্ত কবাব ক্ষেত্রে সম্মোহনেব সাহায্য নেন। এবং তাঁদেব কাছে এও জানতে চাইবেন, কোন্ কোন্ বোগ মুক্তিব ক্ষেত্রে সম্মোহন কার্যকব ভূমিকা নেয। এবই পাশাপাশি কযেকজন তান্ত্রিকেব সাক্ষাৎকাব নেবেন, যাঁরা দাবি কবেন—তন্ত্র-মন্ত্রেব সাহায্যে ভৌতিক উপাযে শুধুমাত্র একটি ফটোগ্রাফ পেলেই সেই ফটোব মালিককে সম্মোহন কবতে সক্ষম। এই ধবনেব ফটো-সম্মোহনেব সাহায্যে তাঁবা নাকি বিবহী প্রেমিক-প্রেমিকাদেব মিলন ও বিবাহ ঘটিযে দিয়ে থাকেন, শত্রুকে পাযেব সুকতলা বানিযে থাকেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমিত জানালেন কযেকজন মনোবোগ চিকিৎসক ও তান্ত্রিকদেব নাম, যাঁদেব সাক্ষাৎকাব নেবাব ইচ্ছে আছে। এবই ভিতব একটি নাম গৌতম ভাবতী। উত্তব কলকাতাব উপকণ্ঠে লেকটাউন শিবকালী মন্দিবেব গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতী বিজ্ঞাপনেব মাহাত্ম্যে অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী হিসেবে খ্যাত। অনেক দিনেব ইচ্ছে, গৌতম ভাবতীকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখাব। অমিতকে জানালাম, "গৌতম ভাবতীব মুখোমুখি হওযাব একটা আন্তবিক ইচ্ছে আমাব আছে। কিন্তু সমযাভাবে ইচ্ছেটা বাস্তব রূপ নিতে পাবেনি।"

আমাব কথায অমিত প্রায লাফিযে উঠলেন, "আপনি যদি আমাব সাক্ষাৎকাব নেবাব সময আমাব সঙ্গী হন তো দারুণ হয। ব্যাপাবটা তাহলে দারুণ জমবে।"

বললাম, "আমাব পবিচয পেলে ব্যাপাবটা আদৌ জমবে বলে মনে হয না। ববং গৌতম ভাবতী হযতো মুখই খুলতে চাইবেন না। আমাব একটা পবিকল্পনা আছে। আমি যদি পবিচয গোপন কবে 'আলোকপাত'-এব প্রতিনিধি হিসেবে আপনাব সঙ্গী হই, আপত্তি আছে?"

আমার যুক্তি অমিতেবও মনে ধবলো। বললেন, "না না, কোনও আপত্তি নেই।

সন্ধানে।

গৌতম ভাবতী একজনকে ডেকে আমাদেব জিজ্ঞেস কবলেন, "কী খাবেন বলুন ?"

অমিতই বললেন, "মিষ্টি খেতে পাবি।"

তিনজনেব জন্য মিষ্টি আব ঠাণ্ডা পানীয আনাব নির্দেশ দিযে গৌতম আমাদেব দিকে নজব দিলেন। ববং সত্যি বলতে কি, আমাব দিকেই নজব দিলেন। একটানা মিনিট দশেক পুলিশী জেবাব প্রতিটি হার্ডল পাব হতে হলো। গৌতম নিশ্চিন্ত হলেন, আমি প্রবীব ঘোষ নই। ইতিমধ্যে তিনটি বেকাবি বোঝাই মিষ্টি এলো, এলো ঠাণ্ডা পানীয। খেতে খেতে শুনছিলাম গৌতমেব অতীন্দ্রিয দৃষ্টি ও অলৌকিক-ক্ষমতাব অনেক অনেক কাহিনী। জানালেন, যে কোনও মানুষকে দেখলেই গৌতম তাঁব অতীন্দ্রিয দৃষ্টিব সাহায্যে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পান। অতীন্দ্রিয দৃষ্টিব কাছে মানুষেব গোপনীয কিছুই থাকতে পাবে না।

আমি প্রবীব ঘোষ নই, এই বিষযে গৌতমেব নিশ্চিন্ত হওযাব সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিশ্চিন্ত হলাম, গৌতমেব পুঁজি কতখানি জেনে।

আমাব সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে দিযেও কথা বলাচ্ছিলেন। আবেগতাডিত মানুষেব মত আমিও কথা বলে যাচ্ছিলাম। বলছিলাম আমাব অনেক দুঃখেব কথা। সাংবাদিকতাব লাইনে দীর্ঘবছব থেকেও প্রতিষ্ঠাব মুখ দেখতে না পাওযাব দুঃখেব কথা।

গৌতম ভবসা দিলেন। বললেন, "আপনাব ভক্তি আছে, অনেক গুণ আছে। জীবনে সফলতা পেতে প্রযোজন সেইসব লুকোন গুণগুলোকে বেব কবে নিযে এসে ঠিক মত কাজে লাগান। একজন অভিনেতাব সমস্ত প্রতিভাকে দর্শকদেব সামনে সফলভাবে হাজিব কবতে পাবেন শুধুমাত্র একজন সফল ডাইবেক্টব। মাযেব ইচ্ছেয আপনি যখন আমাব কাছে এসেই পডেছেন, তখন আব চিন্তা কী ? ডিবেক্টবেব ভূমিকা না হয আমিই নেব। ধবুন ধবুন ধবুন"

গৌতম হঠাৎ তাঁব ডান হাতটা শূন্যে তুলে কাঁপতে কাঁপতে নামিযে আনলেন। আমাব কপালে তাঁব কাঁপা কাঁপা হাতটা ঠেকিযে আমাব ডান হাতে দিলেন একটি শিকড। অমিতেব হাতেও দিলেন একটি শিকড। বললেন, "এই শিকডটা সব সময সঙ্গে বেখে দেবেন। মঙ্গল হবে। মানসিক শক্তি বাডবে।"

জিজ্ঞেস কবলাম, "শিকড দুটো কি আপনাব হাতেই ছিল ? নাকি ও-দুটো সৃষ্টি কবলেন ?" আমাব স্ববে স্পষ্ট বিহ্বলতা।

গৌতম হাসলেন। বললেন, "ওগুলো শূন্য থেকেই সৃষ্টি কবেছি। এই তো কযেকদিন আগে আপনাদেব বিখ্যাত গাযক অমৃক সিং অবোবাকে ঠিক এমনিভাবেই এনে দিযেছিলাম একটা বডসড বঙিন পাথব।"

বিস্মিত আমি বললাম, "এতদিন জানতাম নেই থেকে আছে হয না। আজ নিজেব চোখে দেখে বিশ্বাস কবতে বাধ্য হলাম। আসলে তবুও ধন্দ থেকেই যায , যা দেখেছি সেটা ম্যাজিক নয তো ? অথবা, সম্মোহনেব ফল ? এতদিনেব বিজ্ঞান পডাব সংস্কাব থেকে চট্ কবে বেডিযে আসাও তো সহজ কথা নয। ভবসা দিলে একটা অনুবোধ কবি।"

"বলুন বলুন।" আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গৌতম আমার দিকে তাকালেন—যে চোখে শিকারী শিকারকে খেলিয়ে তোলার মুহূর্তে তাকিয়ে থাকে।

শিশুর সরলতা নিয়েই আবদার করলাম, "আমি শিকড়টা মুঠো বন্দী করছি। আপনি এটাকে একবারের জন্য অদৃশ্য করে দিয়ে দেখান, আছে থেকে আবার নেই-তেও কোনও কিছুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।"

আমার কথায় গৌতম মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে পড়লেন। তারপরই বহু বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানসেবী রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিতসমাজের প্রণম্য গৌতম প্রণাম পাওয়ার যোগ্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে গর্জন করে উঠলেন,"আমি শুধু ঈশ্বরের দাস, আর কারও দাস নই। আপনার কথা শুনব কেন মশাই?"

বুঝলাম, ডোজটা একটু কড়া দিয়ে ফেলেছি। কাঁচুমাচু হয়ে বোকা-বোকা চোখে এমন করে গৌতমের দিকে তাকালাম, যেন অজ্ঞতার দরুন অন্যায় কিছু করে ফেলে বড় বেশি কুণ্ঠিত।

অবস্থা সামাল দিতে অমিত প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। জানতে চাইলেন, "আপনার দৃষ্টিতে অর্থাৎ একজন সিদ্ধ তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে সম্মোহন কী?"

উত্তরে গৌতম শুরু করলেন, "সম্মোহনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'হিপ্‌নোটিজম্'। 'হিপ্‌নোটিজম্' কথাটি আবার এসেছে 'হিপ্‌নোসিস্' কথা থেকে। 'হিপনোস্' কথার অর্থ ঘুম। স্বাভাবিক ঘুমের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও সম্মোহন-ঘুম আর স্বাভাবিক-ঘুম এক নয়, কারণ দু'য়ের মধ্যে অ-সাদৃশ্যও কম নয়। তবে এটা বলা যায়, সম্মোহন ঘুমেরই রকমফের, এবং জেগে থাকা ও ঘুমের একটা অন্তবর্তী অবস্থা।

কোলের ছোট্ট বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর কৌশল ও সম্মোহন-ঘুম পাড়ানোর কৌশল অনেকটা একই ধরনের। শিশুদের ঘুম পাড়ানো হয় একটানা একঘেয়ে সুরে গান গেয়ে। সম্মোহনের জন্যেও সম্মোহনকারী প্রায় একই ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। সম্মোহনকারী যাকে সম্মোহন করতে চায়।"

গৌতমের মুখ নিঃসৃত বাণী শুনে বুঝলাম, গত দু'দিনে তিনি "অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির প্রথম খণ্ডের 'সম্মোহন' অধ্যায়টা ভালমতই মুখস্ত করে ফেলেছেন। অমিত একটা স্লিপ লিখে আমার হাতে এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা—"ও যে আপনারই বই থেকে মুখস্ত বলে যাচ্ছে।"

গৌতম তাঁর সম্মোহন শক্তির যে দুটি উদাহরণ আমাদের সামনে উত্থাপন করলেন, সে দু'টিরই উল্লেখও 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইতেই আছে। আমাদের মনোযোগিতায় গৌতম আরও উৎসাহিত হলেন। বললেন, কারোকে চোখ বন্ধ করতে বলে তার শরীরে প্রচণ্ড গরম কিছু ঠেকান হচ্ছে, এমন ধারণা সঞ্চার করে স্রেফ একটা আঙুল ছুঁইয়ে সম্মোহিত মানুষটির শরীরে ফোস্কা ফেলে দিতে পারেন। পারেন সম্মোহনের সাহায্যে বহু রোগীকে রোগ মুক্ত করতে।

বললাম, "সত্যি বলতে কি, আপনার মুখ থেকে শোনা সত্ত্বেও কথাগুলো বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। আপনি যদি আমার হাতে একটু ফোসকা ফেলে দেখান।"

গৌতম চতুর মানুষ। যা পারেন না, তা গল্পেই সীমাবদ্ধ রাখেন, ঘটাবার চেষ্টা করেন না। এ-ক্ষেত্রেও তার অন্যথা করলেন না। বললেন, "মাঝে মাঝে আসুন।

সময়ে অনেক কিছুই দেখতে পাবেন।”

অমিত ফটো সম্মোহনের বিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। গৌতম জানালেন, “তন্ত্র হল বিজ্ঞান। তথাকথিত সাধারণ বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, তন্ত্রের সেখানে শুরু। এতক্ষণ আপনাদের যে-সব সম্মোহনের কথা বলছিলাম, সেগুলো ঘটাতে তন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, সামান্য চেষ্টাতেই যে কোনও মনোবিজ্ঞানীই ওইসব ঘটনা ঘটাতে পারেন। কিন্তু ফটো সম্মোহন—সেটা হল তন্ত্রের এক বিশেষ জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার কোনও একজনের ছবি পেলে সেই ছবির সাহায্যেই ছবির মালিককে সম্মোহিত করা যায়। অনেক ব্যর্থ প্রেমিক বা প্রেমিকা তাঁদের ব্যর্থ-প্রেমকে সফল করে তুলতে আমার কাছে আসে। তাদের কষ্ট দেখে ফেরাতে পারি না। ফটো সম্মোহন করে মিলন ঘটিয়ে দিয়ে ব্যর্থ জীবনে বাঁচার আনন্দ এনে দিই। আর এতেই আমার আনন্দ।”

“ব্যাপারটা কেমন ভাবে ঘটান?” সত্যিকারের কুমার রায়ই এবার প্রশ্ন করলেন।

“ধরুন একটি ছেলে এলো। একটি মেয়ের সঙ্গে গভীর প্রেম ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাড়ির চাপে বা অন্য কোনও কারণে মেয়েটি ছেলেটিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলছে। বা বলা যায় ছেলেটিকে নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চাইছে। ছেলেটিকে বললাম তার প্রেমিকার একটি ছবি এনে দিতে। ছেলেটি একটি ছবি এনে দিল। এ-বার শুরু হল যাগযজ্ঞের সাহায্যে তন্ত্রমতে মেয়েটিকে সম্মোহন করা। মেয়েটি যত দূরেই থাক, তন্ত্রের এই সম্মোহন শক্তিকে কিছুতেই সে এড়াতে পারবে না। তার মস্তিষ্ক কোষে ধারণা সঞ্চার করে দিই—সে ছেলেটিকে ভালবাসে। ছেলেটিকে ভালবাসার মধ্যেই সে খুঁজে পাবে জীবনের সার্থকতা। এমনি তিনটে সিটিং—এরপর দেখা যাবে, মেয়েটি ছেলেটির বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছে না। ছেলেটির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুল হয়ে রয়েছে। ফলে দু’জনের মিলন ঘটতেও দেরি হয় না।”

আমি প্রশ্ন তুললাম, “প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি ফটো সম্মোহনে সফলতা পাওয়া সম্ভব?”

গৌতমও পাল্টা প্রশ্ন করলেন, “কেন সম্ভব নয়? তন্ত্র যদি বিজ্ঞানই হয় তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা আসতে বাধ্য। যেমন একের সঙ্গে এক যোগ করলে সব সময়ই দুই হতে বাধ্য। যাদের দায়িত্ব নিয়েছি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি।”

গৌতম ভারতীর আদেশে ম্যানেজারবাবু কিছু খাতাপত্তর বের করে দিলেন। গৌতম সে সব ঘেঁটে চারটি নাম বের করে দিলেন, মালা বসাক, সৌমিত্র সেন এবং স্মৃতিরেখা চ্যাটার্জি, আলোক ব্যানার্জি। বললেন, “এদের মিলন ঘটিয়েছি ফটোসম্মোহন করে।”

বললাম, “সব কিছু জানা-বোঝার পরও সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে। আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, তার ভালবাসা চাই, মেয়েটির ছবি আপনাকে হাজির করতেই আপনি তাকে আমার করে দিলেন—ভাবতে পারা যাচ্ছে না।”

“ভাবতে না পারার মত অনেক কিছুই এই পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। এই যে আমি ‘মোহিনী ঔষধি’ দিয়ে থাকি, এর এমনই বশীকরণ শক্তি যার প্রভাবে যে কোন শত্রুকে,

যে কোন স্ত্রী বা পুরুষকে বশে আনা সম্ভব।" জানালেন গৌতম।

বললাম, "তাহলে ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদের 'মোহিনী ঔষধি' না দিয়ে এত যাগযজ্ঞ করে ফটোসম্মোহন করার দরকার কী?"

গৌতম জানালেন, "মোহিনী ঔষধি'-তে বশ করা আর প্রেম পাওয়া কি এক ব্যাপার? ফটোসম্মোহনে সম্মোহিত করে একজনের মনে আর একজনের প্রতি প্রেম জাগিয়ে তুলি।"

অমিত জিজ্ঞেস করলেন, "ফটো সম্মোহনের জন্য কত নেন?"

গৌতম জানালেন, "কোনও টাকা-পয়সাই নিই না। যজ্ঞের খরচটুকুই শুধু নিই।"

"সেটা কত?" অমিতই জিজ্ঞেস করলেন।

"তিন হাজার এক টাকা।"

"আমি বললাম, "আপনার সমস্ত কথা শোনার পর কয়েকটা বিষয় আমার মাথায় জট পাকিয়ে গেছে। আপনি ফটো সম্মোহনের বিষয়ে বলার আগে সম্মোহন প্রসঙ্গে যে-সব কথা বললেন, এমনকি আপনি সম্মোহন করে দু-জনের ক্ষেত্রে যে দুটো ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে জানালেন সে সবই আমি সম্প্রতি পড়েছি। অমিতই মাস-খানেক আগে আমাকে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইয়ের অংশ-বিশেষের ফটো কপি পড়তে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গ ছিল সম্মোহন। তাতে এ-সবেরই উল্লেখ ছিল। সম্মোহনের সাহায্যে অনেক রোগীকে আরোগ্য করা যায় বলে আপনি যে সব কথা বললেন, সে-সব কথার সঙ্গে সম্প্রতি আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার হুবহু মিল লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল, 'সম্মোহন ও রোগমুক্তি'। সম্মোহন প্রসঙ্গে পড়ে যতটুকু জেনেছি, তাতে সম্মোহন হলো মস্তিষ্কস্নায়ু কোষে ধারণা সঞ্চারের ব্যাপার। অর্থাৎ, সম্মোহন করার প্রাথমিক শর্ত, আপনি যার মধ্যে কোনও ধারণা সঞ্চার করতে চাইবেন তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ অবশ্যই থাকতে হবে। আপনি ফটোর মধ্যে ধারণা সঞ্চারিত করবেন কী করে? ফটো তো জড় বস্তু। ফটোর মস্তিষ্ক, স্নায়ু বা মন আছে, এ ধরনের কল্পনা তো স্রেফ পাগলামি বা চূড়ান্ত অজ্ঞতা। আপনাকে যদি চ্যালেঞ্জ জানাই, ফটো সম্মোহনের বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারবেন?"

মহা অলৌকিক শক্তিধর, অবতার গৌতম ভারতী আমার কথায় ফ্যাকাশে মেরে গেলেন। তাঁর বড় বড় চোখ দুটো সরু সরু হয়ে গেল। ফোলান বুক থেকে হাওয়া বেরিয়ে গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। নিজের অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিলেন। অনুরোধ করলেন তাঁর বিষয়ে বিরূপ কিছু না লিখতে।

'৮৭-র নভেম্বর সংখ্যা আলোকপাতে 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয়?' শিরোনামে লেখাটি প্রকাশিত হলো। সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখাটির লেখক তাপস মহাপাত্র ও অমিতবিক্রম রাণা। প্রতিবেদনটিতে লেখক জানালেন, "ছদ্মবেশে যাওয়া সুদক্ষ সম্মোহনবিদ প্রবীর ঘোষকে তিনি (গৌতম ভারতী) চিনতে পারলেন না কিছুতেই। শুধু তাই নয় প্রবীরবাবুর লেখা, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বই-এর হুবহু উদাহরণ দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি বলে বাহবা চাইতেও ছাড়েননি। প্রবীরবাবুর একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তরে শেষ পর্যন্ত হার মানলেন শ্রীযুক্ত ভারতী। কিন্তু তাঁর এইসব তন্ত্রমন্ত্রের বুজরুকি কথাবার্তা প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধও করলেন। কেননা এতে তাঁর

ব্যবসার ক্ষতি হবে।" এই প্রবন্ধে প্রতিবেদক আরও জানান, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ ফটো-সম্মোহন ক্ষমতার দাবিদারদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন কেউ তাঁদের দাবির যথার্থতা প্রমাণ করতে পারলে তিনি দেবেন ৫০,০০০ টাকা। "আসলে পুরো ব্যাপারটাই ফাঁকি। মানসিক ভারসাম্যহীন বিরহী প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক ঘৃণ্য উপায়ে ঠকান।"

লেখাটির সঙ্গে গৌতম ভারতীর ভণ্ডামীর চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে ছদ্মপরিচয়ে চিনতে না পারা আমাকে আশীর্বাদরত গৌতম ভারতীর একটি ছবি প্রকাশিত হয়।

'আলোকপাত' জানুয়ারী '৮৮ সংখ্যায় 'পাঠকের অধিকার' বিভাগে একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক অমৃক সিং অরোরা এবং গৌতম ভারতীর অন্যান্য ভক্তবৃন্দ জানান,

'নভেম্বর '৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয়?' লেখাটিতে লেকটাউন শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম এবং আচার্য শ্রীগৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতী সম্পর্কে প্রবীর ঘোষের মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদ জানাই। গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতীর সঙ্গে অনেক মহাপুরুষকে এভাবে প্রবঞ্চক হিসেবে তুলে ধরার জন্য আমরা ব্যথিত। নিজস্ব মতামত দিয়ে কাউকে এভাবে নস্যাৎ করার এবং হীন বলে প্রচার করার ক্ষুদ্র মানসিকতার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

উত্তরে আমি যে চিঠি দিই, তা 'আলোকপাত' মার্চ ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জানাই,

"জানুয়ারি '৮৮ সংখ্যা আলোকপাতের পাঠকের অধিকার-এ প্রকাশিত আচার্য শ্রীগৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতীর ভক্তবৃন্দের প্রতিবাদপত্রের উত্তরে জানাই উক্ত প্রবন্ধটির লেখক আমি নই, লেখক হলেন—তাপস মহাপাত্র ও অমিতবিক্রম রাণা। শ্রীরাণা আমার একটি সাক্ষাৎকার নেন। তাঁর কাছেই শুনতে পাই তিনি আপনাদের গুরুদেবের একটি সাক্ষাৎকার নেবেন। আমি একজন অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে সত্যানুসন্ধানী মানুষ হিসেবে শ্রীরাণার সঙ্গী হতে চাইলে তিনি সানন্দে রাজি হন। তারপর যা ঘটেছে, যা দেখেছেন, তাই শ্রীরাণা লিখেছেন একজন সৎ সাংবাদিক হিসেবেই। অতএব এই লেখার মধ্যে আমার ভাষণ আসছে কোথা থেকে? মিথ্যেই বা আসছে কোথা থেকে?

যাই হোক এ-বিষয়ে চিঠির কূট-কচালির কোন প্রয়োজন আছে কী? বরং আপনাদের গুরুদেবকে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে (নিয়মমত ৫,০০০ টাকা জমা রেখে ৫০,০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ) আমার বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দিতে বলুন।"

'৮৭ শেষ হলো, '৮৮ শেষ হলো। গৌতম ভারতী জবাব দিতে হাজির হলেন না। বিপুলভাবে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়ে হাজির হলেন '৮৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। ১৯ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় ও ২১ ফেব্রুয়ারি আজকাল পত্রিকায় আলোকপাতের সেই ছবিটি সহ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

ঐশী শক্তির জয়

যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ পৃথিবীর সমস্ত সন্ত-মহাপুরুষদের ধোঁকা-বাজ বলে তাঁদের কুৎসা প্রচারে পঞ্চমুখ। কিন্তু পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চিত। এহেন প্রবীরবাবু—৯৯ডি/১ লেকটাউন (লেকটাউন ও যশোর রোডের সংযোগ স্থল) শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমে আচার্য শ্রীমদ গৌতম ভক্ত সিদ্ধান্ত ভারতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমদ ভারতীর কাছে সকল প্রশ্নের সুসমাধান পেয়ে প্রবীরবাবু মাথা নত করে ভারতীজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।



শ্রীশ্রীগৌতম ভারতীর নিকট আশীর্বাদ গ্রহণরত প্রবীর ঘোষ।
বিজয় দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারী,দমদম পৌর প্রতিষ্ঠান
৭/২ যশোর রোড, কলিকাতা-২৮

আজকাল ২১ ফেব্রুয়ারি '৮৯ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

পরাজিত প্রবীর ঘোষ

এক শোচনীয় ও মর্মান্তিক পরাজয়। যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ লেকটাউনস্থিত শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম—৯৯ডি/১ লেকটাউন, কলিকাতা-৮৯-এর

অধ্যক্ষ মাতৃসাধক আচার্য্য শ্রীমদ্ গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতী ঠাকুবকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিযে তাঁব শ্রীচবণে মাথা নত কবতে ও আশীর্বাদ ভিক্ষা কবতে বাধ্য হন। ইতি—

শ্যামাপদ ঘোষ

এরও একটা পশ্চাৎপট বযেছে। সেই বিষযে সামান্য আলোকপাত কবা প্রযোজন। ১২ ফেব্রুযাবী আজকাল পত্রিকাব 'ববিবাসব'-এ আমাব একটি লেখা প্রকাশিত হযেছিল। শিবোনাম—'আমাব চ্যালেঞ্জাববা'। লেখাটিতে গৌতমেব সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎকাবেব ঘটনাটিব উল্লেখ কবেছিলাম। সেই সঙ্গে জানিযেছিলাম—পত্রিকাটিতে (আলোকপাত) প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হযেছিল, ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ জানিযেছেন গৌতম ভাবতী তাঁব ফটো সম্মোহনেব যথার্থতা প্রমাণ কবতে পাবলে শ্রীঘোষ দেবেন পঞ্চাশ হাজাব টাকা। সে নিযেও কম জল ঘোলা হয়নি, চিঠি-চাপাটিব অনেক চাপান-উতোব চলেছিল। আমি একটি চিঠিতে লিখেছিলুম, গৌতম ভাবতী তাঁব দাবিব সমর্থনে প্রমাণ দিলেই যেখানে ল্যাঠা চুকে যায, সেখানে এত চিঠিব কূট-কচ্‌কচানিব কী আছে?"

আজকাল-এব লেখাটিব সঙ্গে একটি ছবি প্রকাশিত হযেছিল। ছবিটি ছিল শ্রীশ্রীসদানন্দ দেবঠাকুব ও আমাব। কিন্তু ভুলে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে ছবিব তলায ছাপা হযেছিল—গৌতম ভাবতীব সঙ্গে লেখক।

আমি যে লেখাটি আজকাল পত্রিকাব 'ববিবাসব' বিভাগে দিযেছিলাম, তাতে সদানন্দ দেবঠাকুব বিষযেও কিছু লিখেছিলাম। সম্ভবত স্থানাভাবে অংশটিকে বাদ দিতে হয। ফলে কিছু বিভ্রান্তিব সৃষ্টি হওযাব বা সৃষ্টি কবাব সম্ভাবনা ছিল।

এই বিজ্ঞাপন দুটি বিশাল প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি কবেছিল। অলৌকিকতাব ব্যবসাযী ও জ্যোতিষ ব্যবসাযীবা এবং তাদেব অন্ধ ভক্ত ও উচ্ছিষ্টভোগীবা এবং অলৌকিকতায বিশ্বাসী সাধাবণ মানুষেবা যুক্তিবাদেব এই পবাজযেব খববে প্রচণ্ডভাবে উল্লসিত হযেছে। প্রতিটি যুক্তিবাদী আন্দোলনে ব্রতী স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানকে অপ্রিয প্রশ্নেব মুখোমুখি হতে হযেছে। অপমানিত হতে হযেছে, ধিকৃত হতে হযেছে। কযেকটা দিনেব জন্য বহু ক্ষেত্রেই স্তব্ধ হযে গিযেছিল কুসংস্কাব বিবোধী আন্দোলন। ঘটনাব আকস্মিকতায কিংকর্তব্যবিমূঢ় শত শত সংগঠনেব চিঠিব পাশাপাশি বহু মানুষেব উৎকণ্ঠাভবা বাস্তব সত্যকে জানতে চাওযা চিঠিব পাহাড় জমেছিল। ভোব থেকে বাত দুপুব পর্যন্ত বাড়িতে এসেছেন দূবেব-কাছেব বহু গণ-সংগঠনেব প্রতিনিধিবা। তাঁবা অনেকেই অভিযোগ কবছেন, অলৌকিক বিবোধী অনুষ্ঠানেব পোস্টাব ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, দেওযাল লিখনে লেপে দেওযা হচ্ছে আলকাতবা, হাত থেকে ছিনিযে নিযে প্রচাব-পত্র ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। অলৌকিক বিবোধী অনুষ্ঠানেব ওপব হামলা চালান হচ্ছে।

আমাদেব সংগ্রামী সাথী যাঁবাই এসেছিলেন, তাঁদেব প্রত্যেকেবই বক্তব্য ছিল—একটা কিছু কবতে হবে। কোণঠাসা অবতাববা আজ যে আক্রমণ চালিযেছে, তাকে ভেঙে গুঁড়িযে না দিলে আমাদেব আন্দোলনেব অস্তিত্বই বিপন্ন হযে পড়বে। আমবা সঠিক আঘাত হানতে পাবছি বলেই অবতাববা আজ আমাদেব প্রত্যাঘাত

করেছে।

কী করবো আমরা? কুসংস্কার মুক্তির এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন যখন সঙ্কটের আবর্তে পাক খাচ্ছে তখন আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল—বিজ্ঞাপনের জবাবে পাল্টা বিজ্ঞাপন দেওয়া। কারণ, আমাদের যতদূর জানা আছে, ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ পাঠান কোনও চিঠি প্রথম শ্রেণীর কোনও ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। আবার ধনকুবের অবতারদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনের লড়াইয়ে নামলে তা হয়ে দাঁড়াবে অসম লড়াই। আমরা খবর পাচ্ছিলাম কিছু অবতার ও জ্যোতিষীরা এই লড়াইকে তাঁদের বাঁচার শেষ লড়াই হিসেবে ধরে নিয়ে একত্রিত ও সংগঠিত হয়েছেন। এক অবতারের টাকার জোরের সঙ্গে টক্কর দিতেই যখন আমরা অপারগ, তখন বহুর বিরুদ্ধে লড়ব কেমন করে? আমরা যখনই একটা কাগজে ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে বাস্তব সত্যকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরবো, তখন বিরোধী শিবির দশটা কাগজে দশটা ঢাউস বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

ইতিমধ্যে 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'। আমরা বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ও অগ্রণী বিজ্ঞান সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে অলোচনায় বসলাম আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে। সমস্ত রকমের সক্রিয় সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা। ওই উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যেই কয়েকজন অভিযোগ তুললেন, একটি স্ব-বিজ্ঞাপিত যুক্তিবাদী সমাজ সচেতন মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকার কিছু কাছের মানুষ ইতিমধ্যে প্রচারে নেমে পড়েছে—প্রবীর ঘোষ ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পরাজয় মেনে নিয়েছে। আমাদের দেশে ঈর্ষাকাতর মানুষের কোনও দিনই অভাব ছিল না। কিন্তু এমন অভাবনীয় বিপদের দিনে কেউ সহযোগিতার পরিবর্তে মিথ্যে কুৎসা রটিয়ে আখের গুছোতে চাইবে এটা বিজ্ঞান আন্দোলনের পক্ষে যেমনই দুঃখজনক, তেমনই ঘৃণ্য চক্রান্ত। অবশ্য এই ধরনের যুক্তি-বিরোধী, মিথ্যাচারিতা ও ঈর্ষাপরায়ণতার বহু দৃষ্টান্ত এর আগেও ওই পত্রিকাটি স্থাপন করেছে। আরো একবার ওদের আসল রূপটা আমাদের দেখাল।

আমরা সাধারণ মানুষের কাছে সত্যকে তুলে ধরার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগের সম্পাদক ধীরেন দেবনাথের হাতে প্রতিবাদপত্র তুলে দিলে তিনি জানালেন, মিথ্যে বিজ্ঞাপনের দরুন কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের প্রতি তাঁর সমস্ত রকম সহানুভূতি থাকলেও, আমাদের চিঠি ছাপতে তিনি অপারগ। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার ও আজকাল পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে আমাদের সমস্যার কথা জানিয়ে কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের স্বার্থে সত্যকে তুলে ধরার অনুরোধ রেখেছিলাম। দুজনেই সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন।

২২ ফেব্রুয়ারি আজকাল পত্রিকায় 'প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে আমার লেখা চিঠিটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে প্রকাশিত হয় আরও তিনটি চিঠি—



আজকাল

২২ ফেব্রুযাবি ১৯৮৯

বুজরুকবা মিথ্যা বিজ্ঞাপনেব আশ্রয নিচ্ছেন

যুক্তিবাদীদেব সঙ্গে লড়াই-এ না পেবে বুজরুকবা এখন মিথ্যা বিজ্ঞাপনেব আশ্রয নিচ্ছেন। ২১ ফেব্রুযাবি আজকালেব প্রবীব ঘোষ ও ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব বিরুদ্ধে শ্যামাপদ ঘোষ যে সচিত্র বিজ্ঞাপনটি দিযেছেন তা নির্জলা মিথ্যা। তথ্য ও সত্যেব মাবাত্মক বিকৃতি ঘটিযেছেন তিনি। বিজ্ঞাপনটিতে বলা হযেছে লেকটাউন শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমেব অধ্যক্ষ শ্রীমদ গৌতম সিদ্ধান্ত ভাবতীব কাছে পবাজিত হযে মাথা নত কবতে বাধ্য হযেছেন। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ছবিটি '৮৭ সালেব নভেম্ববে 'আলোকপাত' পত্রিকায প্রকাশিত হযেছিল। তলায ক্যাপসন ছিল 'এই গৌতম সিদ্ধান্ত ভাবতীকে চ্যালেঞ্জ জানিযেছেন প্রবীব ঘোষ।' বিজ্ঞাপনে ক্যাপসনটিকে সম্পূর্ণ বদলে দেওযা হযেছে। ছবিব সঙ্গে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে যে তথ্য প্রকাশিত হযেছিল তা থেকেই পবিষ্কাব যে গৌতম ভাবতীব অলৌকিক ক্ষমতা কিছুই নেই। আলোকপাতে প্রকাশিত ঐ লেখাটিব শিবোনাম ছিল 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয কি?' লেখক ছিলেন তাপস মহাপাত্র ও অমিত বিক্রম বাণা। ছবিটি তুলেছিলেন কুমাব বায। প্রতিবেদনে লেখকদ্বয জানিযেছিলেন 'ফটোগ্রাফাব ভদ্রলোক পৌঁছুনোমাত্র আশ্রমাধ্যক্ষ (অর্থাৎ গৌতম ভাবতী) হঠাৎই ম্যাজিকেব মত খালি হাতটি এগিযে দিযে হাতেব মুঠো থেকে বেব কবলেন নাম-না-জানা শিকড়। এ দিব্যদৃষ্টি। সম্মোহনে ত্রিকাল দর্শনও কবতে পাবে। এসব তাঁব দাবি। এক্ষেত্র বলাবাহুল্য ফটোগ্রাফাবেব ছদ্মবেশে যাওযা সুদক্ষ সম্মোহনবিদ্ প্রবীব ঘোষকে তিনি চিনতে পাবলেন না কিছুতেই' 'প্রবীববাবুব একটাব পব একটা প্রশ্নে হাব মানলেন শ্রীযুক্ত ভাবতী। কিন্তু তাঁব এইসব তন্ত্রমন্ত্রেব বুজরুকি কথাবার্তা প্রকাশ না কবাব জন্যও অনুবোধ কবলেন। কেন না এতে তাঁব ব্যবসাব ক্ষতি হবে। এই লেখা থেকে পবিষ্কাব হাব আমাব হযনি। হেবেছেন তিনিই। ছবিটিবও একটা নেপথ্য কাহিনী আছে। গৌতম ভাবতীব কাছে আমি গিযেছিলাম আত্মপবিচয গোপন কবে। সাধাবণ ভক্ত সেজে। নাম দিযেছিলাম কুমাব বায। কিন্তু সবজান্তা এই গুরুদেব আমাব আসল পবিচয জানতে পাবেননি। আব পাঁচটা ভক্তকে যেমন আশীর্বাদ কবেন তেমনভাবেই আশীর্বাদ কবেছিলেন আমাকে। আমি নিশ্চিত আমাব পবিচয জানাব পব তিনি আমাকে আশ্রমে ঢুকতেই দিতেন না। আমাব পক্ষেও সম্ভব হত না তাঁব বুজরুকি ধবা। আমাকে চিনতে না পেবে আশীর্বাদবত গৌতম ভাবতীব এই ছবিটিই 'আলোকপাতে' ছাপা হযেছিল। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওযাব পব বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকাব পব আবাব আসবে নেমেছেন গৌতম ভাবতীব 'ভক্তবা'। কিছুদিন আগে 'আজকাল' পত্রিকায ববিবাসবে 'আমাব চ্যালেঞ্জাববা' শীর্ষক লেখাটিতে গৌতম

ভারতীর বুজরুকির মুখোশ আর একপ্রস্থ খুলে দেবার পরই আমার বিরুদ্ধে এই বিজ্ঞাপন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতা শ্যামাপদ ঘোষ সহ প্রতিটি বুজরুক এবং তাঁদের ধারকবাহকদের উদ্দেশ্যে জানাই টাকার জোরে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের দেশে গড়ে ওঠা কুসংস্কার বিরোধী গণ আন্দোলন বন্ধ করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। আপনাদের বিজ্ঞাপন প্রমাণ করে আপনারা ভীত, সন্ত্রস্ত। তাই মিথ্যাচারিতাকে আশ্রয় করে গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে আঘাত করতে চাইছেন। আমি আবার চ্যালেঞ্জ করছি আপনাদের গুরুদেবকে বলুন, সবসর্মক্ষে তাঁর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণ করতে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ধৃষ্টতা যদি আপনার গুরুদেবটি দেখান তাহলে তাঁর মাথা যুক্তিবাদী মানুষের পায়ে তথা আন্দোলনের কাছে নত হতে বাধ্য হবে।'

প্রবীর ঘোষ, সম্পাদক, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

কেন এই লেখা ?

আমরা ক্ষুব্ধ

(১)

জনৈক প্রবীর ঘোষের 'আমার চ্যালেঞ্জারবা' শীর্ষক লেখা পড়লাম। ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবাসরে। এ ধরনের একজন আনাড়ির লেখা আজকালের মত প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে দেখে আমরা বিস্মিত। প্রবীর ঘোষ বহু মহাপুরুষের নামে বহু বাজে উক্তি করেছেন। এর মধ্যে লেক টাউনের শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমের অধ্যক্ষ গৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতীকে নিয়ে একটি ভুল ছবিও প্রকাশ করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা ও আচার্যদেবকে হেয় করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আমরা তাঁর এই হীন মনোভাবে ক্ষুব্ধ। আমরাও প্রবীর ঘোষকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, গৌতম ভারতী ঠাকুর সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তার সত্যতা তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে পারলে আমরা তাঁকে ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ হাজার টাকা দেব। প্রবীরবাবু নিচের ঠিকানায় করে আসতে পারবেন জানলে খুশি হব। আমরা তাঁর জবাবের অপেক্ষায় রইলাম ।

বিজয় দাশগুপ্ত, ৭/২, যশোর রোড, কলি-২৮।
অসীম কুমার মিত্র, কলি-৯১।
কাজল কুমার পোদ্দার, কলি-৯
রজত পাল, কলি-৫০ এবং আরও অনেকে।

(২)

গত ১২ ফেব্রুয়ারি প্রবীর ঘোষের লেখা 'আমার চ্যালেঞ্জারবা' লেখাটি পড়ে আমি মর্মাহত। কারণ লেখাটির বিষয়বস্তু ছিল কতিপয় অলৌকিক ম্যাজিক প্রদর্শনকারী জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে। এবং আমার সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ ছিল না। অহেতুক আমার ছবিটি এই বিতর্কিত লেখাটির মধ্যে ছাপা হয়েছে। ছবিটি গৌতম ভারতীর নয়, আমার। এতে আমার হাজার হাজার ভক্ত নরনারীদের সঙ্গে আমিও

হার মেনে প্রবীরবাবু তাঁর সামনে মাথা নত করেছেন। বক্তব্যের সমর্থনে একটি ছবিও বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ছবি ও কথায় ছিল "পৃথিবীর সমস্ত সন্ত-মহাপুরুষদের ধোঁকাবাজ বলে তাঁদের কুৎসা প্রচারে পঞ্চমুখ" প্রবীরবাবু "শ্রীমদ ভারতীর কাছে সকল প্রশ্নের সুসমাধান পেয়ে মাথা নত করে ভারতীজির আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।" প্রবীরবাবুর মতে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কতখানি মিথ্যা প্রচার করা যায়— এ তারই নিদর্শন। ছবিটি অবশ্য সাজানো নয়—এক আলোকচিত্রীরই তোলা। সেই ঘটনাও ঘটেছিল সাংবাদিকদের সামনেই, ১৯৮৭ সালে—তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। পরিচয় গোপন করে প্রবীরবাবু উপস্থিত হয়েছিলেন গৌতম ভারতীর সামনে। দিব্যদৃষ্টির অধিকারী বলে প্রচারিত তান্ত্রিক আদৌ বুঝতে পারেননি প্রবীরবাবুর উদ্দেশ্য। বরং দর্শনার্থীদেরই একজন মনে করে ভারতী তাঁকে আশীর্বাদ করেন। সেই ছবিটি তখনই তোলা। একটি পত্রিকায় তা ছাপাও হয়। হুবহু এই ছবিটিই বিজ্ঞাপনেও রয়েছে। সেই পত্রিকার প্রতিবেদনে স্পষ্টই জানানো হয়েছিল, প্রবীরবাবুর বিভিন্ন প্রশ্নে পরাজিত গৌতম ভারতী প্রবীরবাবুকেই অনুরোধ করেছিলেন 'তন্ত্রমন্ত্রের বুজরুকি/কথাবার্তা প্রকাশ না করতে।' এখন প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কিন্তু এর উল্টো কথাই বলা হয়েছে।

যাঁদের নামে এই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে তাঁদের একজন দমদম পৌর প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারি বিজয় দাশগুপ্ত। 'ঐশী শক্তির জয়' শিরোনামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ছবি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, ছবি তোলার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুরীতে। ঘটনাটি লেকটাউনের। তা সত্ত্বেও তিনি জানালেন, বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব তাঁরই। একই মর্মে 'প্রবীর ঘোষ পরাজিত' শিরোনামে আর একটি বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপক শ্যামাপদ ঘোষ বললেন, প্রবীরবাবু তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছিলেন। "কিন্তু আশীর্বাদ তো তিনি নিয়েছেন, আমরা সেটাকেই ঘুরিয়ে প্রচার করছি।"

গেলাম গৌতম ভারতীর কাছেই। বাঘছালের আসনে বসে থাকা এক দোহারা যুবক। জানতে চাইলাম। আপনি কি অলৌকিক-শক্তিমান ?—"আমি ? আমি কিছুই না। সবই মা। আমি কী তা কে বলবে। তোমরা বল।" লক্ষ্য ভক্তরা। তাঁরা গুরুর আশ্চর্য সব ক্ষমতার কথা বললেন। গুরু জানিয়ে দিলেন ক্ষমতা তাঁর নয়, 'ক্ষমতা মায়ের'। তা সত্ত্বেও তিনি পার্থিব সম্পদ কিন্তু পান ভক্তদের কাছ থেকেই। যদিও তাঁর নিজের কথায় "আমি কিচ্ছু নিই না। ওরা দেয়। জোর করে দেয়। না নিলে তো ওদের অপমান করা হয়, তা-ই নিই। এই যে রুপোর গ্লাস, ওই যে ওটা (এয়ারকুলার), সব জোর করে ব্যবহার করায় আমাকে দিয়ে।"

এক ভক্ত জানালেন, গুরুর কোনও দাবি নেই। কেউ দু'হাজার টাকা দিলে তা-ই নেন, কেউ পঁচিশ হাজার দিলে তা-ও নেন।

আপনি কীভাবে রোগ সারান ?

—আমি না, আমি না—মা সারান। আমি হাত মুঠো করি। মা সন্দেশ দিলে আমি সন্দেশ দিই, মা রসগোল্লা দিলে আমিও রসগোল্লা দিই। বারবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও কিন্তু বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনায় গেলেন না তিনি। শুধু বললেন, "ও সব ভক্তদের কাজ।"

তাবপবেই সাবাক্ষণ কবজোড়ে বসে থাকা গৌতম ভাবতী সুব পাল্টে বললেন, "তবে উনি (প্রবীব ঘোষ) বড বাড়াবাড়ি কবছেন, ওব ব্যবস্থা ভক্তবাই কববে।" সেই সঙ্গেই জানিযে দিলেন, কাগজগুলোও যদি বাড়াবাড়ি কবে, ভক্তবাই ব্যবস্থা নেবে। "আমি ওদেব বাবণ কবি, ওবা আমাব কথা শোনে না।"

চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি , যা জানা যাচ্ছে তা থেকে মনে হচ্ছে প্রবীববাবুব বিরুদ্ধে ভক্তবা 'ব্যবস্থা নিতে' দৃঢপ্রতিজ্ঞ। যদিও গৌতম ভাবতী এও বলেছিলেন, "কে এই প্রবীব ঘোষ ? সে বিখ্যাত লোকেব গাযে কাদা ছুঁড়ে বিখ্যাত হতে চাইছে।" মজাব কথা, গৌতম ভাবতীব শিষ্যবাই কিন্তু এই বিজ্ঞাপন ছেপে প্রবীববাবুকে আবও বিখ্যাত হওযাব সুযোগ কবে দিলেন। বাব বাব প্রশ্ন কবে জেনেছি গৌতম ভাবতী প্রবীব ঘোষেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগ্রহী নন। প্রবীববাবু কিন্তু স্পষ্টই বলেছেন, "মিথ্যাচাবিতাকে আশ্রয কবে টাকা-পযসাব জোবে ওবা বিজ্ঞান-আন্দোলনকে আঘাত কবতে চাইছে।" ভক্তদেব কাছে প্রবীববাবু তাঁদেব গুরুদেবেব অতীন্দ্রিয ক্ষমতা প্রকাশ্যে প্রমাণেব চ্যালেঞ্জও জানিযেছেন। (একটি সূত্রেব খববে প্রকাশ ইতিমধ্যেই লেকটাউনেব শিবকালী আশ্রমেব গৌতম ভাবতী ও তাব দাদা দমদম শিবকালী আশ্রমেব গৌতম ভাবতীব সঙ্গে আবও দু-একজন তান্ত্রিক ও জ্যোতিষী যুক্ত হযেছে)।

২ মার্চ 'আজকাল' পত্রিকাব প্রথম পৃষ্ঠায প্রকাশিত হলো আব একটি ছবি সহ খবব—

আত্মহত্যাব চেষ্টায় 'অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতী হাসপাতালে : ভাঙচুব, পুলিস

দেবাশিস ভট্টাচার্য 'আত্মহত্যাব' চেষ্টায ব্যর্থ হযে 'অলৌকিক শক্তিধব' গৌতম ভাবতী এখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেব এমার্জেন্সিব তিনতলাব বেডে চিকিৎসাধীন। দমদম লেকটাউনেব শ্রীশ্রী শিবকালী আশ্রমেব 'অলৌকিক শক্তিধব' এই আচার্য বুধবাব ভোববাতে নিজেব তলপেটে ভাঙা কাচেব বোতল ঢুকিযে বক্তাবক্তি কাণ্ড বাঁধান। হঠাৎ-ই অ্যাপেন্ডিসাইটিসেব প্রচণ্ড ব্যথা ওঠায 'অলৌকিক শক্তিধব' গৌতম ভাবতী যন্ত্রণায ছটফট কবতে কবতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হযে একটি বোতল ভেঙে নিজেব তলপেটেব ডানদিকে ঢুকিযে দেন। তাবপব যন্ত্রণা-কাতব গৌতম ভাবতীব চিৎকাবে আশ্রমেব ভক্ত-শিষ্যবা ছুটে এসে দেখেন চাবদিক বক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওই অবস্থায তাঁব ভক্ত-শিষ্যবা গৌতম ভাবতীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিযে আসেন। এমার্জেন্সিব তিনতলায সি বি টপ ১৩৬ নম্বব বেডে তাঁকে ভর্তি কবা হয। ডাক্তাববা সঙ্গে সঙ্গে তাঁব ক্ষতস্থানেব চিকিৎসা কবেন। বুধবাব সকালেই তাঁব অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপাবেশন কবা হয। অপাবেশনেব পব প্রায সাবাদিনই তিনি ছিলেন অচৈতন্য। সন্ধ্যে নাগাদ ধীবে ধীবে তাঁব জ্ঞান ফিবে আসে। সাবাদিনই তাঁব স্যালাইন চলে। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ এক সিস্টাব তাঁকে ইঞ্জেকশন দিতে এলে গৌতম ভাবতী আবাব রুদ্রমূর্তি ধবেন। হঠাৎই উন্মত্তেব মত আচবণ

করতে থাকেন তিনি। চিৎকার করতে করতে তিনি বেড থেকে লাফ দেন। তাঁর নিজের স্যালাইনের বোতল ছিটকে পড়ে। এরপর তিনি তাঁর চারদিকের রোগীদের দিকে তেড়ে যান। তাঁদের স্যালাইনের বোতল ছিঁড়ে নিয়ে তিনি চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি ছুঁড়তে থাকেন।

গৌতম ভারতীর উন্মত্ত আচরণে অসুস্থ অবস্থাতেও অন্যান্য রোগীরা দৌড়দৌড়ি শুরু করে দেন। ইঞ্জেকশন দিতে আসা সিস্টার ভয়ে দৌড়ে চলে যান। ডাক্তাররাও ভয় পেয়ে যান। ডাক্তার এবং সিস্টারদের অনুরোধ সত্ত্বেও গৌতম ভারতীর উন্মত্ততা বন্ধ হয়নি। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন পুলিসকে খবর দিতে। তাঁরা লালবাজার এবং বৌবাজার থানায় ফোন করেন। দু ঘণ্টা পরে প্রায় রাত নটা নাগাদ পুলিস আসে হাসপাতালে। ডাক্তারদের উপরোধ অনুরোধে যে কাজ হয়নি, পুলিশ আসামাত্রই সে কাজ সমাধা হয়। পুলিশ দেখেই গৌতম ভারতী চুপচাপ তাঁর বেডে শুয়ে পড়েন। এই প্রতিবেদক রাত দশটা নাগাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিনতলার ওই ওয়ার্ডে গিয়ে দেখেন চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে স্যালাইনের বোতল ভাঙা কাচের টুকরো। চিকিৎসারত ডাক্তাররা জানান, সম্প্রতি যুক্তিবাদীরা "অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতীর 'শক্তি'কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। সম্ভবত, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে না পারার আশঙ্কায়, গৌতম ভারতীর মধ্যে 'মস্তিষ্ক বিকৃতি'র লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অ্যাপেন্ডিসাইটিসের যন্ত্রণা তাঁকে ইন্ধন যুগিয়েছে। ফলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি সম্ভবত আত্মহত্যায় প্ররোচিত হন। ডাক্তাররা জানান, গৌতম ভারতীর শারীরিক অবস্থা এখন আর সঙ্কটজনক নয়। বুধবার রাত সোয়া নটা নাগাদ গৌতম ভারতীকে দেখতে আসেন একজন মনস্তত্ত্ববিদ। চিকিৎসারত ডাক্তাররাই তাঁকে ডেকে আনেন। এদিন সন্ধ্যায় গৌতম ভারতীর উন্মত্ত আচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ বলেছেন, রোগীর (গৌতম ভারতী) সম্ভবত রোজ সন্ধ্যায় মদ, গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস আছে। এদিন (বুধবার) সন্ধ্যায় তা না পাওয়ায় তিনি হিংসাত্মক হয়ে উঠে ভাঙচুর করেন। তবে, আরও পর্যবেক্ষণ না করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না বলে মনস্তত্ত্ববিদ মন্তব্য করেছেন।

২ মার্চ আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা হলো। আমাকে তুলতে কোনও অবতারের 'মা' আসেননি। যদিও অবতারদের কথা মত সবই মা'য়ের ইচ্ছে। তবু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, অবতার নিজেই কিন্তু মায়ের শক্তির উপর সামান্যতম ভরসা করেন না। ভরসা করেছিলেন পেশীশক্তি সম্পন্ন অ-মানুষের ওপর। হায় যাঁরা, শত্রুকে স্ব-বশে আনতে অপরকে মোহিনী ঔষধি দেন, তাঁরাই আবার শত্রুকে বশ করতে মোহিনী ঔষধির উপর ভরসা রাখতে পারেন না? বশীকরণ, ফটোসম্মোহনের দাবিদাররাও নিজের বিপদকালে অসার দাবির কথা ভুলে বাহুবলের ওপর অধিক ভরসা রাখেন।

৩ মার্চ বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হল। এখানে 'আজকাল'-এ প্রকাশিত খবরটি তুলে দিলাম—

প্রবীর ঘোষকে কিডন্যাপের চেষ্টা
অপ্রকৃতিস্থ নন গৌতম ভারতী : বিশেষজ্ঞ

আজকালের প্রতিবেদন . বুধবার রাতে মেডিক্যাল কলেজের সি বি টপ ওয়ার্ডে তাণ্ডবের নায়ক 'অলৌকিক শক্তিধর' গৌতম ভারতী মোটেই অপ্রকৃতিস্থ (অ্যাবনর্ম্যাল) নন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের এই অভিমত। বৃহস্পতিবার মেডিকেল কলেজের সাইক্রিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ হরি গাঙ্গুলি গৌতম ভারতীকে দেখেন। চিকিৎসক ডাঃ মৃগাঙ্কমোহন দাসের কাছে লেখা নোটে তিনি জানিয়েছেন 'নো অ্যাবনর্ম্যালিটি হ্যাজ বিন ফাউন্ড ইন হিজ স্পিচ ওরিয়েন্টেশান অ্যান্ড পারসেপশান।' ঐ নোটেই তিনি জানিয়েছেন বুধবার রাতে ওঁর আচরণ এক ধরনের হিস্টিরিয়া অথবা ভানও হতে পারে। রোগী অবসাদগ্রস্ত ও অপরাধবোধে আক্রান্ত। মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে। যাতে পান না করতে পারে সে ব্যাপারে নজর রাখা উচিত। এদিকে 'ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন' লেকটাউনের শিবকালী আশ্রমের এই আচার্যের ক্ষমতার প্রথম চ্যালেঞ্জার প্রবীর ঘোষকে এদিন সকালে দুই দুর্বৃত্ত তাঁর বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ তাঁকে বাড়ির সামনেই পাকড়াও করে দুর্বৃত্তরা। বলে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখনই তাঁকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে। প্রবীর রুখে দাঁড়ানোয় তারা অবশ্য পিছু হটে। পরে প্রবীর সুভাষবাবুর ঘনিষ্ঠ মহলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এদিন সকালেই তিনি দীঘা চলে গেছেন। এই ঘটনার ব্যাপারে দমদম থানায় প্রবীর একটি ডায়েরীও করেছেন। বুধবার রাতের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন এবং স্পেশাল অ্যাটেনডেন্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সুপারের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ চলে সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। অ্যাটেনডেন্টদের অবশ্য অন্যান্য দাবিদাওয়াও ছিল। দুটি সংগঠনই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন। এ বি জে ডি এফ-এর পক্ষ থেকে ডাঃ গিরিশ বেরা ও সুবীর ব্যানার্জি জানান বার বার জানানো সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনার ২ ঘণ্টা পরে এসেছে। অবস্থা সামাল দেওয়ার বদলে পুলিশ ডাক্তারদের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করেছে। চিকিৎসক ডাক্তার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছেন রোগীকে আলাদাভাবে রাখা হোক। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা অবধি গৌতম ভারতীকে অন্য বেডে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এদিন ঐ ওয়ার্ডেরই বেশ কিছু রোগী অভিযোগ করেন এমন একজন পেশেন্টের সঙ্গে তাঁদের থাকতে ভয় লাগছে। বুধবার রাতে তাণ্ডবের সময় ডাক্তার, নার্স, কর্মী ও রোগীদের সবাই পালিয়ে গেলেও নিরুপায় কয়েকজন রোগী বিছানাতেই ছিলেন। এঁদের অন্যত্র যাওয়ার ক্ষমতাও ছিল না। এই ঘটনা আবার ঘটুক তা তাঁরা চান না। রোগীদের অনেকেরই জিজ্ঞাসা শুনেছি উনি বিরাট সাধুবাবা। তা হলে নিজের অ্যাপেন্ডিক্সটা অলৌকিক ক্ষমতাবলে উনি সারিয়ে তুলছেন না কেন?

এসব সত্ত্বেও ভক্তরা এদিন ভিজিটিং আওয়ারে ভিড় জমিয়েছেন তাঁর শয্যার সামনে। হাত পা বাঁধা ভারতী অবশ্য তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। তাঁর স্যালাইন চলছিল। এদিকে অলৌকিক শক্তিধরের ক্ষমতার প্রথম চ্যালেঞ্জার ভারতীয়

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব সাধাবণ সম্পাদক প্রবীব ঘোষ এদিন এ প্রসঙ্গে জানান যুক্তিবাদীদেব সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেবে ও এখন এইসব অভিনয শুরু কবেছে। ও একজন বড অভিনেতা। এই ঘটনাই প্রমাণ কবেছে ও ধাপ্পাবাজ। যিনি অপবেব বোগ নিবাময কবতে পাবেন বলে বিজ্ঞাপন দেন তিনি নিজেব বোগ নিবাময কবতে পাবলেন না কেন ? এমনও হতে পাবে, এইসব অভিনয কবে উনি ওঁব শিষ্যদেব আমাব বিরুদ্ধে লেলিযে দেবাব চেষ্টা কবছেন। আমাদেব সমিতি সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানকর্মী সংগঠনেব পক্ষ থেকে গণ বিজ্ঞান আন্দোলনেব বিরুদ্ধে পবিকল্পিত সন্ত্রাস বোধে ব্যবস্থা নেওযাব জন্য মুখ্যমন্ত্রীব কাছে একটা স্মাবকলিপি পাঠানো হযেছে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায যুক্তিবাদী আন্দোলনেব সমর্থনে গৌতমকে ধিক্কাব জানিযে বহু চিঠি প্রকাশিত হযেছে, যা আমাকে এবং আমাদেব যুক্তিবাদী আন্দোলনকে শক্তি যুগিযেছে, প্রেবণা দিযেছে।

১৪ মার্চ আনন্দবাজাব পত্রিকাব চতুর্থ পৃষ্ঠাটি খুলেই নিজেব চোখকেও যেন বিশ্বাস কবতে পাবলাম না। মানুষ আমাদেব আন্দোলনেব সমর্থনে আছেন। নিশ্চিত হলাম, এত মানুষেব ভালবাসায জয ছাড়া আব কিছুই আসতে পাবে না। 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে 'অলৌকিক শক্তিধবদেব প্রতি চ্যালেঞ্জ, বিপন্ন যুক্তিবাদী এবং প্রশাসন' শিবোনামে প্রায পৃষ্ঠা জুড়ে বহু পাঠকেব চিঠি প্রকাশিত হযেছে। এবই মধ্য থেকে কিছু চিঠি আপনাদেব আগ্রহ নিবাবণেব জন্য তুলে দিচ্ছি।

অলৌকিক শক্তিধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ, বিপন্ন যুক্তিবাদী এবং প্রশাসন

গত ১৯ ফেব্রুযাবি আনন্দবাজাবে গৌতম ভাবতীব আশীর্বাদ গ্রহণবত প্রবীব ঘোষেব ছবি দেখেছিলাম। ছবিটি দেখেই বুঝেছিলাম এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই অপেক্ষায ছিলাম আপনাদেব কাগজ মাবফত প্রবীব ঘোষেব প্রতিবাদেব।

২৫ ফেব্রুযাবি অপেক্ষাব অবসান হয। দেখলাম প্রবীব ঘোষেব প্রতিবাদেব উত্তবে অলৌকিক শক্তিধব গুরুব হুমকিব সংবাদ। বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেবা যখন যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানেব সাহায্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত কবাব চেষ্টায বত, তখন মুষ্টিমেয ক্ষমতালিপ্সু অলৌকিক (!) শক্তিধবদেব প্রশ্রয দিযে যান মানুষকে ভুল বোঝাবাব জন্য।

কোনও অলৌকিক (!) কারণে হযতো প্রবীব ঘোষ অদৃশ্য হতে পাবে। কিন্তু তাঁব যুক্তিবাদী মননেব শিকড যে বহু দুব পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ কবেছে তা এই উত্তবঙ্গেব গ্রামে বসেও অনুভব-কবছি। এক প্রবীব ঘোষ ইতিমধ্যেই বহু প্রবীব ঘোষেব জন্ম দিযেছে। গৌতম ভাবতীব দল কি তাঁদেব স্তব্ধ কবতে পাববে ?

সাধিকা দাস। মথুবাপুব, মালদহ

॥ ২ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হিসাবে সত্যিই খুব বিপন্ন বোধ করছিলাম। কলকাতা থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে আমার নিজের গ্রাম এবং সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চলের কয়েকজন জ্যোতিষী এবং গুরুজির তন্ত্রমন্ত্রের বুজরুকি ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে আমরা কয়েকজন যুবক-যুবতী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছি। খুব একটা সাড়া যে পাচ্ছিলাম তা নয়। তবে চেতনা বাড়ছে। গ্রামে লড়াইটা একেবারেই অসম। ওরা, জ্যোতিষী, গুরুজিদের এখানে বড় সুবিধা। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন। তাছাড়া, যাঁরা শিক্ষিত তাঁদের মধ্যেও অনেকে (এঁদের দলে শিক্ষকমশাইরাও আছেন) জ্যোতিষীদের মুখনিঃসৃত বাণীকে অভ্রান্ত মনে করেন।

এ অবস্থায় কাগজে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষের ছবি সহ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের কাটিং নিয়ে স্থানীয় গুরুজিরা প্রচারে নামেন। তাঁদের চেলারাও যত্রতত্র আমাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেন। আনন্দবাজারে অলৌকিক শক্তিধরদের মুখোশ খুলে দিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে সেটা দেখেই আট কপি আনন্দবাজার কিনে কয়েকটি গ্রামে ঘুরলাম। পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের এটা একটা উপযুক্ত জবাব।

মধুসূদন সরকার। গাংনাপুর, নদীয়া

॥ ৩ ॥

২৫ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজারে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষের বিপদের কথা পড়লাম। ওঁর অপরাধ, তিনি তথাকথিত গুরু/বাবাদের মুখোশ খুলে দিতে চান। ধোঁকাবাজ মহাপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয় না। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে বানচাল করতে তাঁরা যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সেটাই স্বাভাবিক।

বামফ্রন্ট সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ, অবিলম্বে প্রবীরবাবুর যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে দিন।

আশিস রায়চৌধুরী। জলপাইগুড়ি

॥ ৪ ॥

অলৌকিক শক্তিধরেরা কবরের ভেতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে, আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে, কিংবা নাড়িবন্ধন করে সমাধিস্থ হওয়ার বিভিন্ন প্রকার 'অলৌকিক কাণ্ড' দেখায়। চ্যালেঞ্জ জানালাম—আমিও তাদের সামনে ওইসব খেলা দেখাব এবং তার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দেখাব।

সুশান্ত দে। দিঘড়া, উঃ ২৪ পঃ

॥ ৫ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' প্রতিবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুন্নত দেশগুলিতে যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী শিক্ষার অভাব সেখানে একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং এদের ঘিরে গড়ে ওঠা কিছু স্বার্থান্বেষী এবং কিছু অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমর্থকদের দল বহু লোকের কষ্টার্জিত সম্পদ কৌশলে হস্তান্তর করেন কেবল মাত্র অলৌকিক আশীর্বাদ, আশ্বাস, মাদুলি, কবচ, পাথর প্রভৃতি বুজরুকির দ্বারা। হতাশাগ্রস্ত মানুষেরা অলৌকিকত্বের ফাঁদে পড়ে মিথ্যা আশ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এমনকি মিথ্যা আশ্বাসে অচিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসায় প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হয়। মাঝে মাঝে তথাকথিত গুরুদেব প্রতারণার খবর আদালত পর্যন্তও গড়ায়। উন্নত দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদ কোনও অলৌকিক শক্তির দ্বারা অর্জিত হয়নি। সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন। কোনও স্বর্গীয় মা বা বাবা তাঁদের কিছু পাইয়ে দেয় না।

আমাদের দেশে যেখানে চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ,ক্রীড়াবিদ্, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পর্যন্ত আংটি বা মাদুলি ধারণ করে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করেন সেখানে যুক্তিবাদীদের আরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রচারে নামতে হবে। যুব সমাজকে চিন্তা করতে হবে ড্রাগ অ্যাডিক্‌শনের মতো অলৌকিকত্বের আসক্তিও একটা সামাজিক সমস্যা। যুক্তিবাদী প্রবীরবাবু একা নন, তাঁকে সমর্থন করতে অগণিত প্রগতিশীল নরনারী এগিয়ে আসবেন।

ডাঃ শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈহাটি

॥ ৬ ॥

প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ যে গুরুদেবকে বেশ বিপাকে ফেলেছে তা প্রমাণিত হল গৌতম ভারতীর হাস্যকর হুমকি ও অসংলগ্ন বক্তব্যে। তিনি ভক্তদের দেওয়া পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করেন, কেননা না নিলে 'ওদের অপমান করা হয়'। আবার প্রবীর ঘোষ এবং 'কাগজগুলোও যদি বাড়াবাড়ি করে, ভক্তরাই ব্যবস্থা নেবে।'

এইভাবে সরাসরি ভক্তদের প্ররোচিত না করে তিনি নিজের 'অলৌকিক ক্ষমতা' এক্ষেত্রে প্রদর্শন করতে অথবা ভক্তদের সঠিক পথে পরিচালিত করে প্রকৃত গুরু হতে পারতেন। "আমি ওদের বারণ করি, ওরা আমার কথা শোনে না।" তিনি কেমন গুরু যে ভক্তরা তাঁকে মান্য না করে উন্মার্গগামী হয়?

তপনকুমার দাস। রানাঘাট, নদীয়া

॥ ৭ ॥

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরীর 'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' লেখাটি (২৫-২) পড়লাম। যাঁরা প্রবীরবাবুর জীবননাশের হুমকি দিচ্ছেন তাঁদের ধিক্কার জানাই। প্রকৃত ধর্ম বুজরুকির ধার ধারে না। মহাভারত বলছে .

"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনাঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্মঃ"—অর্থাৎ যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম। মনুর মতে—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (অচৌর্য), শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ। হারীতের মতে, 'যাতে উন্নতি হয়, তাই শ্রেয়, তাই ধর্ম।' যাজ্ঞবল্কের মতে, 'যা কু-কার্য ও কলুষ থেকে সকলকে নিবৃত্ত করে' সৃষ্টিকে রক্ষা করছে, তাই ধর্ম। বিবেকানন্দের মত সৎকর্মই ধর্ম এবং যা নিজের কল্যাণ করে ও জগতের হিতসাধন করে তাই ধর্ম।'

প্রকৃত গুরু যাঁরা তাঁরা কোনও দিন ধান্দায় ছোটেন না।

রাধাকৃষ্ণ প্রধান। ডায়মণ্ডহারবার

॥ ৮ ॥

আমরা দুর্গাপুরে যুক্তিবাদী সংগঠন করেছি যার নাম 'লৌকিক'। 'লৌকিকের' পক্ষ থেকে গৌতম ভারতী ও তাঁর অন্ধ বিশ্বাসধারী শিষ্যদের এইটুকুই জানিয়ে রাখছি যে, প্রবীর ঘোষ ও তাঁর বিজ্ঞান সংগঠন কর্মীদের মৃত্যুর হুমকি দেওয়ার আগে একটু চিন্তা করে নেবেন।

উৎপলকুমার দে। দুর্গাপুর-১০

॥ ৯ ॥

মিথ্যাচার তথা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমেই কুরু-পঞ্চালে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাবা-প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। পঞ্চালের আর্য জন-সমিতির তৎকালীন সেনাপতি 'বধ্র্যশ্ব' কয়েকটি যুদ্ধ জয় করে সমগ্র আর্যসমাজের সম্মান লাভ করে। এই সুযোগে আত্মসুখ ও অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগের লোভে 'বধ্রশ্ব' জন-সমিতির ক্ষমতা খর্ব করে রাজা প্রথার প্রবর্তন ঘটায় আর বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রের পূর্বপুরুষকে উৎকোচ দিয়ে তাদের 'বাবা-পদে' বসায়। পরিবর্তে এই বাবারা প্রচার করেছিল—ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ, বিশ্বদেব এবং অন্যান্য দেবতারা রাজাকে পাঠিয়েছেন পৃথিবীর প্রজাকে শাসন করবার জন্য। অতএব সাধারণ মানুষ যেন রাজার হুকুম মেনে চলে আর যথাবিহিত সম্মান করে। এর সবটাই ছিল বেইমানী। 'বাবাদের' মিথ্যাচারের ফলে পঞ্চালের আর্য-সমাজের গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল। পরবর্তীকালে বধ্রশ্য-পৌত্র দিবোদাসের রাজত্বে 'বিশ্বামিত্র বাবাগিরি করে জনগণকে প্রতারিত করেছিল। আজ গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজত্বে ভারতীরা শূন্য থেকে মায়ের দেওয়া সন্দেশ এনে খাওয়াচ্ছে আর বিজ্ঞান কর্মীদের (এঁরাও পারেন শূন্য থেকে রসগোল্লা, সন্দেশ আনতে) মেরে ফেলবার হুমকি দিচ্ছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ঘৃণ্য রাজনীতির আবর্তে সরাসরি অন্যায়ের বিরোধিতা করতে গিয়ে কে কতটা প্রশাসনিক সাহায্য পাবেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জনপ্রতিনিধি বা আমলারা যেখানে বাবাদের দ্বারস্থ হন সেক্ষেত্রে সাহায্য পাবার আশা দুরাশা মাত্র।

অভিজিৎ বোস। বহড়া, উঃ ২৪ পঃ

॥ ১০ ॥

গৌতম ভারতী জানিয়েছেন, তিনি আসলে কিছুই করেন না। মা (?)-ই সব করে থাকেন। তা হলে প্রবীরবাবুকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি কেন 'ভক্তদের' সাহায্য নিচ্ছেন? এখানে কি তাঁর 'মা' ব্যর্থ? তাঁর ভক্তরা কাগজগুলোকেও দেখে নেবে—এমন হুঙ্কারও তিনি ছেড়েছেন। তাঁর এই হুঙ্কারের কারণ কী? তিনি কি অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছেন?

চিত্তরঞ্জন পাল। হাওড়া-৩

॥ ১১ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শীর্ষক খবরটি (২৫-২) পড়ে বুঝলাম সক্রেটিসের হাতে বিষ তুলে দেওয়ার যুগ থেকে অনেকটা এগিয়ে আসার অহঙ্কারটা আমাদের মিথ্যে। অলৌকিক শক্তিধরদের বুজরুকির ভিত হল মানুষের প্রশ্নহীন অন্ধ বিশ্বাস। সেই ভিতে নাড়া পড়লে মিথ্যার মিনারটি মিলিয়ে যাবার আশঙ্কায় বিপন্ন বোধ করে তাঁরা তো ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় নেবেনই। কারণ ধোঁকাবাজিই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন।

জ্যোতিরুণা মুখোপাধ্যায়। খড়্গপুর

॥ ১২ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' প্রতিবেদনটি পড়লাম।

প্রবীর ঘোষ গত এক দশকের চেনা নাম। তথাকথিত 'সর্বজ্ঞ' 'অমুক বাবা' 'তমুক ব্রহ্মচারী'দের যে কোন অলৌকিক ক্ষমতাই নেই যৌক্তিক পদ্ধতিতে তিনি সে কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাঁর বিজ্ঞানমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য কোথায় তাঁকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করব তা নয়, তিনি আজ বিপন্ন হতে বসেছেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে পুলিশও ইতিকর্তব্য পালনে বিমুখ।

তিমিরবরণ চঁদ। গুসকরা, বর্ধমান

॥ ১৩ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' (২৫-২) প্রতিবেদন পড়ে অবাক হলাম ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে কি বাক-স্বাধীনতা লোপ পাচ্ছে?

মনোজ ভোজ। কলকাতা-৬

॥ ১৪ ॥

'অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শীর্ষক সংবাদে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হলাম। দেশেব দুববস্থাব অন্যতম প্রধান কাবণ হল এই সব 'গুরুবাবা'। বর্তমানে মানুষেব ভাবনা অনেক উন্নত হয়েছে, যুক্তি ছাড়া কোনও কিছুকে কেউ মেনে নিতে পাবছে না। তাই 'মাযেব সুপুত্তুব'বা মাযেব নামে ভয় দেখিযে বা জোব কবে সাধাবণ মানুষকে তাদেব চেলা বানাতে চাইছে।

পার্থসাবথি বিশ্বাস। হেতিযা, বাঁকুড়া

॥ ১৫ ॥

দীপ্তেন্দ্র বাযচৌধুবীব প্রতিবেদন 'অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন' (২৫-২) এবং 'ঐশী শক্তিব জয' বিজ্ঞাপন (১৯-২) প্রকাশেব জন্য যুগপৎ অভিনন্দন ও ধিক্কাব। কিছু অসাধু লোক ধর্মেব দোহাই দিযে লোক ঠকাচ্ছে। প্রবীববাবু তাদেব মুখোশ খুলে দিযেছেন। এতেই তাদেব গাত্রদাহ, শিবঃপীড়া। ওবা খুনেব হুমকি দেয। যুগে যুগে এটাই হযে আসছে।

সঞ্জীবকুমাব বায। মঙ্গলবাড়ি, মালদহ

॥ ১৬ ॥

২৫-২-৮৯ তাবিখেব আনন্দবাজাব থেকে জানলাম, অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী প্রবীব ঘোষ বিপন্ন। খুবই স্বাভাবিক—কাবণ, প্রবীববাবু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে 'অলৌকিক শক্তিধবদেব' মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তাঁদেব ভণ্ডামি জনসমক্ষে ফাঁস কবে ফেলছেন যে। আসলে অল্প আযাসে প্রচুব অর্থ বোজগাবেব লোকঠক্যানি ব্যবসায ভাটা পড়ে যাবাব আশঙ্কায বুদ্ধিমান জোচ্চোবেব দল নিজেবাই বিপন্ন হযে প্রবীব ঘোষেব প্রাণনাশেব এমন আদিম বর্ববোচিত হুমকি দিচ্ছে।

যে সব 'ভক্ত' মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিযে জনগণকে ধোঁকা দেবাব চেষ্টা কবে, তাবা যে স্রেফ বুজরুকদেব দালাল সেটা সাধাবণ লোকেও বোঝে। দালালবা হাতসাফাই-এব কাযদা-জানা এক একজন লোককে কবাযত্ত কবে অবতাব ছাপ দিযে দেয। আব এইভাবেই হাজাব হাজাব কুসংস্কাবাচ্ছন্ন অসহায বোকা লোককে ঠকিযে আদায কবা লাখ লাখ টাকাব দান-প্রণামী নিজেদেব মধ্যে ভাগ কবে নেয।

অশোক প্রামানিক। বীবভূম

॥ ১৭ ॥

তথাকথিত অলৌকিক শক্তিধবদেব বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী প্রবীব ঘোষেব দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও বুজরুকদেব দ্বাবা তাঁব প্রাণনাশেব হুমকিব সংবাদ আপনাদেব কাগজে মুদ্রিত কবাব জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

আশিসকুমাব নন্দী। ত্রিবেণী

॥ ১৮ ॥

'ঐশী শক্তির জয়' বিজ্ঞাপনটি যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল, 'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শীর্ষক রিপোর্টে সেই বিভ্রান্তির অবসান ঘটেছে। ইচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতার বা হুমকির দ্বারা কখনও প্রকৃত সত্যের গতিরোধ করা যায়নি, যাবেও না। 'অলৌকিক শক্তিধর' বুজরুকের দল সাবধান।

স্বস্তিক সেনগুপ্ত। স্কটিশ চার্চ কলেজ

॥ ১৯ ॥

ধর্মগুরুরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে-যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের প্রাণদণ্ডের হুমকি দিতে শুরু করেছেন। আগেও বিজ্ঞানীকে মরতে হয়েছে কিছু ধর্মগুরুর নির্দেশে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়েও ধর্মগুরুদের হিংসামূলক কাজকর্মে উসকানিতে কিছু মানুষকে উৎসাহিত হতে দেখে অবাক লাগে।

মলয়কুমার দাস। কেশিয়াড়ি, মেদিনীপুর

॥ ২০ ॥

'অলৌকিক শক্তিধরদের চ্যালেঞ্জ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' খবরটি পড়ে স্তম্ভিত হচ্ছি। প্রবীর ঘোষকে যাঁরা হত্যার হুমকি দেখাচ্ছেন তাঁদের জানা উচিত একজন প্রবীর ঘোষের মুখ বন্ধ করা যায় হয়তো, কিন্তু সত্যের মুখ বন্ধ করা যায় না।

আশিসকুমার চক্রবর্তী। জগদীশপুর, হাওড়া

॥ ২১ ॥

আনন্দবাজারের খবর (২৫-২-৮৯) থেকে জানলাম যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ তথাকথিত বাবাদের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর উপর নাকি দৈহিক আক্রমণও হতে পারে। এটা প্রমাণ করে যে, যাঁরা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করেন, তাঁরা ভয় পেয়েছেন। এবং এইখানেই প্রবীরবাবুর সাফল্য।

অমল রায়চৌধুরী। চন্দননগর।

ভূতুড়ে সম্মোহনে মনের মত বিয়ে : কাজী সিদ্দিকীর চ্যালেঞ্জ

'আলোকপাত' জানুয়ারি ১৯৮৮ সংখ্যায় পাঠকদের অধিকার বিভাগে "দোষ ধর্মের নয়, ব্যক্তির" শিরোনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি লিখেছিলেন চুরুলিয়া, বর্ধমান থেকে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী। চিঠিটা খুবই কৌতূহল জাগানোর মত এবং

তারই সঙ্গে যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে একটি জোরালো চ্যালেঞ্জ। চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম।

আলোকপাত নভেম্বর '৮৭ সংখ্যায় 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয় ?' পড়লাম। প্রবীর ঘোষ মহাশয়ের চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই, বিজ্ঞান বিশ্ব সৃষ্টি করেনি এবং নিয়ন্ত্রকও নয়।
মূলত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন প্রভেদ নেই। সূক্ষ্মতাত্ত্বিক ব্যাপার হেতু সাধারণ বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না। এই তত্ত্বকে প্রখ্যাত সূফী সাধক জোলনুন থেসরী তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

১) ঈশ্বরের একত্ব তত্ত্ব, এই জ্ঞান সাধারণ বিশ্বাসীদিগের।

২) প্রামাণিক ও যৌক্তিক তত্ত্ব, এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের।

৩) একত্রে গুণ-রাশির তত্ত্ব, এই জ্ঞান ঈশ্বর প্রেমিক ঋষিদিগের।

এই সূত্রানুসারে প্রবীরবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। এখানে ধর্মের ভড়ং করে কেউ যদি প্রতারণা করে তাহলে তা ধর্মের দোষ নয়—দোষ ব্যক্তির। এই জাতীয় প্রতারণা ধরে বিজ্ঞানের মহিমা গাথায় ধর্মকে অস্বীকার করা অহংকারের প্রকাশ মাত্র—এটা অযৌক্তিক ও অসমীচীন। এই অহংকারের বশবর্তী হয়ে তিনি বিরাট অংকের চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। ফটো সম্মোহন বা তান্ত্রিক মতে এ জাতীয় কোন প্রক্রিয়ার ফল হয় কি না জানি না। তবে এমন কিছু প্রক্রিয়া আছে যা আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ বা নারীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমাবেগ বা বিতৃষ্ণা এনে মিলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে দিতে বা বিচ্ছিন্ন করতে পারে। অবশ্যই কোনরূপ প্রচলিত সম্মোহন নয় এটা—সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়া।

প্রবীরবাবুর যদি তাঁর পরিচিত কোন নারীকে প্রকৃতই জীবন সঙ্গিনী করার ইচ্ছে থাকে তাহলে কোন ছবি-টবি নয় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রকৃত তথ্য দিলেই হবে। তথ্যগুলো অবশ্যই অপার্থিব নয়।

যদিও তিনি ফটো-সম্মোহন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন তবুও তিনি আগ্রহী হলে তাঁর এ প্রক্রিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।

প্রকাশ থাকে যে তাঁর ঘোষিত অর্থের আমার কোন প্রয়োজন নেই। মিলনের সূত্রপাত ঘটলে তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর ঘোষিত অর্থ কোন নির্মীয়মাণ মুসলিম ছাত্রীআবাসে বা কোন অরফ্যানেজে নিজ পছন্দ মত দান করে দেবেন।

কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী'র চিঠিটি আমার নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে ৭ জানুয়ারি একটি উত্তরও পাঠিয়ে দিই 'আলোকপাত' পত্রিকার দপ্তরে। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

আলোকপাত জানুয়ারি '৮৮ সংখ্যায় 'পাঠকদের অধিকার' বিভাগে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী'র একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটিতে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় তিনি আমার মনের মত নারীকে আমার জীবন সঙ্গিনী করে দিতে পারেন। কাজী জানতে চেয়েছেন আমি তাঁর চ্যালেঞ্জ

গ্রহণে আগ্রহী কি না ? চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছেন অহংকারের বশবর্তী হয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করে বসেছি।

উত্তরে বিনীতভাবে জানাই—এই চ্যালেঞ্জ কোনও অহংকার নয়, এই 'চ্যালেঞ্জ' যুক্তিবাদী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়াতেই এই 'চ্যালেঞ্জ'। অবতার, জ্যোতিষী, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার ও তাঁদে উচ্ছিষ্টভোগী এবং অন্ধভক্তদের কাছে অথবা কিছু ঈর্ষাকাতরদের কাছে 'চ্যালেঞ্জ' 'অশোভন' 'অহংকার' ইত্যাদি মনে হতেই পারে, কারণ 'চ্যালেঞ্জ' বাস্তব সত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু 'চ্যালেঞ্জ' বিষয়ে জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, সত্য প্রকাশিত হয়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন ? অলৌকিকতার বিরুদ্ধে এই চ্যালেঞ্জ যুক্তিবাদী আন্দোলনের, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের অতি শক্তিশালী হাতিয়ার।

আমি বিবাহিত। তাই আমার মনের মত নারীকে জীবনসঙ্গিনী করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার এক তরুণ চিকিৎসক বন্ধু অনিরুদ্ধ কর অবিবাহিত। কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী যদি অনিরুদ্ধের পছন্দমত এবং আমার নির্দেশ মত মেয়েটিকে অনিরুদ্ধর জীবনসঙ্গিনী করে দিতে পারেন তবে অনিরুদ্ধের বিয়ের সাত দিনের মধ্যেই কাজী সাহেবের ইচ্ছে মত প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা, এবং সেই সঙ্গে স্বীকার করে নেব—পৃথিবীতে অলৌকিক ঘটনার অস্তিত্ব আছে।

কাজী সাহেবের কথা মত মেয়েটির 'কয়েকটি প্রকৃত তথ্য' অবশ্যই দেব, উপরন্তু দেব মেয়েটির একটি ছবি।

কাজী সাহেব যদি বাস্তবিকই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তবে মেয়েটির তথ্য ও ছবি কাজী সাহেবের হাতে তুলে দেওয়ার পর দেব ৬ মাস সময়, এই সময়ের মধ্যে অনিরুদ্ধের পছন্দমত মেয়েটির সঙ্গে তিনি বিয়ে ঘটিয়ে দিতে পারলে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব। নতুবা ধরে নেব কাজীসাহেব পরাজিত।

প্রবীর ঘোষ

আমার চিঠিটা আজ পর্যন্ত 'আলোকপাত'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি। কাজী সাহেবের চ্যালেঞ্জ যে অনেককেই নাড়া দিয়েছিল তারই প্রমাণ পাই যখন দেখি '৮৮ ফেব্রুয়ারি 'পরিবর্তন'-পত্রিকা আমার একটি সাক্ষাৎকার নিতে এসে কাজী সাহেবের প্রসঙ্গটি তোলেন। ৩০ মার্চ '৮৮ সংখ্যার 'পরিবর্তন'-এ দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে কাজী সাহেবের প্রসঙ্গটুকু শুধু তুলে দিচ্ছি।

"পরিবর্তন 'আলোকপাত' জানুয়ারি '৮৮ সংখ্যায় বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ার জনৈক কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় আপনার মনের মতো নারীকে আপনার জীবন সঙ্গিনী করতে পারেন। পরবর্তী দুটো সংখ্যা 'আলোকপাত'-এ এমন কোনও খবর চোখে পড়লো না যাতে লেখা আছে আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। আপনি কি তবে পিছু হটেছেন ধরে নেব ?

শ্রীঘোষ ৭ জানুয়ারি একটি চিঠি দিয়ে 'আলোকপাত' সম্পাদককে জানাই, 'আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।' এইটুকু বলতে পারি চিঠিটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। চিঠির প্রতিলিপিটি আপনি দেখতে পাবেন।"

এখনও কাজী সাহেবের জন্য চ্যালেঞ্জ খোলাই রইলো, তবে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সময়ের মধ্যে যদি ডাঃ অনিরুদ্ধ কর বিয়ে করে ফেলেন তবে আমার অন্য কোনও অবিবাহিত বন্ধুর পছন্দ মত মেয়েকে বন্ধুটির জীবন সঙ্গিনী করতে হবে।

অনিরুদ্ধ আমাকে এই প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মেয়েটিকে পছন্দ করার পর কাজী সাহেব যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করে আক্ষরিক অর্থে তাঁর হাতে-পায়ে ধরে আমার সঙ্গে বিয়ে ঘটিয়ে দেয়?"

আমি বলেছিলাম, "আপনার শ্রীদেবী, রেখা, অথবা তার চেয়েও কোনও দুর্লভ মেয়েকে বিয়ে করতে কোনও আপত্তি নেই তো৷" দুর্লভ মেয়েদের যে সব নাম বলেছিলাম, তাতে অনিরুদ্ধ প্রাণ খুলে হো-হো, করে হেসে বলেছিলেন, "কাজী সাহেব আপনার চিন্তার হদিশ পেলে চ্যালেঞ্জ জানাবার দুঃসাহস দেখাতেন না।"

ভূতের দুধ খাওয়া

মেদিনীপুর জেলার 'গোলগ্রাম গ্রামোন্নয়ন সংস্থা'র আমন্ত্রণে আমাদের সমিতির সদস্যরা ও আমাদের সহযোগী ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার সভ্যরা '৮৮-র ১১ ফেব্রুয়ারি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান করতে যান।

গ্রামোন্নয়ন সংস্থার তরফ থেকে গুণধর মুর্মু অনুষ্ঠানের মাস দুয়েক আগে যখন প্রথম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তখনই তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলাম, ডেবরা ও গোলগ্রাম অঞ্চলের ওঝা, গুণিন, জানগুরু সখারা কী কী তথাকথিত অপ্রাকৃতিক ক্ষমতা দেখিয়ে স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। উদ্দেশ্য, সেই সব অপ্রাকৃতিক ক্ষমতার পরিচয়ই আমাদের সমিতির সভ্যরা অনুষ্ঠানে দেবেন এবং তারপর প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতার লৌকিক কৌশলগুলো দর্শকদের বুঝিয়ে দেবেন। এর ফলে স্বভাবতই ওঝা, গুণিন, জানগুরু, সখাদের লোকঠকানো ব্যবসা বন্ধ হবে। ইতিপূর্বে আমরা এই ভাবে কাজ করে যথেষ্ট সফলতা পেয়েছি।

আমাদের ছেলেরা ওখানে গিয়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের সাড়া জাগিয়েই অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই সঙ্গে সভায় এই ঘোষণাও করেন—আপনারা যদি কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা চান, আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন অথবা গোলগ্রাম গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনাদের জানতে চাওয়া অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে দেব।

ওই সভাতেই গ্রামোন্নয়ন সংস্থারই এক কর্মকর্তা গুণিন এন কে মান্নার কথা জানান। মান্না ওই অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি সাধারণ মানুষদের সামনে বহুবার প্রমাণ করেছেন ভূত আছে। ভূত নিয়ে এসে প্রমাণ করেছেন ভূতের অস্তিত্ব। কেমনভাবে ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন? একটা কাচের গ্লাসে তাড়ি রাখা হয়; তাড়ির গ্লাসে-র

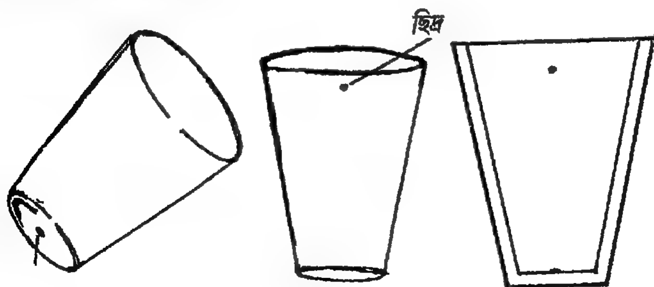
উপব তিনি একটি মডাব মাথা বসিযে দেন। নানা ধবনেব মন্ত্র-তন্ত্রেব সাহায্যে নবমুণ্ডকে জাগ্রত কবেন। নবমুণ্ড তখন চোঁ-চোঁ কবে গ্লাসের তাড়ি পান কবতে থাকে। শ্রীমান্না ভক্তদেব নানা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধাবেব ব্যবস্থা কবে দেন, নানা সমস্যা সমাধানেব উপায বাতলে দেন। এই সবই তিনি কবেন ভূতেব পবামর্শমত। বাংলা চলচ্চিত্রেব অতি জনপ্রিয এক নাযকও নাকি মাঝে মধ্যে শ্রীমান্নাব কাছে আসেন।

আমাদেব ছেলেবা সেখানেই এই ঘটনাব ব্যাখ্যা দিতে পাবেননি। জানিযেছিলেন, এই বিষযে তাঁবা নিশ্চযই যত তাডাতাডি সম্ভব গোলগ্রামেব মানুষদেব কাছে ব্যাখ্যা হাজিব কববেন।

সমিতিব সভ্যবা ফিবে এসে শ্রীমান্নাব বিষযটি আমাকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদেব ছবি এঁকে বোঝাতে চেষ্টা কবেছিলাম, স্রেফ লৌকিক কৌশলেই বাস্তবিকই এই ধবনেব ঘটনা ঘটানো সম্ভব।

২১ ফেব্রুযাবি দমদম কিশোব ভাবতী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিনিধি ও অঞ্চলেব বিজ্ঞানকর্মীদেব নিযে সাবাদিনব্যাপী এক কুসংস্কাব বিবোধী শিক্ষা শিবিবেব আযোজন কবি। সেখানে শ্রীমান্নাব ভূতে তাডি খাওযাব প্রসঙ্গটি আলোচনা কবি। হাজিব কবি একটি দুধ ভর্তি গ্লাস, অর্থাৎ তাডিব অভাবে দুধ। একটি মডাব খুলি গ্লাসেব উপব চাপিযে বিড-বিড কবতেই দর্শকবা অবাক হযে দেখলেন গ্লাস থেকে কোন অলৌকিক ক্ষমতায দুধ দ্রুত কমে যাচ্ছে। দর্শকদেব বিস্ফাবিত দৃষ্টিব সামনে ব্যাখ্যা হাজিব কবতেই বিস্ফাবিত চোখে নেমে এলো আনন্দেব জোযাব।

কৌশল মডাব খুলিতে ছিল না। কৌশল ছিল না দুধে বা শ্রীমান্নাব তাডিতে। কৌশল যা ছিল, সবই ছিল গ্লাসে। দুটি ভিন্ন মাপেব স্বচ্ছ প্লাস্টিক গ্লাস জুডে তৈবি কবা হযেছিল গ্লাসটি। একটি গ্লাস যত বড আব একটি গ্লাস তাব চেযে সামান্য ছোট। দেখতে হবে ছোট গ্লাসটা যেন বড গ্লাসটাব মধ্যে ঢুকে যায। ছোট গ্লাসেব তলায একটা ছোট্ট ফুটো কবা বযেছে। বড গ্লাসেব উপবে কানা ঘেসে ওই ধবনেবই আব একটা ফুটো বযেছে। দুটো গ্লাসেব কানা এমনভাবে জুডে দেওযা যাতে সামান্যতম বাতাস ওই কানাব কোনও অংশ দিযে ঢুকতে না পাবে। ছবিতে গ্লাস দুটো এঁকে বোঝাবাব চেষ্টা কবছি।



ভিতবেব ছোট গ্লাস *বাইবেব বড গ্লাস*

এবার গ্লাসের ভিতর দুধ ঢাললে ছোট গ্লাসের ফুটো দিয়ে দুধ দু-গ্লাসের ফাঁকে এসেও জমা হয়। বড় গ্লাসের কানায় যে ফুটো আছে সেটা সেলোটেপ দিয়ে বন্ধ করে দিই। এবার গ্লাসটা উপুড় করে দিলে ছোট গ্লাসের দুধ যায় পড়ে। দু'গ্লাসের মাঝে ঢুকে থাকা দুধ থেকেই যায়। নরমুণ্ডটা গ্লাসে বসিয়ে মন্তর পড়ার সময় সেলোটেপটা খুলে নিতেই বাইরের বাতাস বড় গ্লাসের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়তে চাপ দিতে থাকে। বাইরের বাতাসের চাপে ছোট গ্লাসের ফুটো দিয়ে দুধ বেরিয়ে এসে ছোট গ্লাসের তলায় জমতে থাকে এবং দু'গ্লাসের ফাঁকে আটকে থাকা দুধ দ্রুত কমতে থাকে। এক সময় ছোট গ্লাস ও দু'গ্লাসের ফাঁকের দুধ একই সমতলে এসে হাজির হয়। দর্শকরা দেখতে পান, বিশ্বাস করেন নরমুণ্ডই দুধ খেল, পড়ে রইল সামান্য তলানি।

পরবর্তীকালে গোলগ্রামের "অলৌকিক নয়, লৌকিক" অনুষ্ঠানে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'-র সভ্যরাই ভূতের তাড়ি খাওয়ার রহস্য উন্মোচন করেন স্থানীয় মানুষদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে।



তারপর থেকে এখন পর্যন্ত বহু সংস্থাই "অলৌকিক নয়, লৌকিক" শিরোনামের অনুষ্ঠানে এই ঘটনাটি ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন।

'জাগ্রত' নরমুণ্ড সিগারেট টানল তারাপীঠের মহাতান্ত্রিক নির্মলানন্দের নির্দেশে

১৬ জানুয়ারি '৯০ আজকাল পত্রিকায় চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। তিন কলম জুড়ে ছবি সহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে অলৌকিক বিশ্বাসীদের ও অলৌকিক ব্যবসাদারদের নব বলে বলীয়ান করবে, কিছু দোদুল্যমান মানুষকে অলৌকিকতায় বিশ্বাসীদের শিবিরে টেনে নিয়ে যাবে, কিছু যুক্তিবাদীদেরও অস্বস্তি ঘটাবে, বিভ্রান্ত করবে।

প্রতিবেদনটি এই রকম

'জাগ্রত' নরমুণ্ড সিগারেট টানল

আজকালের প্রতিবেদন গা ছমছমে তারাপীঠ শ্মশানেই শুটিং হচ্ছে 'তান্ত্রিক' ছবির। এই ছবিতে অভিনয় করছেন তারাপীঠের মহাতান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ স্বয়ং। দ্বারকা নদীর ধারে তারাপীঠ শ্মশানের ওপরেই নির্মলানন্দ তীর্থনাথের ছোট আশ্রমটাই লোকেশনে। আশ্রম না বলে একটা ছোটখাটো খুঁড়েঘরই বলা উচিত। যার মধ্যে বসে নির্মলানন্দ তান্ত্রিক সাধনা করেন। তাঁর বেদির নিচেই পোঁতা রয়েছে একটা ন বছরের মেয়ের মৃতদেহ। ঘরের চারধারে নরমুণ্ড সারি সারি সাজানো। মাঝখানে হোমকুণ্ড। এর মধ্যে একটা নরমুণ্ডের পুরোপুরি অভিনেতা।

তন্ত্র নিয়েই ছবি। পরিচালক অঞ্জন দাসকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাহায্য করছেন তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ নিজেই। তন্ত্র হল বিজ্ঞান, কোণের দিকে আঙুল তুলে নির্মলানন্দ বললেন, এটা জাগ্রত। আমিই জাগিয়ে রেখেছি একে। দিনে সিগারেট ও খাবেই। বলেই একটা সিগারেট নরমুণ্ডের মুখে গুঁজে দিলেন তীর্থনাথ। নরমুণ্ড সিগারেট খেতে শুরু করল অবিকল জীবন্ত মানুষের মত। নির্মলানন্দ এদিকে শুটিং জোনে গিয়ে নিজের সংলাপ বলে এলেন। সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমারের সামনে। এ ছবিতে তন্ত্রের সমস্ত ধারাই আসবে। আসবে শবসাধনা। যেখানে মৃতদেহ সরাসরি চিতা থেকে তুলে আনবেন নির্মলানন্দ তীর্থনাথ। পরিচালক অঞ্জন দাস নিজেই এই তান্ত্রিক ছবির আলোকচিত্রী। তাঁর ভয় এই সব দৃশ্য তিনি ক্যামেরায় সাহস করে শেষ অবধি ধরতে পারবেন কিনা।

'তন্ত্র'কে আকর্ষণীয় করার জন্যে এই ছবিতে একটা গল্প থাকছে। আর সেখানেই অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার প্রমুখরা। আসলে তন্ত্রের গোপন রহস্যকে তুলে ধরার জন্যেই এই ছবি। আর সেই শর্তেই এই ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হয়েছে তারাপীঠ শ্মশানের তান্ত্রিক নির্মলানন্দ ও তাঁর সাধন মা শুক্লাতিথি বসু।

রাতের শ্মশানে চিতায় হোম সেরে ভোর হতেই শুটিংয়ে নেমে পড়ছেন এখন তারাপীঠের তান্ত্রিক। যিনি দীর্ঘ বার বছর সাধনার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, তাঁকে ফিল্মে বন্দী করার মত কঠিন কাজ করছেন পরিচালক অঞ্জন দাস।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য জানতে চেয়ে রাশি রাশি চিঠি এলো।

২৬ ফেব্রুয়ারি সমিতির তরফ থেকে একটা চিঠি পাঠালাম 'আজকাল' পত্রিকার দপ্তরে। ৬ মার্চ চিঠিটি প্রকাশিত হল।

জাগ্রত নরমুণ্ড একটি চ্যালেঞ্জ

১৬ ফেব্রুয়ারির আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'জাগ্রত নরমুণ্ড সিগারেট টানল' প্রতিবেদনটি পড়ে জানতে পারলাম 'তান্ত্রিক' ছবির শুটিং হচ্ছে তারাপীঠ শ্মশানে। তন্ত্র-সাধনা নিয়ে তোলা হচ্ছে ছবিটি। তন্ত্র-সাধনাকে তুলে ধরার স্বার্থে অভিনয়ে রাজি হয়েছে তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ ও তাঁর সাধন মা শুক্লাতিথি বসু। ছবিটির পরিচালক অঞ্জন দাস। নির্মলানন্দ নাকি দাবি করেছেন—তন্ত্র হল বিজ্ঞান। তিনি নাকি নরমুণ্ডকে তন্ত্রবলে জাগ্রত করে রাখেন। প্রমাণ হিসেবে নরমুণ্ডের মুখে গুঁজে দিয়েছিলেন একটা সিগারেট। নরমুণ্ড সিগারেট টানতে লাগল অবিকল জীবন্ত মানুষের মত।

'আজকাল'-এর মত একটি সমাজ সচেতন ও যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসারে অগ্রণী পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় স্বভাবতই বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমার ও আমাদের সমিতির বক্তব্য জানতে চেয়ে রাশি রাশি চিঠি এসেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউন বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে আমাদের সমিতির 'অলৌকিক নয় লৌকিক' অনুষ্ঠানে তিনজন জাগ্রত নরমুণ্ডের সিগারেট টানার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে ব্যাখ্যা চান। একজন তো কাগজের কাটিংটি পর্যন্ত হাজির করেছিলেন। সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির অবসান কল্পে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্মলানন্দকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। তিনি নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্য সমাবেশে কৌশল ছাড়া মড়ার খুলিকে দিয়ে সিগারেট টানাতে পারলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং সমিতির কয়েক'শত সহযোগী সংগঠন ও শাখা সংগঠন তাঁদের সমস্ত রকম অলৌকিক বিরোধী কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকবেন। প্রণামী হিসেবে আমি দেব ৫০ হাজার টাকা। এই চিঠিটি 'আজকাল'-এ প্রকাশিত হওয়ার দশ দিনের মধ্যে নির্মলানন্দ আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করলে অবশ্যই ধরে নেব নির্মলানন্দ একজন বুজরুক, প্রতারক। যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তবে আমরা তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাঁর অলৌকিক

ক্ষমতাব পবীক্ষা নেব।

প্রবীব ঘোষ
সাধাবণ সম্পাদক
ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।
কলকাতা-৭৪

চিঠি প্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ দেখা কবে, ফোনে অথবা চিঠিতে অভিনন্দন জানালেন, এঁদেব অনেকেবই বক্তব্য ছিল, "আপনাব চ্যালেঞ্জে নির্মলানন্দ আসবেন না। যতসব ফালতু ব্যাপাব।" আমাব স্ত্রী সীমাব তবলচী গোবিন্দ লাহিড়ি ৮ তারিখ সকালে এসে জাগ্রত নবমুণ্ড প্রসঙ্গটি তুলে জানালেন, "গোবক্ষবাসী বোডে এক জ্যোতিষী থাকেন। যিনি আবাব তান্ত্রিকও। প্রায় শনিবাবই তাবাপীঠে যান। পবশুও আমি ও আমাদেব পাড়াব কযেকজন 'আজকাল'টা নিযে গিযেছিলাম দেখাতে। আমবা বললাম, নির্মলানন্দ কি প্রবীববাবুব চ্যালেঞ্জ নেবেন ? তান্ত্রিক ভদ্রলোক বললেন, নির্মলানন্দকে খুব ভালবকমই চিনি। তাবাপীঠেব সব তান্ত্রিককেই চিনি। নিজেও তন্ত্র বিষযটা ভালবকম জানি। তন্ত্রেব কেউ নবমুণ্ডকে জ্যান্ত কবে সিগাবেট খাওযাবে এমন আজগুবি গপ্পো কোন দিন শুনিনি। পত্রিকাব সাংবাদিক সিনেমাকে তোল্লা দিতে নিজেই বানিযে টানিযে ওসব লিখে দিযেছে।"

গোবিন্দবাবুকে বললাম, "আপনাদেব পাড়াব তান্ত্রিকটি বেজায় ধূর্ত। তাই সাংবাদিকেব উপব দাযিত্ব চাপিযে নির্মলানন্দকে ও তন্ত্রশক্তিকে বাঁচাতে চাইছেন। আপনাব তান্ত্রিক প্রতিবেশী নবমুণ্ডেব সিগাবেট খাওযা ব্যাপাবটা ঘটানো একেবাবেই অসম্ভব বলে সাংবাদিকেব উপব খববটিব সব দায-দাযিত্ব চাপাতে চাইছেন বটে, কিন্তু যদি প্রমাণ কবে দিই নবমুণ্ডকে দিযে সিগাবেট খাওযানো আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব তখন তিনি কী বলবেন ? যে চিঠিটা আজকাল পত্রিকায প্রকাশেব জন্য দিযেছিলাম, তাব থেকে শেষ কিছু অংশ প্রকাশ কবা হযনি। প্রকাশিত হলে ওই তান্ত্রিকবাবাজী ও কথা বলতেন না।'

"শেষ অংশে কী ছিল ?" গোবিন্দবাবু জানতে চাইলেন।

'অফিস কপি' বেব কবে ওই অংশটুকু পবে শোনালাম

"প্রসঙ্গত জানাই, ২৫ ফেব্রুয়াবি '৯০ লেকটাউন বইমেলাব অনুষ্ঠানে দর্শকদেব কাছ থেকে চেযে নেওযা একটি ছবিব মুখে সিগাবেট গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বেলে দিতেই ছবিটি সিগাবেট টেনেছে, বিং ছেড়েছে জীবন্ত মানুষেব মতই। উপস্থিত দর্শকবাই সাক্ষী। ঘটনাটা ঘটিযে ছিলাম লৌকিক কৌশলে, ছবিব ভূতকে জাগ্রত কবে নয়।

একই সঙ্গে পবিচালক অঞ্জন দাসেব কাছে দাবি জানাচ্ছি—সত্যেব নামে মিথ্যা প্রচার কবা থেকে এবং অন্ধকাব যুগে ফিবিযে নেওযাব চেষ্টা থেকে বিবত থাকুন অথবা আমাদেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবে প্রমাণ করুন তন্ত্র হল বিজ্ঞান।'

আশা বাখি আমাদেব এই দাবিব সঙ্গে প্রতিটি সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও গণসংগঠন একমত হবেন এবং সোচ্চাব হবেন।"

৯ মার্চ '৯০ বর্তমান পত্রিকাতেও ছবি সহ চাব কলম জুড়ে একটি প্রতিবেদন

প্রকাশিত হলো—বাংলায় তন্ত্র নিয়ে ছবি হচ্ছে—তান্ত্রিক। প্রতিবেদনটির শেষ অংশে ছিল—"তারাপীঠের শ্মশানে দাঁড়িয়ে শুটিং স্পটে নির্মলানন্দ বলেছিলেন, 'তন্ত্রের প্রভাব এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। কিছু অপপ্রয়োগে তন্ত্র নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হচ্ছে। তন্ত্র এখনও জাগ্রত।'—সেই সময় জনৈক সাংবাদিক বলে ফেললেন, 'দেখাতে পারবেন?'—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলেই পাশের কুটিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন বিশাল হোমকুণ্ডর সামনে সার সার খুলি। সেই খুলির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট দিলেন—অবিকল মানুষের মত সেই খুলি সিগারেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। সাংবাদিকরা বিস্মিত হলেন—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।

১৯ মার্চ '৯০ বর্তমান পত্রিকায় এর উত্তরও প্রকাশিত হলো 'জনমত' বিভাগে।

তান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ জানালো যুক্তিবাদী সমিতি

৯ মার্চ 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলায় তন্ত্র নিয়ে ছবি হচ্ছে—তান্ত্রিক' প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ একটি মড়ার খুলির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দিয়ে দেখালেন যে সেই খুলি সিগারেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। অর্থাৎ এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, 'তন্ত্র এখনও জাগ্রত'।

'বর্তমান'-এর মত একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় স্বভাবতই জনমনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমার ও আমাদের সমিতির মতামত জানতে চেয়ে রাশি রাশি চিঠি এসেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউন বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে আমাদের 'অলৌকিক নয় লৌকিক' অনুষ্ঠানে তিনজন জাগ্রত নরমুণ্ডের সিগারেট টানার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে ব্যাখ্যা চান। কারণ ইতিপূর্বে অন্য একটি পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। একজন তো ঐ পত্রিকার কাটিং পর্যন্ত হাজির করেছিলেন। সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির অবসানকল্পে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্মলানন্দকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তিনি নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্য সমাবেশে কৌশল ছাড়া মড়ার খুলিকে দিয়ে সিগারেট টানাতে পারলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ও সমিতির কয়েকশো সহযোগী সংস্থা এবং শাখা সংগঠন তাদের সমস্ত রকম অলৌকিক-বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবে। প্রণামী হিসেবে আমি দেব ৫০ হাজার টাকা।

এই চিঠিটি 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে নির্মলানন্দ আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করলে অবশ্যই ধরে নেবো নির্মলানন্দ পিছু হটেছেন। যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তবে আমরা তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণের একমাসের মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ নেবো।

প্রসঙ্গত জানাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউনে বইমেলার অনুষ্ঠানে দর্শকদের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া একটি ছবির মুখে সিগারেট দিয়ে আগুন জ্বেলে দিতেই ছবিটি



একটি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে সিগারেট টানছে মড়ার খুলি

সিগারেট টেনেছে, রিং ছেড়েছে জীবন্ত মানুষের মতই। উপস্থিত দর্শকরাই সাক্ষী। ঘটনাটা ঘটিয়ে ছিলাম লৌকিক কৌশলে, ছবির ভূতকে জাগ্রত করে নয়।

একই সঙ্গে পরিচালক অঞ্জন দাসের কাছে দাবি জানাচ্ছি সত্যের নামে মিথ্যা প্রচার করা থেকে এবং মানুষকে অন্ধকারের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। অথবা আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রমাণ করুন 'তন্ত্র' হলো বিজ্ঞান'।

প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮, দেবীনিবাস রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৪

৩১ মার্চ '৯০ 'আজকাল' পত্রিকায় নির্মলানন্দের পাল্টা চ্যালেঞ্জ প্রকাশিত হয়। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

জাগ্রত নরমুণ্ড : পাল্টা চ্যালেঞ্জ

৬ মার্চের আজকালে 'জাগ্রত নরমুণ্ড : একটি চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক চিঠি চোখে পড়ল। চিঠিটি লিখেছেন প্রবীর ঘোষ। বলতে বাধ্য হচ্ছি, চ্যালেঞ্জ করাটা প্রবীর ঘোষ

মহাশয়ের একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। ওঁর চিঠিতে 'বুজরুকি' কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে বলেই নেশা কথাটা লিখতে বাধ্য হলাম। হয়তো ওঁর জানা নেই, আত্মার কোন মৃত্যু নেই এবং অভেদানন্দের লেখা 'মরণের পরে' বইটাও হয়ত পড়া নেই। তন্ত্র সাধনা আত্মা নিয়ে খেলা এবং এটা বই পড়ে হয় না। এজন্য চাই কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা। ওর প্রণামীর চাইতে তারা মা এবং গুরুর আশীর্বাদ আমার কাছে যথেষ্ট। নরমুণ্ডের সিগারেট টানার ব্যাপারটা বিতর্কিত ছবির মধ্যে নেই কারণ আমার সাধনার বস্তু কখনই এভাবে প্রকাশিত করা যায় না। তবে বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকেরা যখন ছবির শুটিং দেখতে যান তখন অন্য সকল দর্শনীয় দ্রব্যের সঙ্গে এই নরমুণ্ডের সিগারেট টানা দেখে অবাক হন। তাঁরা পত্রিকায় একথা প্রকাশ করেন। চ্যালেঞ্জ থেকে চ্যালেঞ্জে আসতে বাধ্য হলাম। প্রবীর ঘোষ যেন এই চিঠি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার দশ দিনের মধ্যেই নিজের হাতে আমার সামনে এসে পরীক্ষা করেন। ঐ পরীক্ষা ঐ মহাশ্মশান বা আশ্রমেই করতে হবে। কারণ সাধনার বস্তু কখনই বাজারের ফলমূলের মত তুলে আনা যায় না। যদি উনি না আসেন, তাহলে আমার যা করণীয় তা করব। আমি তান্ত্রিক না সাধক জানি না তবে মাকে নিয়ে পড়ে আছি।

নির্মলানন্দ তীর্থনাথ।
তারাপীঠ মহাশ্মশান।
চণ্ডীপুর। বীরভূম।

৪ এপ্রিল '৯০ 'বর্তমান'—পত্রিকাতেও প্রকাশিত হলো নির্মলানন্দের চিঠি।

প্রসঙ্গ : তান্ত্রিক

গত ৯ মার্চ 'বর্তমান' সংবাদপত্রে 'বাংলায় তন্ত্র নিয়ে ছবি হচ্ছে তান্ত্রিক' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল, আমি সাংবাদিকদের সামনে একটি মাথার খুলির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দেওয়ায় সেই খুলি সিগারেটে ঘনঘন টান দিচ্ছিল। একথা সম্পূর্ণ সত্যি। এরপর গত ১৯ মার্চ আমায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ একটি চিঠি লিখেছেন। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জানাই, স্বামী অভেদানন্দের লেখা বইটি হয়ত তাঁর পড়া নেই। আত্মার কোনও মৃত্যু নেই। তন্ত্র সাধনা আত্মা নিয়ে খেলা এবং এটা বই পড়ে হয় না। কঠোর পরিশ্রম, সাধনা সেই সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা থাকলে তবেই এটা সম্ভব হয়। নরমুণ্ডের সিগারেট টানার ব্যাপারটা 'তান্ত্রিক' ছবির মধ্যে নেই। সাংবাদিকরা অন্য সকল দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে এটা দেখে অবাক হয়ে যান এবং একথা পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

আমি চ্যালেঞ্জের জবাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে বাধ্য হলাম। এই চিঠি প্রকাশিত হবার দশ দিনের মধ্যে প্রবীরবাবু যেন নিজের হাতে আমার সামনে এই পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা তারাপীঠের মহাশ্মশানেই করতে হবে। কারণ, সাধনার বস্তু কখনই বাজারের

ফলমূলের মত তুলে আনা যায় না। যদি উনি না আসেন তবে আমার যা করার তাই করবো। আমি তান্ত্রিক না সাধক জানি না—তবে মা-কে নিয়ে পড়ে আছি। পত্রলেখককে অভিনন্দন সহ শ্মশানবাসী এই অনভিজ্ঞ-র এই আবেদন রইল।

নির্মলানন্দ তীর্থনাথ
তারাপীঠ মহাশ্মশান, চণ্ডিপুর, বীরভূম

'আজকাল' ও 'বর্তমান' দুটি পত্রিকাতেই আমরা বক্তব্য পাঠালাম ১ এপ্রিল ও ৪ এপ্রিল '৯০। কিন্তু চিঠি দুটি যে কোনও কারণে হোক প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ছিল। আমরাই কয়েক শো চিঠি পেয়েছি—যেগুলোতে পত্রলেখক জানতে চেয়েছিলেন নির্মলানন্দের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করেছি কি না?

আজকাল পত্রিকায় পাঠান চিঠিটির একটি প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ করলাম। 'বর্তমান' পত্রিকাতেও এই বক্তব্যের চিঠিই পাঠিয়েছিলাম।

১-৪-৯০

৩১ মার্চ আজকাল পত্রিকায় 'জাগ্রত নরমুণ্ড পাল্টা চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে প্রকাশিত চিঠিটি পড়লাম। তাঁর চিঠির প্রথম অভিযোগের উত্তরে জানাই, 'চ্যালেঞ্জ' ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কর্মধারার বিভিন্ন পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় মাত্র। আমাদের সমিতি কুসংস্কার ও জাতপাতের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে আমরা তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের মধ্যে হাজির হয়ে তাদেরই সঙ্গে মিশে গিয়ে কুসংস্কার ও তার মূল কারণগুলোর বিষয়ে সচেতন করছি, নাটক, প্রদর্শনী, গণসংগীত, প্রতিবেদন, বইপত্র, আলোচনাচক্র, শিক্ষাচক্র, ইত্যাদি মাধ্যমে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলে দেব। সাধারণ মানুষকে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' মুক্ত করতেই আমাদের চ্যালেঞ্জ। যতদিন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' থাকবেল ততদিন 'নেশা' কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জের নেশাও থাকবে।

নির্মলানন্দ জানিয়েছেন, স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পরে' বইটা হয় তো আমার পড়া নেই। উত্তরে বিনীতভাবে জানাই বইটির নাম 'মরণের পারে', 'পরে' নয়। কিন্তু বইটির প্রসঙ্গ টানলেন কেন, বুঝলাম না। আমার পড়া থাকা বা না থাকায় কি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়?

বইটি পড়া আছে। অভেদানন্দের কথা মত আত্মা মানেই 'চিন্তা', চেতনা', বা 'মন'। শরীর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জেনেছে, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ-কর্মের ফলই হলো 'চিন্তা', 'চেতনা' বা 'মন'। মানুষের মৃত্যুর পর তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই চিন্তারূপী চৈতন্যরূপী আত্মারও মৃত্যুর পর বাস্তব

অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

নির্মলানন্দের পরীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম নিরপেক্ষ স্থানে এবং প্রকাশ্যে। একবারের জন্যেও অনুরোধ করিনি, আমাদের সমিতির কার্যালয়ে এসে তাঁকে প্রমাণ দিতে হবে। জানতাম নির্মলানন্দ কখনই নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যে কোনও কৌশল ছাড়া নরমুণ্ডুকে সিগারেট খাওয়াতে পারবেন না। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই উনি প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ স্থানে হাজির হতে অক্ষমতা জানিয়েছেন। নারাজ হওয়ার পিছনে একটি কুযুক্তিও হাজির করেছেন—"কারণ সাধনার বস্তু কখনই বাজারের ফলমূলের মত তুলে আনা যায় না।"

সিনেমার তো এখন আন্তর্জাতিক বাজার। সেই বাজারে সাধনার ফলকে হাজির করতে পারলে নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যে হাজির করতে অসুবিধে কোথায়? ওঁর আশ্রমে আমি গেলে আমি হারলেও হারবো, জিতলেও হারবো।

চিঠির শেষে নির্মলানন্দ যে প্রচ্ছন্ন হুমকী দিয়েছেন, আমার বা আমাদের সমিতির কাছে সেটা নতুন কিছু নয়। এর আগে যখনই আক্রান্ত হয়েছি, দুর্বার জনরোষ আক্রমণকারীদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আক্রমণকারীরা কখনও হয়েছে ফেরার, কখনও বা সচেষ্ট হয়েছে আত্মহননে।

নির্মলানন্দকে আবারও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, প্রকাশ্য নিরপেক্ষ স্থানে আপনার ক্ষমতার পরীক্ষা দিয়ে কৌশল ছাড়া নরমুণ্ডুকে দিয়ে সিগারেট খাওয়ান। আর প্রকাশ্য স্থানটা কলকাতা প্রেস ক্লাব হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ধৃষ্টতা যদি নির্মলানন্দ দেখান, তাঁর মাথা যুক্তিবাদের কাছে নত হতে বাধ্য হবে। আবারও প্রমাণ হবে অলৌকিকত্বের অস্তিত্ব আছে শুধু কল্পকাহিনীতে।

ঠাকুরনগর খেলার মাঠে ১৩ এপ্রিল বিকেল তিনটেয় আমাদের সমিতির 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে নির্মলানন্দের ছবিকে দিয়েই সিগারেট খাওয়াবো। নির্মলানন্দসহ উৎসাহিতদের উপস্থিতি কামনা করছি।

শুভেচ্ছা সহ
প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮, দেবীনিবাস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৭৪।

এরপরও আরও কিছু বলার রয়ে গেছে। নির্মলানন্দকে রেজেস্ট্রি ডাকে একটি চিঠি পাঠাই ২৬ ৫-৯০। দীর্ঘ চার পৃষ্ঠার চিঠির প্রথম অংশটা ছিল 'আজকাল' ও 'বর্তমান'-এ পাঠান জবাব—যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। শেষ অংশটুকু আপনাদের কৌতূহল মেটাতে তুলে দিচ্ছি।

"ইতিমধ্যে আমরা বহু 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের অনুষ্ঠানে ছবিকে

দিয়ে সিগারেট পান করিয়েছি। ছবি সিগারেট টেনেছে জীবন্ত মানুষের মতই। পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতেও যে কোনও নিরপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যেই এমন ঘটনা ঘটিয়ে দেখাবেন আমাদের সমিতির বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থার হাজার হাজার সভ্যরা। এর জন্য আমরা আশ্রয় নিয়েছি তন্ত্রের নয়, কৌশলের।

মাসিক পত্রিকা 'আলোকপাত' পাঠে জানলাম, আপনি নরকঙ্কালের মুণ্ডুকে দিয়ে কারণবারিও পান করান। ইতিমধ্যে আমাদের সমিতি ও কয়েকশত সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠন নরমুণ্ডুকে দিয়ে দুধ (মদের পরিবর্তে) পান করিয়ে দেখিয়েছেন অন্তত কয়েক হাজার অনুষ্ঠানে।

আমাদের সঙ্গে আপনার পার্থক্য, আমরা এগুলো ঘটিয়ে দেখিয়ে কোনও অলৌকিক ক্ষমতার দাবি রাখি না। আপনি এগুলো ঘটিয়ে দাবি করেন অলৌকিক ক্ষমতার।

যেহেতু নরমুণ্ডুকে দিয়ে সিগারেট পান বা মদ্যপান লৌকিক কৌশলেই করা সম্ভব, তাই আপনার অলৌকিক ক্ষমতার দাবি বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্যোতিষ ক্ষমতার দাবিদারদের দাবির যথার্থতা জানতে সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি। আপনি একজন সৎ মানুষ হলে আমাদের এই সৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে আপনার দাবির ক্ষেত্রে আমাদের সত্যানুসন্ধান চালাতে সমস্তরকম সহযোগিতা করবেন—এ আশা রাখি।

আগামী ১৬ জুন রবিবার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সময় বিকেল চারটা। সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আপনি মড়ার খুলিকে জাগ্রত করে সিগারেট ও মদ খাওয়াতে পারলে আমি ও আমাদের সমিতি পরাজয় স্বীকার করে নেবো। তবে অবশ্যই ঘটনাগুলো আপনাকে ঘটাতে হবে কৌশল ছাড়া।

আমাদের সমিতির এই সত্যানুসন্ধান বিষয়ে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেব আপনার তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাগুলো আর যাঁদেরই দেখান না কেন, আমাদের নিরপেক্ষ পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আপনিও আমাদের মতই কৌশলের সাহায্যেই ঘটনাগুলো ঘটিয়ে থাকেন।

শুভেচ্ছা সহ
প্রবীর ঘোষ

না, নির্মলানন্দ চিঠিটি গ্রহণ করেননি। সম্ভবত প্রেরক হিসেবে আমাদের সমিতির ও আমার নামটিই চিঠিটি গ্রহণ করার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিঠিতে পুরো ঠিকানাই অবশ্য ছিল।

শ্রীনির্মলানন্দ
তারাপীঠ মহাশ্মশান, চণ্ডীপুর, বীরভূম।

নির্মলানন্দের জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ আজও রইল। সাধ্য থাকলে যেন গ্রহণ করেন।

ছয়

ডাইনি ও আদিবাসী সমাজ

ডাইনি লাগা

'বর্তিকা' পত্রিকাব '৮৭ সালেব জানুযাবি-জুন সংখ্যাব জন্য লেখাব আমন্ত্রণ পেযে, অজিত সিং একটি লেখা পাঠান। লেখাটি প্রকাশিত হয। পত্রিকাটিব সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী। অজিত সিং তাঁব একটি অভিজ্ঞতাব কথা জানিযেছিলেন। আপনাদেব অবগতিব জন্য লেখাটি এখানে তুলে দিলাম

আপনাব দেওযা পত্র পাইযা, আপনাব পত্রিকাব জন্য চাওযা বিষয নিম্নে লিখিযা পাঠাইলাম।

ডাইনি আজকাল কেউ বিশ্বাস কবে না, কাবণ বিজ্ঞানেব যুগ,—কিন্তু আমি কবি। এ বিশ্বাস আমাব জন্মেছে গল্প শুনে নয, ডাইনি শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কি দেখেছি—বলছি।

আজ থেকে কিছুদিন আগেকাব ঘটনা। আমি দাঁডিযে খেলা দেখছিলাম। বেশ জমানো তাস খেলা হচ্ছে। এমন সময একজন এসে খবব দিল যে, ইন্দ্রেব মাকে ডাইনি লেগেছে। সবাই খেলা ছেডে ইন্দ্রেব বাডী গেল। গিযে দেখি ইন্দ্রেব মা ভুল বকাবকি কবছে। হঠাৎ এই অবস্থা দেখে কেউ যেন কূলকিনাবা পাচ্ছে না। কাবণ সবাই দেখছে ইন্দ্রেব মা এখনি পুকুব থেকে স্নান কবে গেছে।

এব আগে তো এমন দেখিনি। যাবা ডাইনি বিশ্বাস কবে তাবা বলছে হযতো জ্বব হযনি, যাবা বিশ্বাস কবে না তাবা বলছে হযতো জ্বব তুলেছে, কিন্তু জ্বব তুললে তো গাযেব তাপ পবিবর্তন হয। ইন্দ্রেব মাকে দেখে মনে হয না যে, তাব জ্বব তুলতে পাবে, কাবণ সে তাকিযে চুপচাপ বসে আছে। এই অবস্থায দেখে গ্রামে এক ওঝা আছে, তাকে ডাকা হলো। ওঝাকে দেখে ইন্দ্রেব মা যেন অন্য মূর্তি। ওঝা তাব কাছে গিযে বসলো। ওঝাব কাছে ছিল একটি আলো এবং একটি হাডিব লাটা। ইন্দ্রেব মা তখন আলোব দিকে তাকাযনি, অন্যদিকে তাকিযে আছেন। "আলোটাব দিকে একবাব মুখ ঘুবা মা"—এই বলে ওঝা আলোটা তাব মুখেব দিকে নিযে যায। তখন ইন্দ্রেব মাযেব মুখ ঢাকা নিযে অন্য দিকে তাকায এবং একটু কবে হাসছে। তখন ওঝা বাইবে এসে ইন্দ্রকে বলে যে, "প্রকৃত ডাইনি ভব কবেছে।" ওঝাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, "কি কবে বুঝলে যে ডাইনি ভব কবেছে" ? ওঝা তাব উত্তবে আমাদেবকে বলল, তাব কতগুলো

নিযম আছে, "যেমন আলোব দিকে তাকায না, আতা পাতা দিলে তাব বাগ হয । যদি না বিশ্বাস হয যা দেখি একজন আতা পাতা নিযে তাব কাছে দিযে আয ।" কিন্তু কে যাবে—সবাই এব মনে একটা ভয আছে। গৌব নামে বছব ৩৫/৩৬ এব একজন লোক এই কথা শুনে কিছু আতা পাতা নিযে তাব কাছে গেল । যেমনি বিছানাব কাছে এসেছে, তেমনি সে তাকে তাড়া কবে নিযে যেতে লাগল। গৌব তখন কি তার বিছানায আতা পাতা দিবে—ভযে ঘব থেকে পালিযে এলো। তাবপব আবাব সে বকাবকি আরম্ভ কবে দিল। ওঝা বাবণ কবে বলল, "শুধু শুধু তাব সঙ্গে লাগিস না ।"

তখন আব কেউ না লাগিযে ওনাব বহস্য দেখতে লাগল। ওঝা একটি পাত্রে কিছু আগুন বেখে, মুখে কি বিড বিড কবে বলল, তাবপব আগুনেব মধ্যে কিছু ধূনা ফেলে দিল। তখনই ইন্দ্রেব মা "ছাড—ছাড, আমি ঘব যাব," এই বলে ওঝাব কাছ থেকে চলে এলো। কিছুটা গিযে ইন্দ্রেব মা ফিবে এলো। এইভাবে ওঝা তিন-চার বাব কবাব পবে ও যখন তাব গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পাবল না, আবাব সে ফিবে এলো। ওঝা তখন বুঝতে পাবল যে, এখন ডাইনিব ভব তাব গা থেকে যাবে না। সন্ধ্যাব সময যাবে। ওঝাব এই কথা শুনে একজন বলল যে, কোথাকাব ডাইনি, কোন ডাইনি ভব কবেছে ? ওঝা কোনো মতেই এই প্রশ্নেব উত্তব দিতে বাজি হয নাই। কাবণ তাব বিশ্বাস ডাইনি সহজে তাব নাম এবং বাড়ী কোথায বলে না। বেশী আলতু-ফালতু জিজ্ঞাসা কবলে কণ্ঠা ফেলে দেয। তবু তাকে কোনো মতে বাজি কবান গেল। ওঝা তখন ইন্দ্রেব মাকে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা কবছে যে, "তুমি কোথায এসেছো ?" এব উত্তবে ইন্দ্রেব মা বলল, "কেন আমাব পুত্রাবাড়ি এসেছি। আবাব কি জিজ্ঞাসা কবতে এসেছো ? আমাব দবকাব ছিল তাই এসেছি ?" তুমি কবে এসেছ ? "কাল থেকে এসেছি।" এই কথা শুনে সবাই মনে ভাবতে লাগল কোথাকাব ডাইনি কেউ বুঝতে পাবছে না। ওঝা জিজ্ঞাসা কবছে, "ঘব কখন যাবে ?" "সন্ধ্যাব সময় যাব"। তোব কয ছেলে মেযে ? আমাব তিন ছেলে এক মেযে। ইন্দ্রেব বাবা তোব কে হয ?—"ভাশুব হয"। ওঝা তাবই বাড়ীব সামনেব এক ছেলেকে লক্ষ্য কবে বলল—"এ কে হয ? একে চিনতে পাবলাম না।" তখন বুঝতে পাবা গেল কোথাকাব ডাইনি। ওঝা ইন্দ্রেব বাবাকে কাছে ডাকল, কাছে যেতে ইন্দ্রেব মা ভাশুব আসছে বলে মাথায ঘোমটা তুলে ওঝাব কাছ থেকে সবে যেতে লাগল।

ইন্দ্রেব বাবাকে ওঝা বলল যে, "গ্রামেব যাবা ডাইনি বলে পবিচয, তাদেব কাবো তো তিনটি ছেলে এবং একটি মেযে নেই। পাশাপাশি গ্রামেব যাবা ডাইনি বলে পবিচয তাদেবকে লক্ষ্য কবলাম। সাতভাণ্ডাবী গ্রামেব একজনেব তিনটি ছেলে ও একটি মেযে। কাল তাদেব বাড়ী গিযেছিল ধানেব ব্যাপাবে নিযে। সবাই জানে সে খুব শান্ত ডাইনি। যাক্ এখন কিছু কবাব নেই। সন্ধ্যায যা হবাব হবে। সন্ধ্যাব সময ওঝা তাব কাজ শুরু কবল। চাব পাঁচ জন লোক ডেকে বলল, "আমি এখন ধূনাব ছাঁট মাবব, তোমবা খুব শক্ত কবে ধববে। আব ছাড়া হযে গেলে তাব পেছন ছাডবে না। মাটিতে বেশী জোবে পডতে দেবে না"। এই বলে ওঝা মুখে কি বিডবিড কবে বলল, তাবপব ধূনাব ছাঁট মাবল। ধূনাব ছাঁট মাবতে কি কবে বাখবো ছাড ছাড বলে,—ছুটে ঘব থেকে বেবিযে এলো এবং বাস্তায এসে দডাম কবে পডল। সেখান থেকে তুলে আনলে

আবাব ধূনা ছাঁট মাবল, এবাবও তাকে তুলে আনল। তাব ঘব কোথা জিজ্ঞেস কবল না। তাকে ধবতে না পাবলে ঘব জিজ্ঞাসা কী কবে কববে। এবাব খুব শক্ত কবে ধববে এবং ঘব জিজ্ঞেস কববে। এই বলে ওঝা মুখে কি বিড বিড কবে বলল এবং মাবলো ধূনাব ছাঁট। তাবা খুব শক্ত কবে ধবে জিজ্ঞাসা কবল, "তোব ঘব কোথা ? ছাড বলছি।" এবাব তাব গ্রামেব নাম সাতভাগুবী বলে ঘব থেকে বেবিযে এলো। কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা কবতে পাবল না। তাবপব বাস্তা থেকে তুলে আনল এবং আবাব ধুনাব ছাঁট মাবল, কিন্তু আব কিছু হলো না। তখন ইন্দ্রব মা খুব ক্লান্ত হযে পডেছে। ওঝা তখন বলল, তাব গাযে ডাইনি আব ভব কবে নেই। তাকে বিছানায শুইযে দিল এবং ইন্দ্রেব বাবাকে বলল, কাল যদি এইভাবে বকাবকি কবে বা কাউকে না চিনতে পাবে, তবে ওঝাকে যেন ডাকে। স্বাভাবিক থাকলে ডাকতে হবে না। সহজেই এইভাবে ডাইনি ধবা যায।

এই ঘটনাটি নিযে আলোচনায যাওযাব আগে 'বর্তিকা'ব ওই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত শ্রীগঙ্গাধব মাহাত'ব অভিজ্ঞতা আপনাদেব শোনাতে চাই

'ডাইনি', শব্দটা অশবীবী, অলৌকিক আব অলৌকিক মানেই তাব কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই (অন্তত সাধাবণেব কাছে), আব আমবা যেহেতু ইলেকট্রনিকস্-এব যুগে বাস কবছি সেহেতু স্বভাবতই এব পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক ধাবণা (যদিও মৌলিক নয) চালাবাব চেষ্টা কবি আব সেখানেই আমবা সব থেকে বেশি ভুল কবি বলেই আমাব ধাবণা। আমাব অবশ্য বিজ্ঞান চিন্তাধাবা অনেকটা সীমিত তবু এব মধ্যেই বিশ্লেষণ কবাব চেষ্টা কবি, কোনও দিন সফলকাম হতে পাবিনি। মানুষকে বোঝাবাব চেষ্টা কবি এসব এক ধবনেব বোগ কিন্তু কী বোগ তাব কোন সফল ব্যাখ্যা দিতে পাবি না কাবণ আমি নিজেও জানিনা ব্যাপাবটা আসলে কী ?

একটা ঘটনাব কথা উল্লেখ কবি, কযেকদিন আগে আমাবই এক বন্ধুব বোন, বযস ৯/১০ বছব, হঠাৎ শুনলাম তাব নজব লেগেছে। গ্রামেব লোকেব কথায ডাইনি লেগেছে। তডিঘডি কবে ছুটলাম, আমাব বাডিব ৩০০ গজেব মধ্যে তাব বাডি। গিযে দেখি মেযেটি মুখ ঢেকে হাত-পা ছুঁডছে কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে। মুখ থেকে হাত সবিযে দেবাব চেষ্টা কবলাম তখন তিন জন সমর্থ পুরুষ হিমসিম খেযে গেলাম তাকে সামলাতে। এবাব গ্রামেব প্রথামত আতা পাতা বিছানায দিলাম। তখন সেকি ছটফটানি সামলে বাখা দায। ছেডে দিলাম, সবিস্ময়ে দেখলাম সমস্ত পাতাগুলো ফেলে না দেওযা পর্যন্ত তাব যেন স্বস্তি নেই। সবাই একমত হলেন যে ওকে ডাইনি ভব কবেছে ওঝা ডাক্তাব ব্যবস্থা কবা হলো। অবশ্য আমবা মানে আমি এবং আমাব বন্ধু যাবপবনাই চেষ্টা কবলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ওঝা এসে মন্ত্র পডে ধুনোব এ বামব ('একটি পলতেতে আগুন জ্বালিযে সেই শিখাব উপব দিযে ধুনোব গুঁডোব ঝাঙটা মাবা' এতে অনেক সময বোগিণীব চামডা পুবে যায চুল পুডে যায) মাবতেই সে চিৎকাব কবে উঠলো 'ছেডে দে আমি যাবো'। বলেই বিছানা থেকে ধডমডিযে উঠে দৌড লাগাল এবং একটি বাডিব দবজাব সামনে পডে গেলো। সেই বাডিব একজন মধ্যবযস্কা স্ত্রীলোক 'ডাইনি' বলে পবিচিত। এব কোন বৈজ্ঞানিক কাবণ আমি খুঁজে পাইনি।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি ঘটেছিলো আজ থেকে একবছর আগে, আমার মায়ের ক্ষেত্রে, সবেমাত্র টাইফয়েড ছেড়ে পথ্য করেছেন, দেহ বেশ দুর্বল হাঁটা চলা করেন খুব কম। ঘরের পাশাপাশি সকাল বিকাল একটু বেড়ান। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। সেদিনটা ছিল শনিবার স্কুল থেকে ফিরে মাকে ওষুধ খাওয়ানোর জন্য গিয়েছি। হাত ঘড়িতে তখন বেলা তিনটে। দেখি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মা শুয়ে আছেন আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। আমি ডাকলাম, 'মা ওষুধ খাবে ওঠ' কোন সাড়া নেই, বিড়বিড় করে কী বলছেন শুনতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। গায়ে হাত দিয়ে একটু জোরের সঙ্গে ডাকলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর 'কে তোর মা'। আমি আবার বললাম 'মা আমি গঙ্গাধর'। "দূর শালা দিদি বলতে পারিস না ? আমি তোর মা নই, আমি তোর দিদি।" ভয়ে বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না, প্রথমে ভাবলাম মা কি পাগল হয়ে গেলেন ? পথ্য করার পর থেকে যিনি কথা বলতে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি এত জোরে কথা বললেন কী ভাবে। হাত ধরে ওঠাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু এত জোরে ঝটকা দিলেন আমি খাট থেকে নিচে নেমে এলাম। অবাক হলাম। যিনি হাঁটতে পারেন না এত জোর পেলেন কোথা থেকে। এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো, মন সন্দিহান হয়ে উঠলো। বাড়ির অন্যান্য লোকদের খবর দিলাম। তাঁরাও এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন একই ধরনের উত্তর। যেমন কাকা এসে বৌদি ডাকতেই বলে উঠলেন 'দূর বেহায়া আমি তোর কাকী হই, লজ্জার মাথা খেয়েছিস।' সবার মনে সংশয় ঘনীভূত হল। এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু মুখ থেকে কাপড় একটুও সরাননি, বিড়বিড় করা অব্যাহত আছে। বাড়ির ও আশেপাশের প্রবীণ-প্রবীণারা আতা পাতা এনে বিছানায় দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাতাগুলি ক্ষিপ্রতার সহিত উনি বিছানার নিচে ফেলে দিলেন। অতঃপর ওঝা এলো, মন্ত্র পড়লো। মা খাট থেকে নেমে বাইরে গেলেন এবং একটি ঘরের দরজার পাশে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন। আমরা সবাই ধরাধরি করে খাটে এনে শুইয়ে দিলাম। প্রচণ্ড ঘাম হলো আর তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আগেও যাঁর শক্তি আমাদের পরাভূত করেছিলো তিনি এখন জ্ঞানহীন, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় অল্পক্ষণেই জ্ঞান ফিরলো। দুচোখ বড় বড় করে আমাদের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন মনে হলো অন্য কোন গ্রহ থেকে আসা আগন্তুকদের দেখছেন।

ভুতে পাওয়া নিয়ে আগে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, সে আলোচনার আলোকে আপনাদের নিশ্চয়ই বুঝতে সামান্যতমও অসুবিধে হচ্ছে না যে তিনটি ক্ষেত্রেই মহিলা তিনজনই মানসিক রোগের শিকার হয়েছিলেন। এই মানসিক রোগ বিষয়ে ধারণা না থাকলে মনে হতেই পারে, 'ভুতে ভর' বা 'ডাইনি পাওয়া' বিষয়গুলোর পিছনে কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই বলে যে সব ইলেকট্রনিক্স যুগের মানুষ বিষয়টা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা ভুল করছেন।

এও ঠিক, আমরা সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য তুলে দিতে পারিনি। কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে

যতটুকু কাজ কবেছেন, প্রযোজনেব তুলনায তা এতই অপ্রতুল যে মানুষেব মনেব 'ভূত-প্রেত-ডাইনি' মন ছেড়ে নির্বাসনে যাযনি। এই বিষযে সাধাবণ মানুষকে সচেতন কবাব, জানান ও বোঝানোব দাযিত্ব কিন্তু বর্তায প্রধানত বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সবকাবী প্রশাসনেব।

সাঁওতাল সমাজে ডাইনি বিশ্বাস

সাঁওতাল সমাজে ডাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতা বিষযে বিশ্বাস সমুদ্র-গভীব। এই সমাজেব যাঁবা শিক্ষাব আলোকপ্রাপ্ত তাঁদেবও সংখ্যাগবিষ্ঠদেব মধ্যেও ডাইনিদেব অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বিষযে বিশ্বাস গভীব। একই সঙ্গে তাঁবা জানগুরুদেব অলৌকিক ক্ষমতায ও তাঁদেব ডাইনি খুঁজে বেব কবাব ক্ষমতায আস্থাশীল।

যাঁবা ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনে সামিল হযেছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদেব অনেকেই এই বিষযে দ্বিধাগ্রস্ত বাস্তবিকই ডাইনি ও জানগুরুদেব কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে? কী, নেই?

সিংবাই মুর্মু বাঁকুড়া জেলায ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনে নেমেছেন। সিংবাই মুর্মুব কথায—

আমাদেব সমাজে এক শ্রেণীব অসাধু ব্যক্তি আছে, আদিবাসী ভাষায এদেব সানি ও সখা বলে। ভালো কথায জানগুরু। ইনি ভূত প্রেত ধবতে জানেন এবং কেউ ডাইনি হলে ঠিক বকম বলতে পাবলে কিন্তু ডাইনি ছাড়াতেও পাবে অবশ্য সেই জন্য মোটা টাকা দক্ষিণা হিসেবে দাবি কবে। এবং ডাইনি কাউকে কবিলে জবিমানা কবা হয বা দিতে হয। কিন্তু যাব দু মুঠো অন্ন সমযে জোটে না, জীবন শেষ হযে যায তাব পক্ষে মোটা টাকা দেওয়া কি বকম কষ্টকব তা সহজেই অনুমেয। এই ব্যাপাবে আমবা বহু সমাজ সমিতি কবেছি এবং বহু জাযগায আমবা আদিবাসীব সমাজে সে আলোচনা কবেছি কিন্তু তাতেও কোনো পড়েনি—বেশিব দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই ডাইনি বাংলাব বিভিন্ন বাজ্য সবকাবেব কাছে আমাদেব বহুবাব তুলে দিযেছিলাম। কি ভারতবর্ষে সমাজ দিককে নিপুঞ্জকব এবং পুলিশদেব হাতেও এই ব্যাপাবে তুলে দিযেছিল, কিন্তু কোনো ফাযদা হযনি। সে জন্য আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখিত। আমাব জীবনেব যাত্রাতে এ ধবনেব একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা হলো বাংলা ১৩৭৫ সাল ১৫ই আশ্বিন। আমাদেব গ্রামে একটি বৃদ্ধা মহিলা মুড়ি ভাজতে গিযে তাঁহাব বাঁ পাটি উনুনেব ভিতব চলে যায এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব বাঁ পাযেব বাইবেব চামড়া আগুনেব তাপে ঝলসে যায। জ্বলে যাবাব পব স্থানীয ডাক্তাবেব অভাবে তাঁহাব পবিবাবেব লোকেবা জঙ্গলেব মধ্যেব শিকড়-বাকড়েব ওষুধ বেঁধে সেই ঘাযেব উপব লাগাল। কিছুদিনেব পব দেখা গেল ঘা-টি আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে এবং নতুন চামড়া গজাচ্ছে। কিন্তু দুঃখেব ব্যাপাব সেই বৃদ্ধ মহিলা আব স্থিব হতে পাবছেন না, চলা

ফেবাব জন্য অস্থিব। কোনো বকমে আব বাখা গেলো না। যেমনি চলাফেবা কবলেন তেমনি তাঁব পাযেব চামডা ফেটে ঝবঝব কবে বক্ত বেবোতে লাগল। পাযেব অবস্থা আবও মন্দ হযে দাঁডালো। সেই মহিলাব একটি ছেলে, যে হচ্ছে একজন প্রথম শ্রেণীব শিক্ষক। মাযেব কেটে যাওযা ঘা দেখে তাব মধ্যে একটা সন্দেহ ফুটে উঠল। আমাব মা আব ভালো হবে না এবং আমাব মাকে ডাইনি আক্রমণ কবেছে। এতো ওষুধ লাগাচ্ছি ভালো হচ্ছে না কেন ? তাহলে ডাইনি ছাডা কোনো কিছু আক্রমণ কবতে পাবে না। কিন্তু এইটুকু শিক্ষক মশাই বুঝতে পাবলেন না, মাযেব ঘা এখনও শুকোযনি চলাফেবা বন্ধ হোক। কিন্তু তা সে কবল না। তিনি সোজা গ্রামেব মোডলকে আবেদন দিলেন, মাযেব ঘাটি ভালো হতে হতে কেন বক্তঝবণা হয ? এতে নিশ্চযই কিছু আছে।

মোডল শিক্ষক মহাশযেব আবেদন শুনে ঠিক কবল, তাডাতাডি পাডাব লোককে ডেকে এবং মাস্টাব মহাশযেব ব্যাপাবটাব একটা সিদ্ধান্ত নেন। আমবা সবাই মোডলেব নির্দেশ অনুযাযী সব ব্যাপাবটা হ্যাঁ কবলাম কাবণ তাঁব কথা অমান্য কবা মানে সংসাবে আগুন ফেঁকা। কাজেই মোডলেব আদেশ অনুযাযী আমবা সবাই পাডাব লোক তেল ও খডি দেখব। কি কাবণে মাযেব ঘা ভালো হচ্ছে না। সবাই এক হযে একটি ওঝাব কাছে যাওযা গেল। তিনি আমাব হাতে তুলে দিলেন আমাদেব শিক্ষক মহাশয এক মুঠো শালপাতা এবং ২৫০ গ্রাম তেল। সেই তেল দিযা ওঝাবাবু আমাদেব দেবতাকে ধববে। ওঝাবাবু শালপাতায তিন ফোঁটা সবিষাব তেল দিযা পানেব মতন মুডে নিজেব গাযে বুলিযে বাঁ পাযেব বুডো আঙুল দিযে চেপে বাখলেন। মিনিট পাঁচ পবেই সেই শালপাতায নানাবকম ছবি দেখা গেল। এতে আমাদেব কাছে পবিষ্কাব ভাবে দেখিযে দিলেন, তোমাদেব সমস্যাটা পুবোপুবি জানলাম। এটা কোনো পাডাব যোগতী তেল নয, এটা একটা মালিকেব তেল এবং মালিক পাডাব সহযোগিতা নিযেছে। সবাই আমবা হাঁ কবি এবং পবিষ্কাব ভাবে ওঝাবাবু দেখিযে দেন, ঘবেব পশ্চিম পাশে একটি আধাবযস্ক মহিলা আছে। সে বিধবা, সেই মাযেব ওপব অত্যাচাব আক্রমণ চালাচ্ছে। পবিষ্কাব আমাদেব মোডল থেকে পাডাব সবাইকে ওঝাবাবু খুশি কবিযে দেয কিন্তু আমাব কোনো উপায ছিল না কাবণ একে সবাব চেযে বযেসে ছোট তাই বলাব কোনো সুযোগ নাই। পবে সবাই আমবা ওঝাবাবুব মতামত শুনে তাঁকে দশটাকা দক্ষিণা দিযা সবাই আমবা ওখান থেকে সবে যাই। কিছু কিছুদূব আসাব পব আমাদেব মোডলবাবু একটা আদেশ কবেন। কি ব্যাপাব, কতটা সত্য আবও অন্য দুই জাযগাতে দেখা যাক। পবে আমবা একটা আলো নিযে আসব।

সেদিন সকাল থেকে খাওযা-দাওযা নাই সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমবা অন্য আবও দুই জাযগাতে দেখলাম। ব্যাপাবটি সন্দেহজনক, কিন্তু আমি সন্দেহ কবি না। কাবণ যদি মহিলাটি ডাইনি হতেন—তাঁব সন্তানেব আমাব মত বযস, এবং সে ছেলে আমাব সঙ্গে ঘোবাফেবা কবেছে, খাওযা-দাওযা কবেছে। সবাই আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু উপায ছিল না। সেদিন আমবা পাডাব লোক গ্রামে ফিবে আসাব পব মোডলবাবু আব একটি আদেশ কবলেন। আমবা যে তিন জাযগাতে তেল খডি কবলাম আবও আশপাশে তিনটি গ্রামে দিতে হবে। সবাই আমবা আবও তিনটি গ্রামে তেল খডি পৌঁছিযে

দিলাম এবং সবাইকে এক দুই দিনের মধ্যে Result চাইলাম যথাক্রমে আমরা একই দিনে সব লোকের তেল খড়ি মিলিয়ে দেখলাম ঐ পশ্চিম পাশের মহিলাটি ডাইনি বলে, আমাদের তেল খড়িতে বেরিয়েছে আর কোনো কথা নাই—সবাই গেলাম ওঝাবাবুর কাছে। দিন ঠিক করা হোলো এবং মোড়লবাবুর আদেশ অনুযায়ী আমরা সবাই সখা বাবুর কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু যাবার আগে মোড়লবাবু একটি কথা ঘোষণা করেন যেন আমরা সবাই সখাবাবুর কাছে যাব। যাবার আগে আমি একটা কথা ঘোষণা করছি—"আমাদের মধ্যে কেউ যদি ডাইনি হয়, তাকে জরিমানা হিসেবে ৩০০ টাকা দিতে হবে নইলে পাঁচ বিঘা জমি আমরা দখল করে নেব"। আমার কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে অমত। আমার সন্দেহ একান্ত বৃথা। মোড়লের আদেশ অনুযায়ী সকাল ১০টার সময় সখাবাবু মন্দির মুখে জপ করছিল। আমাদের দলবল দেখে সখাবাবু হাসিমুখ করে কিন্তু আমার মুখ শুকনো। আমরা সবাই সখাবাবুর চরণ ধুলো মাথায় নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষক মহাশয় ২৫০ গ্রাম সরিষার তেল সখাবাবুর হাতে তুলে দিলেন। সখাবাবু নিজের দেবতাকে তাঁর ভাষায় কিছু বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ফলাফল জানালেন। "তোমাদের তেলের ভিতর দোষ আছে। যদি তোমরা তেল পরিষ্কার করতে চাও তাহলে আমার দক্ষিণা হিসেবে ৩,০০০ টাকা আমার মন্দিরে রাখ এবং আমি তোমাদের সব কিছু পরিষ্কার করে দেব। কোনো চিন্তা নাই।" কিছুক্ষণ পর সখাবাবু বললেন, "ঘরে একটি বিপদ কিছুদিন আগে হয়েছে কিন্তু তোমরা অনেক কিছু করেছ এতে ঠিক হয়নি। যাক ঠিক হয়ে যাবে।" আমরা চাঁদা করে ৩,০০০ টাকা দক্ষিণা হিসেবে মন্দিরে রাখলাম এবং সখাবাবুর কথা অনুযায়ী মাকে কিছুদিন চলাফেরা বন্ধ করা হোলো। একটা ওষুধ দিলেন, দিনে দুবার লাগানোর জন্য—মা কালীকে স্মরণ করে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া নেই। ভালোভাবে ভুঁড়িটি ভরে দিলেন। আমার করার কিছুই ছিল না। পরে বুঝলাম সব। কিছুদিন পরে বৃদ্ধা ভালো হয়ে যান।

ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনের শরিক এবং ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ গুরুচরণ মুর্মুর কথায় "সান্তাড়দের (সাওতালদের) পুরাতন বৃদ্ধ কথায়" (সাঁওতালি ভাষায়-"হড় করেন মারে হাপড়ামক রেয়াও কথা") আছে কিভাবে একজন জ্ঞানী 'জানগুরু' তাঁর অদ্ভুত সব ক্ষমতার পরিচয় দিতেন। জানগুরু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে বলে দিতে পারতেন রোগীর নাম, রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের নাম। রোগিণী বিবাহিতা হলে তাঁর স্বামীর শ্বশুর-শাশুড়ীর নাম পর্যন্ত বলে দিতে পারতেন। অথচ রোগী বা রোগিণী হয় তো দূর গ্রামের বাসিন্দা, বলতে পারতেন, রোগের কারণ অপদেবতা না ডাইনি। অপদেবতা বা ডাইনির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়ও বলে দিত পারতেন।

গুরুচরণের কথা মত, "তখনকার জানদের (জানগুরুদের) বিশ্বাস করানোর মত কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তবে কি ডাইনিও ছিল ? উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে কোন লোকের যদি অলৌকিক ক্ষমতায় ভাল করার শক্তি থাকে তাহলে অলৌকিক ক্ষমতায় মন্দ করার শক্তিকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক। একজনের অলৌকিক শুভ শক্তিকে স্বীকার করলে অন্য আর একজনের অলৌকিক অশুভ শক্তিকেও স্বীকার

কবতে হয। তন্ত্র সাধনাব গভীবতায না গিযেও বলা যায ষটকর্মেব স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচাটন-মাবণেব কথাও অনৈতিকহাসিক নয।”

সুখেন সাঁতবা ডাইনি প্রথাব বিবোধী। তাঁব ধাবণায, এইসব ডাইনিব মত মধ্যযুগীয প্রথাগুলো তাঁদেব সমাজে আবও বহুদিন প্রচলিত থাকবে। থাকবে না কেন, যে সমাজেব তিন ভাগ মানুষ দাবিদ্র্য সীমাব নিচে আব অশিক্ষা-কুশিক্ষাব মধ্যে বাস কবে সেই সমাজ থেকে এই অন্ধ সংস্কাবেব জগদ্দল পাথবকে ঠেলে সবাবাব মত মহাজন কোথায ?

এইসবই সুখেনেব কথা। আবাব এই সুখেনই বলেন, “বোগীবই অর্ধেক বোগ সেবে যায। এই বকম ভাবে কারো পেটে সাবা হলে পেট ভুটভাট কবলে পাডায পাডায বুডো-বুডিদেব নুনপডা দিতে দেখেছি। অর্থাৎ খানিকটা নুন নিযে মন্ত্র পডে দেয, সেটা জল দিযে তিন দিন খেতে হয। এক্ষেত্রে আমবা দেখেছি পেটে বায়ু জমা বোগীব পক্ষে নুন জল খুব উপকাবি। সেইরকম ভাবে শবীবে কোথাও মোচড লেগে গেলে তেলপডাব বিধান। অর্থাৎ, মন্ত্রপূত সবষেব তেল দিযে মালিশ। এক্ষেত্রে ঐ বোগীব সবষেব মালিশটাই কাজ করে। আবাব শোযাব দোষে ঘাডে ব্যথা লাগলে বোতলে কবে গবম জল ভবে ঘাডে তাপ দিতে দিতে মন্ত্র পডতে দেখিছি। ঐ তাপটাই ঘাডের ব্যথা উপশমেব কাজ কবে এখানে।

এমনি আবো বহুবকম বোগেব বহুবকম ঝাডফুঁক তুকতাকেব ব্যাপাব আছে যেগুলোব সঙ্গে আবাব কোনবকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই মেলে না। যেমন কাউকে সাপে কাটলে আমি গাঁ-গঞ্জেব বহু বোজাকে দেখেছি কেবল মন্ত্র ঝাডফুঁক কবেই তাব বিষ নামিযে দেয। সে বিষধব সাপ হলেও। এইতো কিছুদিন আগে আমাব মাকে বাত্রিবেলা চন্দুবে বোবা কামডে দিল। বিষেব জ্বালায মাযেব শবীব অবশ হযে আসতে লাগল, চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলেন। এইবকম একটি বোগীকে আমাদেবই পাডাব একটি বউ কি একটা গাছেব শিকড দিযে (ওবা নাম বলতে চায না) হাত চেলে আব ঝাডফুঁক দিযে মাত্র ঘন্টাদুযেকেব মধ্যে সাবিযে তুললো। আমাকে অসংখ্যবাব নানা ধবনেব সাপে কেটেছে। কিন্তু আমি কখনো হাসপাতালে যাইনি ঐ ঝাডফুঁকেতেই ভাল হযেছি।

আবাব সাপে কাটা বোগীকে থালা পডা, সবা পডা দিযেও ভাল কবতে দেখেছি। তেমন বোজাও আমাদেব গাঁযে এখনো আছে। পিতলেব থালায মন্ত্র পডে বোগীর পিঠেব ওপব ছুঁডে দেয। সেই থালা চুম্বুকেব মত বোগীব পিঠের ওপব টেনে ধবে। যতক্ষন না বিষ নামে থালা ছাডতে চায না। সরা পডাটা আবাব আবো আশ্চর্যেব ব্যাপাব। বোজা একটা মাটিব সবায মন্ত্র পডে দিযে বোগীকে ঝাডফুঁক কবতে থাকে। এবাব যতক্ষণ না বোগীব দেহ থেকে বিষ নামবে ততক্ষণ ঐ সবা আছাড মেবেও কেউ ভাঙতে পাববে না। তবে কোন সাপে কাটা বোগীকে যদি কোন ডাইনি ভেড়ে দেয তাহলে কোন বোজাব বাপ্যেব সাধ্যি নেই বিষ নামায। এইজন্য কাউকে সাপে কাটলে সে কথা বোজাব কাছে ছাডা কাবো কাছে প্রকাশ কবতে নেই। বলা যায না কাব পেটে কি আছে, যদি ভেডে দেয তখন প্রাণ নিযে টানাটানি। ডাইনিকে তো আব আলাদা কবে চেনা যায না। আমাদেব মতই মানুষ সে। সুতবাং চেনা দায। আমাদের

পাড়াতেও তো এমনি এক ডাইনি বুড়ি আছে। গরুর বাচ্চা হলে এরা বাঁটের দুধ শুকিয়ে দেয় মন্ত্র দিয়ে। সদ্য-প্রসূতি মায়েদের এমন মাথ ভেড়ে দেবে ছেলে আর মাই খাবে না। মাইয়েতে যন্ত্রণা হবে। তখন আবার রোজার কাছে যাও, সে জলপড়া দিয়ে ঝাড়ফুঁক দিয়ে তবে ভাল করবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা মাদুলিও দিয়ে দেয় পাঁচসিকে আড়াই টাকা দাম মূল্য নিয়ে, যাতে ঐ ডাইনিতে পুনর্বার আর মাই না ভাড়তে পারে। গরুর গলাতে জিওলের বোল বেঁধে দিলেও ডাইনিরা আর ভাড়তে পারে না। আবার কারো গায়ে ঘা-ছি হলেও রক্ষে নেই। অমনি ডাইনিরা পাকা আমের মত গন্ধ পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ে দেয় তারা। তখন সেই ঘা আর মোটে সারতে চায় না।

তবে ডাইনিদেরও জব্দ করার রাস্তা আছে। নিজের পায়খানা নিয়ে ওকে খাইয়ে দাও, ব্যাস্, ডাইনি তার মন্ত্র ভুলে যাবে। এমনি একবার এক ঘটনা ঘটেছিল—এক বৌয়ের শাশুড়ী ডাইনি ছিল। তা বৌয়ের পায়ে হোঁচট লেগে খানিকটা কেটে গেছিল। অমনি ডাইনি তা থেকে পাকা আমের গন্ধ পেল। সে আর লোভ সামলাতে পারল না। নিজের বৌকেই ভেড়ে দিল। তা বউতো ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে সারা। কত পয়সা খরচ হতে লাগল, কত ওষুধ খেল কিন্তু সেই ঘা আর ভাল হতে চায় না। হবে কী করে, ঘরেতেই যার ডাইনি। বরং দিনে দিনে তার ঘা আরো বাড়তে লাগল। বউতো মহাচিন্তায় পড়ল। সোয়ামীকে বললে বলে—তোমার জন্যে কি আমি মাকে দূর করে দেব।

চিন্তায় চিন্তায় বউতো শুকোয়। তখন গাঁয়ের এক তিন মাথা বুড়ি তাকে পরামর্শ দিল। বলে,—ওলো বউ, তুই বরং এক কাজ কর, তোর শাউড়ীকে ডালের সঙ্গে গু খাইয়ে দে, দেখবি ও ওর ডাইনি মন্ত্র ভুলে যাবে। নিরুপায় বউ তাই করল। ডাইনিও তার মন্ত্র ভুলে গিয়ে দিনে দিনে রুগ্ন হয়ে একদিন মরে গেল। সেজন্য অবশ্য বউ ডাক ছেড়ে খুব কেঁদেছিল। কারণ শাউড়ী ডাইনি হলেও তার মরণতো সে চায়নি।”

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর “আদিবাসী সমাজের সংস্কার ও কুসংস্কার” লেখাটিতে এক জায়গায় বলছেন, “এটাকে (ডাইনি প্রথাকে) কুসংস্কার কিংবা অন্ধ বিশ্বাস যাই বলি না কেন, ভারতবর্ষের প্রায় সব আদিবাসী সমাজেই এই ক্ষতিকারক বিদ্যার চর্চা দেখা যায়। যদিও সকলেই জানে এর প্রয়োগ অসামাজিক তবুও তারা এর মোহমুক্ত হতে পারেনি। আদিবাসী সমাজের কাছে এটা নিদারুণ অভিশাপ।

অর্থাৎ শ্রীবাস্কের ধারণায়—ডাইনির মত একটা ক্ষতিকারক বিদ্যার-চর্চা চলছে। ক্ষতিকারক মানে? ডাইনি বিদ্যার সাহায্যে, ডাইনি ক্ষমতার সাহায্যে মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব? অর্থাৎ ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে?

শ্রীবাস্কে আরও বলছেন, “অনেক আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস, তুক-তাক ও ইন্দ্রজাল (black magic) বিদ্যায় মেয়েরাই পারদর্শী হয়। স্বাভাবিক কারণেই তারা দুর্বল। সমাজে নানা কাজে পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাদের অনেক কিছু স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে ঋতুবতী নারীর সম্পর্কে কিছু কিছু সংস্কার পৃথিবীর সব সমাজেই প্রচলিত আছে। এই অবহেলার জন্য অনেকে ক্রুদ্ধ হয় আর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এ বিদ্যা আয়ত্ত করে থাকে।”

বাস্তবিকই কী 'ডাইন-বিদ্যা'ব অস্তিত্ব আছে ? ডাইনি-বিদ্যায অন্যেব মধ্যে রোগ সংক্রামিত কবা যায ? উচাটণ-মাবন মন্ত্রে যে কোনও প্রাণীব মৃত্যু ঘটান সম্ভব ?

শ্রী বাস্কেব প্রগতিশীল সংগ্রামী মন অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও বলে, "এ সব মেয়েবা নিজ স্বার্থসিদ্ধিব জন্য অন্যেব ক্ষতি কবে এবং তাবা মনে কবে যে অন্যেব ক্ষতি কবাব স্বাভাবিক ক্ষমতা তাদেব আছে। এ ক্ষতি হযতো কোন অলৌকিক উপাযে ঘটে না, কৌশলে কার্যকাবণেব যোগসাজোসেই এ সব হযতো ঘটিযে থাকে।"

শ্রীবাস্কেব মনেই সংশয থেকে গেছে—হযতো ডাইনিবা অলৌকিক উপাযে ক্ষতি সাধন কবেন না। অর্থাৎ ডাইনিবা হযতো অলৌকিক উপাযেই ক্ষতি সাধন কবে। শ্রীবাস্কেব মনেই যদি ডাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতা আছে কী নেই—এই বিষযে সংশয় থাকে তাহলে সাধাবণ সাঁওতাল সমাজেব মানুষেব ডাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষযে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক।

শ্রীবাস্কে ডাইনি প্রথাব বিরুদ্ধে কতকগুলো উপায উল্লেখ কবেছিলেন। তাব মধ্যে ডাইনি বিদ্যাব অপকাবিতা সম্পর্কে নাটক মঞ্চস্থ ও তথ্যচিত্র তোলাব কথা ছিল। কিন্তু ডাইনি বিদ্যা বলে বিদ্যাই যেখানে কল্পনা মাত্র, সেখানে ডাইনি বিদ্যাব পক্ষে বা বিপক্ষে বলাব প্রশ্নই উঠতে পাবে না। বাস্তব সত্যকে সাধাবণেব সামনে তুলে ধবা আমাদেব অবশ্যই প্রযোজনীয এবং আদিবাসী সমাজেব কাছে গ্রহণযোগ্য সহজ-সবল



নদীয়া জেলাব জনৈক জানগুরু

যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে—ডাইনি বিদ্যা বলে কোনও বিদ্যার অস্তিত্বই নেই। জানগুরু, সখা বা ওঝাদেরও নেই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা।

ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যাঁদের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তাঁদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় আমি শ্রদ্ধাবনত। শুধু এটুকু মনে হয়েছে—তাঁদের আন্তরিকতার সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে দৃষ্টির স্বচ্ছতা যুক্ত হলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

ডাইনি প্রথা বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যে পত্রিকা ও প্রচারপত্র মারফৎ দাবি জানিয়েছেন সারদাপ্রসাদ কিসকু, সভাপতি, 'সাঁওতাল সাহিত্য পরিষদ', মহাদেব হাঁসদা, সম্পাদক, 'তেতরে' মাসিক পত্রিকা, কলেন্দ্রনাথ মান্ডি, সম্পাদক, 'সিলি' দ্বিমাসিক পত্রিকা, গুরুদাস মুর্মু, সম্পাদক, 'খেরওয়াল জারপা', বালিশ্বর সরেন, সম্পাদক, 'জিরিহিরি'।

দাবি-পত্রে তাঁরা জানিয়েছিলেন, "...ভণ্ড জানগুরুদের কথায় বিশ্বাস করে কত যে অপরাধ, অন্যায়, অবিচার সংগঠিত হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ডাইনি প্রথা একটা অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপকার পাবার প্রশ্নও নেই। এর মূল সমাজের এত ভিতরে প্রবেশ করেছে যে, এক্ষুণি এর অবসান ঘটানো সাধারণের ক্ষমতার অতীত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও ভারতের মত একটা কল্যাণ রাষ্ট্রের এ ধরনের কু-প্রথার অস্তিত্ব বিস্ময়জনক।

**এই কুপ্রথার উচ্ছেদকল্পে
সরকার যদি আইন প্রণয়ন করেন, অন্তত
ভণ্ড জানগুরুদের বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন,
তাহলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হতে পারে।
আমরা এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের
সহানুভূতি কামনা করছি এবং আশু ডাইনি
প্রথা বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য
অনুরোধ জানাচ্ছি।"**

যুগ যুগ ধরে যে বিশ্বাস আদিবাসীদের শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে রয়েছে তা কয়েকজনের ব্যক্তি প্রচেষ্টায় বা কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চেষ্টায় (সে চেষ্টা যতই আন্তরিক ও ব্যাপক হোক না কেন) নিমেষে যাবার নয়। এ জন্য আরও বেশি করে সমাজসচেতন মানুষ ও সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে সরকারী প্রশাসনকে। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বহুজনের চেষ্টাতেই সম্ভব এই অবস্থা থেকে উত্তরণ। কিন্তু বহুজন কবে এগিয়ে আসবে এ আশায় বসে না থেকে আমাদের কাজ

করতে হবে। আমার কথায় কাজ হচ্ছে, কাজ চলছে। বহু আদিবাসীরাও এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন কিছু প্রতিষ্ঠান। আমাদের সমিতিও সীমিত ক্ষমতায় আদিবাসীদের অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত করতে কাজ করছে বিভিন্ন ভাবে। সাড়াও পাচ্ছি বিপুলভাবে।

আমরা হাজির হচ্ছি একটু নতুন ভাবে। আমাদের সমিতি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামে অনুষ্ঠান করতে বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে প্রতিনিয়ত যাচ্ছে, তার মধ্যে আদিবাসীপল্লীও পড়ে। যখন যাই তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই স্থানীয় বিশাল অঞ্চল জুড়ে যত জানগুরু, সখা, সৎসখা, দিখলী, ওঝা (সচরাচর সাঁওতাল সমাজ যাদের 'জানগুরু' বলে বিভিন্ন আদিবাসী-অধ্যুষিত জেলায় তারাই এ সব নামে পরিচিত) ও অবতারদের বিষয়ে খবর নিই—তারা কি কি ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার (?) অধিকারী। অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালান হয়। ফলে আশ-পাশের গাঁয়ের মানুষ নানা অলৌকিক ঘটনা দেখার উৎসাহে হাজির হন। স্থানীয় অলৌকিক ক্ষমতাবানদের এতদিন ধরে ঘটানো ঘটনাগুলোই আমাদের সমিতির সভ্যরা অনুষ্ঠানে ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন। ঘটনাগুলো দেখবার পর বোঝাচ্ছেন—এগুলো কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়, কৌশলে ঘটাচ্ছি। আপনারাও যে কেউ চেষ্টা করলেই এমনটা ঘটাতে পারবেন, তারপর দর্শকদের দিয়েও ঘটনাগুলো ঘটানো হতে থাকে। উৎসাহী গ্রামবাসীরা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসতে থাকেন। এবং অদ্ভুত সব ঘটনা হাতে-কলমে করার কৌতূহলে, আনন্দে, এতদিনের দেখা জানগুরুদের ঘটানো ঘটনাগুলো যে ওঁরাও ঘটাতে পারেন, এই প্রত্যয় বহুর মধ্যে সংক্রামিত হয়। আমরা ঘোষণা করি—আপনারা তো কৌশলগুলো জেনে গেলেন, এবার জানগুরুদের এইসব কৌশল গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে দিন, দেখতে পাবেন ওদের সব জারিজুরি বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো ঘটানোর কৌশলগুলো আপনারা জানতেন না, ওরা জানতো। সেই কৌশল দিয়ে এতদিন আপনাদের ঠকিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করেছে, টোটকা ওষুধে অসুখ সারাতে না পারলে নিজের দোষ ঢাকতে আপনাদেরই কারো পরিবারের নিরীহ মেয়েদের ডাইনি বলে ঘোষণা করেছে। ওরা যা করে সব কৌশলেই করে, অলৌকিক ক্ষমতায় নয়।

আরো একটা কাজও আমরা করি। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগেই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তরা প্রকাশ্যে এবং ব্যাপক প্রচার চালিয়েই স্থানীয় অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণের জন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসেন। চ্যালেঞ্জের জবাবে কেউ হাজির হলে তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্যই পরাজিত হন। হাজির না হলে গ্রামবাসীদের উপর তাঁদের প্রভাব প্রচণ্ড কমে যায়। ওঝা, জানগুরু, সখাজাতীয় অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের বুজরুকি বন্ধ হলে ডাইনি চিহ্নিত করার কাজও বন্ধ হয়, কারণ এঁরাই ডাইনি চিহ্নিত করেন। অবশ্য এরই পাশাপাশি আরো বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করার আশু প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতায় কিছু কিছু পর্যায়ে কাজও করছি।

বিভিন্ন জানগুরুদের ক্ষমতার কৌশল নিয়ে পরে আলোচনা করব। এবং এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য আপাতত কী কী করা যেতে পারে সে প্রসঙ্গেও আসব। কিন্তু

তাব আগে 'ডাইনি' নিযে আবও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনায যাওযাব প্রযোজন অনুভব কবছি। সমস্যাটিব বিষযে মোটামুটি ধাবণা না দিযেই সমাধানেব বিষযে কিছু বলতে যাওযাটা বোধহয সমীচীন হবে না।

বাঁকুড়া জেলা হ্যান্ডবুক, ১৯৫১, থেকে

ডাইনি

ডাইনি হলো আমাদেব 'হড়হপনেব' (সাঁওতালদেব) মস্ত জ্বালা। ডাইনিব জন্য লোকে শত্রু হচ্ছে। কুটুম্বদেব দুযাব বন্ধ হচ্ছে। বাপে-ছেলেতে ঝগড়া হচ্ছে। ভাইযে-ভাইযে বিবোধ হচ্ছে। ডাইনি না থাকলে আমাদেব অনেক সুখ থাকতো। সাহাব লোকেবা সবই ভাল বিচাব কবেছেন যতদূব জানা যায . কিন্তু ডাইনি সম্বন্ধে কি কবে যে অন্ধ হচ্ছেন, বুঝতেই আমবা পাবি না। ডাইনিবা আমাদেব খায। আমবা ধবে একটু হুডুম হুডুম কবলে, উল্টো আবও হাকিমবা হাজতে দিচ্ছেন , মহা জ্বালায পড়েছি, কি ক'বলে আমাদেব ভাল হবে, দিশেহাবা হ'যে গেছি। হাকিমদেব বুঝালেও তাঁবা বিশ্বাস কবেন না। বলেন, কৈ দেখি আমাব আঙ্গুল খাক্, তবে তো বিশ্বাস ক'বব, ডাইনি আছে বল—তাবপব তোমাকে কযেদ ক'বে বসল। খাপবি ছুবি নিযে ত ডাইনিবা খাচ্ছে না, বিদ্যাব জোবে পবপাবে পাঠিযে দেয। কি আব একেবাবে সোজা। আগে মাঝি, পাবানি কবা দমন কবছিলেন, আব ভাল না হ'লে, পাঁচ জনে মিলে বে-আবরু কবে গ্রাম থেকে তাড়িযে দিতে ছিল, আজকাল হাকিমদেবই বশ ক'বে শেষ ক'বল। সেইজন্য সব পুরুষেই ভযে পিছিযে গেছে।

পুরুষ মানুষেব কথা আব চলছে না, এখনকাব যুগে মেযেবাই বাজা হযে গেছে। একটু বেশী কিছু বলেছ কি টক ক'বে মুখে পুবেছে, সেই ভযে চুপ ক'বে থাকে। ডাইনিবা বাত্রে জমা হয, কোন বনে কি মাঠে। যাবাব সময ঠুঁটো ঝাঁটা কি কোন কিছু পুরুষেব কাছে বেখে যায, আব তাবা মনে কবে, ঘবেব মানুষ আমাব আছেই, কেবল ধাঁধাতে ঐ ঝাঁটাকে নিজেব লোকেব মত দেখে তা না হ'লে ওবা দেবতাব কাছে বিযে হবাব জন্য চলে গেছে। জানেন, হেঁটে ওবা যায না, কোনো গাছে চড়ে বিদ্যাব জোবে হাওযাব মত যায। দেবতাদেব আখড়ায নেমে, দেবতাদেব সঙ্গে নাচে, সিংহদেব ডাকে। চুল আঁচড়িযে দেয, চুমা খায, তাবপব দেবতাদেব কাবু ক'বে দিব্যি দেয, যেন কোন বকমে খড়ি দেখাব সময না উঠে। এইসব কবে মুবগী ডাকেব সময ঘবে ফিবে আসে

ডাইনীবা অনেক শিষ্য কবে। ছোট ছেলেমেযেদেবও ভুলায তাবা মবে গেলে বীজ যেন থাকে। প্রদীপ নিযে বাত্রে ঘুবে লোকেব বাড়িতে ঢুকে শিষ্যা কবাব জন্য মেযেদেব তুলে আব তাবা স্বীকাব না কবলে বলে না শিখলে তুমি মাবা যাবে, তা না হলে সিংহে খাবে। সেইজন্য ওবা ভযে তাড়াতাড়ি শিখে। চেলাদেব জাগিযে ডাইনীবা ঝাঁটা পবে, আব ভাঙা কুলা কাঁখে নিযে জাহেবে যায প্রদীপ নিযে। সেখানে মুবগী পূজা কবে আব

খিচুড়ি পিঠা তৈরি করে খায়। চেলাদের সিংহের চুল আঁচড়ান করায়, আর তারা ভয়ে স্বীকার না করলে বলে কিছুই করবে না, বোন! ভয় করো না, তারপরে মন্ত্র আর মাডনি গান শিখিয়ে দেয়, তারপর দীক্ষা দিবার জন্য বলে যাও বোন, বাবাকে তোমার বড়দাদাকে খাও।। স্বীকার না করলে জ্বর হওয়ায়, কিংবা পাগলী করে দেয়। 'কাটকম চারেচ' (একরকমের ঘাস) এর দ্বারা কলিজা খুঁটে বার করে, আর সেটা সিদ্ধ করে প্রথমে চেলাদেরই আগে খাওয়ায়। সেইদিন থেকে ঐ চেলাদের সমস্ত দয়া-মায়া শেষ হবে, রেগে গেলে ছেলে কি বাবা ভাইদেরও খাবে, আর নিজেদের স্বামীদেরও মায়া করে না, খেয়েও ফেলে।

প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে দুটি ছোকরাকে মাদল বাজাবার জন্য ডাইনীরা রোজ তুলে নিয়ে যেত। একদিন একটি ছোকরার কলিজা ডাইনীরা বার করে নিয়ে গেল, আর এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, চাল, নুন, হলুদ, হাঁড়ি, খলা তাদের বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে গেল জাহেরে। সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই কলিজা সিদ্ধ করে, সেই ছোকরা দুজনকেও ধরা দিল খাবার জন্য। কিন্তু ওরা খেল না, কোঁচড়ে লুকিয়ে রাখল, শুধু হাঁড়িয়াটুকু খেল। দেবতাদের সঙ্গে নেচে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এল। পরদিন সকাল হতেই কলিজা বার করা ছোকরা মূর্ছা গেল। যে সব লোকে দিশেহারা হোলো, বলতে লাগল ঃ শেষ হয়ে গেল ? ঐ ছোকরাদের মায়া হ'ল। সেইজন্য বলল যাও অমুক অমুক মেয়েদের ধর তাহ'লে মানুষটি ভালো হবে। তারপর মাঝির বৌ ইত্যাদি ভাল ভাল লোককে ধরে নিয়ে এল ওদের কথা মত। ওরা এসে স্বীকার করতে চায় না, গালাগালি দিতেই চাইছে আর তাদের স্বামীরাও রাগে গরগর করছে, বলছে প্রমাণ করে দাও তা না হলে ভাল বলছি না। তখন সেই ছোকরা দুটি তাদের দেওয়া ভাগ পাঁচজনের সামনে খুলে বলল এই যে, বাবা মাল। সেটা দেখে ডাইনী আর তাদের স্বামীরা চুপ।

তারপর পারগামাকে নিয়ে এল। সে হুকুম দিল যাও টাঙ্গি নিয়ে এসো, আনিল। সেই সময় পারগামা ডাইনীদের বলল যাও ভাল কর, তা না হলে কেটে ফাঁক করবো, তোমরা হলে কাঠ ওহোল মরা। তারপর ভয়ে ভালো করে দিল। ভাল না করে দেওয়ার জন্য বহু জায়গায় কেটে দিয়েছে। মাঝির স্ত্রীকে পারামিকের স্ত্রী ডাইনী থাকলে প্রমাণ করা বড় শক্ত, কেন না তাদের স্বামীরা গড়াতে দেয় না। পূর্বে যেমন, একজন ওঝা মানুষ রেগে গিয়ে মাঝি আর পারামিকদের স্ত্রীদের ডাইনী বলেছিল। মাঝিরা তাকে বলল এটা তুমি প্রমাণ না ক'রলে তোমার মাথা রাখব না। উত্তর দিল একদিন চোখে দেখিয়ে দিব। তারপর চুপচাপ হল। ওঝা একদিন সন্ধ্যাবেলা খেয়ে দেয়ে তীর ধনুক নিয়ে জাহেরে চলে গেল। সেখানে একটি গাছে উঠে ওৎ পেতে রইল।

সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পরই যাদের দোষ দিয়েছিল সেই ডাইনী মেয়েরা জাহেরে গেল। গিয়েই একপাক নেচে ঘুরল। তারপর তাদের একজন 'রুম' (ঝুঁপার) হ'ল। তারপর সিংহকে ডাকল, লুক্ষু নামে নাম ধরে সিংহকে দুইবার শিস দিয়ে ডাকল, তারপর দুইটিই চলে এল। তারপর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, সেই সময় ওৎপেতে বসা লোকটি বড় সিংহটিকেই তীর মারল। তখন সিংহ মনে করল যে,

এবাই আমাকে কিছু কবল বোধ হয। সেই বাগে এক এক কবে এলোপাথাডি কামডিযে মেবে ফেলল ডাইনীদেব আব অন্য সিংহটিকেও বিধে মেবে ফেলল, তাবপব ঘবে ফিবে গেল।

পবদিন সকাল হলে দেখল, তাদেব নাই , তখন ঘবে ঘবে পবস্পবকে জিজ্ঞাসা কবছে যে আমাদেব সব কোথায গেল বলে। তখন ওঝা লোকটি তাদেব বলল , জাহেবেব দিকেই দেখে এস, ওইদিকেই যেতে দেখেছিলাম।

তাবপব গেল, দেখে যে, "বিলিযা বিতিদ" সিংহ দুটি কামডিযে তাদেব মেবে ফেলেছে আব তাবাও পডে আছে। তখন চাবদিকে গোলমাল হতে ধ্বাবে পাশেব লোক জমা হযে তাদেব দেখল। তখন থেকে বিশ্বাস কবে আসছি ডাইনীব কথা।

পুর্বপুকষেবা বলতেন যে, মাবাং বুক বেটাছেলেদেব ডাইন শিক্ষা দিচ্ছিলেন কিন্তু মেযেলোকেবা কোবফান্দী ক'বে গুণ (বিদ্যা) আগেই নিযে নিল। একদিন যেমন, বেটাছেলেবা জমা হ'ল পবস্পবকে শিক্ষা দিবাব জন্য, নিজেদেব ঝগডাটে বৌদেব কি কববে বলে। বলিল আমবা হলাম বেটাছেলে, কী ক'বে আমাদেব কথা চলছে না ? দুই এক কথা মেযেলোকদেব বললে বিশ বাখান গাল দিতে আবম্ভ কবে, এ বকম সহ্য কবব না। তাবপব ঠিক কবল, চল্ মাবাং বুরুব কাছে যাই, তাব কাছে গুণ শিক্ষা কবে আসি, যেমন কবেই হোক এই মেযেদেব যেন কাবু কবতে পাবি। তাবপব দিন ঠিক কবল যে, মাঝ বাত্রে কালনা বনে জমা হবে। গেল। মাবাং বুককে মিনতি জানাল, ডাকল ও ঠাকুর্দা, একবাব আসুন, বহু লোক এসেছি আপনাব কাছে নাবাজ হ'যে। মাবাং বুক চলে এলেন, জিজ্ঞাসা কবলেন কী দুঃখ তোমাদেব আছে নাতি ? তবপব তাদেব দুঃখ জানাল আব মিনতি কবল যেন গুণ (বিদ্যা) শিখিযে দেন নিজেদেব বৌদেব শাযেস্তা কবতে।

মাবাং বুক বলিলেন শিখাতে পাবি, কিন্তু এই সমস্ত পাতায তোমাদেব বক্তে লিখলে তবে। সেই সব শুনে বিস্তব ভয পেযে বলিল কাল ফিবে এসে লিখে গুণ নিব। তাবপব চলিযা গেল। কিন্তু তাদেব স্ত্রীবা লুকিযে এসে আডাল থেকে সব কথা ঠিক শুনে নিল। তখন তাবা বলিল এই পুকষদেব ধর্ম হচ্ছে এই, আমাদিগকে বিযে কবাব আগে কুকুবেব মত গোঁসাই গোঁসাই কবে পিছনে ঘুবে বেডিযেছিল ; এখন বুডি হযেছি ব'লে খাবাপ দেখছে, মেবে ফেলতেই চেষ্টা কবছে আচ্ছা দেখে নেব, কে কাকে মাবতে পাবে। এইসব যুক্তি কবে গলি বাস্তা দিযে তাডাতাডি এগিযে চলে গেল। বাস্তায ঠিক কবে নিল কী কববে বলে। পুকষেবাও পবে ঘবে ফিরে এলো। ফিবো আসা মাত্র মেযেবা তাদেব স্বামীদেব সোহাগেব সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'বল, তাতে বেটাছেলেবা মনে ক'বল, নিজে নিজেই ভালো হযেছে, কি জন্যই বা যাব ?

পরদিন মেযেবা নিজেদেব স্বামীদেব ভাল ক'বে ভাত তবকাবি কবে দিল, আব বেশি কবে সন্ধ্যাবেলা হাঁডিযা দিল। পুকষেবা খেযে মাতাল হযে বেহুঁস হ'ল। তখন মেযেবা একত্র হযে ধুতি পাগডি পবে আব ঠোঁটে ছাগল চুল লাগিযে জঙ্গলে মাবাং বুরুব কাছে চলল। ডাকিল ও ঠাকুর্দা, আসুন শীঘ্র তাডাতাডি, আমাদেব স্ত্রীবা দিনবাত জ্বালিযে মাবছে।

মাবাং বুক চলে এলেন। তখন তাকে বলিল দিন আপনাব পাতা বাব করুন, নিজে

নিজেব দাগ কাটব (লিখব), আব সহ্য কবতে পাবি না মেয়েদেব অত্যাচাব। মাবাং বুরু তাঁব শাল পাতা বাহিব কবিলেন, আব তাবা ফুঁড়ে রক্ত দিয়ে নিজেব নিজেব পুরুষেব ছবি আঁকিল। তাবপব মাবাং বুরু মন্ত্র আব ঝাড়ানি শিখিয়ে দিলেন, সিদ্ধাই দিলেন লোক খাওয়াব জন্য। মুচকি মুচকি হেসে তাবা বাড়িতে ফিবে এলো।

পবদিন সকালে পুরুষেবা তাড়াতাড়ি উঠছে না বলে ভীষণ গালাগালি দিয়ে মুখ শুকনো কবে দিল। পুরুষেবা আঁধা ধুঁদা উঠে চোখ বগড়াতে লাগল, ঘুমও ভেঙে গেল, আব মেয়েবা শান্ত হচ্ছে না তাও বুঝতে পাবল। তাবপব টলমল বৈঠক বসাল। সেখানে ঠিক ক'বল চলতো যাই। মাবাং বুরু যাই বলুক, গুণ নিশ্চযই শিখব। তাবপব রাত্রে জঙ্গলে গেল, আব কাক-শকুনেব মত বিস্তব মিনতি মাবাং বুরুকে কবল দাও বাবা, নিশ্চযই শিখিয়ে দাও, মেয়েবা আমাদেব ভযানক জ্বালাচ্ছে।

সেইসব শুনে মাবাং বুরু আশ্চর্য হ'যে তাদেব বলিলেন গুণতো তোমাদেব দিয়ে দিয়েছি, কী চাইছ ঘন ঘন? তখন পুরুষেবা একসঙ্গে বলে উঠল কৈ কখন দিলেন আমাদেব? সেদিন থেকে আমবা তো আসি নাই। সে সব শুনে মাবাং বুরু মহা চিন্তায় পড়লেন, বললেন তোমাদেব দিয়েছি নাতো কী কবেছি? এই যে তোমাদেব দাগ দেখতো। পুরুষেবা নিজেদেব নিজেদেব দাগ দেখে বলল দাগ যেন আমাদেবই কিন্তু আমবা তো দাগ কাটি নাই, কাবা যেন আমাদেব দাগ কেটেছে (ছবি এঁকেছে)।

তখন মাবাং বুরু গালে হাত দিয়ে চিন্তা কবতে লাগলেন, তাবপব বুঝতে পাবলেন যে, মেয়েবা আমাকে শুদ্ধ ছেলেমানুষ কবে ফেলল। তাবপব বেগে গিয়ে ঐ পুরুষদেব বললেন নাও এখানে তাড়াতাড়ি দাগ কাট, ঐ বদমাইস মেয়েদেব দেখে নিব। দাগ দিল, আব তিনি ওঝা আব ডান হবাব সিদ্ধাই দিলেন, যেমন কবেই হোক ডাইনীদেব ধবে যেন সাজা দিতে পাবে। তখন থেকে ডাইনী আব ওঝা কি জানদেব ভীষণ শত্রুতা আছে। কিন্তু ওঝা আব জানেবা পাবছে না, কেননা ডাইনীবা ওদেব দেবতাদেব সহজেই কাবু কবছে সেইজন্য সহজে ধবতে পাবে না, অন্য লোকই খড়ি মাটিতে (খড়ি গুণা) উঠেছে, আব জানেবা আঁধা হয়ে অন্য লোকদেব বলছে (দোষ দিচ্ছে)।

কতক লোক বলে যে, ডাইন, ওঝা আব জান সকলেই কামরু গুরুব কাছে শিখেছে। হ্যাঁ বহু পূর্বে আমাদেব পূর্ব পুরুষেবা তাঁব কাছে গিয়েছিলেন। ওঝা হওয়াব কথা সত্যই, কেননা ওঝা লোকেবা প্রথমেই তাঁব নাম দেন, তা না হ'লে ডাইন আব জানেব কথা জানি না, কামরু গুরুব কাছে শিখেছে কি না জানি না। দোহাযটুকু তাঁব দোহায দেয না, সেইজন্য বলছি, তাঁব কাছে শিখে নাই।

ওঝাকো (ওঝাবা)

ওঝাবা সত্যি কামরু গুরুব কাছে শিখেছে বহু পূর্বে। তাঁব দেশ আব আমাদেব দেশ লাগালাগি ছিল, মুরুব্বিবা সেকথা আমাদেব বলেছেন। ওঝাদেব কাজ হল ছযটি (১) খড়ি দেখে, (২) চাল ছড়ায, (৩) কামড়ায কিংবা 'লুণ্ডা কবে, (৪) দেবতা খুঁড়ে, (৫) দেবতা ছাড়ায, (৬) লোককে ওষুধ দেয। বোগী ঔষধে যদি ভাল না হয, গ্রামেব

লোক ওঝাকে দিয়ে খড়ি দেখায়। তেল আর শালপাতা নিয়ে আসে, আর সে বসে দুটি পাতাতে তেল মাখাবে, আর মন্ত্র বলতে বলতে ঘষবে 'তেল তেল বায়ে তেল, মাম তেল, কুসুম তেল, ই তেল পড় হায়েতে, কি উঠো, ডাম উঠো, ভূত উঠো, ফুগিন উঠো, বিষ উঠো, কে পড়হে, গুরু পড়হে, গুরু আগতা মাত্র পড়হে'। এরপর মাটিতে একটু রাখবে। তারপর খুলে দেখবে। লোক ওঝাকে জিজ্ঞাসা করবে দেন্ বাবা অনুগ্রহ করুন, কী সব পেলেন? বললে তবে তো আমরা বুঝব। ওঝা খড়ি দেখবারই আগে ঠিক করে রেখেছে যে, এখানে হল জান, এখানে হল ঘরের দেবতা, এখানে হল বাইরের দেবতা, এখানে হল দুঃখ আর এখানে হল বিষ। পাতার যে ঘরের দাগ উঠবে হিজিবিজি, সেইটি বলে দেয়, ডাইন হলে ডাইন, দেবতা হলে দেবতা, দুঃখ হলে দুঃখ, আর বিষ হলে বিষই। ডাইন যদি উঠে, মাঝি পারামিক সন্ধ্যাবেলা বলে যায়। শুন অমুক, অমুকের অসুখ করেছে, ভাল যেন হয়, তোমাকেই ধরেছি, ভাল না হলে তোমাকে বলছি না। তাতে ভাল হলে ভালই। তা না হলে দুইজন করে মাঝি চারদিকে তেল দেখাতে পাঠাবে। সন্ধ্যাবেলা জমা হয় আর তেল দেখাতে যে সব লোক গিয়েছিল তাদের একে একে জিজ্ঞাসা করবে। তিন দিক থেকে ডাইন ঠিক করে আনলে বাছবার জন্য ডাল পুঁতিবে, আর যদি মিল না হয়, আরও পুনরায় খড়ি দেখিয়ে আসবে।

ঘরের দেবতা যদি ওঠে তাহলে রোগীকে বলবে নাও তোমার ঠাকুর সামলাও। তারপর জল দিয়ে মানৎ করবে যে ভাল হলে পূজা করব। বাইরের দেবতা উঠলে ওঝা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে দেবতাকে চাল ছড়িয়ে দিবে, ('নে তবে কালনা বঙ্গা বুল মায়াম সিটকা মযাম এমাম্ চালাম্ কামাঞ কবিযাক্—ক কাটিক্ মায, অকোরে আচু লেৎ মেয়া ডোড়ে লেৎ মেরা উনিরেন সিবা হপমগে সঠ্রুক সামবাড কেম্, তেঁঞে খা—দ নিযা অডা- দ ছিকেম্ হাডিকেম, ওকাডেতাম মাম বা থাম সেকজং রেরেৎজং মে।) মাও তবে কাল না বঙ্গা জাং এর রক্ত শিবায রক্ত দিচ্ছি, ভাল যেন হয়ে যায়, যে তোমাকে লাগিয়েছিল তার সেবা ছেলেই সাবাড করুন, আজ থেকে এ বাড়ি ছেড়ে দেন, নিজের থানে চলিযা যান। মারাং বুরু আর পারগামাকেও চাল ছড়ায়ে 'বাঁখেড' (মিনতি) করবে, এই যে অমুক মাঝির ঘরে 'জজম বঙ্গা' (যে দেবতা মানুষকে খায়।) জজম বুরু লেগেছিল পড়েছিল, ধরে সাবুদ করলাম, খুদ চাল তার দিয়ে দিলাম, তারই সাক্ষী সভা করুন, আজ থেকে যেন ভাল হয় রোগী। এইরূপ আলাদা মারাং বুরু আর পারগামাদেরও ওঝা মিনতি করে। শেষে মুডা ঢডা সীমা আইলের দেবতাদের চাল ছড়িয়ে মিনতি করে এই নিন তবে আপনারা মুডার খুঁটির, লাটার, লোপাকের সিমার আইলের বড় ছোট ঝুলি ঝোলা কাঁধে, খড়ম হাতে যোগি ইত্যাদি, যাদের চলে তাঁরা আসুন, যাঁদের চলে না তাঁরা দূরে থেকে সাক্ষী শোভা করুন।

দুঃখ উঠলে ওষুধ বাঁটিয়া খাওয়ায় আর বিষ হলে কামড়ায় আর লুণ্ডা করে (ওষুধের গোলা তৈয়ার করে সেটা দিয়ে মালিশ করে)। ওঝারা প্রথমে এক জায়গায় মন্ত্র দ্বারা ঝেড়ে জমা করে, তারপর মুখে কামড় দিয়ে বার করে পাতার খলাতে ফেলবে। কী যেখানে রোগ আছে, গুঁড়ির গোলা তৈরি করে পাতার খলাতে ফেলবে। কি যেখানে রোগ আছে, গুঁড়ির গোলা তৈরি করে মন্ত্র পড়ে লুণ্ডা করে। লোকটি ভাল হলে

ওঝাকে 'সাকেৎ' (মানসিকেব) মুবগি দেয। সেগুলি বলি দিযে খায, আব গ্রামেব দুই একজনকে ভাগ দেয।

ঢাউবা : বিৎ 'ডাল' পোঁতা

ঢাউবা বিৎ হচ্ছে এই বকম ডাইন কি দেবতা। কি দুঃখ খডিতে উঠলে, সেটা সঠিক কববাব জন্য জলাশযেব পাডে ডাল গোঁতে। সাক্ষী হিসেবে একটি ডাল মাঝখানে প্রথমে পোঁতে তাবপব ঘবেব দেবতাব নামে একটি, তাবপব 'মাইহার' এর (শ্বশুববাডিব) দেবতাব নামে একটি, তাবপব ভাযাদি কুটুমেব নামে একটি, ওটাব পব মেযে, বোনদেব নামে একটি, সেটাব পব প্রতি ঘবেব নামে একটি ডাল পোঁতে। প্রতি ডালে সিন্দবুব দিযে যায। তাবপব চাল ছডিযে 'বাঁখেড' কবে প্রণাম তবে সিঞবঙ্গা (সূর্যদেব)। বেডাব মত চাবদিক ঘিবে বেখেছে, চাবখুঁট, সাবা পৃথিবী ভযে বযেছে তবে এই যে ডালী কালী কবছে, দোষেবই দোষ কবে, সেইটাই যেন শুকনো হযে ঝবে যায, সাক্ষী বহিলেন আব যদি না হয, সবুজ হযে নূতন পাতা বাহিব হবে, সোনাব মত সুন্দব থাকবে (বলে ডাল পুঁতবে)।

আবও বলে যদি দেবতা হয, এটাই যেন শুকনো মচমচে হযে যায, যদি না হয সোনাব মত সত্যই (খাঁটি থাকবেন) সাক্ষী বইলেন। সেইরূপ প্রত্যেকেব নামে প্রতি ডালে 'বাঁখেড' কববে। এইসব কবাব পব ঘবে চলে যায়। পাঁচ ঘন্টা পবে ফিরে আসে ডাল দেখবাব জন্য। যে নামেব ডাল মবেছে, সেটাই ঠিক হবে। ডাইনে যদি ঠিক হল, যত ঘবেব মবে যাবে ওবাই ডাইন হবে। তাবপব অন্য গ্রামেব পুনবায সেইরূপ 'সুহি' (বাছাই) কবিবে দুই তিন জাযগায। তাবপব সেই দুঃখ পাওযা লোকটিকে বলবে এই যে এইটি তোমাকে ঠিক কবে দিলাম, এখন গুরুব কাছে নিযে যাচ্ছ, না ভাল হযে গেছ ? সে উত্তব দিবে কমছে না, গুরুব কাছ থেকে যাচাই কবে নিযে আসি। দিন ঠিক কবে জানেব কাছে চলে গেল।

জানকো (জানদেব)

জান হচ্ছে আমাদেব ডাইনেব হাইকোর্ট। ঐ যে যাবা ডাইন হয, ওদেবই সত্যিই ডাইন বলি। কি জানি সত্যিই পায, না মিথ্যা, আমবা বিশ্বাস কবি সত্যিই পায বলে, কেননা মাবাং বুরুব কাছে সিদ্ধি লাভ কবেছে। আব পবীক্ষাও কবছি, দেবতাব শক্তিতেই বলে না ফাঁকিবাজি কবে জান হচ্ছে।

কোন লোক ওষুধে ভাল না হলে প্রথমে ওঝাব কাছে নিযে খাডি (গুটি চালান বা খডি দেখা) কবাই , তাবপব গ্রামে গ্রামে ডাল পুঁতি, অতঃপব জানেব কাছে যাই, গ্রাম

শুদ্ধ লোকেব অসুখ ক'বলে, মাঝি সমস্ত পুরুষ মানুষদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, আব একজনেব অসুখ কবলে সেই মাঝিব কাছে কাঁদবে, তাবপব বোগীব তবফেব দুই একজন আব খাড়িতে যাকে পাওয়া গেছে তাব স্বামী বা ভাই আব গ্রামেব পাঁচ ছয়জন সাক্ষী জানেব কাছে যাবে। এক সঙ্গেই থাকবে, যেন কেউ লুকিয়ে জানকে কিছু না বলতে পাবে। জানেব কাছে একবাবে যাবে না (সোজাসুজি যাবে না), বাইবে ডেবা বাঁধে। কোথাকাব লোক, কি জন্য এসেছে, কাব জন্য এসেছে, আব কি অসুখ, সে সবেব কথা কাউকে কিছু বলে না। জানেব গ্রামেব মাঝিকে বলবে ওগো বাবা, গুরুব কাছে তেল, পূজা কবতে দাও। তাবপব সে জিজ্ঞাসা কববে · কতজন পূজা কবাবে (দেখাবে)? বলিল এতজন অতজন আছি। সেই মাঝি জানেব কাছে নিয়ে যাবে। মাঝি তাদিগকে পূজাব জিনিস হাজিব কবাবে, যেমন একটি সুপাবি, একটি ভাঁউনিচ্ (পাতাব খলা বা বাটি) আতপ্চাল, তেল সিন্দুব, ধূনা আব বেলপাতা।

তখন জান বলিবে আচ্ছা এসো তবে পবে এই এই বেলা। তাবা ডেবায ফিবে যাবে। সেখানে গ্রামেব কোনো লোক এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কথা বলবে না, অন্য দেশ আব অন্য গ্রামই বলবে। ধার্য সময়ে জানেব কাছে যাবে। জান কখনও তাব ঘবেবই দোষ দেয, আব কখনও 'জাহেবে' কি বাইবে। তাবা চুপচাপ বসে আছে, আব নিজ আতপ্ চাউল অনেক জাযগায দেবতাব নামে বেখে বেখে যায, আব বেলপাতা তাতে বেখে যায, ওব পব চাল বাখা জাযগাতে সিন্দুব দিযে যাবে তেলে গুলে; আব ধূপেব সবাব আগুনে ধুনা ফেলে বাখবে, শাঁখ বাজাবে আব পূজাব ঘন্টা বাজাবে আব দেবতাদেব পূজা কবে তাবপব ভব দেয, ভব দিযে বকতে থাকে।

প্রথমে তাদেব দেশেব নাম বলবে, ওটাব পর গ্রাম, তাবপব কুলহি (গ্রামেব বাস্তা) কোন কোন দিকে আছে, সেই সব বলে: তাবপব মাঝি, ওটাব পব ফবিযাদী লোক, ওটাব পব তাব কাকা, জ্যেঠা, ভাই, ভগিনীদেব ছেলেদেব, মেযে আব ওবা যতজন আব সকলের নাম বলবে।

তাবপব জিজ্ঞাসা কববে কী বাবা এই সমস্ত ঠিক বলেছে কি না? তাবপব তাবা বলবে . ঠিকই, বিশ্বাস কবলাম, এবাবে ভেঙে বলে দেন। জান উত্তব দেয দাও 'বুন্দা' (ঠাকুবেব টাকা) দাখিল কব; তবে তো বলবো। তাবপর একটি কবে টাকা দেয। আব চুক্তি কবে গিযে থাকলে, যত টাকা চুক্তি কবেছে, সেটাও চেযে নিবে, সে সব দিলে পবে তবে বলবে ডাইন কি দেবতা, আব তাবা কাবা। তাবপব জান বলবে, এত এত জাযগায 'ঠালি ঢাউবা' কবেছ, এটা-ওটা ঠিক কবে ছিলে কী না? তাহাব জবাব দিবে হেঁ বাবা ঐগুলিই। তখন জান তাদেব বলবে যদি তৃপ্ত না হযে থাক তাহলে সাত সখাব কাছে (সাত জাযগায) বুঝে দেখ। সাত সখাব আলাদা হলে বুন্দা টাকা ফেবৎ দিযে দিব। তাবপব ঘবে ফিবে আসবে। বঙ্গা ধবা হলে, অসুস্থ লোক বাজী মানত কববে, আব ডাইন ধবা হলে হুড়ুম দুড়ুম কবে জবিমানা কবে আব বে-আবরু কবে গ্রাম থেকে তাড়িযে দেয। এক জানেব কাছে ডাইন হযেছে, লোক খুশি না হলে অন্য জানেব কাছে নিযে যায, পুনবায প্রমাণ কববে বলে কিন্তু সেটা আজকাল, কিন্তু ডাইনেবা এক জায়গায দোষী হলে, হাজাব জানেব কাছে গেলেও সেই কথাই বলে। শুধু দুই একজন ডাইনী গুণে (বিদ্যায) জানদেব কথা গডবড কবতে

পাবে মাঝিব স্ত্রী ডাইনি ধবা হলে তাডাতে পাবে না নিজেই উল্টে যে লোকটিকে খাচ্ছে তাকে বলবে যাও দেখে নাও কোন দিক, সুখ যদি না হচ্ছেত, আমি গ্রাস কবেছি , আমি কোথায যাব ?

আজকাল জানেবা ভীষণ ঠকাচ্ছে। পূর্বেব মত ধবম জানদেব (ধার্মিক জানদেব) মত সত্য এদেব নাই। পূর্বে জানেবা জান শিক্ষা কবে নাই, আপনা হতেই পেযেছিল। তাবা ভাব দিচ্ছিল না, বাত্রেব বেলা স্বপ্নে পেত কী দিনেব বেলা জলে দেখে। দেবতা এসব বলে দেয যে, অমুক অমুক অমুক আসছে এটা ওটাব জন্য, তুমি তাদেব এইবকম বলবে। আজকাল সে বকম জান নাই, বেশিব ভাগই ফাঁকিবাজি কবে সূত্র জিজ্ঞাসা কবছে, টাকা খাচ্ছে। সেইজন্য 'ফুলধাবিযা' (পূজাব ফুল যোগাড করে জানের পূজা ইত্যাদিতে সাহায্য কবে) বেখেছে বেড কাটাবাব জন্য। আব যে জানেব 'ফুলধাবিযা' নাই তাবা দেখে শুনে বলে। আধা নাম বলে দেখে, আব জান কবতে আসা লোকদেব দিকে তাকায, ঠিক কিনা আব বেঠিক হলে আবও নাম বলে দেখবে। সেই জন্য আল জানদেব মিল খাচ্ছে না। 'ফুলছাবিযা' বাখা জান সহজেই বেব কবে নিতে পাবে সেবকম জান ঠিক না বলতে পাবলে বলে বাবা বেড আছে, ওটা সবান কবাও। তাবপব ফুলধাবিযাব কাছে যায। বেড কাটাবাব জন্য কি কি লাগিবে, সেসব জান বলে দিযেছে। ফুলধাবিযা' সেসব পূজা কববে; মুবগি ফবিডং কি ব্যাং কি শেওলা কি সাদা বিডাল। পূজা কববাব আগে জিজ্ঞাসা কবে . কাব নামে বেড় কাটব ? তখন মাঝি পাবানিকদেব নাম বলে দেয, ফবিযাদী লোকেব নামও বলে, আবও দুই এক কথা বলে দিযে পূজা কববে। তাবপব তাদেব বলবে সন্দেহ তোমাদের থাকলে আমাকে পাহ্যবা দিতে পাব, জানেব কাছে যাব না। কিন্তু নিজেব ঘবে যাবেই, আর তার ঘবেব লোক আব জালেনব ঘবেব লোকেব সঙ্গে কথাবার্তা হতে পাবে, তাহলে অনেক চালাকি হতে পাবে।

● ● ●

আদিবাসী সমাজ

সাঁওতাল সমাজেব পবম্পবাগত নেতাকে বলা হয 'মাঝি' সামাজিক কোনও কামকর্ম বা পুজো মাঝিব অনুমতি ছাড়া হতে পাবে না। বলতে গেলে মাঝি গ্রামেব পুবোহিতেব চেযে কিছু বেশি। বিযে দিতে মাঝিব অনুমতি নিযে হয। গ্রামে নতুন বউ এলে বউযেব বাবা জামাতাব গ্রামে মাঝিকে প্রণামী দেন। গ্রামে বব বিযে কবতে ঢুকলে ববযাত্রীবা বউযেব গ্রামেব মাঝিব বাডিতে আগে যাবেন, সেখানে মাঝিকে সম্মান জানিযে তাবপব যাবে বিযেব আসবে। 'পববে' (উৎসবে) নাচ শুরু হবে মাঝিব বাডি থেকে। শিকাব উৎসবে নিহত পশুদেবব ভাগ দেওযা হয মাঝিকে। সমাজেব কেউ কোনও সমস্যা নিযে হাজিব হলে বা সম্পত্তি বণ্টনেব জন্য পবামর্শ চাইলে মাঝি প্রযোজন মনে কবলে 'কুলহি দুরুপ' ডাকবেন। 'কুলহি দুরুপ' হল পূর্ণবযস্ক পুরুষদেব নিযে সভা। এই সভায সকলেই আলোচনায অংশ নিতে পাববেন। কিন্তু শেষ কথা বলবেন মাঝি। মাঝিকে সাহায্য কববেন সমাজেব পাঁচজন, যাঁদেব বলা হয 'মোবে

হড়' (মোরে=পাঁচ, হড়=মানুষ)। মাঝির অনুমতি পেলে সমাজের কেউ পুলিশের কাছে যান বা আদালতে যান। গ্রামে কোনও অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে সাধারণত মাঝিই থানায় খবর দেন। থানা থেকে কেউ গ্রামে এলে প্রথমে মাঝির সঙ্গেই দেখা করেন।

গ্রাম পত্তনের সময় আদিবাসী সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা মাঝি সহ আরও কিছু সমাজ নেতা নির্বাচন করেন। পদটি সাধারণত বংশানুক্রমিক হলেও 'মাঝি' বড় ধরনের কোনও অপরাধ করলে গ্রামবাসী পুরুষেরা মিলিত হয়ে নতুন কাউকে মাঝি নির্বাচিত করেন।

গ্রামের কেউ দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ভুগলে গ্রামের মানুষ সাধারণত মাঝির কাছে 'ডাইনির নজর'-এর সন্দেহের কথা জানান। মাঝির নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা ওঝা বা জানগুরুর কাছে হাজির হন। জানগুরু কাউকে ডাইনি বলে ঘোষণা করলে ঘোষিত ডাইনির বিরুদ্ধে শাস্তিদানও মাঝির নির্দেশেই হয়।

জগমাঝি হলেন সমাজের আর এক প্রধান। জগমাঝি হলেন নৈতিকতার রক্ষক। জগমাঝি দেখেন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে সহ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো সামাজিক বিধানমতই সমাজের মানুষেরা পালন করছেন কিনা। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক ভ্রষ্টাচার, যৌন-ভ্রষ্টাচার রোধ করা এবং প্রয়োজনে তার বিচারের প্রশ্ন এলে বিচারের দায়িত্ব পালন করেন জগমাঝি।

জগমাঝিকে এসব প্রতিটি কাজে সহকারীরূপে যিনি সাহায্য করেন, তাঁকে বলা হয় পারানিক।

'নাইকে' সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত। পদটি বংশানুক্রমিক। সাঁওতাল সমাজের বোঙ্গারা (দেবতারা) দুধরনের বলে সমাজের বিশ্বাস। শুভকারী বোঙ্গা ও অশুভকারী বোঙ্গা। শুভকারী বোঙ্গাদের পুজো নাইকের প্রধান কাজ। পুজোয় বলি দেওয়া পশুর মাথা নাইকে দেওয়া হয়। শিকার উৎসবে যোগদানের আগে গ্রামবাসীরা বোঙ্গার পুজো দেন এবং নাইকেকে এ জন্য দেওয়া হয় পাঁচটা মোরগ।

কুডম নাইকে হলেন নাইকের সহকারী। অর্থাৎ সহকারী পুরোহিত। কুডম নাইকে অশুভকারী বোঙ্গাদের পুজোর অধিকারী। সমাজের বিশ্বাস অশুভকারী বোঙ্গারা গ্রামে মানুষদের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। তাই তাদের তুষ্ট করতে পুজো দেন।

সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের পাঁচজনকে নিয়ে 'মোরে হড়' তৈরি হয়। 'মোরে হড় -এর প্রতিপত্তি সমাজে যথেষ্ট। সামাজিক অপরাধ, বিবাহ-বিচ্ছেদের বিচার করেন মোরে হড়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারে দোষীদের জরিমানা হয়। অভিযোগকারী পান জরিমানার অর্ধেক। বাকি অর্ধেক মাঝির হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাঝি তার থেকে সামান্য রেখে বাকি টাকায় হাঁড়িয়া কিনে সমাজের সকলে এক সঙ্গে পান করেন।

'গোডেৎ'-এর কাজ মাঝির ডাকা সভার খবর গ্রামে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া।

সমাজেব ধর্মীয় জীবনে জানগুরুব কোনও স্থান নেই। আদিবাসী সমাজে পুজো-পার্বণেব ভাব কখনই জানগুরুকে দেওয়া হয না। ওঝা বা জানগুরু অথবা আব যে নামেই পবিচিত হোন না কেন এঁবা সমাজেব মানুষেব ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আদায কবে। নানা কাবণে মানুষ ওঁদেব পবামর্শ নিতে হাজিব হন। বোগেব কাবণ ও বোগমুক্তিব জন্য, বন্ধ্যা বমণী মা হওযাব বাসনা নিয়ে, চুবি যাওযা জিনিসেব খোঁজে, গৃহপালিত পশুব অসুখেব সমস্যা নিয়ে, সন্তান-সম্ভবাব সন্তান যেন ভালভাবে হয এই প্রার্থনা নিয়ে, ডাইনি ধবেছে সন্দেহ কবলে, ডাইনিব নজব পড়েছে সন্দেহ কবলে অথবা ডাইনিকে খুঁজে বেব কবাব আবেদন নিয়ে সমাজেব বিভিন্ন মানুষ উদ্ধাব পেতে জানগুরুব শবণাপন্ন হন।

সমাজেব বিশ্বাস, জানগুরুবা এক বিশেষ ধবনেব বোঙ্গাব মাধ্যমে অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী। এইসব বোঙ্গাদেব সাহায্যে জানগুরু ডাইনিদেব এবং অনিষ্টকাবী আত্মাদেব প্রভাব নষ্ট কবতে সক্ষম। জানগুরুবা বিভিন্ন প্রযোজনে বিভিন্ন বোঙ্গাদেব কাজে লাগিয়ে অনিষ্টকাবী বোঙ্গা, আত্মা, ডাইনিদেব নিযন্ত্রণ কবেন। দু একটি উদাহবণ ববং দিই। প্রসূতিব হিতার্থে ভালুযাবিজয বোঙ্গা, উলুমপাইকে বোঙ্গা, জুলুমপাইকে বোঙ্গা, খোস-পাঁচড়ায় গোসাঞী-এবা বোঙ্গা, পাগল ভাল কবতে নাশনচণ্ডী বোঙ্গা, দুবিযা বাবদো বোঙ্গা, গৃহপালিত পশুদেব অসুখে জাহেব এবা বোঙ্গাও নাগ-নাগিন বোঙ্গাদেব তুষ্ট কবে কাজে লাগান হয। জানগুরুদেব বোঙ্গাদেব মধ্যে কিছু হিন্দু দেব-দেবীও আছেন। যেমন গঙ্গা, কালী, দিবি (দুর্গা)।

আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস, জাদু দুবকমেব—হিতকাবী ও অনিষ্টকাবী। জানগুরুবা হিতকাবী জাদু ক্ষমতাব অধিকাবী এবং ডাইনি বা ডাইনবা অনিষ্টকাবী জাদু ক্ষমতাব অধিকাবী। সমাজ বিশ্বাস কবেন একমাত্র জানগুরুবাই ডাইনিব মন্ত্রশক্তিব বিরুদ্ধে লড়াব ক্ষমতা বাখেন। যদি কোনও ডাইনিব শক্তিব কাছে একজন জানগুরু পবাজিত হন অন্য জানগুরু আসবেন। জানগুরুবা সমাজেব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ।

ডাইন প্রসঙ্গে বহু জানগুরুব সঙ্গে কথা বলেছি। তাদেব অনেকের মত—ডাইনি যাব উপব নজব দিয়েছে, তাব গু ডাইনিকে খাওযালে ডাইনিব ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায। আবাব অনেকেব মতে ডাইনি যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ তাদের ক্ষমতাও কাজ কবে।

দ্বিতীয মতটি সমাজেব মানুষদেব প্রভাবিত কবে বলেই ভীত মানুষগুলো- বোগ থেকে নিজে বাঁচতে বা আত্মীয়কে বাঁচাতে জানগুরু যাকে ডাইনি বলে ঘোষণা কবে তাকে অতি নিষ্ঠুবতাব সঙ্গে হত্যা কবতে সামান্যতম কুণ্ঠিত হন না। ববং অনেক সময হত্যাকাবীবা মনে কবেন, ডাইনি হত্যা কবে সমাজেব উপকাবই কবেছেন, ভবিষ্যতে কাউকে ডাইনিব নিষ্ঠুরতাব বলি হতে হবে না। এ ধবনেব ঘটনাও বহু ঘটেছে, ডাইনি হত্যাকাবী নিজেই বীরেব মত থানায গিয়ে আত্মসমর্পণ কবেছেন।

সমাজ অবশ্য সাধাবণভাবে বিশ্বাস কবে, ডাইনি ইচ্ছে কবলে তাব মন্ত্র ফিবিয়ে নিতে পাবে।

ধর্ম

সাঁওতাল সমাজেব কাছে সিং বোঙ্গাব (সূর্যেব) স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। সিং বোঙ্গা বোজ পূর্ব দিকে দেখা দেন বলে সমাজেব কাছে পূর্ব দিক পবিত্র দিক। পুজো-পাঠ হয পূর্ব দিকে মুখ কবে। নির্দিষ্ট সময মেনে সিং বোঙ্গাব পুজো হয না। সিং বোঙ্গাব করুণা পেতে পাঁচ-সাত-দশ বছবে একবাব পুজো দিলেই হলো। পুজোতে সাদা মোবগ অথবা পাঁঠা বলি চডান হয।

'মাবাং বুরু' (আক্ষবিক অর্থে বড পাহাড) বোঙ্গাদেব মধ্যে অন্যতম প্রধান। মাবাং বুরু জাতিব ও সমাজেব পালনকর্তা। ইনিই আদিম মানব-মানবীকে পালন করেছিলেন, খাওয়া-পবাব ব্যবস্থা কবে দিযেছিলেন। শিখিযেছিলেন হাঁড়িযা তৈবিব পদ্ধতি। শুরুতে মাবাং বুরুব পুজোয দেওয়া হত হাঁড়িয়া বা বাড়িতে তৈবি মদ। পববর্তীকালে মুণ্ডাদেব প্রভাবে মাবাং বুরুব কাছে বলি দেওযা হতে থাকে।

মাবাং বুরু কোন কোন খুঁটেব (উপগোষ্ঠিব) গৃহদেবতা। বীবহোব, ভূমিজ, হো বা মুণ্ডাদেব কাছেও পূজিত হন মাবাং বুরু।

'জাহেব-এবা' জাহেব থানেব (পবিত্র কুঞ্জ, যেখানে সমাজেব সার্বজনীন দেবতাবা অবস্থান কবেন) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনেকের ধাবণা। জাহেব-এবাকে মুণ্ডাবা জাহেব বুড়ি বলেন, ওযাওঁবা জাহেব এরাকে বলেন ঝাকড়া বুঢিযা বা সবণা বুঢিযা। ফাগুযা বা দোলেব দিন জাহের এবাব বিশেষপুজো হয। দেবীব কাছে প্রার্থনা কবা হয যেন গ্রামেব ছেলে-মেযেবা সুস্থ থাকে, খাবাপ বাতাস রোগ না বযে আনে।

'গোঁসাঞী-এবা' যা-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগেব বোঙ্গা। সাদা মোবগ বলি দিযে গোঁসাঞী-এবাকে সন্তুষ্ট বাখা হয।

'মোবাইকো-তুরুইকো' (আক্ষবিক অর্থে পাঁচ ছয) বোঙ্গা একজন বোঙ্গা হিসেবেই পুজো পান। মোবাইকো-তুরুইকো গ্রামেব ভাল মন্দের দেখাশুনো কবেন, শস্যেব ফলন, বৃষ্টি, খবা, মডক ইত্যাদিব নিযন্ত্রক।

সমাজ বিশ্বাস কবে ডাইনি ও ডাইনদেব উপব 'পবগনা বোঙ্গা'ব নিযন্ত্রণ আছে। ডাইনিব নজব পবে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে বলে জানগুরু ঘোষণা কবলে ডাইনিদেব মন্ত্রকে কাটান দিতে জানগুরুবা পবগনা [illegible] পুজো কবেন।

গ্রামেব প্রান্তে থাকে জাহেব [illegible] বা পবিত্র-কুঞ্জ। এই পবিত্রকুঞ্জে সমাজেব বোঙ্গা বা দেবতাবা থাকেন। পাশাপাশি তিনটি শালগাছেব তলায় তিনটি পাথব মাবাং বুরু, জাহেব-এবা ও মোবেইতো-তুরুইকো নামে পূজিত হয। সমাজেব বিশ্বাস পাথরগুলো বোঙ্গাবাই বেখে গিযেছেন। দুটি মহুয়া গাছতলা হয গোঁসাঞী-এবা ও পবগনাব থান।

জাহেব থানে বোঙ্গারা প্রধান প্রধান পববেব বা উৎসবেব সময পুজো পান। প্রধান উৎসবগুলো হলো ফসল তোলাব উৎসব 'সোহবাই', ফসল বোনাব উৎসব 'এবোক্ সিম্', পুষ্প উৎসব 'বাহা' ইত্যাদি।

জাহেব থানেব বোঙ্গাবা ছাডা গ্রামেব মাঝে থাকে 'মাঝি বোঙ্গা'ব থান। মাঝি বোঙ্গাকে 'মাঝি বুড়ি' বা 'মাঝি হডম্' নামেও ডাকা হয়। মাঝি থানেব অবস্থান গ্রামেব মাঝিব বাড়িব সামনে। মাঝি বোঙ্গা গ্রামেব মাঝিব আধ্যাত্মিক উপদেষ্টাব কাজ করে।

মাঝি বোঙ্গা গ্রামেব ভাল-মন্দ দেখাশুনো কবেন। জাহেব থানেব বোঙ্গাদেব পুজো দেবাব আগে মাঝি বোঙ্গাব পুজো দেওয়া হয। মাঝি বোঙ্গাব পুজো কবেন মাঝি স্বযং। পুজোয মাঝি বোঙ্গাকে নিবেদন কবা হয় হাঁড়িযা, বলি দেওয়া হয দুটি পাযবা।

সমাজের বিশ্বাস মাঝি বোঙ্গা ও পবগনা বোঙ্গাব অন্যান্য বোঙ্গাদেব উপব যথেষ্ট প্রভাব আছে।

যদিও জাহেব বোঙ্গাবা আদিবাসী অনেক জনজাতিব কাছে পূজনীয, কিন্তু এক গ্রামেব মানুষ অন্য গ্রামেব জাহেব থানে পুজো দেন না। যদি একগ্রামেব মানুষ স্থাযীভাবে অন্যগ্রামে বসবাস শুরু কবেন, তবে তিনি নতুন গ্রামেব জাহেব থানে পুজো দেওযাব অধিকাব পান্।

এসব ছাড়াও প্রতিটি খুঁটেব বা উপগোষ্ঠিব বযেছে নিজস্ব দেবতাও। সাধাবণত এঁদেব বলা হয আব্‌গে বোঙ্গা। আব্‌গে বোঙ্গাব পুজোব প্রসাদ মেয়েদেব খাওযাব বা ছোঁযাব অধিকাব নেই। প্রসাদে মেযেদেব ছোঁযা লাগলে দ্বিগুণ নৈবেদ্য দিযে আব্‌গে বোঙ্গাব পুজো দিয়ে প্রাযশ্চিত্ত কবতে হয।

সমাজেব বিশ্বাস আত্মা অমব। দেহত্যাগেব পব যতদিন তাঁদেব কথা বংশধববা মনে বাখেন ততদিন আত্মা বিপদ-আপদে তাঁদেব সাহায্য কবে। কেউ দেহত্যাগ কবাব পব বোঙ্গা হযে যান। পাবলৌকিক কাজ শেষ হওযাব পব আত্মাব বোঙ্গা সাঁওতালদেব বাড়িতে স্থান পান। আত্মাব এই বোঙ্গাকে বলে হপ্‌বামপো বোঙ্গা। প্রতি পববে পবিবাবেব লোক হপ্‌বামপো বোঙ্গাকে নৈবেদ্য দেয।

'দিশম সেন্দ্রা' বা বার্ষিক শিকাব পববেব সময সাঁওতাল সমাজ জঙ্গল মহাসভা বা লো বীব' ডাকে। 'লো বীব'-এব নির্দেশ সমাজেব সকলেই মান্য কবেন। 'ডিহবি' হলেন লো বীব পববেব সর্বোচ্চ ক্ষমতাব অধিকাবী।

ফাল্গুন মাসে বাহা পববেব পব 'লো সেন্দ্রা' অনুষ্ঠিত হয। ডিহবি শিকাব পববেব দিন ঠিক কবেন ও কোথায কোথায শিকাবীবা বাত্রিবাস কববেন, তাও ঠিক কবেন। বিভিন্ন হাটে দূত পাঠান ডিহবি। দূতদেব হাতে থাকে 'ধাবওযাক্' (পাতাসমেত শালগাছেব ডাল)। হাটেব লোকজন 'ধাবওযাক্' হাতে কোনও লোক দেখলেই বুঝতে পাবেন ডিহবিব দূত এসেছেন। সমাজেব লোকেবা দূতেব কাছ থেকে জেনে নেন শিকাবি পববেব দিনক্ষণ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি।

গ্রামেব নাইকে পববে যাওযা শিকাবীদেব কল্যাণ কামনায পাঁচটা মোবগ উৎসর্গ কবে পুজো দেন ডিহবি, শিকাব পববেব কযেকদিন আগে থেকেই সহবাস বন্ধ বাখেন, শয্যা নেন ভূমিতে। শিকাব পববেব আগে সন্ধ্যায পিতলেব পাত্রে জলে দুটি শাল-পল্লব বেখে দেন। পবদিন ওই পল্লব-দুটি তাজা থাকলে শুভ লক্ষণ বলে ধবে নেওযা হয, শিকাবীবা আসাব আগেই ডিহবি তাঁব স্নান সেবে ফেলেন। শিকাবীবা হাজিব হওযাব পব ডিহবি বোঙ্গাদেব পুজো কবেন। বলি দেওযা মোবগ চালেব সঙ্গে বান্না কবা হয। এই খেযে ডিহবি তাঁব উপোস ভাঙেন। শিকাবীবা বেবিযে পবেন শিকাবে।

সাবাদিন শিকাব কবাব পব সন্ধ্যায তাঁবা সমবেত হন। এক-এক গ্রামেব মানুষ

এক-এক জায়গায় বসেন। রাতের খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকতে যাঁরা 'লো-বীর' সভায় যাবে তারা ছাড়া সকলে মিলে নাচ-গান-বাজনা শুরু করবে। এই প্রমোদ আসরকে বলে 'তোরিয়া'। শিকারের দেবী 'বঙ্গো কল্জি' বোঙ্গাকে খুশি করতেই তোরিয়ার আয়োজন। নাচ-গানে রাত শেষ হবে। ডিহরি ভোর বেলায় স্নান সেরে পুজো করবেন, বলি চাপাবেন। শুরু হবে শিকার। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শিকার পরব শেষ হয়। শিকারীরা গ্রামে ফেরেন। শিকারীদের স্ত্রীরা স্বামীদের পা ধুইয়ে স্বাগত জানান।

শিকার পরবের সময় বিবাহিতেরা চুলে ফুল গুঁজতে পারেন না, হাতে পরেন না লোহার বালা। শিকারীরা না ফেরা পর্যন্ত গ্রামে পশু বা মোরগ মারা নিষিদ্ধ।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নারী

সাঁওতালদের বহু লোককথায় পুরুষদের বীরসুলভ সরলতা ও নারীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সমাজের নারীদের সম্মানরক্ষাকে পুরুষরা তাঁদের বীর-ধর্ম বলে মনে করেন। এগুলো যেমন সত্যি, পাশাপাশি এ-ও সত্যি পুরুষরা মহিলাদের বিশ্বাস করেন না। সমাজ বিশ্বাস করে মন্ত্র বা অলৌকিক ক্ষমতা দখল করার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রণী। নারীদের বোঙ্গার পুজোর অধিকার দিলে ছলাকলায় তাঁরা বোঙ্গাদের হৃদয় জয় করে নেবেন। নারীরা রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী হলে সমাজের ক্ষতিই হবে।

নারীদের রহস্যময় ক্ষমতাকে ভয় পাওয়ার হদিশ পাওয়া যায় লোকগাথাতেই।

সে অনেক অনেক আগের কথা। সমাজে বাস করতেন এক গুণীন্। তাঁর ছিল অলৌকিক সব ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার জোরে অনেক মৃত আদিবাসীদের নতুন জীবন দিয়েছিলেন। গুণীনের গুণগ্রাহী জুটলো। গুণীন ঠিক করলেন, তাঁদের দীক্ষা দেবেন। গুণীন বুঝেছিলেন তাঁর আয়ু বেশি দিন নয়। ভক্তদের ডেকে বলেছিলেন, তোদেরই তো দীক্ষা দেবো। কিন্তু মনে হচ্ছে, সব কিছু শেখাবার আগেই আমার মৃত্যু হবে। তোদের কয়েকটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন, আমি মারা গেলে আমার মৃতদেহ যেন অবশ্যই দাহ করিস তোরা। চিতা থেকে এক সময় লাফিয়ে উঠবে আগুনের গোলা। আগুনের গোলা দেখে ভয় না পেয়ে তোরা গোলাটাকে গ্রহণ করিস। তাহলেই আমার সমস্ত মন্ত্রশক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা তোরা পেয়ে যাবি।

ভক্তদের দীক্ষা দেওয়ার দিন ঠিক হলো। দীক্ষার দিন গুরু যখন ঘর থেকে বের হচ্ছেন তখন একটা সাপ কামড়াল গুরুর মাথায়। গুরুকে বাঁচাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। গুরুকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতা সাজিয়ে তার উপর শোয়ানো হলো। চিতায় আগুন জ্বলে ওঠার কিছু পর বিশাল শব্দ করে একটা আগুনের গোলা শূন্যে উঠে গেল। ভীত ভক্তেরা সেই শব্দে ও গোলার আগুনের তীব্রতায় পালিয়ে গেলেন। কাছের মাঠে কিছু মেয়ে শুকনো কাঠি কুড়োচ্ছিল। আগুনের গোলাটা তাদের কাছে

পড়তেই তারা গোবর লেপা ঝুড়ি দিয়ে চাপা দিল। ফলে মেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো গুণীনের অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতার বড় অংশ। পরের যে ছোট আগুনের গোলাটা শূন্যে উঠে মাটিতে এসে পড়েছিল, সেটা সংগ্রহ করেছিলেন ভক্তেরা। ভক্ত পুরুষদের মধ্যেও সংক্রামিত হলো গুরুর শক্তি, তবে তা খুবই কম।

কোন কোন ক্ষেত্রে সাঁওতাল সমাজের মেয়েরা কিছু কিছু হিন্দু দেব-দেবীর পুজো করছেন বটে। (কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি), কিন্তু এগুলো বিরল ব্যতিক্রম। হিন্দু দেব-দেবীদের পুজোর বাইরে কিন্তু সাঁওতাল সমাজ তাঁদের নারীদের বোঙ্গা পুজোর অধিকার স্বীকার করে নেয়নি।

ডাইনি, জানগুরু প্রথার বিরুদ্ধে কী করা উচিত

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সব বছর ভাল ফসল হয়, সমাজে অভাব অনটন কম হয়, সেসব বছর 'ডাইনি' হত্যা বা ডাইনি' বিচারের ঘটনা কম ঘটে। যেসব বছর ফসল ভাল হয় না, গো-মড়ক দেখা দেয়, সেসব বছরগুলিতে ডাইনি নিয়ে অভিযোগ ওঠে বেশি।

জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস সাধারণ মানুষদের এমনি আসেনি। তাঁরা দেখেছেন জানগুরুদের 'অলৌকিক' সব কাণ্ডকারখানা। জানগুরুরা আত্মা, ভূতদের নিয়ে আসতে পারেন, কাজে লাগান। ভূতেরা গ্লাস থেকে তাড়ি খায়। কঞ্চি চালান করে, নখদর্পণে, আটার গোলা ভাসিয়ে, হাতে ছাই ঘষে নাম ফুটিয়ে চুরি যাওয়া জিনিসের হদিশ দিচ্ছেন। যেভাবে এসব ঘটনা জানগুরু ঘটাচ্ছেন, সেগুলোর ব্যাখ্যা সাধারণ বুদ্ধিতে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ঘটনাগুলোকে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ভাবার অবকাশ থাকছে না। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজের শিক্ষিত স্নাতক, শিক্ষকরাও জানগুরুদের নির্দেশকে অভ্রান্ত মনে করে ডাইনি হত্যায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন।

ডাইনি হত্যার পিছনে রয়েছে ডাইনিদের এবং জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি সাধারণের অন্ধ-বিশ্বাস। অন্ধ-বিশ্বাস কিন্তু শিক্ষার সঙ্গেই শুধুমাত্র সম্পর্কিত নয়। যাঁরা মনে করেন আদিবাসী সমাজকে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে দিলেই ডাইনি হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁরা প্রকৃত সত্য বিষয়ে বা সমস্যার গভীরতা বিষয়ে ঠিক মত অবহিত নন, এ কথা অবশ্যই বলা চলে। ডাইনি ও জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই দূর করা সম্ভব বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসে আচ্ছন্ন শিক্ষিতের সংখ্যাই যে আমাদের দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সংখ্যাগুরু, এ সত্যকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, বিজ্ঞান পেশার মানুষ, শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এমনকি স্বীকৃত মার্কসবাদীদের মধ্যে কি আমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের সাক্ষাৎ পাই না? বাস্তব সত্যটি এই যুক্তি দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বোঝালে শুধুমাত্র

শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষরাই নন, শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষরাও সংস্কার মুক্ত হন। এই কথাগুলো কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত বা ধারণাপ্রসূত নয়, বরং বলতে পারি হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। মানুষ শৈশব থেকেই বেড়ে উঠছে অলৌকিকের প্রতি আস্থাশীল পরিবারে, সমাজে পরিবেশে। পড়ার বই ও গল্পের বইয়ের মাধ্যমেও অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস ও ভুল ধারণাই প্রতিনিয়ত সঞ্চারিত হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে। বিপরীত কোনও যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়ার ফলে অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাসগুলোই দিনে দিনে দৃঢবদ্ধ হয়েছে। মানুষ যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে যে আন্তরিকতার সঙ্গেই যুক্তিকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন এই সত্যটুকু যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে উপলব্ধি করেছি।

শত শত বছর ধরে ভাববাদী দর্শন যে অন্ধ-বিশ্বাসগুলোকে, আমাদের চিন্তার জগৎকে, প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে চলেছে যুক্তিবাদী দর্শন মুহূর্তের চেষ্টায় কোটি কোটি মানুষকে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে, এমনটা ভাবা বাতুলতা মাত্র। আমাদের দেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য। শিক্ষিতদের মধ্যেও অতি প্রয়োজনীয় (লেখাপড়া শিখতে যতটুকু না কিনলেই নয়) বই কেনা ছাড়া বই কেনার অভ্যাস খুবই কম। অন্ন-বস্ত্রের মত বই কেনাকে বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন বলে মনে করেন না। কিনলেও সাধারণভাবে 'শেষ পাড়ানের কবি' হিসেবে ধর্মগ্রন্থই সেখানে গুরুত্ব পায়। কুসংস্কার মুক্তির কাজ এক বা কয়েকজন ব্যক্তির কিছু লেখাতেই সমাধান হয়ে যাবে এমন ভাবাটা একান্তই অমূলক। যুক্তিবাদী লেখা-পত্তর কিছু মানুষ বা কিছু সংগঠনকে যুক্তিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চিন্তার স্বচ্ছতা আনতে সাহায্য করতে পারে, দিশা দিতে পারে মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত মানুষরা বিভিন্ন গণসংগঠন করে যেদিন অক্ষরজ্ঞানহীন, শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া মানুষদের স্বচ্ছ যুক্তির আলোতে উদ্ভাসিত করতে পারবেন, সেদিনই যুক্তিবাদী আন্দোলনে নতুন মাত্রা নতুন গতি যুক্ত হবে।

শিক্ষিত এবং ডাইনি হত্যা বিরোধী মানুষদের লেখাতেও আমরা কিন্তু বার বার লক্ষ্য করেছি, স্বচ্ছতার অভাব। নেতৃত্বের স্বচ্ছতার অভাবই ডাইনি হত্যা বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার পক্ষে প্রবলতর বাধা। শরচ্চন্দ্র রায়ের বিখ্যাত বই 'ওঁরাও রিলিজিয়ন অ্যান্ড কাস্টমস্'-এ শ্রী রায় এ কথাও লিখেছেন, জানগুরু সম্প্রদায়ের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী মানুষগুলো এ সব বিদ্যা শেখে কখনও ভালবেসে, কখনও আয়ের পথ হিসেবে। এরা বুঝতে পারে কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা অতিপ্রাকৃত। এরা অলৌকিক বিদ্যার পাশাপাশি, ভেষজ বিদ্যাও শেখে।

রেভারেন্ড পি ও বডিং 'ট্যাবু কাস্টমস্ অ্যামাং দি সানতালস্' গ্রন্থে একথাই বলেছেন, মেয়েরা, সে ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যেই হোক, অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর কাছে পৌঁছুতে চায়। সেটা প্রকাশ্যে পারে না। কারণ পুরুষেরা মত দেয় না। তাই গোপনে ডাইনি বিদ্যার অনুশীলন করে।

অসিতবরণ চৌধুরীর 'উইচ কিলিং অ্যামাং দি সানতালস্' বইটি পড়লে কোথাও এমন কথা পাই না যাতে মনে হয় 'জান' এবং 'ডান' কারোই কোনও অলৌকিক

ক্ষমতা-টমতা বলে কিছু নেই। ববং শ্রীচৌধুবীব কথায সন্দেহ জাগে এ বিষযে তাঁব নিজস্ব বিশ্বাস বযেছে দোদুল্যমান অবস্থায।

শ্রী চৌধুবীব বিভিন্ন লেখা পড়েও এ বিষযে তাঁব মতামত বুঝে ওঠা আমাব পক্ষে সম্ভব হযনি। তাঁব কথায, 'মন্ত্র-তন্ত্রসমন্বিত জানগুকব কার্যকলাপকে আমবা হিতকাবী জাদু বা white magic বলে অভিহিত কবতে পাবি। অনুরূপভাবে, অনিষ্টকাবী যেসব ব্যক্তি মন্ত্র-তন্ত্রেব আশ্রয নিযেছে, তাঁদেব কার্যকলাপকে অহিতকাবী জাদু বা black magic আখ্যা দেওযা যেতে পাবে। সাঁওতাল সমাজে যাবা black magic কবছে বা জাদু কবছে, তাদেব 'ডান' আখ্যা দেওযা হয।'

তাব মানে? তিনি কি 'ডান' সত্যিই আছে কিনা'ব উত্তবে জানাচ্ছেন 'ডানবা black magic কবছে'? এতো ঈপ্সিতা বায চক্রবর্তীব মত 'ওযার্ল্ড উইচ ফেডাবেশন'-এব সর্বময়কর্ত্রী বলবেন! অসিতববণ চৌধুবী'ব লেখা-পত্তবকে যেখানে আমাদেব সমাজেব উচ্চকোটিব মানুষ ও পত্র-পত্রিকা মূল্যবান বলে মনে কবেন, সেখানে তাঁব এই সিদ্ধান্তেব পিছনে যুক্তিগুলো কী? এ বিষযে জানাব আগ্রহ যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষেবই স্বাভাবিক।

শ্রীচৌধুবী লেখাটিতে ঠিক পবেব লাইনটিতেই বলেছেন, 'এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সাঁওতাল অধ্যুষিত সব জেলাতেই বহু প্রাণহানি ঘটেছে 'ডান' হওযাব অভিযোগে।'

না। 'ডান' প্রথা বন্ধে এটুকু বলাই যথেষ্ট নয। ববং মনে হযেছে—যেহেতু তাঁব লেখা-পত্তব 'ডান' প্রথা বিবোধী বলে প্রচলিত, তাই এ বিষযে তাঁব আবও সতর্কতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিব প্রযোজন ছিল।

ডাইনি প্রথাব মত একটা অমানবিক প্রথাব অবসান প্রতিটি মানবিকতায বিশ্বাসী যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী আন্তবিকভাবেই চান। যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল বিভিন্ন সংস্থা ও মানুষ ডাইনি প্রথাব বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নিযে যাতে আন্দোলনকে সার্থক কবে তুলতে পাবেন, সে দিকে লক্ষ্য বেখেই সাঁওতাল সমাজ বিষযে কিছু আলোচনায় গিযেছিলাম। আলোচনা অনেকেব কাছে নিবস মনে হতেই পাবে, কিন্তু যাঁবা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিযে যেতে আগ্রহী, তাঁদেব আগেই জেনে নেওযা উচিত, স্পষ্ট ধাবণা থাকা উচিৎ, কাদের জন্য কবছি? কী তাঁদেব সমাজ জীবন? কী তাঁদেব সমস্যা ইত্যাদি। যাঁদেব সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবন ও সমস্যা বিষযে আমবা অন্ধকাবে থাকবো, তাদেব সঠিক আলোর সন্ধান দেওয়া দুরূহ।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ কবাব ইচ্ছেতে রাশ টানতে পারলাম না। সম্প্রতি মদনপুর থেকে একটি তরুণ এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, তিনি একজন যুক্তিবাদী। যুক্তিবাদ বিষযক কিছু লেখা লিখতে আগ্রহী। তাঁর ইচ্ছে 'যুক্তিবাদীর চোখে স্বামী বিবেকানন্দ' এই নামে একটি বই লিখবেন। বললেন, এই বিষয়ে নিবঞ্জন ধবেব একটি বই পড়েছেন। আর কী কী বই পড়লে লেখাব খোবাক পাবেন, এই বিষয়ে আমার মতামত চাইলেন। বলেছিলাম "আপনাব উচিৎ সবাব আগে স্বামী বিবেকানন্দকে জানা। তাঁব লেখা-পত্তব ও কাজকর্মেব সঙ্গে পবিচিত হওযা। তাবপব আপনার যুক্তিতে স্বামীজীব লেখাপত্তব বা কাজ কর্মের

যেগুলোকে যুক্তিহীন বা যুক্তি বিরোধী মনে হবে, সেই বিষয়ে আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে পাঠকদের বোঝাতে চেষ্টা করুন, কেন আপনার চোখে স্বামী বিবেকানন্দের ওই সব কাজকর্ম যুক্তি বিরোধী।" তরুণটি বললেন, বিবেকানন্দ বচনাবলী তাঁর পড়া আছে। বললাম, তাতে কোনও কিছু যুক্তি বিরোধী মনে হয়েছে কী?

তরুণটি বললেন,—না, তেমন কিছু চোখে পড়েনি। বিবেকানন্দ বচনাবলী থেকেই কিছু কিছু কথা বলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এসব বিকোনন্দেরই কথা, আপনি কি মনে করেন, এগুলোর পিছনে যুক্তি আছে? তরুণটি বললেন, "বিবেকানন্দ এ ধরনের কোনও কথা বলেছেন বলে তো কোনও বইতে পাইনি।" একটা ডাইরীর পৃষ্ঠা খুলে কলম বাগিয়ে বললেন, "ঠিক লাইনগুলো কি একটু বলুন না? অথবা বইটার নাম? পৃষ্ঠা সংখ্যা?"

বলেছিলাম, "বিবেকানন্দ বচনাবলী থেকেই কথাগুলো বললাম। আপনি বচনাবলী ভালমত পড়লে কথাগুলো অপরিচিত মনে হত না। বাস্তবিকই যুক্তিবাদী মানসিকতা নিয়ে লিখতে চাইলে যে বিষয়ের বিরোধিতা করতে চান, সেই বিষয়টিকে আগে ভালমত জানার চেষ্টা করুন। তার দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা, যুক্তিহীনতাকে খুঁজে বের করুন, তবে তো ভাল লেখা হবে। আপনি যদি লেখার শর্ট-কার্ট কিছু রাস্তার খোঁজে আমার কাছে এসে থাকেন তো বলব সে বিষয়ে সাহায্য করতে আমি অক্ষম।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। '৮৯-এর জানুয়ারি। একটি বিজ্ঞান ক্লাবের অলৌকিক বিরোধী শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করতে গিয়েছি। এই উপলক্ষে দু-দিনের একটি বিজ্ঞান মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। বড়-সড় মেলা। আশেপাশে কয়েকটি জেলা থেকেও এসেছেন অনেক বিজ্ঞান ক্লাব। ব্যবস্থাপক বিজ্ঞান ক্লাবের সম্পাদক এক তরুণ শিক্ষক। আমাকে সম্পাদক জানিয়েছিলেন, শিক্ষণ-শিবিরে আমি যেন আত্মা, জাতিস্মর, প্ল্যানচেট, সম্মোহন, ভূতে ভর, ঈশ্বরে ভর এইসব বিষয়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি। জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে ক্লাবের সভ্যদের জ্ঞান যথেষ্ট গভীর। মনে আছে, আমি একটু মজা করতেই বলেছিলাম, "জ্যোতিষ শাস্ত্রের পক্ষে বক্তব্য রাখি, আমাকে আপনারা হারাতে পারবেন তো?" সম্পাদক দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'অবশ্যই'।

মাঠের তিন পাশ ঘিরে রঙিন কাপড় দিয়ে তৈরি এক একটি ঘরে এক একটি বিষয় নিয়ে মডেল ও ছবির সাহায্যে বিজ্ঞান বোঝাবার প্রদর্শনী চলছিল। প্রথম দিন বিকেলেই জ্যোতিষ বিষয়ক প্রদর্শনী কক্ষে যুক্তির আক্রমণ চালালেন দুই জ্যোতিষী। একজন স্থানীয় এবং একজন নৈহাটির জ্যোতিষী। ওই কক্ষে টাঙান দুটি চার্ট দেখিয়ে জ্যোতিষী দুজন ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালেন, এই পোস্টার দুটিতে দেওয়া তথ্যগুলো ভুল। এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ক্লাবের অনেকেই বিতর্কে অংশ নিলেন, অংশ নিলেন সম্পাদক স্বয়ং। শেষ পর্যন্ত সম্পাদকই আমাকে ওখানে ডেকে নিয়ে গেলেন। জ্যোতিষী দুজনের অভিযোগের উত্তরে বিনীতভাবেই স্বীকার করে নিলাম, পোস্টার দুটিতেই ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। একই জন্ম সময় নিয়ে বিভিন্ন জ্যোতিষী বিভিন্ন ধরনের গ্রহ অবস্থান দেখিয়ে ছক করছেন এটা অবিশ্বাস্য। বরং এই ছক তিনটি দেখলে সন্দেহ জাগে,

জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এবং জ্যোতিষীদের হাসির খোরাক করতে গিয়ে নিজেরাই মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বিতীয় পোস্টারটিতে কয়েকটি গ্রহবস্তু বিষয়ে তথ্যগত ভুল ছিল। সম্পাদক জানালেন, তাঁরা এই তথ্যগুলো একটি বিজ্ঞান পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছেন। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। শর্টকার্ট-এ বাজিমাৎ যে করা যায় না, অন্তত নেতৃত্ব দিতে গেলে প্রতি-আক্রমণের মুখে সামাল দিতে, যাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানবো, তাদের বিষয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। এর কোনও ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। নতুবা তেমন আঘাতের মুখে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

আবার আমাদের মূল আলোচনায় ফেরা যাক। আদিবাসীদের বা সাঁওতালদের মধ্যে যাঁরা খৃস্টান বা হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তারাও কিন্তু ডাইনি বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কারণ, সমাজের আশেপাশের মানুষদের ডাইনির প্রতি বিশ্বাস তাঁদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছিল।

এও দেখেছি সাঁওতাল গ্রামের আশেপাশের শহরের বা গ্রামের ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত জানগুরুদের কাছে দৌড়োন নানা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায়।

ডাইনি ও জানগুরুর অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি যে বিশ্বাস বংশপরম্পরায় সমাজজীবনে চলে আসছে, তারই পরিণতিতে ঘটে চলেছে ডাইনি হত্যার মত বীভৎস প্রথা।

এ সমস্যা সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা। এর জন্য শুধু আইন নয়, প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের। অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষগুলোকে বোঝাতে হবে 'ডান' বা 'জান' কারোর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। এসব বোঝাতে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে জানগুরুদের তথাকথিত অলৌকিক-ক্ষমতার রহস্য ফাঁস। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অনেকেই উদ্যোগ নিয়ে ডাইনি বিরোধী নাটক লিখছেন।

**যদি এমন নাটক আদিবাসী
সমাজের কাছে হাজির করা হয় যাতে
সেই এলাকার জানগুরুদের ঘটানো তথাকথিত
অলৌকিক ঘটনার কৌশলগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হবে,
তবে সে নাটকই হবে জানগুরুদের প্রতি সবচেয়ে
বড় আঘাত। জানগুরুদের প্রতি ছুঁড়ে
দেওয়া এই চ্যালেঞ্জ তাদের
অস্তিত্বকেই বিপন্ন
করে তুলবে।**

জানগুরুরা বুজরুক, জানগুরুদের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই, যুক্তি দিয়ে এই বিশ্বাস মানুষের ভিতর যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে ডাইনি হত্যা বন্ধের ক্ষেত্রে

অনেকটাই এগোন যাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বলা সোজা, কিন্তু করা কঠিন, কারণ জানগুরুদের কৌশলগুলো জানবো কেমন করে? উৎসাহী আন্দোলনের সাথীদের উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, আমার সঙ্গে আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করলে কৌশলগুলো অবশ্যই তাঁদের হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেব। ডাইনির ভর, ডাইনির নজরলাগা মানুষগুলোর 'আতা-পাতা' সহ্য করতে না পারার কারণ বিষয়েও নাটকে ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব যাঁদের উপর তাঁদের নিয়ে শিক্ষণ শিবির করে শেখাতে হবে ভূতে ভর, জিনের ভর, ডাইনির নজর লাগা, জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য। ছাত্র-ছাত্রীদের এই বাস্তব সত্যকে জানালে কার্যকর হবে। এই বিষয়ে আমি ও ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সমস্ত রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে তৈরি আছি।

ডাইনি প্রথা রোধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যদি আন্তরিক ও নির্ভীক হন তবে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই কার্যকর ভূমিকা নেবে এবং আমাদেরও সহযোগিতা গ্রহণ করবে। সরকারের যদি এই ধারণা হয় আদিবাসী সমাজের এই অন্ধ-বিশ্বাসের (যেগুলো ওঁদের ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে) উপর আঘাত হানলে আদিবাসী সমাজ ক্ষেপে উঠবে তাহলে স্পষ্টভাবে জানাই, এ ধারণা আদৌ সত্য নয়।

সাঁওতাল সমাজের অনেকেই আজ এই প্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী। সরকার তাঁদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে অবশ্যই ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনে নতুন গতি যুক্ত হবে।

এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, জানগুরুদের অর্থের লোভ বা রাজনৈতিক ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে অনেক ব্যক্তি বা রাজনীতিক তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ডাইনি-বিশ্বাসকে কাজে লাগাচ্ছেন। এই স্বার্থভোগীরা যে ডাইনি প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে ব্যর্থ করতে সচেষ্ট হবে এই কথা স্পষ্টভাবে মাথায় রেখেই সরকারকে এগুতে হবে।

ডাইনি হত্যা বন্ধে যে সব পরিকল্পনা এখুনি সরকারের গ্রহণ করা উচিত

তথ্যচিত্র ও স্লাইড দেখিয়ে আদিবাসী সমাজের মানুষ ও পশুদের নানা রোগ ও তার প্রতিকারের উপায় বিষয়ে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে খরা, অজন্মার পিছনে কারণগুলি কোনও সময়েই অতিপ্রাকৃতিক নয়। বোঝাতে হবে অপুষ্টি থেকে হওয়া শিশু রোগ ও বিভিন্ন 'ভর' বিষয়ে। দেখাতে হবে জানগুরুদের অলৌকিক কার্যকলাপের গোপন রহস্য। এ সবের মধ্য দিয়ে মানুষের বিজ্ঞান চেতনা বাড়াতে হবে।

শিক্ষার, বয়স্ক শিক্ষার, নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পরিকল্পনা নিতে হবে। এই বিষয়ে সরকারকে যেমন উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

জানগুরুদের ব্যবসার বিরুদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টার পাশাপাশি প্রয়োজনে পুলিশ ও প্রশাসনকে জানগুরুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জানগুরু কাউকে ডাইনি বলে ঘোষণা করলে জানগুরুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই ঝাড়ফুঁক, মন্তর-তন্তরে রোগ সারে না, অতএব তোমরা ওঝা, গুণীন, জানগুরুদের কাছে যেও না বললে কিছুতেই কাজ হতে পারে না। "কেরোসিনের কম আলোয় কাজ করলে বা পড়লে চোখের ক্ষতি হয়" এ উপদেশ তখনই দেওয়া সাজে যখন কেরোসিনের বিকল্পে প্রায় সমমূল্যে বিদ্যুৎ সেইসব মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

রোগ সারাতে ঝাড়-ফুঁকের বিকল্প হিসেবে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধে (অবশ্যই বিনামূল্যে) না দিয়েই ঝাড়-ফুঁকের বিরুদ্ধে যতই বক্তব্য রাখি, তা কার্যকর হবে না।

একই সঙ্গে এ-ও সত্যি—স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে দিলেই আদিবাসী মানুষরা তাঁদের এতদিনের গড়ে ওঠা বিশ্বাস বর্জন করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দৌড়োবেন না। সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে যে খবর পেয়েছি এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে এটুকু বলতে পারি, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে যেখানে দেওয়া হচ্ছে সেখানকার আদিবাসী মানুষেরা ধীরে ধীরে সেসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতেও শুরু করেছেন। আদিবাসী সমাজের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা-মাফিক সমস্ত কাজ-কর্ম একযোগে শুরু করলে আদিবাসী সমাজের মানুষদের কাছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো আরও বেশি বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে থাকবে।

পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব এবং তার দরুন জল-বাহিত বিভিন্ন রোগের আক্রমণের শিকার হন এইসব বঞ্চিত মানুষজন। এ বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রশাসনের নিতে হবে।

বহির্জগতের সঙ্গে আদিবাসীদের মেলামেশা, যোগাযোগ যাতে বাড়ে, সে বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হবে। সরকারী তত্ত্বাবধানে আদিবাসীদের জমির মালিকানা ফিরিয়ে দিতে হবে।

জানগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতার রহস্য সন্ধানে

রেভারেন্ড পি ও বডিং-এর লেখা থেকে ব্রিটিশ আমলের সাঁওতাল পরগনার এক সহকারী কমিশনারের কথা জানতে পারি, যিনি অদ্ভুত কৌশলে অনেক ঘোষিত ডাইনির জীবন বাঁচিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঘটাতেন অনেকটা সীতার অগ্নি পরীক্ষার ধাঁচে। সহকারী কমিশনার সাহেব ব্যাটারি চালিত বিদ্যুৎ সৃষ্টির একটি জাদু-দণ্ড তৈরি করিয়েছিলেন। কাউকে ডাইনি ঘোষণা করা হয়েছে খবর পেলেই জাদু-দণ্ডটি নিয়ে সেই গ্রামে হাজির হতেন। যে জানগুরু বা জানগুরুরা ডাইনি ঘোষণা করেছে তাদের হাজির করতেন আদিবাসীদের সামনে। আনা হতো ঘোষিত ডাইনিকেও। সাহেব এবার জনসমক্ষে জানাতেন এই আশ্চর্য দণ্ড কোনও মিথ্যাচারী স্পর্শ করলে তার শরীরে আকাশের বজ্র এসে আঘাত করবে। মৃত্যু না হলেও অনুভব করবে মৃত্যু যন্ত্রণা। সত্যভাষীদের এই দণ্ড স্পর্শে কোনও বিপদ ঘটবে না। তারপর সাহেব জানগুরুদের দিয়ে ঘোষণা করাতেন কে ডাইনি। ঘোষণার পর জানগুরুরা দণ্ড ছুঁতেন। সাহেব দণ্ডে প্রবাহিত করতেন বিদ্যুৎ। জানগুরুরা বিদ্যুৎ তরঙ্গের আঘাতের আকস্মিকতায়, তড়িতাহত বিষয়ে অজ্ঞতায় ভীত, আতঙ্কিত হয়ে আর্তনাদ করে উঠতেন। এবার ঘোষিত ডাইনিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কী ডাইনি?" মেয়েটি জানাতেন, "না"। এবার মেয়েটিকেও দণ্ডটি স্পর্শ করতে হতো। সাহেব এবার দণ্ডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতেন না। আদিবাসী সমাজ এমন একটা অসাধারণ প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস করে নিতেন, মেয়েটি নির্দোষ। জানগুরুরা মেয়েটির প্রতি কোনও আক্রোশ মেটাতে ডাইনি বলে ঘোষণা করেছিল।

সাহেব নাকি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কৌশল প্রয়োগ করে ঘোষিত ডাইনিদের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এবারের ঘটনাস্থল নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী। সময় '৮৯-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। গিয়েছিলাম বেথুয়াডহরী বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত একটি বিজ্ঞান মেলায় বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করতে। খবর পেলাম বেথুয়াডহরীর উপকণ্ঠে এক সাঁওতাল পল্লীতে এক রমণীকে 'ডাইনি' ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ে গ্রামে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। বিজ্ঞান পরিষদের সক্রিয় তরুণের সংখ্যা প্রচুর। তাঁরা ওই গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরকে হাজির করলেন আমার কাছে। ওঁদের কাছে আমার পরিচয় দিয়েছিলেন কলকাতার বড় গুণীন হিসেবে। কথা বলে জানলাম, গত ছয় মাসে ওদের পল্লীর সাত জন মারা গেছেন। ডাইনিই নাকি ওদের খেয়েছে। এক জানগুরুর কাছে ওরা গিয়েছিলেন গাঁয়ের মাঝিকে নিয়ে। জানগুরুকে তেল-সিঁদুর দিতে শালপাতায় তেল ছিটিয়ে, ধূনো জ্বেলে, শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে মন্ত্র পড়ে শেষে শালপাতা দেখে জানিয়েছেন মৃত্যুর কারণ ডাইনি। যাঁর বউকে ডাইনি ঘোষণা করা হয়েছিল তিনিও এসেছিলেন। ওঁদের বললাম, "আমি কাল দুপুরে যাব, তোমাদের গাঁয়ের সকলকে হাজির থাকতে বোলো।"

পরের দিন গেলাম। সঙ্গী বিজ্ঞান পরিষদের বহু তরুণ, আমার পুত্র পিনাকী ও স্ত্রী সীমা। আমরা ঘুরে ঘুরে ওদের ছোট্ট গ্রাম দেখছিলাম। পরিচ্ছন্ন গ্রাম। গ্রামের মানুষ

ভিড কবে এলেন। একটা খাটিযা পেতে দিলেন পবম যত্নে। বসলাম। ওঁদেব সঙ্গে গল্প কবলাম। ওঁদেব গান গাইতে অনুবোধ কবলাম। গান শুনলাম, মাদলেব তালে তালে। এবাব শুক কবলাম যে জন্য আসা, সে কাজেব প্রস্তুতি। একটা মাটিব পাত্র দিতে বললাম। পাত্র এলো। পাত্রেব উপব স্তূপ কবলাম আখেব শুকনো ছিবডে। একটা ছোট্ট বাটিতে কবে জল দিতে বললাম, জল এলো। এবাব একটা আতা পাতা ছিঁডে বিডবিড কবতে কবতে গ্রামেব চাবপাশটা ঘুবলাম, আব মাঝে মাঝে আতা পাতায জল তুলে মাটিতে ছেটাতে লাগলাম। ঘোবা শেষ হতে এসে বসলাম মাটিব সবাব কাছে। পাশে বাখলাম জলেব বাটিটা। জানালাম সত্যেব অগ্নি-পবীক্ষা নেব। কিছুক্ষণ 'অং-বং' মন্ত্র পডে বললাম, "এগ্রামেব যে কজন গত ছ-মাসে মাবা গেছেন, তাঁদেব একজনকে যদি 'ডাইনি'তে খেযে থাকে তবে মন্ত্র শক্তিতে এই মাটিব পাত্রে আগুন জ্বলে উঠবে।"

বাটিব জল নিযে আখেব শুকনো ছিবডেব উপব ফেললাম, আগুন জ্বলল না। গ্রামেব মানুষগুলোব মধ্যে সামান্যতম উত্তেজনা লক্ষ কবলাম না। বুঝলাম, আগুন না জ্বলাটাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে ওবা ধবে নিযেছে।

এবাব বললাম, "গত ছ'মাসে যাঁবা মাবা গেছেন তাঁদেব কাউকেই যদি ডাইনি না খেযে থাকে, ঠিক মত ওষুধ না খাওযায মাবা গিযে থাকে, তবে জল ঢাললেও আগুন জ্বলবে।"

আতা পাতায জল তুলে ছিবডেতে ঢালতেই আগুন জ্বলে উঠলো। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখে বাচ্চা-বুডো, পুকষ-মহিলা সকলেই উত্তেজনায সোবগোল তুললেন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওই পল্লীব সাঁওতালবা বিশ্বাস কবেছিলেন, জানগুকব ক্ষমতা নেই। জানগুকব জডিবুটিতে তাই বোগ সাবেনি। ব্যর্থতা ঢাকতে একটা নিবীহ মানুষকে ডাইনি বলেছিল।

জানি, যে পদ্ধতিব আশ্রয নিযে সে দিন একজন ঘোষিত ডাইনিকে বাঁচিযেছিলাম, সে বকমভাবে একজনকে শুধু বাঁচান যেতে পাবে মাত্র, কিন্তু এব দ্বাবা আদিবাসী সমাজ থেকে 'ডাইনি' ও 'জানগুক'দেব অলৌকিক অশুভ ও শুভ ক্ষমতা বিষযে গডে ওঠা অন্ধ বিশ্বাস দূব হবে না।

আদিবাসীদেব মধ্য থেকে কুসংস্কাবেব অন্ধকাব দূব কবা একটা দীর্ঘ প্রক্রিযাব ব্যাপাব, এ বিষযে আগেই আলোচনা কবেছি। তবু একটি হত্যা বোধ কবতে তাৎক্ষণিক আব কোনও উপায আমাব জানা ছিল না।

যেভাবে আগুন জ্বালিযেছিলাম, তাব মধ্যে যে কোনও অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপাব ছিল না, এটা নিশ্চযই নতুন কবে বলাব অপেক্ষা বাখে না। বিজ্ঞান পবিষদেব ছেলেদেব সাহায্যে দুটি জিনিস সংগ্রহ কবেছিলাম—পটাশিযাম পাবম্যাঙ্গানেট ও গ্লিসাবিন। সবাব দৃষ্টিব আডালে আখেব ছোবডায ফেলে দিযেছিলাম পটাশিযাম পাবম্যাঙ্গানেট। গ্রাম ঘোবাব সময বাটিব পুবো জলটাই ছিটিযে বা ফেলে শেষ কবে দিযেছিলাম। হাতেব কৌশলে, সবাব নজব এডিযে বাটিতে ঢেলে দিযেছিলাম গ্লিসাবিন।

প্রথম দফায গ্লিসাবিন ঢেলে ছিলাম ছিবডেব সেই জাযগাগুলোতে, যেখানে

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট নেই। দ্বিতীয় দফায় গ্লিসারিন ঢেলেছিলাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের গুঁড়োর উপর। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গ্লিসারিনের সংস্পর্শে এসে তাকে অক্সিডাইজ করেছে। অক্সিজেনের ফিজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে ওই রাসায়নিকের উত্তাপ বেড়ে গিয়ে এক সময় আগুন জ্বলে উঠেছে।

যেখানে গ্রামবাসীরা ঘোষিত ডাইনিকে গ্রাম ছাড়া করেছে অথবা 'এখুনি' হত্যা করবেন না মনে হচ্ছে, সেখানে গ্রামবাসীদের অন্যভাবে সত্যকে বোঝান যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে একটা ঘটনা তুলে দিচ্ছি।

এবারের ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়ার সাঁওতাল পল্লী। সালটা ১৯৫৮। ঈশ্বর সোরেন বছর কুড়ির এক তরুণ, কিছু দিন ধরে কাশতে কাশতে রক্ত বের করে ফেলছিল মুখ থেকে। শরীরও শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এমনটা কেন হচ্ছে? ঈশ্বরের বাবা ছোট্ট সোরেন জানগুরুর জড়িবুটি খাওয়াচ্ছিল কিন্তু তাতে কোন কাজ হচ্ছিল না। জানগুরু শেষে জানাল ঈশ্বরকে ডান খাচ্ছে। ডান কে তাও জানাল। ঈশ্বরের বিমাতা চুরকীই ঈশ্বরকে খাচ্ছে।

চুরকীকে ডাইনি ঘোষণা করায় প্রাণ বাঁচাতে চুরকী বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়। বাপের বাড়ি কাছেই পশুই গ্রামে।

মনিগ্রাম বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ঈশ্বর লেখাপড়া শিখতে আসতেন। শিক্ষক কমলারঞ্জন প্রামাণিকের সন্দেহ হলো ঈশ্বরের টি বি রোগ হয়েছে। কমলারঞ্জন গ্রামের মানুষদের বোঝালেন ঈশ্বরের এক ধরনের অসুখ হয়েছে। এই অসুখে এমনিভাবেই মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। চুরকী যে ঈশ্বরকে খাচ্ছে, এ কথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে? গ্রামের অনেকেই যদিও প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করে জানিয়েছিলেন তাঁরা দেখেছেন চুরকী ডাইনি। কিন্তু কী দেখেছে, যাতে ডাইনি বলে জানতে পেরেছে—কমলারঞ্জনের এই প্রশ্নে অনেকে অস্বস্তিতে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত কমলারঞ্জন ঈশ্বর ও ছোট সোরেনের সমর্থন পেয়ে অন্যদের রাজি করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। বহরমপুর সদর হাসপাতালে বুকের ছবি তুলে চিকিৎসক জানালেন টি বি। চিকিৎসক কমলারঞ্জনের কাছে পূর্ব-সমস্যার কথা শুনে ঈশ্বরকে বোঝালেন, কেন এই রোগ হয়েছে, কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসা শুরু হলো। পরবর্তীকালে কমলারঞ্জন ঈশ্বরকে হাজির করলেন গ্রামের মানুষদের সামনে। ঈশ্বর জানালেন চিকিৎসকের মতামত। মানুষগুলো কিন্তু যুক্তি মেনে নিলেন। মেনে নিলেন চুরকী ডাইনি নয়। ছোট সোরেন চুরকীর গ্রামবাসীদের ৬০ টাকা জরিমানা দিয়ে চুরকীকে ফিরিয়ে আনেন। তিন ছেলে এক মেয়ে নিয়ে চুরকীর এখন ভরা সংসার।

গুণীন কালীচরণ মুর্মু

কালীচরণ মুর্মু জগমাঝি। এই নামেই পরিচিত গুণীন কালীচরণ। 'জগমাঝি' কালীচরণের উপাধি নয়। 'জগমাঝি' সাঁওতাল সমাজের নৈতিকতার রক্ষক ও সমাজের অন্যতম প্রধান। গুণীনের অভ্রান্ত গণনার কথা শুনে প্রতিদিন অনেকেই

আসেন। কেউ আসেন হারানো গরু, চুরি যাওয়া জিনিস-পত্তরের খোঁজে, কেউ বা আসেন নিখোঁজ আপনজনের হদিশ জানতে। গুণীনের টানে আসা মানুষজন সাধারণত নদীয়া ও তার আশেপাশের জেলার মানুষ। ট্রেনে এলে নামতে হয় মদনপুর-এ। ছোট স্টেশন। স্টেশনের বাইরে মিলবে রিক্সা ভ্যান। ভ্যানে পনের মিনিটের পথ জঙ্গল গ্রামের মোড়। সেখানে নেমে জিজ্ঞেস করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে কালীচরণের বাড়ি। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। কালীচরণের বয়স ষাটের ধারে কাছে। বয়সের ঠাওর মেলবে না শরীরে। কাজ করতেন কল্যাণীর স্পিনিং মিলে। অবসর নেওয়ার পর পুরো সময়ের গুণীন। ওর তুক-তাক্, ঝাড়ফুঁক, গোনার ক্ষমতায় বিশটা গাঁয়ের লোকের তরাস লাগে।

তরাসের হাওয়া লাগেনি সম্ভবত মদনপুরের কিছু এঁচোড়ে পাকা দামাল ছেলে-মেয়েদের। এদের জাতপাতের বালাই নেই, ঈশ্বর-আল্লা না মেনেও এরা বুক ঠুকে বলে, আমরা সাচ্চা-ধার্মিক। এমনি দুটি ছেলে ভানু হোর রায় আর রেজাউল হক গিয়েছিল গুণীনকে কিঞ্চিৎ বাজিয়ে দেখতে। এখন ৯০ সালের অক্টোবরের শেষ। আশপাশের গাঁ-শহরের রাজনীতির বাবু মশাইরা কদিন আগেও বড়ই ব্যস্ত ছিলেন দুর্গাপুজো, কালীপুজো নিয়ে। কালীঠাকুরকে জলে ডুবিয়েই বাবুদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার হাত থেকে দেশ উদ্ধারে। জঙ্গলগ্রাম অবশ্য এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। 'রাম-রাবরি'র বিষের হল্‌কা নানা বাঁক ঘুরে এখানে পৌঁছোবার আগেই ঝিমিয়ে পড়েছে।



চিব, বেজাউল, কালীচবণ, মুর্মু ও ভানু

গুণীন কালীচরণ গুণে-গেঁথে রেজাউল আর ভানুর আসার উদ্দেশ্য বের করে ফেলেছিলেন। বললেন, 'তোমরা এসেছ কেন, জানি। তোমাদের গ্রামে একটা গণ্ডগোল বেধেছে তাই '

'উঁহু, সে জন্যে তো আসিনি। আর আমাদের গ্রামে গণ্ডগোলও কিছু বাধেনি।' গুণীন ওদের এমন বেখাপ্পা কথায় চটলেন,

বললেন, 'আমার ক্ষমতায় সন্দো ? তোমাদের ভাল হবে না। আমি যদি তোমার চারপাশে গণ্ডি কেটে দিই, সে গণ্ডি আমি না কাটান দিলে পেরোতে পারবে ? পিঁড়িতে বসিয়ে মন্ত্র পড়ে দিলে পিঁড়ি পাছায় এমন সেঁটে যাবে, তখন বুঝবে সন্দো করার মজাটা।'

ভানুও ঝপাং করে তেতে গেল। বললো, 'বেশ তো গণ্ডি কেটে আমাকে বন্দী করুন তো। আজই করে দেখাতে পারলে পাঁচ'শ টাকা দেব। আর যদি কয়েকটা দিন পরে দেখান—পঞ্চাশ হাজার দেব।'

'তোমাদের দেখছি বড় চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা, বড় টাকার গরম। পুঁইচচ্চড়ি চিরোন চেহারা আর মুখে পঞ্চাশ হাজারের গপ্পো। বোঙ্গা ক্ষেপলে ও সব বুকনি ঠাণ্ডা মেরে যাবে।'

রেজাইল সামাল দিল, 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির নাম শুনেছেন, আমরা সেই সমিতিরই ছেলে। যারা আপনার মত ক্ষমতার দাবি করে, তাদের দাবি সত্যি কি মিথ্যে, পরীক্ষা করি আমরা। কী সব যুগ পড়েছে, 'ঠগ বাছতে গাঁ-উজাড়'। পরীক্ষা না করে কারো দাবি মানা কি উচিৎ ? আপনিই বলুন না ?'

কালীচরণ জুলজুল করে রেজাউলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সুর নামিয়ে বললেন, 'আসল কথা কি জান, গণ্ডি দিতে অনেক হ্যাপা। অনেক জিনিস-পত্তর যোগাড় করতে হয়। এই বয়সে তোমাদের জন্যে এতো হ্যাপা তুলতে পারব না।'

ভানু, রেজাউল অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। ভানুর নাছোড়বান্দা আবদার, 'তাহলে মন্ত্রে পিঁড়ি সাঁটাটা অন্তত দেখান। এত নাম-ডাক আপনার, শুনেছি বোঙ্গার কৃপায় আপনি তুক্-তাক্, রোগ চালান, ঝাড়-ফুঁকে অনেক অসম্ভব সম্ভব করেন। আমাদের ওই পিঁড়ির ব্যাপারটা দেখাতেই হবে।'

কালীচরণ নরম হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, কাল সকালে এসো।'

সকালে দুজনের বদলে সমিতির আটজন হাজির হলো কালীচরণের আস্তানায়—তবে নানা দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা ভাবে। তারপর কী ঘটেছিল, শোনা যাক মদনপুর শাখার সম্পাদক চিররঞ্জন পালের কাছ থেকেই।

'আমার সঙ্গী ছিল অসীম। সাহসী, বেপরোয়া অসীম আমারই মত তরুণ এবং সমিতির পুরো সময়ের কর্মী। মুখে যতদূর সম্ভব চিন্তার ভাব ফুটিয়ে কালীচরণকে বললাম, 'বড় একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি, আপনাকে সমাধান করে দিতেই হবে।'

জগমাঝি কালীচরণ আমাদের অপেক্ষা করতে বলে উঠে গিয়ে নিয়ে এলো দশ-বারোটা সবুজ কাঁঠাল পাতা। হাঁক্ পাড়তেই একটি ছোট মেয়ে একটা তেলের শিশি দিয়ে গেল, সঙ্গে কিছু কাঠি। জগমাঝি বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছিল আর একটা করে কাঁঠাল পাতা তুলে নিয়ে তাতে দু-ফোঁটা তেল ছিটিয়ে পাতাটা ভাঁজ করে একটা

করে কাঠি গুঁজে দিচ্ছিল এ-ফোঁড়, ও-ফোঁড় করে।

আমাকে নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের সমিতির আট জন সদস্য এখানে আছি। ভানু বেজাউলও এসেছে। সম্ভবত তথাকথিত কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে ভানু, বেজাউলকে অবাক করে দিয়ে পিঁড়ি আটকানোর চ্যালেঞ্জটা এড়াতে চায় বলেই ভানুরা আমার আগে আসা সত্ত্বেও আমার সমস্যা নিয়ে গুণতে শুরু করলো কালীচরণ।

ছটা পাত্যায় তেল দিয়ে ভাঁজ করে কাঠি গুঁজে রেখে শুরু করলো নানা অঙ্গভঙ্গি করে বেজায় রকম মন্ত্র পড়া। এক সময় একটা পাতা তুলে নিয়ে কাঠি খুলে ফেলে পাতাটার ভাঁজ খুলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেদিকে। একটু পরে বললো, 'তুমি যার জন্যে এসেছ সে মেয়ে।'

বললাম, 'না, সে তো মেয়ে নয়।'

জগমাঝি এবার আর একটা পাতা তুলে নিল। পাতা খুলে তেল পড়া দেখে বললো, 'যার জন্য এসেছো সে একটা বাচ্চা ছেলে।'

বললাম, 'না, সে তো বাচ্চা ছেলে নয়।'

জগমাঝি এবার তৃতীয় পাতা তুলে নিল, 'তার পেটে ব্যথা হয়।'

বললাম, 'ব্যথাটা পেটে তো নয়, বুকে।'

জগমাঝি ওই তৃতীয় পাতাটার দিকেই আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'বুকের ব্যথাটা ওই পেটের জন্যেই। ডাক্তার দেখাচ্ছো। ওষুধ খাওয়াচ্ছো, তাও ভাল হচ্ছে না। ওষুধে ভাল হবে না। খারাপ হাওয়া লেগেছে। ঝাড়তে হবে। রোগীকে নিয়ে এসো ঝেড়ে দেব।'

বললাম, 'রোগীর এত বয়স হয়েছে, রোগে ভুগেও কাহিল, নিয়ে আসাটাই সমস্যা।'

আবার পাতার দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে একটু পরেই আমাকে বললো, 'হ্যাঁ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বুড়ো, খুব বুড়ো। ও তোমার কে হয়?'

বললাম, 'ঠাকুরদা'।

'হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে। বুক চেপে ধরে রয়েছে। বাড়ি ফিরে ঠাকুরদাকে জিজ্ঞেস করো, ঠিক এই সময় বুকে ব্যথা উঠেছিল কি না, তাইতেই আমার ক্ষমতা বুঝতে পারবে।' ভানু ও রেজাউলের দিকে চেয়ে বললো, 'তোমরাও যাও না কেনে ওর সঙ্গে। গেলেই বুঝতে পারবে আমি জগমাঝি ঠগ্ কি গুণীন।'

জগমাঝি কি ঠগ্? সে উত্তর আমাদের পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরদা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর। কিন্তু সে প্রসঙ্গ ওখানে তুললাম না, জগমাঝির মিথ্যাচারিতা ধরতে আমি যে অভিনয়ের আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেটা উপস্থিত অন্ধ-বিশ্বাসী ভক্তরা কিভাবে নেবে—এই ভেবে। ওর মিথ্যাচারিতার মুখোশ অন্য ভাবে খোলাটাই এক্ষেত্রে শ্রেয়। আর সেই শ্রেয় পথটিই অবলম্বন করলো ভানু। ভানু বললো, 'আজ কিন্তু আমাদের দুজনকে আসতে বলেছিলেন। আপনি আমাদের দুজনের যে কোনও এক জনকে পিঁড়িতে বসিয়ে মন্ত্র পড়ে পিঁড়ি পেছনে আটকে দেবেন বলেছিলেন। এখন দিন। আপনি পারলে গুণে গুণে পাঁচশো টাকা দিয়ে যাব।'

হাসলো জগমাঝি, 'কেউ টাকার লোভ দেখালেই কি ক্ষমতা দেখাতে হবে? আমি বা আমার বোঙ্গা কি তোমাদের জন-খাটার মানুষ যে, তোমরা বললেই দেখাবো?'

অক্ষমতা এড়াবার কু-যুক্তিটা ভালই রপ্ত করেছে জগমাঝি ওরফে ঠগ্‌মাঝি।

প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে জগমাঝি উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললো, 'পরীক্ষা নেওয়ারও নিয়ম-কানুন থাকে। এই যে ছেলেটির ঠাকুরদার বুকে ব্যথার কথা গুণে বলে দিলাম, সত্যিই কি মিথ্যে খোঁজ নিয়ে এসে না ক্যানে। হারানো জিনিসের খোঁজ চাইতে, গুণে বলে দিতাম।'

কথাটা শেষ করতেই ভানু বললো, 'আমার একটা কলম হারিয়েছে, দামী কলম, মনে হয় চুরি করেছে আমারই কোনও বন্ধু। গুণে বের করে দিলে প্রণামী দেব।'

আবার কাঁঠাল পাতা এলো, তেল ছিটিয়ে আগের মতই মন্ত্র পড়ে পাতা খুলে তেল পড়া দেখে জগমাঝি বললো, 'হুঁ চিনের কলম।'

ভানু বললো, 'না, জাপানের।'

'ওই হলো। আচ্ছা, তুমি কি পেনটা নিয়ে বাজারে বা দোকানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, তা গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ছে দোকানে কলমটা দিয়ে লিখেছি, পকেটে পুরেছি কি না, মনে পড়ছে না।'

জগমাঝি আর একটা পাতার তেলপড়া দেখে বললো, 'ওই দোকানের মালিকের কাছেই আছে।'

'পেনটা ফেরৎ যাতে পাই, তার ব্যবস্থা করে দিন।'

'কলমটা কার আছে, বলে দিয়েছি। দোকানদারকে চাপ দিলে ফেরৎ পেতে পার। কিন্তু সে যদি ফেরৎ না দেয়, অস্বীকার করে, তা আমি কী করবো? প্রণামী তিনটে টাকা আর তেল পড়ার জন্য যা খুশি দিয়ে যাও।' এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমিও প্রণামী তিনটে টাকা আর তেল পড়ার জন্য যা খুশি নামিয়ে রাখ।'

বললাম, 'ঠিক উত্তর দিলে নিশ্চয়ই প্রণামী দিতাম। কিন্তু প্রথম থেকেই তো দেখছি, আপনি সব উল্টোপাল্টা বলে যাচ্ছেন। না আমারটা বলতে পেরেছেন, না বলতে পেরেছেন ওঁর কলমের ব্যাপারে কিছু।'

জগমাঝি কালীচরণ বোধহয় নিজের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের উপস্থিতির মধ্যে কোনও পরিকল্পনার সম্ভাবনা অনুমান করে হঠাৎ কেমন চুপ মেরে গেল। তার চোখ দুটোতে একবারের জন্যেও জ্বলে উঠলো না চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন, বরং চোখ দুটোয় আমানির ছলছল নেশা।

আমার ঠাকুরদার বুকে ব্যথার মতোই কলম হারানোর ব্যাপারটাও ছিল পুরোপুরি কাল্পনিক।



সাত

আদিবাসী সমাজের তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক

ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন প্রদেশেব আদিবাসী সমাজেব জানগুরুবা (অঞ্চলভেদে তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন) চোব ধবতে, চুবি যাওয়া জিনিসেব হদিশ দিতে, অথবা চিকিৎসা কবতে গিযে প্রচলিত দেশীয ওষুধ ঠিক মত নির্ণয কবতে না পাবলে অর্থলোভে, জীবিকাব স্বার্থে অথবা নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কোনও মানুষকেই ডাইন বা ডাইনি ঘোষণা কবে এ সবেব জন্য দাযী কবে। এ শুধু লোক ঠকানোব ব্যাপাব নয, শুধুই প্রবঞ্চনা ও প্রতাবণাব মাধ্যমে এবা অজ্ঞ গ্রামবাসীদেব আর্থিকভাবে শোষণই কবে না, এবা ঠাণ্ডা মাথায খুনে। এবা শুধু যে নিজেদেব অক্ষমতা ঢাকতেই কাউকে ডাইন ঘোষণা কবে, তা নয। অর্থ বা অন্য কিছুব বিনিমযে স্বার্থান্বেষীব হযে ঘাতকেব ভূমিকা গ্রহণ কবে, কাউকে ডাইনি ঘোষণা কবে।

মানুষের দুর্বলতা ও অজ্ঞতাই জানগুরুদের শোষণেব হাতিযাব। মন্ত্রশক্তিকে নয, বিজ্ঞানেব কৌশলকে কাজে লাগিযেই ওবা মানুষ ঠকিযে চলেছে। কী সেই কৌশল ? আসুন, সেগুলো নিযেই এখন আমবা একটু নাডাচডা কবি।

চোব ধরে আটার গুলি

বাড়িতে চুবি হলে ওঝাব কাছে বাড়ির লোক হাজিব হন। ওঝা পয়সা ও পাঁচপো আটা আনতে বলে। গৃহস্বামীব কাছ থেকে জেনে নেয কাকে কাকে তিনি সন্দেহ করছেন। আটাতে মন্ত্র পড়া হয়। মন্ত্র পড়া আটা থেকে কিছুটা নিয়ে প্রয়োজনমাফিক জল ঢেলে শক্ত কবে মাখা হয়। এবার আসে একটি জলভর্তি বাটি। ওঝা মাখা আটা থেকে একটু করে আটা ছিঁড়ে নিয়ে একটি করে গুলি পাকায়, একজন করে সন্দেহভাজন মানুষের নাম বলে বাটিব জলে ফেলতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে আটার গুলি জলে ডুবে যাওয়ার কথা। যেতেও থাকে তাই। কিন্তু দর্শকরা হঠাৎ দেখতে পান একটা গুলি জলে ডুবে গিয়ে আস্তে আস্তে আবাব ভেসে উঠছে। এমনটা তো ঘটার কথা নয ? কার নামে আটা ফেলা হয়েছিল ? যাব নামে আটা ফেলা হয়েছিল গ্রামবাসীরা তাঁকেই ধরেন। অনেক ক্ষেত্রে ধৃত ব্যক্তি চোরাই জিনিস বের

করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে জানান জিনিসটা বিক্রি করে দিয়েছেন অথবা জিনিসটা যেখানে রেখেছিলেন সেখানে এখন পাচ্ছেন না। কেউ বোধহয় চোরের উপর বাটপাড়ি করেছে।

এখন দেখা যাক কীভাবে আটার গুলি জলে ভাসে। কীভাবেই বা সত্যিই চোর ধরা পরে?

আটার গুলি বানাবার সময় আটার ভিতরে মুড়ি, খই, শোলার টুকরো বা থার্মোকলের টুকরো ঢুকিয়ে দিলে এবং মুড়ি খইয়ের উপর অতি সামান্য আটার আস্তরণ থাকলে, আটার তৈরি গুলিটা সম-আয়তনের জলের চেয়ে হালকা হলে, গুলি জলে ফেলার পর ভেসে উঠবে। মুড়ি বা খইয়ের চেয়ে শোলা বা থার্মোকল অনেক বেশি হালকা তাই শোলা বা থার্মোকলের টুকরো আটার গুলিতে ঢোকালে সেই আটার গুলি আরও কম আয়েশে ভাসান যাবে।

চোর কী করে ধরা পড়ে? এটা আগেই মনে রাখা প্রয়োজন চুরি করার কথা স্বীকার করার অর্থ কিন্তু এই নয়, বাস্তবিকই সে চোর।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। যতদূর মনে আছে ঘটনাটা এই ধরনের একটি মহিলার বিকৃত মৃতদেহ পুলিশের হাতে আসে। পুলিশ দপ্তর থেকে ছবিটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি পরিবারের একাধিক ব্যক্তি ছবি দেখে এবং অন্যান্য পোশাক-আশাক ও চেহারার বিবরণ দেখে জানান এটি তাঁদের পরিবারের মেয়ে। মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি স্বামী-বস্তুটি বউয়ের খোঁজে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন। বউ নাকি ঝগড়া করে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। শ্বশুরবাড়িতে এসেছে কি না, তারই খোঁজ করতেই স্বামী বাবাজীর এখানে আসা।

স্বামীটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোর্টে কেস ওঠে। স্বামী শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন, তিনিই স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন। কেসের বিবরণ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবার ঘটে যায় আর এক নাটক। যাঁর হত্যা নিয়ে এই বিচার, তিনি স্বয়ং আদালতে হাজির হয়ে জানান, তিনি জীবিত, বাস্তবিকই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর ছেড়েছিলেন। এতদিন ছিলেন এক বান্ধবীর বাড়িতে। পত্রিকায় তাঁর হত্যার কথা স্বামী স্বীকার করেছেন খবরটি পরে হাজির হয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া একটা অদ্ভুত ঘটনায় মিটে গেল।

স্বামীটি হত্যা না করেও কেন হত্যার অপরাধ স্বীকার করে কঠিন শাস্তিকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন? সম্ভবত শারীরিক বা মানসিক অথবা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এর চেয়ে যে কোনও শাস্তিই অনেক লঘু।

ডাইনি প্রথার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহু ঘোষিত ডাইনি গ্রামবাসীদের অত্যাচারে ভেঙে পড়েন এবং স্বীকার করেন, তিনিই ডাইনি। ঘোষিত চোর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একান্ত বাঁচার তাগিদে অপরাধ না করেও বলেন, আমিই অপরাধী।

আটার গুলি ভাসার ক্ষেত্রে যে সব সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম গৃহস্বামী দেন, তাদের মধ্যে কেউ চুরি করতেই পারে। তার নামের গুলি ওঝা জলে ভাসালে গণপ্রহারে চোর চুরি যাওয়া জিনিস বের করে দেয়। কিন্তু যদি ভালমানুষের নামের গুলি ভাসে তখন

গণপ্রহার থেকে বাঁচতে ভাল মানুষটিও অপরাধ স্বীকার করে জরিমানা দেওয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করেন।

হাতে ফুটে ওঠে চোরের নাম

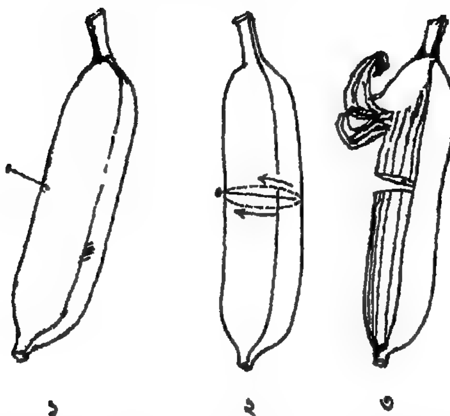
শুধু আদিবাসী সমাজেই নয় বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে অদ্ভুত পদ্ধতিতে চোর ধরা হয়। ওঝা মন্ত্র শক্তিতে চোরের নাম বলে দিতে পারেন, এই বিশ্বাস নিয়ে যখন কেউ নিজের চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করতে ওঝার দ্বারস্থ হন, তখন ওঝা জেনে নেন সন্দেহজনকদের নাম। অনেক ক্ষেত্রেই নাম জানার পর ওঝার এজেন্টরা এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ওঝাকে।

দক্ষিণার বিনিময়ে ওঝা চোর ধরতে নানা ধরনের অং-বং-চং মন্ত্র আওড়ায়। তারপর একটা কাগজে লিখে ফেলে সম্ভাব্য চোরেদের নাম। সেই কাগজ পুড়িয়ে তৈরি করা হয় ছাই। সেই ছাই ওঝা নিজের হাতে বা সহকারী কারো হাতে ঘষে ছাই ঝেড়ে ফেলতেই উপস্থিত দর্শকরা দেখতে পান ছাই ঘসা হাতে কালো হরফে ফুটে উঠেছে একটা নাম। যার নাম উঠেছে সে সন্দেভাজন একজন। তার ওপর চাপ পড়লে কখনো-সখনো চাপে পড়ে স্বীকার করে চুরির কথা। কখন চুরির মাল ফেরৎ পাওয়া যায়। কখনও বা জরিমানা দিয়ে উদ্ধার পেতে হয়। ঘোষিত চোর কেন অপরাধ স্বীকার করে? সে প্রসঙ্গে গেলে, বার বার একই কথা শোনাতে হবে বলে নীরব রইলাম। বরং আসি, কী করে ওঝা ছাই ঘষে হাতে নাম ফুটিয়ে তোলে।

ঘন সাবান জল অথবা বটের আঠা অথবা ঐ জাতীয় কিছুকে কালির মত ব্যবহার করে কাঠিজাতীয় কিছু দিয়ে হাতে চোর হিসেবে যার নাম ঘোষণা করা হবে, তার নামটি লিখে রাখা হয়। অর্থাৎ হাতে লেখা হল আঠা-জাতীয় জিনিস দিয়ে। ছাই ঘষতেই লেখার আঠা ছাইগুলোকে ধরে নেয়। মুখের ফুঁয়ে বা হাতের ঝাপটায় উড়ে যায় বাকি ছাই। তাই পরবর্তী পর্যায়ে দর্শকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ছাইয়ে লেখা নামটি।

চোরের কলা কাটা পড়ে মন্ত্রে

ওঝা সন্দেহভাজনদের হাতে ধরিয়ে দেয় একটা করে খোসা সহ গোটা পাকা কলা, চলতে থাকে মন্ত্র-তন্ত্র। মন্ত্রের পাঠ চুকতে একজন করে সন্দেহভাজন মানুষ এগিয়ে আসেন। কলার খোসা ছাড়ায় সকলের সামনে। খোসা ছাড়াবার পর ওঝা পরীক্ষা করে দেখেন কলাটার ভিতরটা দু'টুকরো করে কাটা কিনা। গোটা থাকলে কলা ধরেছিল যে খায়ও সে। এরই মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে ঘটে যায় বিস্ময়কর কিছু। খোসা ছাড়াতেই দেখা যায় কলাটা পরিষ্কার দু'টুকরো করে কাটা। অবাক কাণ্ড।



১ ২ ৩

তখনও খোসা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, খোসা গোটাই রয়েছে।

প্রতিটি আপত-অলৌকিক ঘটনার মতই চোরের কলা কাটা পড়ে মন্ত্রে নয়, কৌশলে। কৌশলটাও অতি সহজ সরল, একটা গোটা কলা নিল। একটা পরিষ্কার ছুঁচ। এবার ছুঁচটা কলার যে কোনো এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে কলার শাঁসের চার-পাশটা ঘোরান। পুরোটা ঘোরান হলে ছুঁচটা বের করে নিন। কলার খোসার গায়ে ছুঁচের সূক্ষ্ম ছিদ্র ছাড়া আর কিছু নজরে পড়বে না। অথচ ভিতরের কলাটা কাটা পড়েছে ছুঁচটা পুরোটা ঘুরে আসার ফলে। খোসা ছাড়াতেই কাটা কলা দৃশ্যমান হবে।

নখদর্পণ

যাঁর বাড়িতে চুরি হয়, সাধারণত তাঁদের পরিবারের কোনও শিশু, কিশোর বা মহিলাকে দেখান হয় নখ-দর্পণ বা নখের আয়না। সেই দর্পণে ফুটে ওঠে চোরের ছবি। এমনকি অনেক সময় নাকি, কেমন ভাবে চুরি হয়েছিল, কী ভাবে চোর এলো, কী ভাবে চোর পালাল, সমস্ত ব্যাপারটাই চলচ্চিত্রের মতই একের পর এক নখের উপর ফুটে ওঠে। পুরো ঘটনাটাই ঘটানো হয় অপ্রাকৃতিক উপায়ে, গুণীন বা ওঝার 'অলৌকিক' ক্ষমতায়।

বহু ওঝার নখ-দর্পণ ক্ষমতার খবর পেয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খবরদাতাদের বলেছি, আমি একটা জিনিস লুকিয়ে রাখবো। নখ দর্পণে ওঝা লুকোন জিনিস বের করে দিতে পারলেই দেবো পঞ্চাশ হাজার টাকা। খবরদাতারা প্রায়শই প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন। সেই ওঝাকে পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেবেন কথা দিয়েও কেউ রাখেনি। এখনও আমি সেই একই ভাবে নখ-দর্পণ করতে পারা ওঝার খোঁজে আছি।

যে কেউ এমন ওঝা এনে নখ-দর্পণের বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারলে ওঝার হাতে তুলে দেব প্রণামীর পঞ্চাশ হাজার টাকা। এটা অতি স্পষ্ট এবং সত্য যে প্রতিটি অলৌকিক ঘটনার মতই নখ-দর্পণের অস্তিত্বও রয়েছে শুধুই গাল-গল্পে ও মিথ্যাভাষণে। এদিকে এখন একটু তাকাই—নখ-দর্পণ ব্যাপারটা কী? সত্যিই কি তাহলে কিছুই দেখা যায় না? নখ-দর্পণ যেভাবে করা হয় তা হল এই যাঁদের বাড়ি চুরি হয়েছে তাঁদের পরিবারের একটি শিশু, কিশোরী একান্ত অভাবে একজন আবেগপ্রবণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাকে বেছে নেওয়া হয় মিডিয়াম হিসেবে। মিডিয়ামকে পাশে বসিয়ে ওঝা বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলে সন্দেহভাজন মানুষদের নামগুলো জেনে নিতে থাকে। মিডিয়ামও নিজের অজ্ঞাতে সন্দেহভাজন মানুষগুলো বিষয়ে জেনে নেয়। স্বাভাবিক কারণে সন্দেহভাজন এইসব মানুষগুলোও মিডিয়ামের পরিচিত ব্যক্তিই হয়। কী ভাবে চুরি হতে পারে এ সব বিষয়েও ওঝা কিছু কথাবার্তা চালিয়ে যায়। তারপর মিডিয়ামের বুড়ো আঙুলে তেল (সাধারণত সরষের তেল) সিঁদুর বা তেল-কাজল লাগিয়ে দেওয়া হয়। চক্চকে বুড়ো আঙুলটায় মন্ত্র পড়ে দেওয়া হয়। ওঝা বলতে থাকে, 'বুড়ো আঙুলে এবার চোরের ছবি ভেসে উঠবে, চোরের ছবি ভেসে উঠবে। একমনে দেখতে থাক, দেখতে পাবে চোরের ছবি। 'সম্মোহনের মত করেই

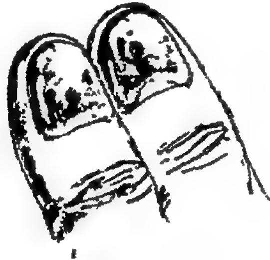


নখদর্পণ করা হচ্ছে

মিডিয়ামের মস্তিষ্ককোষে ধারণা সঞ্চার করা হতে থাকে যে চোরের ছবি ভেসে উঠবে। সম্মোহিত করে ধারণা সঞ্চারের মাধ্যমে যে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটান যায় বা দেখান যায় এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর প্রথম খণ্ডে। তাই আবার এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না।

একসময় সম্মোহনী ধারণা সঞ্চারের ফলে মিডিয়াম বিশ্বাস করতে শুরু করে বাস্তবিকই চোরের ছবি ফুটে উঠবে তার নখে। আবেগপ্রবণতা, বিশ্বাস ও সংস্কারের ফলে এক সময় মিডিয়াম সঞ্চারিত ধারণার ফলে দেখার আকুতিতে অলীক কিছু দেখতে থাকে। এটা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় Visual hallucination। মিডিয়াম মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সন্দেহভাজন কোন একজনের অস্পষ্ট একটা ছবি নিজের নখে দেখতে পাচ্ছে বলে বিশ্বাস করতে থাকে। কখনও বা অস্পষ্ট ছবি স্পষ্টতরও হয় মস্তিষ্ককোষে ধারণা সঞ্চারের গভীরতার জন্য। কখনও হাতের নখে মিডিয়ামে দেখতে পায় চোরের আসা, চুরি করা এবং পালান পর্যন্ত।

কখন কখন নখ-দর্পণের ক্ষেত্রে Visual illusion- হ্যাঁ, ভ্রান্ত দর্শনের ঘটনাও ঘটে। তেল-সিঁদুর নখে মাখিয়ে দেওয়ায় নখটি চকচকে হয়ে ওঠে। অনেক সময় আশেপাশের মানুষজন, গাছপালা ইত্যাদির ছবি অস্পষ্টভাবে চকচকে নখে প্রতিফলিত



হয়। অস্পষ্টতার দরুন দড়িকে সাপ ভাবার মতই প্রতিফলিত অস্পষ্ট ছবিকেই চোরের ছবি বা চুরির ঘটনার ছবি বলে মিডিয়াম বিশ্বাস করে নেয়।

যেহেতু সন্দেহভাজন একজনের কথাই মিডিয়াম বলে, তাই তার ঘোষিত মানুষটি চোর হতেও পারে। চোর না হলেও চুরি করেছে, এমন স্বীকারোক্তিও প্রহার থেকে বাঁচতে যে দিতেই পারেন, সে বিষয়ে আগেই যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

বাটি চালান

চুরি যাওয়া জিনিসের হদিশ পেতে বা চোর ধরতে বাটি চালানের ব্যাপক প্রচলন এখনও আছে। নখ-দর্পণের সঙ্গে বাটি চালানের কিছুটা মিল রয়েছে। বাটি চালানের মিডিয়াম ঠিক করা হয় সাধারণত যার বাড়ি চুরি হয়েছে, তাঁদেরই পরিবারের কোনো

কিশোব-কিশোবীকে। এখানেও ওঝা বা গুণীন মিডিযামকে পাশে বসিয়ে চুবিব খুঁটিনাটি ঘটনা শুনতে থাকে গৃহস্বামীব কাছ থেকে। শুনে নেয কাদেবকে চোব বলে সন্দেহ কবছেন গৃহস্বামী। গৃহস্বামীব সন্দেহ মিডিযামকে প্রভাবিত কবে। তাবপব একসময বাটি চালানেব বাটি আসে। মিডিযামকে বাটিব উপব দু'হাতেব ভব দিযে উবু কবে বসান হয। গুণীন ঘন ঘন মন্ত্র আওডায, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে থাকে, বাটিটা এবাব মিডিযামেব হাত দুটোকে টানবে। বাটিটা যে মিডিযামেব হাত টানবেই, এই কথাটাই বাব বাব গভীবভাবে টেনে টেনে বলে যেতে থাকে ওঝা। আমাদেব হাত নডে, মস্তিষ্ক স্নাযু কোষেব নিযন্ত্রণে ঐচ্ছিক মাংসপেশীগুলোব সংকোচন-প্রসাবণেব ফলে। ওঝাব কথা এক মনে শোনাব ফলে আবেগপ্রবণ মস্তিষ্কে ধাবণা সঞ্চাবিত হতে থাকে, বাটিটা তাব হাত টানছে, বাটিটা একটু একটু কবে গতি পাচ্ছে। বাটিটা চোবেব বাডিব দিকে যাচ্ছে। অনেক সময সন্দেহভাজন মানুষদেব বাটি চালানেব সময হাজিব বাখা হয। সে ক্ষেত্রে মিডিযাম ভাবতে থাকে, বাটি চোবেব দিকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে বাটিব ওপব হাতেব ভব বেখে উবু হযে বসাব ফলে ধাবণা সঞ্চাবেব ফল দ্রুততব হয।



বাটি-চালানোব একটি দৃশ্য

এমনিতেই বাটির ওপর শরীরের ভর আড়াআড়ি ভাবে থাকায় বাটির সরে যাবার বা এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও 'বাটি চোর ধরতে এগোবে' এই বিশ্বাস যখন তীব্রতর হয় তখন অবচেতন মন থেকেই মিডিয়ামে বাটিটিকে ঠেলতে শুরু করে। অর্থাৎ মিডিয়াম নিজের অজান্তেই বাটিকে চালনা করে। মিডিয়ামের মনের ভিতর চোর সম্বন্ধে একটা ধারণা সঞ্চারিত বাটিটিকেঠেলতে শুরু করে। মিডিয়াম নিজের অজান্তেই বাটিকে চালনা করে। মিডিয়ামের মনের ভিতর চোর সম্বন্ধে একটা ধারণা সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। মিডিয়ামের সেই সঞ্চিত ধারণার প্রভাবে অবচেতন মন বাটিটিকে কোনও একজন সন্দেহভাজন মানুষের দিকে অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

কঞ্চি চালান

চোর ধরার ব্যাপারে 'কঞ্চি-চালান' ওঝা, জানগুরুদের একটি জনপ্রিয় তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন। 'নখ-দর্পণ' এবং 'বাটি চালান'-এর মতই কঞ্চিও চালান হয় মিডিয়ামের সাহায্যে। একই ভাবে মিডিয়াম হয় চুরি যাওয়া বাড়ির স্বল্পবয়স্ক কেউ



কঞ্চি চালন হচ্ছে হারানো জিনিস পেতে

অথবা আবেগপ্রবণ সংস্কারাচ্ছন্ন মহিলা। চোর সম্বন্ধে মিডিয়ামের চিন্তায় কিছু নাম ঘোরাঘুরি করে যে নামগুলো বাড়ির মানুষদের কাছ থেকে সন্দেহজনক বলে ইতিপূর্বেই শুনেছে।

মিডিয়াম কঞ্চি ধরে থাকে। কোনও ক্ষেত্রে কঞ্চির এক প্রান্ত ধরা থাকে মিডিয়ামের হাতে, অন্যপ্রান্ত মাটি স্পর্শ করে থাকে। এ ছাড়াও আরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও কঞ্চি ধরার প্রথা আছে।

ওঝার মন্ত্রে বাটির মতই কঞ্চি গতি পায়। কঞ্চি অনেক সময়ই চোর বা চোরের বাড়ি চিনিয়ে দেয়। গণ-প্রহার, চুরি স্বীকার করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা করলে অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে ভেবে নিয়ে কলম সংযত করলাম।

কুলো চালান

শুধু আদিবাসী সমাজেই নয়, গ্রামে-গঞ্জে, আধা শহরে এমনকি খোদ কলকাতাতেও 'কুলো-চালান' দিব্বি 'চলছে-চলবে' করে ঠিকই টিকে রয়েছে। কুলো-চালানে বিশ্বাসী সংখ্যাও কম নয়। আসলে একবার কুলো-চালানে নিজে অংশ নিলে অবিশ্বাস করা বেজায় কঠিন। কেন কঠিন, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে কুলো-চালানে কী হয়, তাই নিয়ে একটু আলোচনা করে নিলে বোধহয় মন্দ হবে না।

যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'-তে দেওয়া সম্ভব তার সবই নাকি কুলো-চালানে জেনে নেওয়া সম্ভব। যেমন ধরুন—'আমি পরীক্ষায় পাশ করব কি না ?' 'আমার প্রমোশনটা এবারে হবে কি না ?' ' এ বছরের মধ্যে আমার চাকরি হবে কি না ?' 'সুদেষ্ণার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কি না ?' 'এ বছর মেয়ের বিয়ে দিতে পারব কি না ?' 'আমার ঘড়িটা গঙ্গাধর চুরি করেছে কি না ?' 'চাঁদু হাঁসদা আমার গরুটাকে বান মেরেছে কি না ?' এমনি হাজারো প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে। তবে প্রশ্ন পিছু নগদ দক্ষিণা চাই। দক্ষিণা নেবেন ওঝা, গুণীন বা তান্ত্রিক, যিনি মন্ত্র পড়ে কুলোকে চালাবেন। কুলো ঘুরবে, বিনা হাওয়াতেই ঘুরবে।

কুলো চালানে'র কুলোর একটু বৈশিষ্ট্য আছে। না, একটু ভুল বললাম। কুলোতে বৈশিষ্ট্য নেই। তবে এই কুলোর উঁচু কানায় গেঁথে দেওয়া হয় ধারাল ছুঁচলো লম্বা কাঁচি। যে কাঁচি দিয়ে নাপিতেরা চুল ছাঁটে, সেই ধরনের কাঁচিই কুলো-চালানে ব্যবহৃত হয়। কাঁচির হাতল বা আঙুল ঢোকাবার দিকটা থাকে কুলোর ওপরে। তলার ছবিটা দেখলে একটা আন্দাজ পাবেন।

কুলোতো তৈরি হলো। ওঝা মন্ত্রও পড়ল। কিন্তু তারপর ? তারপর নয়, মন্ত্র পড়ার সময়ই প্রশ্নকর্তা কাঁচির একদিকের হ্যান্ডেলের তলায় একটা আঙুল রাখেন। সাধারণত তর্জনী স্থাপন করতে বলা হয়। অন্য হ্যান্ডেলের তলায় তর্জনী রাখেন প্রশ্নকর্তার পরিচিত কেউ অথবা গুণীন স্বয়ং। আবার একটা ছবি দিলে কেমন হয় ?

গুণীন এবার প্রশ্নকর্তাকে বলেন, আপনি মনে মনে আপনার প্রশ্নটা ভাবতে থাকুন।

গভীরভাবে ভাবতে থাকুন। আপনার প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, দেখবেন কুলোটা আপনা থেকে ঘুরে যাবে আর, উত্তর যদি 'না' হয়, কুলোটা ঘুরবে না। একই রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রশ্নকর্তা ভাবতে থাকেন। এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় কুলোটি কখনো ঘুরে যাচ্ছে। কখনোও বা রয়েছে নিশ্চল।

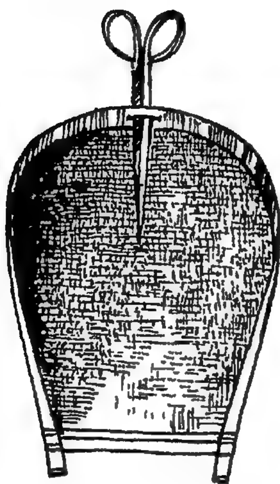
কুলোর এই ঘুরে যাওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে প্রশ্নকর্তার অবচেতন মন।

ওঝার কথায় প্রশ্নকর্তা বিশ্বাস করলে একসময় ভাবতে শুরু করেন, বাস্তবিকই মন্ত্রপূত কুলোটা সমস্ত প্রশ্নের 'হ্যাঁ' বা 'না'-জাতীয় উত্তর দিতে সক্ষম। উত্তরটা 'হ্যাঁ' হওয়ার প্রতি প্রশ্নকর্তার আগ্রহ বেশি থাকলে তার অবচেতন মন নিজের অজান্তেই আঙুল নেড়ে কাঁচি ঘুড়িয়ে কুলোকে ঘুরিয়ে দেয়। প্রশ্নকর্তার অবচেতন মন 'না' উত্তরে আগ্রহী হলে কাঁচির তলাকার আঙুল স্থির থাকে। অতএব স্থির থাকে কুলো। অবচেতন মনের এই জাতীয় কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকলে প্রশ্নকর্তা অবশ্যই বিশ্বাস করে নিতে বাধ্য হন, তাঁর প্রশ্নের উত্তরেই মন্ত্রপূত কুলো ঘুরছে অথবা স্থির থাকছে।

জানগুরু কাঁচি ধরলেও সাধারণত সে তার আঙুল স্থির রেখে দেয়। কারণ সে এই



কলকাতার বুকে কুলোচালান



কুলো চালানের কুলো

মনস্তত্ত্বটুকু জানে, তার আঙুল নেড়ে কুলো চালাবার কোনও প্রয়োজনই নেই। কুলো চালাবে প্রশ্নকর্তার অবচেতন মন।

অবচেতন মন দিয়ে আংটি চালানোর বিষয়ে ভূতে ভর নিয়ে আলোচনায় যেহেতু যথেষ্ট সময় নিয়েছি, তাই আর আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম না। শুধু এটুকু বলি—আপনি নিজে কুলো-চালানের কুলো নিয়ে বসুন। সঙ্গী করুন কাউকে। তাকে বলুন, কোনও প্রশ্ন গভীরভাবে চিন্তা করতে। তবে প্রশ্নটা যেন এমন হয় যাতে তার উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'-তেই পাওয়া যায়। একমনে চিন্তা করতে শুরু করলেই প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কুলো ঘুরবে, 'না' হলে কুলো স্থির থাকবে।

একটু অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন মজা। দেখবেন, আপনার সঙ্গীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে কুলো কখনও ঘুরছে, কখনও বা স্থির থাকছে।

এমন পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারবেন জানগুরু বা তান্ত্রিকদের কুলো-পড়া মন্ত্রের বুজরুকি।

থালা পড়া

থালা-পড়া দিয়ে সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ান রোগীকে ভাল করার মত ওঝা ও গুণীন এখন এদেশে অনেক আছে—এ ধরনের বিশ্বাস অনেক মানুষের মধ্যেই বর্তমান। আবারও বলি, শুধুমাত্র আদিবাসীদের মধ্যেই এই বিশ্বাস সংক্রামিত হয়নি,

ছড়িয়ে পড়েছে বহু শহরবাসী বা শহরে চাকুরীযাদের মধ্যেও।

রোগী রোদ্দুরে পিঠ খুলে বসে থাকে। গুণীন পিতল বা কাঁসার থালায় মন্ত্র পড়ে পিঠে থাবড়ে বসিয়ে দিতেই অবাক কাণ্ড! থালাটা রোগীর পিঠের উপর সেঁটে বসে যায়। যেন চুম্বকের টানে আটকে আছে লোহা। গুণীন যতক্ষণ মন্ত্র পড়ে অর্থাৎ যতক্ষণ সাপের বা কুকুরের বিষ শরীর থেকে না নামে, ততক্ষণ থালা আটকে থাকে পিঠে। বিষ নামলেই পিঠের থালাও সুরসুর করে নেমে আসে।

বহু প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে জানিয়েছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাকি রোগী থালা-পড়াতে বিষ-মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু মূল প্রশ্নটা এই, কী করে প্রত্যক্ষদর্শী সিদ্ধান্তে এলেন রোগী বিষ-মুক্ত ছিলেন? কুকুরে কামড়ালেই জলাতঙ্ক হয় না। জলাতঙ্ক হয় এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ থেকে। যে কুকুরটি কামড়েছে সে যদি আগে থেকেই জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত থাকে শুধুমাত্র তবেই তার কামড়ে সৃষ্ট ক্ষত ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

কুকুর জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হলে সাধারণত ছয় দিনের বেশি বাঁচে না। জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার চারদিন আগেই কুকুরের লালায় রোগের ভাইরাস থাকতে পারে। তাই চিকিৎসকরা সাধারণভাবে বলেন, যে কুকুর কামড়েছে সেটাকে দশ দিন পর্যন্ত লক্ষ্য করবেন। দশ দিনের পরও কুকুরটি বেঁচে থাকলে Anti Rabies Vaccine বা ARV নেওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না। কোনও কারণে কুকুরটিকে নজরে রাখা সম্ভব না হলে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ARV ইনজেকশন নেওয়া উচিত। বর্তমানে অবশ্য কার্যকর আরো কিছু Vaccine বেরিয়েছে। যেমন inactivated Rabies Vaccine তার মধ্যে একটি।

বিড়াল, শেয়ালের বা নেকড়ের কামড়েও জলাতঙ্ক হতে পারে, যদি যে কামড়েছে সে জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সাপে কাটার ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে বলতে হয়, সাপে কামড়ালেই বিষাক্ত সাপ কামড়েছে ভাবার কোনও কারণ নেই। আমাদের দেশে নির্বিষ সাপই সংখ্যাগুরু (শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ)। আবার সংখ্যালঘু বিষাক্ত সাপ কামড়ালেই যে সে কামড় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনটা ভাবারও কোন কারণ নেই। দেখতে হবে সেই কামড়ে একজনের মৃত্যু ঘটানোর মত পরিমাণে বিষ ঢালতে পেরেছে কি না। অনেক সময় এমনটাও হয়ে থাকে, ছোবল মারছে দেখে দ্রুততার সঙ্গে শরীর সরিয়ে নেওয়ায় জন্য বা অন্য কোনো কারণে বিষাক্ত সাপ অতি সামান্য বিষ ঢালতে সক্ষম হয়। এইসব ক্ষেত্রেও রোগীর বিষ থেকে মৃত্যু-সম্ভাবনা থাকে না।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, কুকুর বা সাপ কামড়ালেই 'কুকুরের বিষ' বা 'সাপের বিষ' মুক্ত করার প্রয়োজন হয় না, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বিষমুক্তই থাকে। কিন্তু বাস্তবিকই যদি জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুর, বিড়াল বা শিয়াল কামড়ায় তবে ARV ইনজেকশন নেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কম বেদনাদায়ক টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, ইনজেকশন বা ওষুধও হয়তো আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু কোন ক্রমেই থালা পড়ায় জলাতঙ্কের বিষ টেনে নিয়ে রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।



কুকুরে কামড়াবার পর পিঠে থালা বসান হয়েছে।

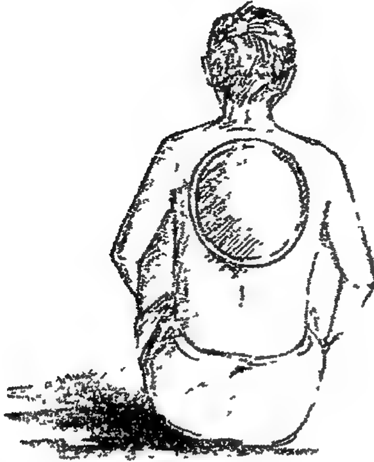
একই কথা সাপের বিষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিষাক্ত সাপ উপযুক্ত পরিমাণে শরীরে বিষ ঢাললে এ্যান্টিভেনম সিরাম নিতে হবে অথবা অন্য কোনও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে মন্ত্রঃপূত থালা কোনও ভাবেই বিষ মুক্ত করে রোগীকে বাঁচাতে পারবে না।

কোনও ভাবেই বিষ মুক্ত করে রোগীকে বাঁচাতে পারবে না।

তবে থালা আটকায় কীভাবে? সে প্রসঙ্গেই আসি। ওঝা যে থালা ব্যবহার করে, সেটা অবশ্যই যার পিঠে বসান হবে তার পিঠের চেয়ে ছোট মাপের। পিতল বা কাঁসার থালাটির মাঝখানটা চারপাশের চেয়ে কিছুটা উঁচু। রোদে বসিয়ে রাখা তথাকথিত রোগীটির পিঠ স্বাভাবিকভাবেই ঘামে ভিজে ওঠে। থালাটির পিছন দিকটি এবার সজোরে রোগীটির পিঠের উপর এমন ভাবে বসান হয় যাতে থালাটির চারপাশ ও পিঠের মধ্যে সামান্যতম ফাঁক না থাকে। পিঠের ঘাম ফাঁক হওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করে। জোরে প্রায় ছুঁড়ে থালাটি পিঠে বসানোয় এবং থালাটির মাঝখানটা সামান্য উঁচু হওয়ায় থালা ও পিঠের মাঝখানে বায়ু থাকে না বা কম থাকে। ফলে বাইরের বাতাসের চাপে থালা পিঠ আঁকড়ে থাকে।

সময় যতই পার হতে থাকে একটু একটু করে বাতাসও ঘামের সূক্ষ্ম ফাঁক-ফোকর দিয়েও ঢুকতে থাকে। ফলে এক সময় থালা পিঠ থেকে খসে পড়ে।

আপনারাও হাতে-কলমে পরীক্ষা করেই দেখুন না। কোনও সাপে কাটা বা পাগলা কুকুরে কামড়ানো রোগী লাগবে না। লাগবে না কোনও মন্ত্র-তন্ত্র। একই পদ্ধতিতে



থালা আটকাবার কৌশল

ঘামে ভেজা থালা চেপে ধরলেই কিছুক্ষণের জন্য আটকে থাকবে।

থালা পড়ায় যে সব মানুষ সাপের বিষ বা জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত হচ্ছেন, থালা পড়া না দিলেও এবং কোনও ওষুধ গ্রহণ না করলেও তারা সাপের বিষ ও জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত হতেন। কারণ তাঁদের শরীরে সাপের বিষ বা জলাতঙ্কের ভাইরাসই ছিল না। কামড়ে ছিল নির্বিষ-সাপ আর ভাইরাস-মুক্ত কুকুর।

'বিষ-পাথর' ও 'হাতচালায়' বিষ নামান

বিষ-পাথরে সাপের বিষ তোলা যায়, এই ধরনের বিশ্বাস বহু মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। আদিবাসী ওঝা, গুণীনের পাশাপাশি অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিষ-পাথরের প্রচলন রয়েছে।

বিষ-পাথর ব্যবহার করা হয় এইভাবে। সাপে কাটা রোগীকে আনার পর তার ক্ষতস্থানে বিষ-পাথর ধরা হয়। পাথর নাকি ক্ষতস্থান থেকে দ্রুত বিষ শুষে নিতে থাকে। পাথরটাকে বিষ মুক্ত করতে এক বাটি দুধে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হয়। দুধের রঙ সাপের বিষে নীল হতে থাকে। পাথরটা তুলে আবার ক্ষতস্থানে বসান হয়। কিছু পরে পাথরের বিষ নামাতে আবার চলে পাথরের দুধ-স্নান। এমনি চলতেই থাকে। এরই মাঝে রোগীকে গোলমরিচ খাওয়ান হয়। রোগীকে জিজ্ঞেস করা হয় ঝাল লাগছে কি না। রোগী জানান, ঝাল লাগছে না। আবারও চলতে থাকে বিষ পাথরের

বিষ তোলা। এক সময় রোগী জানান, গোলমরিচ ঝাল লাগছে। আনা হয় আর এক বাটি দুধ। এবার ক্ষতস্থানে বিষ-পাথর বসিয়ে পাথর দুধে ফেলা হয়। দর্শকরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন দুধ আর নীল হচ্ছে না। পাথরের অদ্ভুত ক্ষমতায় প্রতিটি প্রত্যক্ষদর্শী অবাক মানেন। রোগীও বাড়ি ফেরেন সুস্থ শরীরে।

বিষ পাথর বিষ তোলে না। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তবে দুধ কেন নীল হয় ? উত্তর একটাই—ওঝা বা গুণীন দুধে ছোট্ট একটা নীলের টুকরো ফেলে দেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুধে নীল দ্রবীভূত হতে থাকে এবং দুধও গভীর থেকে গভীরতর নীল রং ধারণ করতে থাকে।

রোগী কেন তবে গোলমরিচের ঝাল অনুভব করতে পারেন না ? উত্তর এখানেও একটাই—গোলমরিচ বলে রোগীকে খাওয়ান হয় পাকা পেঁপের বীচি। ঝাল লাগবে কী করে ?

কিন্তু অসুস্থ সাপে কাটা রোগী সুস্থ হয় কী করে ? উত্তর এখানেও একটাই—কামড়ে ছিল নির্বিষ সাপ। তাই, বিষে অসুস্থ হওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না।

গোলমরিচ পরে কেন ঝাল লেগেছে বা দুধ পরে কেন নীল হয়নি, এর উত্তর নিশ্চয়ই আপনারা পেয়েই গেছেন, ঝাল লেগেছে তখনই যখন গোল মরিচই খেতে দেওয়া হয়েছে। দুধ সাদা থাকে তখনই, যখন দুধে নীল পড়েনি।

এও তো ঠিক, নির্বিষ সাপের কামড় চিনতে না পারলে মৃত্যু-ভয়ে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তেই পারে। আবার বিষ-পাথরের পুরো কর্মকাণ্ড দেখার পর বিষ-মুক্ত হয়েছেন বিশ্বাসেই মানসিক অসুস্থতা বিদায় নেয়।

এই প্রসঙ্গে জানাই, কৃষ্ণনগরে জনৈক পাদ্রী সাহেব দাবি করেন, তিনি বিষপাথরে রোগীর দেহ থেকে সাপের বিষ টেনে নিতে সক্ষম। ওই দাবিদারকে আমাদের সমিতির তরফ থেকে বার বার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। আমাদের সহযোগী সংস্থা কৃষ্ণনগরের 'বিবর্তন' পত্রিকা গোষ্ঠী আয়োজিত কৃষ্ণনগরেরই বিভিন্ন প্রকাশ্য সভায় আমরা এই চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছি। নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরী বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় '৮৮ ও ৮৯' সালে পোস্টার নিয়ে বিশাল পদযাত্রাও হয়েছে। সেখান থেকেও ঘোষিত হয়েছে আমাদের সমিতির সরাসরি চ্যালেঞ্জ।

উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরেও আর এক চিকিৎসক উত্তমকুমার বিশ্বাস একইভাবে বিষ-পাথরের সাহায্যে সাপে-কাটা রোগীদের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইনিও নাকি কৃষ্ণনগরের পাদ্রী সাহেবের মতই বেলজিয়ামের বিষ-পাথর দিয়ে সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসা করেন। দাবি করেন হাসপাতাল যে রোগীকে ভর্তি করতে সাহস করেননি, সেইসব রোগীদেরও তিনি ভাল করে দেন।

এই দুই বেলজিয়াম বিষ পাথর প্রয়োগকারী যে ভাবে বিষ-পাথর ব্যবহার করেন সেটা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। রোগীর সাপে কাটা জায়গাটির আশেপাশের কয়েকটা স্থান নতুন ব্লেড বা ধারাল অস্ত্র দিয়ে চিরে ফেলেন। চেরা জায়গার উপর বিষ-পাথর বসিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন। ব্যাণ্ডেজ খুলে আমাকে এবং 'ইন্ডিয়া টু-ডে' প্রতিনিধিকে দেখিয়েছেন, বিষ-পাথর শরীরে লেগে রয়েছে। বিষ-পাথরগুলোকে দেখে আপাতভাবে পাথর বলে মনে হয়নি। একটা স্লেটকে বহু ছোট ছোট টুকরো করলে যে

ধবনেব দেখাবে, বিষ-পাথবগুলো অনেকটা সে ধবনেব। পার্থক্য এই বিষ-পাথব কিছুটা আঠা আঠা তেলতেলে ও চক্‌চকে। শবীবে একটু চেপে দিযে দেখেছি, কিছুক্ষণেব জন্য বসে যায। পাথবেব তিনটে টুকবো সংগ্রহ কবে নিযে আসি। ভূতত্ত্ববিদ সংকর্ষণ বাযকে একটি পাথব দিযেছিলাম। তাঁব অভিমত—ন্যাচাবাল পাথব নয। কৃত্রিমভাবে তৈবি। আঠাজাতীয কিছু বযেছে।

৩ জুন '৯০। বিকেলে ডাক্তাব বিশ্বাসেব চিকিৎসা কেন্দ্রে গিযেছিলাম। সেদিন তাঁব চিকিৎসা কেন্দ্রে বোগী ভর্তি হযেছিলেন ন'জন। তাদেবই একজন সাধনা মণ্ডল। থাকে, ঠাকুবনগব চিকনপাডায—কিশোবী। ডাক্তাববাবু জানালেন, 'সাধনাকে পদ্ম-গোখবো কামডে ছিল। খুব যন্ত্রণা ফিল কবেছিল।' সাধনাও জানাল, 'যখন কামডেছিল তাবপব থেকে যন্ত্রণা প্রচণ্ড বেডেই যাচ্ছিল।'

অথচ মজা হলো, এই পদ্ম-গোখবো কামডালে যন্ত্রণা বাডত না। কাবণ এই সাপে বিষ স্নাযুগুলোকে অসাড কবে। ডাঃ বিশ্বাস এই জ্ঞানেব ওপব ভিত্তি কবেই কেমন পসাব জমিযে ঠাণ্ডা মাথায মানুষ খুন কবে চলেছেন। কাবণ '৯০ সালেব জুনেই তাঁব কাছে চিকিৎসিত হতে এসে কযেকজন বোগী মাবা যান। মৃতেবা বিষাক্ত সাপেব কামড খেযেছিলেন এবং ডাক্তাব বিশ্বাসেব পক্ষে বা বিষ-পাথবেব পক্ষে বোগীকে বিষ-মুক্ত কবা সম্ভব নয বলেই বোগীদেব মৃত্যু হযেছিল।

ডাঃ বিশ্বাস ও কৃষ্ণনগবেব পাদ্রি নিঃসন্দেহে ঘাতকেব ভূমিকাই পালন কবে চলেছেন। বোগী ও তাব আত্মীযদেব অজ্ঞতাব সুযোগ নিযে শোষণ ও হত্যা চালিযেই যাচ্ছেন।

আমাদেব সমিতিব তবফ থেকে এই দুই ডাক্তাবসহ সব বিষ-পাথবেব দাবিদাবদেব জানাচ্ছি খোলা চ্যালেঞ্জ। তাঁবা প্রমাণ করুণ তাঁদেব বিষ পাথবেব বিষ শোষণ কবাব ক্ষমতা আছে। সর্ত এই—আমবাই বিষাক্ত সাপ সবববাহ কববো। এবং বিষাক্ত সাপেব কামড খাবে যে পশুটি, সেটাও আমবাই সবববাহ কববো। একই সঙ্গে সবকাবী প্রশাসনেব কাছে দাবি—মানুষেব জীবন নিযে যাবা ছিনিমিনি খেলে তাদেব বিরুদ্ধে কঠোবতম শাস্তি দিযে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

এমন সর্তেব পিছনে কাবণটি হলো—বিষ থলে অপাবেশন কবে বাদ দেওযা সম্ভব। দক্ষিণ ২৪ পবগণাব নাজিব আলিব কাছে অনেক সাপেব ওঝা ও তথাকথিত সর্পবিশাবদ এসে বিষেব থলিহীন বিষ দাঁতওযালা সাপ কিনে নিযে যান। এক্ষেত্রে সাপটি বিষাক্ত এবং বিষ দাঁতওযালা হলেও বাস্তবে কিন্তু নির্বিষ। তাই সাপটি সরবরাহেব দাযিত্ব বাখতে চাই নিজেদেব হাতে। পশুটিকেও আমবাই হাজিব কবতে চাই এ জন্যে, যাতে বিষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা একটু একটু কবে পশুব শবীবে গডে তুলে সেই পশুটিকে হাজিব কবে বিষ-পাথবেব কাববাবিবা আমাদেব মাৎ না কবতে পাবেন।

অনেকেব বিশ্বাস ওঝা, গুণীনদেব অনেকে হাত চেলে সাপেব বিষ নামাতে সক্ষম। ধাবণা অমূলক। মন্ত্র পডে হাত চালিযে ওঝাবা তাঁদেবই সুস্থ কবতে সক্ষম যাঁদেব বিষাক্ত সাপ দংশন কবেনি।

বিষাক্ত সাপ কামডেছে অনুমান কবে মানসিকভাবে যাঁবা অসুস্থ হযে পডেন, তাঁবা



বাঁ দিক থেকে ডাঃ সন্দীপ পাল, লেখক, বিষপাথর চিকিৎসক ডাঃ উত্তমকুমার বিশ্বাস ও যুক্তিবাদী সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ বিবল মল্লিক।

যখন দেখেন হাত চেলে দুধে হাত ধুয়ে ফেলতেই দুধ নীল হয়ে যাচ্ছে, গোল মরিচ কামড়েও ঝাল না পাওয়া অসাড় জিব একটু একটু করে সাড় ফিরে পাচ্ছে, অনুভব করতে পারছে গোল-মরিচের ঝাল স্বাদ, তখন স্বভাবতই হাত-চালার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে ফেলেন।

পেট থেকে শিকড় তোলা

অনেক ওঝা বা গুণীন রোগী দেখে জানায়, কেউ রোগীকে তুক্ করে শিকড় খাইয়ে দিয়েছে, তাতেই এই ভোগান্তি। রোগীকে বা রোগীর বাড়ির লোকের হাতেই ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি পিতল বা কাঁসার ঘটি। বলে পাশের পুকুর, কুয়ো, টিউবকল বা জলের হাঁড়ি থেকে জল ভরে আনতে।

জল ভরা ঘটি গুণীনের হাতে দিতে সে রোগীর পেটে জল ভরা ঘটি বসিয়ে মন্ত্র পড়তে থাকে। এক সময় ঘটি নামিয়ে গুণীন রোগী বা রোগীর বাড়ির লোককে ঘটির জল পরীক্ষা করতে বলে। বিস্ফারিত চোখে রোগী ও তাদের বাড়ির লোক দেখতে

পায শিকড বা ওই জাতীয কিছু। খালি ঘটিতে শিকড এলো কোথা থেকে? জল তো গুণীন বা তাব কোনও লোক আনেনি? তবে?

দু-ভাবে এমন ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকে। কখনও পিতল কাঁসাব ঘটিব ভিতবেব

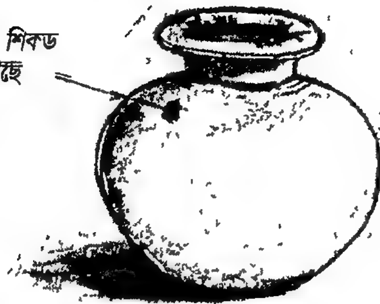


পেট থেকে শিকব তুলছেন জনৈক পুবহিত

গলাব দিকে (সে দিকটা সাধাবণভাবে দৃষ্টিব আডালে থাকে) আটাব আঠা ও ওই ধবনেব কিছু দিযে শিকডটা জল আনতে দেওযাব আগেই আটকে বাখে গুণীন। মন্ত্র-পবাব মাঝে সুযোগ বুঝে আটকে বাখা শিকডকে মুক্ত করে। বিষযটা ছবিতে বোঝাবাব চেষ্টা কবলাম।

কখনও বা মন্ত্র-পডাব ফাঁকে গুণীন সবাব চোখেব আডালে একটা শিকড জলে ফেলে দেয।

এ সত্বেও অনেক সময বোগী কিছুটা সুস্থবোধও কবেন। বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিযে বহু অসুখই সাবান সম্ভব। মনোবিজ্ঞানী, মনোবোগ চিকিৎসক, এমনকি



চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতেও তার প্রচুর উদাহরণও আছে। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। কোন কোন অসুখের ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে অসুখ সারান সম্ভব এবং কেন তা সারে—এই প্রসঙ্গ নিয়ে তাই আবার পুরোন আলোচনায় ফিরলাম না।

চাল-পড়া

বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে হার, দুল, আংটি টাকা পয়সা বা ঘড়ি—এমন ক্ষেত্রে এই একবিংশ শতাব্দীতে পা বাড়াবার মুহূর্তেও অনেকেই থানা-পুলিশ করার চেয়ে গুণীনের দ্বারস্থ হওয়াটাই বেশি পছন্দ করেন।

শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষ ও আদিবাসী সমাজের মানুষরাই গুণীনের চোর ধরার ক্ষমতায় বেশি রকম আস্থাবান। গুণীনদের অনেকেই চোর ধরতে সন্দেহজনকদের 'চাল-পড়া' খাওয়ায়।

চোর ধরতে চাল-পড়ার প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। 'চাল পড়া' জিনিসটা কী ? আসুন ছোট্ট করে বলি। ধরুন আপনার বাড়িতে চুরি হয়েছে। বুঝতে আপনার অসুবিধে হয়নি, এ সিঁধেল চোরের কাণ্ড নয়। আপনারই চেনা-জানা, বাড়ির কাজের লোক অথবা পাড়ারই কোনও হাত-টান দু-চারজনকে সন্দেহও করছেন। হাতে-নাতে প্রমাণ নেই, তাই বসে বসে হাত-কামড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই বলে যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই খবর পেলেন তিন মাইল দূরের সাঁওতাল পল্লীর কার্তিক মুর্মু খুব বড় গুণীন। অব্যর্থ ওর চাল পড়া। আপনি হারানো জিনিস ফেরৎ পেতে পুলিশের ওপর নির্ভর করাটা ডাহা বোকামো ধরে নিয়ে কার্তিক মুর্মুর দ্বারস্থ হলেন। কার্তিক জানালেন কবে কখন যাবেন। আপনাকে নির্দেশ দিলেন সেই সময় পরিবারের

সকলকে এবং সন্দেহজনকদের হাজির রাখতে। সময় মত কার্তিক এলেন। সঙ্গে এক ফুলধারিয়া। শুরু হলো কার্তিকের বকবকানি। তার মন্ত্রঃপূত চাল পড়া খেয়ে কোন্ গ্রামের কে করে মারা গেছে তার এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করে উপস্থিত অনেকেরই পিলে চমকে দিলেন। যারা হাজির রয়েছে তারা চাল পড়া খাইয়ে চোর ধরার অনেক কাহিনীই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে। তাই কার্তিক যখন বলল, সে চালে মন্ত্র পড়ে দেওয়ার পর প্রত্যেককে খাওয়াবে, যে চুরি করেছে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হবে, বুক ধড়ফড় করতে থাকবে, চুরির কথা স্বীকার না করলে মুখ থেকে রক্ত উঠে মারা যাবে—তখন কার্তিকের কথায় অবিশ্বাস করার কোনও কারণ উপস্থিত কেউ খুঁজে পেল না।

আপনার গৃহিণীর কাছ থেকে সামান্য চাল নিয়ে মন্ত্র পড়া শুরু করলেন কার্তিক। সে কী মাথা ঝাঁকানি। ফাঁপানো বাবড়ি চুলগুলো উথাল-পাথাল করতে লাগলো। কার্তিকের শরীর দুলতে লাগলো, মাঝে মাঝে হুঙ্কার। এক সময় রক্ত লাল চোখ মেলে কার্তিক এক একজনকে ধরে ধরে খাওয়াতে লাগলো মন্ত্রঃপূত চাল বা চাল পড়া। এরপর তিন রকমের যে কোনও একটি ঘটনা ঘটতে পারে। একজন চাল পড়া হাতে পেয়ে মুখে পোরার পরিবর্তে আশেপাশে পাচার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলে একবার গুণীনের কাছে আছড়ে পড়ে, একবার আপনার পা ধরে, অপরাধ স্বীকার করে বার বার ক্ষমা চাইতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটতে পারে এই ধরনের—চাল পড়া খাওয়া মানুষদের মধ্যে একজন কেমন যেন অসুস্থ বোধ করতে থাকে। শ্বাস কষ্ট হতে থাকে, বুক ধড়ফড় করতে থাকে, বুক জ্বলে যায়, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় আতঙ্কে। নিজেকে বাঁচাতে অপরাধ স্বীকার করে। গুণীনের পায়ে মাথা কুটে বার বার করুণ আবেদন জানাতে থাকে—'মরে গেলাম, আর সহ্য করতে পারছি না, মন্ত্র কাটান দাও।'

আবার এমন ঘটতে পারে, সবাইকে চাল পড়া খাওয়াবার পরেও কারো শরীরেই সামান্যতম অস্বস্তি দেখা গেল না, অপরাধী ধরা পড়লো না। গুণীন ঘোষণা করলো, 'যারা এখানে উপস্থিত তাদের মধ্যে চোর নেই।' গুণীনের এই ঘোষণাকে অনেক মানুষই সত্য বলে মেনে নেয়।

ঘটনা তিনটিকে আমরা একটু যুক্তি দিয়ে বিচার করি আসুন। চাল পড়ার ক্ষেত্রে এই তিন ধরনের যে কোনও একটি ঘটনাই ঘটে থাকে—তবে হয়তো সামান্য রকমফের করে। এর কোনটিই চাল পড়ার অভ্রান্ততা বা অকাট্যতার প্রমাণ নয়। চাল পড়া না খেয়েই চোর কেন অপরাধ স্বীকার করে এটা নিশ্চয়ই আপনারা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাই বুঝতে পেরেছেন। গুণীনের কথায় চোর বিশ্বাস করেছে। তাই চাল খেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে অপরাধ স্বীকার করাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে।

চাল পড়া খেয়ে কেন চোরের শারীরিক নানা অসুবিধে হতে থাকে, সে বিষয়ে নতুন করে বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না। কারণ 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর প্রথম খণ্ডে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা বহু উদাহরণ সহ হাজির করা হয়েছে। যাঁরা এখনও প্রথম খণ্ড পড়ে উঠতে পারেননি, তাঁদের জন্য খুব সংক্ষেপে দুচার কথায় ব্যাখ্যা হাজির করছি।

যে সব সন্দেহভাজনদের চাল পড়া খাওয়ানো হয়, তাদের মধ্যে চোর থাকতেই পারে। চোরের মনে চাল পড়ার প্রতি ভীতি থাকতেই পারে। যে সব আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু ইত্যাদির মধ্যে সে বড় হয়েছে তাদের অনেকের কাছেই হয় তো নানা অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছে, শুনছে তুক্-তাক, ঝাড়ফুঁকের নানা বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা। পড়তে জানলে ছোটবেলা থেকেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি পড়ে অলৌকিক নানা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস। অনেক সময় চেতন মন অনেক অলৌকিক কাহিনীকে অগ্রাহ্য করতে চাইলেও মনের গভীরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা অলৌকিক বিশ্বাস কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

চোর হয়তো ইতিপূর্বে মা-ঠাকুমা, পাড়া-পড়শী অনেকের কাছেই চাল পড়া খাইয়ে চোর ধরার অনেক গা শির-শির করা ঘটনা শুনেছে। শুনেছে চাল পড়া খেয়ে চোরের বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা ইত্যাদি নানা গল্প। বিশ্বাসও করেছে। হয়তো গুণীনের দেওয়া চাল পড়া খাওয়ার আগে গুণীনের ক্ষমতা বিষয়ে সন্দেহ ছিল। এমনও হতে পারে, মন্ত্র-শক্তির প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। আর তাইতেই খেয়ে ফেলেছে। খাওয়ার পর দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল মনে চিন্তা দেখা দিল—চাল পড়ার সত্যিই যদি ক্ষমতা থাকে তবে তো আমি মারা যাবো। মৃত্যুর আগে আমার শ্বাসকষ্ট হতে থাকবে, বুক ধড়ফড় করবে, বুক জ্বালা করবে। আমার কি তেমন করছে? কোনও অস্বস্তি কি শরীরে অনুভব করছি? হ্যাঁ। আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুকেও যেন কেমন একটা জ্বালা জ্বালা করছে? আমি মিথ্যে ভয় পাব না। কিন্তু এ তো মিথ্যে ভয় নয়। সত্যিই তো বুকে জ্বালা করছে। বুক জ্বলে যাচ্ছে। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে।

বাস্তবিকই চোরটি তখন এইসব শারীরিক কষ্ট অনুভব করতে থাকে। চাল পড়ার ক্ষমতার প্রতি চোরটির বিশ্বাস বা আতঙ্কই তার এই শারীরিক অবস্থার জন্য পুরোপুরি দায়ী। এই শারীরিক কষ্টগুলো সৃষ্টি হয়েছে মানসিক কারণে, চাল পড়ার অলৌকিক ক্ষমতায় নয়।

একটি মাত্র উদাহরণ হাজির করে আপনাদের ধৈর্যের ওপর অত্যাচার থেকে বিরত হবো। '৮৮ সালের ঘটনা। ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতার তখন রমরমা বাজার। পত্র-পত্রিকা খুলেই ঢাউস-ঢাউস ঈপ্সিতা। ঈপ্সিতার নাম, অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পত্র-পত্রিকাগুলোর প্রচারের ঠেলায় আমাদের সমিতির সভ্যদের তখন পিঠ বাঁচানোই দায়। ঠিক করলাম, ঈপ্সিতার মুখোমুখি হবো। শুনে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক সদস্য আমাদের বললেন, 'আরে ধু-র-, ঈপ্সিতার কোনও ক্ষমতাই নেই। ওর বুজরুকি ফাঁস করতে আবার সময় লাগে? গিয়ে একবার চ্যালেঞ্জ করুন না, ভুডু বাণ মেরে আপনাকে মেরে ফেলতে, দেখি কেমন ভাবে মারে?'

বললাম, 'ঠিক আছে, তাই হবে, কাল দেখা করে সেই চ্যালেঞ্জই জানাবো। বলবো বাণ মেরে আপনাকে মারতে।'

শুনেই উনি হঠাৎ দপ্ করে রেগে উঠলেন। বললেন, 'আমাকে কেন মারতে বলবেন? চ্যালেঞ্জ জানান আপনি। আপনি নিজেকে মারতে বলুন।'

পরের দিন রাত ন'টা নাগাদ আমার বাড়িতে হাজির হলেন ওই সদস্য। সরাসরি জানতে চাইলেন ঈপ্সিতাকে বাণ মারার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি কি না। বললাম, 'জানিয়েছি। এবং আমাদের সমিতির তরফ থেকে আপনিই বাণের মুখোমুখি হতে চান, এ কথাও জানিয়েছি। আমার কাছ থেকে আপনার কিছু পারটিকুলার্স নিয়েছেন। জানিয়েছেন, তিন দিন তিন রাতের মধ্যেই আপনার ওপর বাণের অ্যাকশন শুরু হবে।'

ব্যাঙ্ক আন্দোলনের নেতা ওই তরুণ তুর্কি আমার কথা শুনে কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। তারপর বার কয়েক মিন মিন করে বললেন, 'আমি তো ওঁকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইনি। আমাকে এর মধ্যে জড়ান নীতিগত ভাবে আপনার উচিত ছিল না।'

পরের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই খবর পেলাম, তরুণ তুর্কির স্ট্রোক হয়েছে। দৌড়লাম দেখা করতে। প্রথমেই ওঁর স্ত্রীর মুখোমুখি হলাম। আমাকে জবাবদিহী করালেন, 'আপনার কি উচিত ছিল, ঈপ্সিতার বিরুদ্ধে আমার হাসব্যান্ডকে লড়িয়ে দেওয়া?'

বুঝলাম কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে। আসামী আমি রোগী ও তার স্ত্রী দুজনের কাছেই এবার সত্য প্রকাশ করলাম, 'ঈপ্সিতার সঙ্গে ভুডু মন্ত্রে কাউকে মারবার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাই হয়নি। মজা করতে আর কিছুটা পরীক্ষা করতেই মিথ্যে গল্পটা ফেঁদেছিলাম।'

এক্ষেত্রে তরুণ বন্ধুটি ঈপ্সিতার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে আতঙ্কের শিকার হয়েছিলেন। হয় তো মরেও যেতেন। মারা গেলে যেতেন ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতায়, নয় ঈপ্সিতার অলৌকিক ক্ষমতার আতঙ্কে।

বাণ-মারা

সাধারণভাবে বহু মানুষের মধ্যেই একটা ধারণা রয়েছে সত্যিই কারো কারো 'বাণ মারা'র ক্ষমতা আছে। আদিবাসীরা যেমন বাণ মারায় গভীর বিশ্বাসী, তেমনি অ-আদিবাসীদের মধ্যেও বাণ মারায় বিশ্বাসীর সংখ্যা কম নয়।

বাণ মারায় যারা বিশ্বাসী, তাদের চোখে বিষয়টা কী? একটু দেখা যাক। বাণ মারা এক ধরনের মন্ত্রশক্তি, যার সাহায্যে অন্যের ক্ষতি করা যায়—তা সে যত দূরেই থাকুক না কেন। ক্ষতি করা যায় নানা ধরনের, যেমন ঘুসঘুসে জ্বর কাশি, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা, শরীরে ঘা হওয়া, ঘা না শুকোনো, ঘন ঘন অজ্ঞান হওয়া, প্রস্রাবে রক্ত পড়া, গরুর বাঁট দিয়ে রক্ত পড়া, শরীর দুর্বল করে দেওয়া, শরীর শুকিয়ে দেওয়ায় মৃত্যু, অপঘাত মৃত্যু, অন্যের রোগ চালান করা। এছাড়াও দেখা যায়, কেউ হয়তো শত্রুতা করে কারো গরুর ওপর বাণ মারলো। এবেলা ওবেলা মিলিয়ে তিন সের দুধ দিত। কোথায় কিছু নেই গরুর বাঁট থেকে বেরোতে লাগল দুধের বদলে রক্ত। বাগানে থলথল করে উঠেছিল কুমড়ো গাছ। মাচান বেঁধে গাছটাকে ওপরে তুললেন। কড়া পড়লো রাশি রাশি। কী বিপুল সংখ্যায় কুমড়ো হবে ভেবে যখন প্রতিদিন পরম যত্নে জলসিঞ্চন করে চলেছেন, তখন হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলেন গাছটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। গোড়ার মাটি আলগা করে সার চাপালেন। কিন্তু কোনও কাজ হলো না

গাছটা শুকিযে মবে গেল। অতএব ধবে নিলেন, আসলে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। গাছেব অত ফলন দেখে কেউ হিংসেয বাণ মেবে দিযেছে। অতএব ।

এমনি বাণ মাবাব ফলেই নাকি অনেকেব কোলেব বাচ্চা হঠাৎ কেমন ঝিম্ মেবে যায। শবীবেব পেটটা শুধু বাড়ে, আব সমস্ত শবীবটাই কমতে থাকে। কোমবেব তামাব পযসা, জালেব সীসে লোহা—কোন কিছুতেই কাজ হয না। হবে কী কবে, ওকে যে বাণ মেবেছে। পোযাতি জলজ্যান্ত বউটা বাচ্চা বিযোতে গিযে মাবা গেল। কেন? কেউ নিশ্চযই বাণ মেবেছে। এমনই শতেক অসুখ আব ঘটনাব পিছনে অনেক মানুষই সর্বনাশা মন্ত্রেব অদৃশ্য বাণ বা তীবেব অস্তিত্ব খুঁজে পায।

বাণ মাবা শুধুমাত্র সাঁওতাল আদিবাসীদেব বিশ্বাসেব সঙ্গে মিশে নেই। অসম, মেঘালয, নাগাল্যান্ড, মিজোবাম, মণিপুব, ত্রিপুবা, সিকিম, উত্তববঙ্গ, এবং ভাবতেব বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদাযেব মধ্যেই বাণ মাবাব প্রতি গভীব বিশ্বাস বযেছে। আবব কি আফ্রিকা, কানাডা কি অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই বাণ মাবায বিশ্বাসী মানুষ বযেছেন। আফ্রিকাবাসীদেব অনেকেই মনে কবেন, ভুডু মন্ত্রে বাণ মেবে যে কোনও শত্রুবই শাবীবিক ক্ষতি কবা সম্ভব। আফ্রিকাব ভুডু মন্ত্রেব চর্চা ইউবোপিয দেশগুলোতেও প্রভাব বিস্তাব কবেছে।

শবীব বিজ্ঞানে উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব সুযোগ পাওযা মানুষ জানতে পেবেছে, বুঝতে শিখেছে আমাদেব বোগেব কাবণ কোনও তুক্-তাক্, বাণ মাবা ইত্যাদি অশুভ শক্তিব ফল নয, নয পাপেব ভোগ। প্রতিটি বোগকে বিশ্লেষণ কবলেই অলৌকিক কাবণেব হদিশ পাওযা যাবে। যদিও এটা বাস্তব সত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও সব বোগ মুক্তিব উপায উদ্ভাবন কবতে পাবেনি। পাবেনি মৃত্যুকে ঠেকাতে। কিন্তু না পাবাব অর্থ এই নয—বোগেব পিছনে বাণ মাবা, তুক্-তাকেব মত অলৌকিক কিছু শক্তি কাজ কবে। ক্যানসাব, যক্ষ্মা, ধনুষ্টঙ্কাব, গ্যাংগ্রিন, ম্যালেবিযা, অনাহাবজনিত অপুষ্টি ইত্যাদি বোগেব লক্ষণকেই অনেকে বাণ মাবা বা তুক্-তাকেব অব্যর্থ ফল বলে ধবে নেয।

আমাদেব কেন্দ্রীয কমিটিব, শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থাগুলো আজ পর্যন্ত দু'শোব ওপব বাণ মাবাব দাবীদাবদেব চ্যালেঞ্জেব মুখোমুখি হযেছে। কোনও ক্ষেত্রেই বাণ মাবায সমিতিব কোনও সদস্যেব মৃত্যু হযনি—যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাণ মেবে মেবে ফেলাব দাবীই ওঝা, গুণীন, তান্ত্রিকবা কবেছিল। বাণ মাবাব শাবীবিক প্রতিক্রিযা দুর্বল চিত্তেব অলৌকিকে বিশ্বাসীদেব ক্ষেত্রেই শুধু হওযাব সম্ভাবনা থাকে। আব সে সব ক্ষেত্রে গুণীন, তান্ত্রিকদেব ক্ষমতাব কাহিনী পল্লবিত হয, ওদেব ক্ষমতায বিশ্বাসীদেব সংখ্যা বাড়ে, বমবমা বাড়ে।

বাণ মেবে কাবও যেমন মৃত্যু ঘটানো সম্ভব নয, তেমনই সম্ভব নয, মন্ত্রে অন্যেব শবীবে বোগ চালান কবা বা বোগমুক্ত কবা। অনেক সময বোগী চিকিৎসক ও গুণীনেব সাহায্য একই সঙ্গে গ্রহণ কবে। চিকিৎসাব গুণে বোগ সাবানোও বোগী অনেক সময বাণ মারাব ক্ষমতায বিশ্বাসী হওযাব দরুন গুণীনেব কৃপায বোগমুক্তি ঘটেছে বলে মনে কবে। আবাব অনেক সময শুধুমাত্র গুণীনেব বাণ মাবায বোগমুক্তি ঘটেছে এমন কথা দিব্যি গেলে বলাব মত অনেক লোকও পেযেছি। তাদেব কেউ কেউ হযতো

মিথ্যাশ্রয়ী। কিন্তু সকলেই নন, কারণ এমনটা ঘটা সম্ভব।

রোগ সৃষ্টি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের বহু রোগের উৎপত্তি হয় ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি থেকে। মানসিক কারণে বহু অসুখই হতে পারে, যেমন—মাথাধরা, মাথার ব্যথা, শরীরের কোনও অংশে বা হাড়ে ব্যথা, স্পন্ডালাইটিস, স্পন্ডালোসিস, আরথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজমা, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, কামশীতলতা, পুরুষত্বহীনতা, শরীরের কোনও অঙ্গের অসারতা, কৃশতা এমনি আরো বহু রোগ মানসিক কারণে সৃষ্ট। এইসব রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা অনেক সময়ই ঔষধি-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করেন, সঠিক এবং আধুনিকতম চিকিৎসার সাহায্যে রোগ মুক্ত করা হচ্ছে, এই ধারণা রোগীর মনে সৃষ্টি করে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যান। এই রোগীর বিশ্বাস নির্ভর এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। প্ল্যাসিবো চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির প্রথম খণ্ডে বহু উদাহরণ সহ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে আর বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না। শুধু এটুকু বলেই শেষ করতে চাই, যারা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া বাণ মারা বা তুক্তাকের ক্ষমতায় মুক্ত হয়েছে বলে মনে করে, তারা প্রতি ক্ষেত্রেই মানসিক কারণে নিজের দেহে রোগ সৃষ্টি করেছিল। এবং তাদের আরোগ্যের পেছনে বাণ মারা, তুকতাক বা তন্ত্রমন্ত্রের কোনও গুণ বা বৈশিষ্ট্য সামান্যতম কাজ করেনি, কাজ করেছে বাণ মারা, তুকতাক ও মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতি রোগীদের অন্ধ বিশ্বাস।

গরুকে বাণ মারা

গ্রামের মানুষ মাঝে-মধ্যে ওঝা বা গুণীনের কাছে হাজির হয় দুধেল গাইয়ের সমস্যা নিয়ে। কেউ বাণ মেরেছে, অথবা কোনও ডাইনির নজর পড়েছে। গরুর বাঁট থেকে দুধের বদলে বের হচ্ছে রক্ত।

ওঝা ঝাড়-ফুঁক করে টোটকা ওষুধ দেয়। তাতে গরুর রক্ত দুধ সাদা না হলে শালপাতায় তেল পড়ে ঘোষণা করে কোনও ডাইনির নজর লেগেছে। কখনও বা ডাইনি কে তাও ঘোষণা করে গুণীন। পরিণতিতে নিরীহ কোন রমণীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

গরু শুধু নয়, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর সবার ক্ষেত্রেই দুধের পরিবর্তে রক্ত ও পুঁজ বের হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। ভাইরাস থেকেই এই রোগ হয়। পশু চিকিৎসকদের ভাষায় এই রোগকে বলা হয় 'ম্যাসটাইটিস' বা 'ঠুনকো'। আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যেই এই রোগ সারান যায়।

ভোলায় ধরা

নিধা গাঁয়ের মানুষ। প্রতিদিন বিশাল ধূ-ধূ মাঠটা পারাপার করছে এবেলা ওবেলা।

হঠাৎই এক ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে মাঠ পার হয়ে বাড়ি আসতে গিয়ে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। কোথায় বাড়ি? কোথায়ই বা গাঁ? সেই সকালে চাট্টি আমানি পেটে ঢুকেছিল, যাতে ভাতের চেয়ে জলই ছিল বেশি। তিন ক্রোশ পথ হেঁটে টাঙির কোপে জ্বালানী কাঠ জোগাড় করে মাথায় বোঝাটা চাপাবার আগে গলায় ঢেলে নিয়েছিল এক বোতল তরল আগুন। এই আগুন শরীরে না ঢেলে দিলে তিন ক্রোশ পথের আকাশের আগুনকে শরীরকে সামাল দেবে কেমন করে? বেচাল আগুনে হাওয়া ঠেলে চলেছে—সে অনেকক্ষণ। এতক্ষণে ছ'ক্রোশ পথ বোধহয় হাঁটা হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় বাংচিতা আর ঢোলকমলির বেড়ায় ঘেরা গাঁয়ের বাড়িগুলো? ভয় ধরে মনে। পথ ভুল হচ্ছে। এত দিনের চেনা পথ, তবে তো ভোলায় ধরেছে। ভোলায় ভুলিয়ে মারতে চায়। গরম গা ভয়ের ঠেলায় ঠাণ্ডা মেরে যায়। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। জ্বালানীর খোঁজে আসা কয়েকটি কিশোরী ও বৃদ্ধা ওকে অমন পানা পড়ে থাকতে দেখে দৌড় লাগায় গাঁয়ে। ধাঁ-ধাঁ করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। নিধাকে গাঁয়ের লোকেরা নিয়ে আসে বাড়ি। কিন্তু এ কোন্ নিধা? ডাকাবুকো মানুষটা কেমন হয়ে গেছে। হাবার মত চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। কোন কিছুই ঠাওর করতে পারছে না। নিধার বউ গোপা অমন অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। নিধার ছেলে-মেয়েগুলো বড়দের ভিড় ঠেলে বাপের কাছে এগুতে সাহস পেল না। অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে সকলের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। নিধার বাপ হরি বাউড়ি মেলা সোরগোল তুলে চেঁচাল, 'ওরে নিধাকে ভোলায় ধরেছে, জল নিয়ে আয়।' পুরুলিয়া জেলার এমন শুখো জায়গায় জলের অভাবে মাটিতে ফাটল ধরে। শীর্ণ গরুগুলো জল-ঘাসের অভাবে ধুঁকছে। তবু জল হাজির হয়। নিধাকে দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়ে গায়ের ঘামটা মেরে দাঁড় করিয়ে দেয় পাড়াপড়শীরা। মাথায় জল ঢালা হতে থাকে। তারই মাঝে শ্বশুরের আদেশে নিধার কাপড়ের কসিতে টান মারে গোপা। একেবারে পুরষ মা কালী। ঠা-ঠা করে হাসতে থাকে দু-চারজন মেয়ে মর্দ। নিধা চমকে উঠে গোপার হাত থেকে কাপড় টেনে নিয়ে আব্রু বাঁচাতে তৎপর হয়। গোপার আতঙ্ক দূর হয়। মুখে হাসি ফোটে। 'ভোলা' ছেড়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ যে ঘটনাটি বললাম, তাতে স্মৃতির সঙ্গে সামান্য কল্পনার মিশেল দিয়েছি পাঠক-পাঠিকাদের ভোলায় পাওয়া মানুষটির মানসিকতা বোঝাতে। ঘটনাস্থল পুরুলিয়া জেলার আদ্রা শহরের উপকণ্ঠের বাউড়ি পল্লী। ওই মাঠ পার হতে গিয়ে অনেককেই নাকি ভোলায় পেত, শৈশবে এমন গল্প অনেক শুনেছি। আমার জ্যাঠতুতো মেজদাও যখন ষণ্ডা চেহারার এক প্রখর জেদি যুবক, তখন এক সন্ধ্যায় ওই মাঠ পার হতে গিয়ে তিনিও নাকি একবার ভোলার পাল্লায় পড়েছিলেন। যে মাঠ অগুণতি বার পার হয়েছেন, সে মাঠের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুন হরিতকির গাছের কাছে পথ ভুলেছিলেন। এদিক-ওদিক উল্টোপাল্টা ছোটাছুটি করে যখন শীতের সন্ধ্যাতেও ঘেমে নেয়ে একশা তখন সাউথ ইনস্টিটিউটের বনাদা আবিষ্কার করলেন মেজদাকে। বিহ্বল মেজদার গায়ে শীতের রাতেও বালতি বালতি কুয়োর জল ঢালতে দেখেছি।

ভোলায় ধরা যুবতীকে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে তার মাথায় অনবরত জল ঢালতে দেখেছি। আর একগাদা নানা বয়সী নারী-পুরুষের সামনে বয়স্কা

মহিলাকে দেখেছি যুবতীটির অনাবৃত স্তন টিপতে। তাদের ধারণা, এই ভাবে বিভিন্ন বয়সী বিভিন্ন সম্পর্কের নারী-পুরুষদের সামনে ভোলায় ধরা মানুষটিকে লজ্জা পাইয়ে দিতে পারলে ভোলায় ধরা ছেড়ে যায়।

পথিকের আত্মবিস্মৃত হওয়া বা ভুলে যাওয়া থেকেই ভোলায় ধরা কথাটি এসেছে। বিশাল ফাঁকা মাঠ অতিক্রম করতে গিয়ে কিছু কিছু সময় কারো কারো দিক বিভ্রম ঘটতেই পারে। ঠা-ঠা রোদ্দুর ও অন্ধকার রাতে এমন ধরনের দিক-বিভ্রম ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। তার ওপর আবার মাঠটির যদি 'ভোলায় ধরার মাঠ' হিসেবে কুখ্যাতি থাকে, তবে তো সোনায় সোহাগা। ভোলায় ধরার আতঙ্ক থেকেই তাকে ভোলায় ধরে—ভূতে ধরার মতই। ভোলায় ধরার ভয় আদৌ না থাকলে দিক্‌বিভ্রম ঘটলেও ভোলায় ধরে না কখনই।

রাত দুপুরে অতি পরিচিত পথ চলতে গিয়ে দিক ভুল করার অভিজ্ঞতা কম বেশি অনেকেরই আছে। ধরুন শিয়ালদহ্ স্টেশনে নেমেছেন আরো পাঁচটা দিনের মত। রাতের আলো ঝলমল শিয়ালদহ। আপনার সঙ্গী যে দিকে এগুলো তা দেখে অবাক হলেন। 'ওদিকে যাচ্ছিস কেন ?' জিজ্ঞেস করতেই জবাব পেলেন, 'গেট দিয়ে বেরুবো না।' আবার আপনার অবাক হওয়ার পালা। গেট আবার ওদিকে কোথায় ? ওতো গেটের ঠিক উল্টো দিকে হাঁটছে। আপনি কিছুটা হতভম্ব, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে সঙ্গীকে অনুসরণ করতে গিয়ে আবারও অবাক হলেন। অতি স্থির ভাবে মনে হচ্ছে উল্টো দিকে হাঁটছেন কিন্তু ওই দূরে গেটটাও দেখতে পাচ্ছেন। এমন ভুল শ্যামবাজার মোড় গড়িয়াহাটের মোড় বা পৃথিবীর যে কোনও স্থানেই হতে পারে। এই সাময়িক দিক নির্ণয়ে ভুল করাকেই কিছু কিছু মানুষ ভাবেন—কোনও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল মৃত্যুর গভীরে। ভোলায় মারার আগে অন্যের নজরে পড়ায় জীবনটা বেঁচেছে, কিন্তু ভোলায় ধরার পরিণতিতেই এমন স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে।

ভোলা নামক অলীক কিছুর জন্য দিক খুঁজে পাচ্ছে না ভেবে দিক-হারা মানুষটি কেবলমাত্র ভয়েই মারা যেতে পারে। ভয়ে মস্তিষ্ক কোষের ভারসাম্য সাময়িকভাবে নষ্ট হতেও পারে। 'ভোলায় ধরলে সব ভুলে যায়' এমন একটা ধারণা শোনা কিছু কাহিনী বা দেখা কিছু ঘটনা থেকে পথিক প্রভাবিত হতেই পারে। প্রভাবিত পথিক যদি তীব্র আতঙ্কে ভাবতে শুরু করেন, আমাকে ভোলায় ভুলিয়ে নিয়ে ঘোরাচ্ছে, আমাকে হয় মেরে ফেলবে নতুবা সব কিছু ভুলিয়ে দেবে—তবে পথিকের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেমন বন্ধ হতে পারে, তেমনই ঘটতে পারে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশের ঘটনা।

আবারও বলি দিক্ বিভ্রমের মত ঘটনাকে ভোলায় ধরার মত অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে ভয় না খেলে মৃত্যু বা স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দেয় না কখনই।

জন্ডিসের মালা

জন্ডিস বা ন্যাবা রোগে মন্ত্রঃপূত মালা পরার প্রচলন শুধু যে আদিবাসী সমাজ বা গঞ্জেই ব্যাপকতা পেয়েছে, তা নয়। বিভিন্ন শহরে এমনকি কলকাতাতেও মন্ত্রপূত

জন্ডিসেব মালাব প্রতি জন্ডিস বোগীদেব আগ্রহ ও বিশ্বাস লক্ষ্য কবাব মত।

কলকাতাব দর্জিপাড়াব মিত্তিব বাড়িব থেকে জন্ডিসেব মালা দেওয়া হয় প্রতি শনিবাব। তিন-চাব পুরুষ ধবেই তাঁবা এই মালা দিযে চলেছেন। সংগ্রহকাবীদেব ভিড়ও দেখাব মত।

জন্ডিসেব মালায় কী হয়। জন্ডিস বোগী এই মালা পবে সাধাবণত প্রাপ্ত নির্দেশ মত দুদিন স্নান কবেন না। তেল, ঘি, মাখন খাওয়া বাবণ। নিতে হয় পূর্ণ বিশ্রাম। মন্ত্রঃপূত মালা জন্ডিসেব বোগ যতই শুষে নিতে থাকে ততই মালা বাড়তে থাকে। বুক ছাড়িযে পেটেব দিকে নামতে থাকে। আব পাঁচটা স্বাভাবিক মালাব মত এ মালা একই আযতন নিযে থাকে না। মালাব অদ্ভুত ব্যবহাবে ব্যবহাবকাবীব বিশ্বাস বাড়ে। এবং সাধাবণত দেখা যায় বোগী ধীবে ধীবে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

সমগ্র বিষযটাব মধ্যে একটা অলৌকিকেব ছোঁযা ছড়িযে আছে। কোনও মালা কি এমনি কবে বাড়ে? বাড়ে বইকি, মালাটা যদি বিশেষভাবে তৈবি হয ফুলেব বদলে বামনহাটি, ভৃঙ্গবাজ অথবা আপাং গাছেব ডাল দিযে। এইসব গাছেব ডাল ফাঁপা এবং দ্রুত শুকিযে কৃশ থেকে কৃশতব হতে থাকে।

এই জাতীয় গাছেব ডাল ছোট ছোট কবে কেটে তৈবি কবা হয় মালা। ডালেব টুকবোগুলোকে গেঁথে মালা তৈবি কবলে সে মালা কিন্তু বাড়বে না। মালা বাড়াতে গেলে সুতো বাড়াতে হবে। ছুঁচে গাঁথা মালায বাড়তি সুতো পাওয়া সম্ভব নয বলেই সে মালা বাড়ে না। জন্ডিসেব মালা তৈবি হয় বিনা ছুঁচে। বলা চলে জন্ডিসেব মালা বোনা হয। এই বোনাব কৌশলেই বাড়তি সুতো মালা বাড়ায। এবাব আসা যাক মালা বানাবাব পদ্ধতিতে।

বামনহাটি, ভৃঙ্গবাজ বা আপাং অথবা ফাঁপা অথচ দ্রুত শুকোয এমন কোনও গাছেব ডাল কেটে বানান হয ছোট ছোট কাঠি, এক একটা কাঠি আড়াআড়িভাবে ধবে আঙুলেব সাহায্যে ফাঁস দিযে গা ঘেঁষে ঘেঁষে বাঁধা হতে থাকে কাঠিগুলো। এই বিশেষ পদ্ধতিব ফাঁস বা গিঁটেব নাম শিফার্স নট্ (shiffer's knot) বা সেলার্স নট্ (sailor's knot)।

গা ঘেঁষে ফাঁস জড়ান কাঠিগুলো সমযেব সঙ্গে সঙ্গে যতই শুকোতে থাকে ততই সুতোব ফাঁক ঢিলে হয, দু'কাঠিব মধ্যে ফাঁক বাড়ে। মালা বাড়তে থাকে।

এই মালা বাড়াব পিছনে যেমন মন্ত্রশক্তি কাজ কবে না, তেমনই জন্ডিস বোগ শুষে নেওযাও এই বাড়াব কাবণ নয। এই একই পদ্ধতিতে মন্ত্র ছাড়া আপনি নিজে হাতে মালা বানিযে একটা পেবেকে ঝুলিযে পবীক্ষা কবে দেখুন। মন্ত্র নেই, জন্ডিস নেই তবুও মালা বাড়ছে।

জন্ডিস হয বিলিরুবিন নামে হলুদ বঙেব একটি বঞ্জক পদার্থেব জন্য। স্বাভাবিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীব পিত্তে বিলিরুবিনেব অবস্থান। বক্তে এব স্বাভাবিক উপস্থিতি প্রতি ১০০ সি সি-তে ০.১ থেকে ১ মিলিগ্রাম। উপস্থিতিব পবিমাণ বাড়লে প্রথমে প্রস্রাব হলুদ হয। তাবপব চোখেব সাদা অংশ ও শবীব হলুদ হতে থাকে। বক্তে বিলিরুবিনেব পবিমাণ বিভিন্ন কাবণে বাড়তে পাবে। প্রধানত হয ভাইবাসজনিত কাবণে। স্বাভাবিক বোগ প্রতিবোধ ক্ষমতা থাকলে, বিশ্রাম নিলে, চর্বি

জাতীয় খাবার গ্রহণ না করলে রোগী কিছুদিনের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করবেন।
এছাড়াও অবশ্য জন্ডিস হতে পারে। পিত্তনালীতে পাথর, টিউমার, ক্যানসার হওয়ার জন্য অথবা অন্য কোন অংশে টিউমার হওয়ার জন্য পিত্তনালী বন্ধ হলে পিত্ত গন্তব্যস্থল ক্ষুদ্রান্তে যেতে পারে না, ফলে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং জণ্ডিস হয়।
আবার কোনও কারণে রক্তে লোহিত কণিকা অতিরিক্ত মাত্রায় ভাঙতে থাকলে হিমোগ্লোবিনের তুলনায় বেশি পরিমাণে বিলিরুবিন তৈরি হবে এবং জণ্ডিস হবে।
ভাইরাসজনিত কারণে জণ্ডিস না হয়ে অন্য কোনও কারণে জণ্ডিস হলে চিকিৎসার সাহায্যে মূল কারণটিকে ঠিক না করতে পারলে জন্ডিস-মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্রাম ও খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন মেনে জন্ডিস থেকে মুক্ত হওয়া যায় বটে (তা সে জন্ডিসের মালা পরুন, অথবা নাই পরুন), কিন্তু জন্ডিসের মালার ভরসায় থাকলে ভাইরাসজনিত কারণে হওয়া জন্ডিস থেকে মৃত্যুও হতে পারে। যকৃত স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে চিরকালের জন্য যেমন ভুগতে হতে পারে। তেমনই বিলিরুবিনের মস্তিষ্কে উপস্থিতি স্থায়ী স্নায়ুরোগ এমনকি মৃত্যুও হানতে পারে।
জন্ডিস হলে চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে জানা প্রয়োজন জন্ডিসের কারণ। পরবর্তী ধাপ হবে প্রতিকারের চেষ্টা।

জন্ডিস ধোয়ান

জন্ডিস হলে রোগীরা যেমন মালা পড়তে দৌড়ান, তেমনি অনেকে দৌড়োন জণ্ডিস ধোয়াতে।
ওঝা বা গুণীন জন্ডিস রোগীর শরীরে মন্ত্র পড়ে হাত বুলিয়ে জলে হাত ধুতেই মন্ত্র শক্তির প্রভাবে জল হলুদ রঙ ধারণ করতে থাকে। আপনি যদি ভেবে থাকেন 'রামবাবু' বা 'শ্যামবাবু' যে কেউ রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে জলে হাত ধুলেই জল জন্ডিসের বিষ ধারণ করে হলুদ বর্ণ ধারণ করবে তবে ভুল করবেন। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখার পর অনেক বিজ্ঞান পড়া মানুষ যদি মন্ত্র-তন্ত্র বা আদিবাসীদের তুক্-তাক্, ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলেন, তবে অবাক হবো না। আমাদের যুক্তিতে কোনও কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলে অহংবোধে ধরে নিই, এর কোনও ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব নয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যার অতীত, অলৌকিক। আমরা অনেক সময়ই বিস্মৃত হই, আমার জ্ঞানের বাইরের কোনও কারণ দ্বারাই এমন কাজটি ঘটা সম্ভব।
প্রসঙ্গে ফেরা যাক। বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায় রোগী একটু একটু ভালও হচ্ছেন। জন্ডিস-ধোয়া গুণীনের নাম ও পসার বাড়ে। কেন সারে, এই প্রসঙ্গের আবার অবতারণা করা অপ্রয়োজনীয়, কারণ জন্ডিসের মালা নিয়ে আলোচনাতে এই প্রসঙ্গে আমি এসেছিলাম। বরং এই প্রসঙ্গে আসি, কী করে জন্ডিস রোগীর গায়ে রোলান হাত ধুলে জল হলুদ হয়।

একটু কষ্ট করে আম ছাল বেটে রস তৈরি করুন। একটা পাত্রে জল নিয়ে তাতে চুন ফেলে রাখুন। ঘণ্টা কয়েক পরে যে পরিষ্কার চুন জল পাবেন সেটা একটা বাটিতে ছেঁকে স্রেফ জল বলে যার সামনেই হাজির করুন—সকলেই সাধারণ জল বলেই বিশ্বাস করবেন। হাতে ঘষুন আমগাছের রস। এবার একজন সুস্থ মানুষের গায়ে হাত বুলিয়ে হাতটা বাটির চুন জলে ধুতে থাকুন, দেখবেন সেই অবাক কাণ্ডটাই ঘটে যাচ্ছে—জল হলুদ হয়ে যাচ্ছে।

যেসব প্রচলিত তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম, এর বাইরেও কিছু কিছু থেকে গেছে, যেগুলো অপ্রধান বলে আলোচনায় আনিনি, অথবা এমন কিছু কিছু তুক-তাক নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হতো, যেগুলোর বিষয়ে আমি এখনও কিছু শুনিনি বলে আলোচনা করতে পারলাম না। সে সব তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁকের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিয়ে কেউ যদি এর লৌকিক ব্যাখ্যা চান, নিশ্চয়ই দেব। এই বিষয়ে আপনাদের কোনও অনুসন্ধানে প্রয়োজনে আমার এবং আমাদের সমিতির সমস্ত রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি রইলো। শুধু অনুরোধ, চিঠি জবাবী খাম সহ পাঠাবেন।



আট

ঈশ্বরের ভব

ঈশ্ববেব ভব কখনও মানসিক বোগ, কখনও অভিনয

মনসা, শীতলা, কালী, তাবা, দুর্গা, চড়ক পুজোব সময শিব এবং কীর্তনেব আসবে বাধা বা গৌবাঙ্গেব ভব, এমনি আবও কত পবিচিত, অল্পপবিচিত, অপবিচিত ঠাকুব-দেবতাবা যে মানুষেব ওপব ভব কবে তাব ইযত্তা নেই। ঠাকুবে ভব হওযা মানুষগুলোব বেশিমাত্রায খোঁজ মিলবে মফস্বলে গ্রামে-গঞ্জে। শহব কলকাতাতেও অবশ্য ভব হওযা মানুষেব সাক্ষাৎ মেলে। ভবিষ্যৎ জানতে, অসময থেকে উত্তবণেব জন্য দৈব ওষুধ পেতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী-দবিদ্র নির্বিশেষে বহু মানুষই এইসব ভব হওযা মানুষগুলোব দ্বাবস্থ হন। অনেক ক্ষেত্রে ঠাকুবে ভব হওযা মানুষগুলো এমন সব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য আচবণ কবেন যে সাধাবণ বুদ্ধিতে অনেকে এতে অলৌকিকেব অস্তিত্ব আবিষ্কাব কবেন। বিশ্বাস কবেন মানুষটিব শরীব ঈশ্বব দখল কবাতেই এমনটি ঘটছে।

কৈশোবেব একটি ঘটনা। তখন দমদম পার্ক-এ থাকি। আমাব এক বন্ধুব বাড়িতে মাঝে-মধ্যে নাম গানেব আসব বসত। শুনেছিলাম নাম-গান শুনতে শুনতে বন্ধুব মাযেব ওপব বাধাব ভব হত। একবাব দেখতে গেলাম। বন্ধুব মা নাম সঙ্কীর্তন কবতে কবতে এক সময হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে মাথা দোলাতে লাগালেন। মনে হতে লাগল মাথাটাই বুঝি বা গলা থেকে ছিঁড়ে বেবিযে আসবে। উন্মত্তেব মত আচবণ কবতে লাগলেন। ভক্তবা তাঁকে ধবাধবি কবে এক জাযগায বসালেন। ভক্তবা অনেকেই এই সময বন্ধুব মাকে শুযে পড়ে প্রণাম জানাচ্ছিলেন। সেদিন শাবীব-বিদ্যা বিষযে জ্ঞানেব অভাবে বন্ধুব মাযেব এমন অদ্ভুত ব্যবহাবেব কাবণ আমাব অজানা ছিল, তাই বিস্মিত হযেছিলাম। আজ কিন্তু শাবীব-বিদ্যাব কল্যাণে জানতে পেবেছি সে-দিন আমাব বন্ধুর মা নাম-সঙ্কীর্তন কবতে কবতে ভক্তিবসে, ভাবাবেগে আপ্লুত হযে যা যা কবেছিলেন সে সব ছিল হিস্টিবিযা বোগেবই অভিব্যক্তি, অথবা নিজেকে অন্যদেব চেযে বিশিষ্ট, শ্রদ্ধেয বলে প্রচাব কবাব মানসিকতায তিনি ইচ্ছে কবেই পুবো ব্যাপাবটা অভিনয কবছিলেন।

প্রাচীন যুগ থেকেই হিস্টিবিযা বোগকে মানুষ অপার্থিব বলেই মনে কবতেন।

বোগেব উপসর্গকে মনে কবা হত ভূত বা ঈশ্ববেব ভবেব বহিঃপ্রকাশ। এ যুগেও সংস্কাবাচ্ছন্ন মানুষই সংখ্যাগবিষ্ঠ। ফলে এখনও অনেক ক্ষেত্রেই হিস্টিবিযা বোগী পূজিত হয ঈশ্ববেব প্রতিভূ হিসেবে। সাধাবণভাবে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা প্রগতিব আলো থেকে বঞ্চিত সমাজেব মানুষদেব মধ্যেই এই ধবনেব হিস্টিবিযা বোগীব সংখ্যা বেশি। সাধাবণভাবে এই শ্রেণীব মানুষদেব মস্তিষ্ককোষেব স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা কম। যুক্তি দিযে বিচাব কবে গ্রহণ কবাব ক্ষমতা অতি সীমিত। বহুজনেব বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ককোষেব সহনশীলতা যাদেব কম তাবা এক নাগাড়ে একই ধবনেব কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময মস্তিষ্কেব কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। একান্ত ঈশ্ববে বিশ্বাস বা ভূতে বিশ্বাসেব ফলে বোগী ভাবতে থাকে তাব শবীবে ঈশ্ববেব বা ভূতেব আর্বিভাব হযেছে, ফলে বোগী ঈশ্বব বা ভূতেব প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব আচবণ কবতে থাকে।

'ভূত-ভব' প্রসঙ্গে এই নিযে বিস্তৃত আলোচনা আগে কবা হযেছে। তাই পাঠকদেব একই ধবনেব কথা বলে তাঁদেব ধৈর্যেব উপব অত্যাচাব কবাব চেষ্টা থেকে নিজেকে বিবত কবলাম। ববং এখানে একটি গণহিস্টিবিযাব উদাহবণ তুলে দিচ্ছি।

হিস্টিরিযা যখন ভব

১৯৬৬ সালেব মে মাসেব ২৭ তাবিখ। স্থান—বাঁচীব উপকণ্ঠেব পল্লী। সময—সন্ধ্যা। নাযিকা একটি কিশোবী। প্রচণ্ড মাথা দোলাতে-দোলাতে শবীব কাঁপাতে-কাঁপাতে কী সব আবোল-তাবোল বকতে লাগল।

সন্ধে বেলায জল বযে আনাব পবই এমনটা ঘটেছে, নিশ্চযই ভূতেই ধবেছে। বাড়িব লোকজন ওঝাকে খবব দিলেন। ওঝা এসে কাঠকযলায আগুন জ্বেলে তাতে ধুনো, সবষে আব শুকনো লঙ্কা ছড়াতে শুরু কবল, সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি কবে মন্ত্র-পাঠ। মেযেটি কঠিন গলায ওঝাব ওইসব কাজ-কর্মে বিবক্ত প্রকাশ কবল। ওঝা দেখলে ভব কবা ভূতেবা চিবকালই ক্ষুব্ধ হয। অতএব ভূতেব বাগে ওঝাব উৎসাহ তো কমলই না, ববং দ্বিগুণ উৎসাহে মন্ত্রসহ নাচানাচি শুরু কবল।

গম্ভীব গলায মেযেটি জানাল, সে ভূত নয, ভগবান, সে 'বড়ি-মা' অর্থাৎ মা' দুর্গা। ওঝা ওব সামনে বেযাদপি কবলে শাস্তি দেবে। ওঝা অমন অনেক দেখেছে। ভূতেব ভযে পালাবাব বান্দা সে নয। সে তাব মত মন্ত্র-তন্ত্রে পাঠ চালিযে যেতে লাগল। মন্ত্র পড়া সবষেব কিছুটা কাঠকযলাব আগুনে আব কিছুটা মেযেটিব গাযে ছুঁড়ে মাবতেই মেযেটি অগ্নিকুণ্ড থেকে টক্‌টকে লাল একমুঠো জ্বলন্ত কাঠ কযলা হাতে তুলে নিযে ওঝাকে বলল, "এই নে ধব প্রসাদ।" ওঝাব হাতটা মুহূর্তে টেনে নিযে মুহূর্তে ওব হাতে উপুড় কবে দিল জ্বলন্ত কাঠকযলাগুলো।

তাপে ও যন্ত্রণাব তীব্রতায ওঝা চিৎকাব কবে এক ঝটকায কাঠ কযলা উপুড় কবে ফেলে দিল। মেযেটি কিন্তু নির্বিকাব। তাব চোখে-মুখে যন্ত্রণাব সামান্যতম চিহ্ন লক্ষ্য কবা গেল না। এমনকি হাতে ফোস্কা পর্যন্ত নয। উপস্থিত প্রতিটি দর্শক হতচকিত,

বিস্মিত। এ মেযে 'বডি-মা' না হযেই যায না। প্রথমেই নতজানু হযে মার্জনা ভিক্ষা কবল ওঝাটি। তাব বশ্যতা স্বীকাবে প্রত্যেকেবই বিশ্বাস দৃঢতব হলো।

মেযেটি তাব মা-বাবাকে নাম ধবে সম্বোধন কবে জানাল, "আমাব কাছে মানত কবেও মানত বাখিসনি বলে আমি নিজেই এসেছি।"

মা-বাবা ভযে কেঁপে উঠলেন, মানত কবে মানত না বাখতে পাবাব কথাও তো সত্যি। মা-বাবা মেযেব পাযেব ওপব উপুড হযে পডলেন। মেযেটি বাতাবাতি 'বডি-মা' হযে গেল। আশপাশেব গ্রামগুলো থেকে দলে দলে মানুষ বডি-মা'-ব দর্শনেব আশায, কৃপালাভেব আশায, সমস্যা সমাধানেব আশায বোগ-মুক্তিব আশায হাজিব হতে লাগলেন। কিশোবীটিব ব্যবহাবে অদ্ভুত একটা পবিবর্তন এসে গেছে। কেউ জুতো পাযে, লাল পোশাক পবে বা চশমা পবে ঢুকতে গেলেই ভর্ৎসনা কবছে। বডদেবও নানা ধবনেব আদেশ কবছে। ভক্তবা ফল, ফুল, মেঠাইযে ঘব ভবিযে তুলতে লাগলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিযে ধূপ-দীপ জ্বালিযে চলতে লাগল। বডি-মাব পুজো। এবই মধ্যে বডি-মাব কিছু সেবিকাও জুটে গেছে। বডি-মাব আবির্ভাবেব দিন দুযেকেব মধ্যে এক বযস্কা বিবাহিতা সেবিকা ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন। এক সময বডি-মাব মতন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘোষণা কবলেন তিনি 'ছোটি-মা'। একই ঘবে দু-মাযেবই পুজো শুরু হযে গেল।

কিশোবী ও বিবাহিতা মহিলাব ওপব বডি-মা ও ছোটি মা-ব ভবেব কাহিনী ঘিবে আশেপাশে বিবাট অঞ্চল নিযে তখন দারুণ উত্তেজনা, বলতে কি ধর্মোন্মাদনা। ৩০মে এক অষ্টাদশী তরুণী ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন। পডশীবা ব্যস্ত হযে পডলেন। মেযেটিকে ভূতে পেযেছে কি ঠাকুবে—বোঝাব চেষ্টা কবতে লাগলেন। ওঝা আসবে, কি পুজো কববে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তাঁদেব বেশিক্ষণ অপেক্ষা কবতে হল না। মেযেটি ঘোষণা কবল, সে মা কালী। এখানেও দলে দলে ভক্ত জুটে গেলেন। রাঁচীব আশেপাশে ঈশ্ববেব ঘন ঘন আবির্ভাবে ভক্তবা শিহবিত হলেন। বুঝলেন কলিব শেষ হলো বলে। কলি যুগ ধ্বংস কবে আবাব সত্য যুগ প্রতিষ্ঠা কবতে এবাব হাজিব হলেন ধ্বংসেব দেবতা মহাদেব। আট বছবেব একটি বালকেব মধ্যে তিনি ভব কবলেন।

৩১মে একটি বিবাহিতা তরুণীব ওপব ভব কবলেন 'মাঝলী-মা'। সে-বাতেই এক সদ্য তরুণী নিজেকে ঘোষণা কবল 'সাঁঝলি-মা' বলে। এদেব ক্ষেত্রেও মাযেদেব আবির্ভাব সূচিত হযেছিল ঘন ঘন ফিট ও হিস্টিবিযা বোগীব মতই মাথা ঝাঁকান, শবীব দোলানব মধ্য দিযে।

রাঁচীব মানসিক আবোগ্যশালাব চিকিৎসকদেব দৃষ্টি স্বভাবতই এমন এক অদ্ভুত গণহিস্টিবিযা ঘটনাব দিকে আকর্ষিত হযেছিল। সাত দিনেব মধ্যেই এইসব ভবেব বোগীবা তাদেব স্বাভাবিক জীবনে ফিবে আসে। রাঁচী মানসিক আবোগ্যশালাব চিকিৎসকদেব মতে, গ্রামেব ভবে পাওযা বোগীবা প্রত্যেকেই পবিবেশগতভাবে বিশ্বাস কবত, ঈশ্বব সময সময মানুষেব শবীবে ভব কবে। একজন মানসিক ভাবসাম্য হাবিযে হিস্টিবিযাব শিকাব হলে সে নিজেব সত্তা ভুলে গিযে ঈশ্ববেব সত্তা নিজেব মধ্যে প্রকাশিত ভেবে অদ্ভুত সব আচবণ কবতে থাকে। স্থানীয অধিবাসীদেব মধ্যে বেশিব ভাগই শিক্ষালাভে বঞ্চিত, ধর্মান্ধ, যুক্তি-বুদ্ধি কম, আবেগপ্রবণ এবং তাদেব

মস্তিষ্ককোষেব সহনশীলতা কম। ফলে একজনেব হিস্টিবিয়া বোগ অন্যেব মধ্যে দ্রুত সঞ্চাবিত হয়েছে। যাবা হিস্টিবিয়া বোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তাবা প্রত্যেকেই গভীবভাবে ভাবতে শুরু কবেছিল ঈশ্বব তাদেব ওপবেও ভব কবেছে। শুরুব পর্যায়ে তাদেব ভাবনা ছিল আমাব ওপবেও যদি ঈশ্বব ভব কবে? এক সময় 'যদি' বিদায় নিয়েছে। রোগীবা আন্তবিকভাবে বিশ্বাস কবতে শুরু কবেছিল ঈশ্বব তাব ওপব ভব কবেছে। যে ঈশ্বব অপর একজনেব ওপব ভব কবেছে, সে আমাব ওপবেও ভব কবতে পাবে। এই বিশ্বাস থেকেই তাদেব প্রত্যেকেব ওপব ভর কবেছে এক একটি নতুন নতুন ঈশ্বব।

কল্যাণী ঘোষপাড়ায় সতীমা'যেব মেলায় ভব

নদীয়া জেলাব কল্যাণী ঘোষপাড়ায় প্রতি বছব দোল উৎসবে সতী'-মাব বিবাট মেলা বসে। সার্কাস, সিনেমা, ম্যাজিক, নাগবদোলা, বাউলেব গান, দোকান-পাঠ আব লক্ষ লক্ষ ভক্ত। সমাগমে মেলা আশপাশেব বিবাট অঞ্চলকে জাঁকিয়ে বাখে। 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়েব আউলিয়া এই মেলায় দেড়শ-দু'শ তাঁবু ও আখড়া হয়, পুলিশ ফাঁড়ি বসে। পশ্চিমবাংলাব বহু মানুষ নানা মানসিক ও প্রার্থনা নিয়ে আসেন। কেউ আসেন বোগ মুক্তিব কামনা নিয়ে, কেউবা আসেন সন্তান কামনায়, কেউবা অন্য কোনও সমস্যা নিয়ে। এখানেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য গণ-ভব'। কয়েক শত পুরুষ ও মহিলাব উপব সতী'-মাব ভব হয়।

সতীমায়েব বাক্‌সিদ্ধ হওয়াব যে কাহিনী ভক্তদেব মুখে মুখে ঘোবে, তা এবকম। অষ্টাদশ শতকেব গোড়ায় ভাগ্য-অন্বেষণে রামশবণ পাল এসে বসবাস শুরু কবেন নদীয়া জেলাব কল্যাণীব কাছে ঘোষপাড়ায়। বিয়ে কবেন সদগোপ জমিদাব গোবিন্দ ঘোষেব মেয়ে সবস্বতীকে। আউলচাঁদ ফকিবেব সঙ্গে পথে আলাপ বামশবণেব। বামশবণ তাঁকে নিজেব বাড়ি নিয়ে আসেন। আউলচাঁদ ডেবা বাঁধেন বামশবণেব বাগানেব ডালিমতলায়। পাশেই হিমসাগব পুকুব দেখে ফকিব আনন্দে আত্মহাবা। বললেন, "বাঃ, এটায় চান কবলেই গঙ্গা চানেব কাজ হয়ে যাবে। এব সঙ্গে গঙ্গাব যোগাযোগ বয়েছে বে।"

অদ্ভুত ব্যাপাব, তাবপব থেকে গঙ্গাব সঙ্গে সঙ্গে পুকুবেও জোয়াব-ভাটা হতো। বামশবণ ও সবস্বতী বুঝেছিলেন, ফকিব বাক্‌সিদ্ধ। একদিনেব ঘটনা, সবস্বতী কিছুদিন ধবেই অসুখে ভুগছিলেন। সে-দিন অসুস্থতা খুব বাড়তে চিন্তিত বামশবণ দৌড়ালেন কবিবাজ মশাইকে ধবে আনতে। পথে আউলচাঁদ বামশবণকে থামালেন। সবস্বতীব অসুস্থতাব খবর শুনে বললেন, "তোকে আব কবিবাজেব কাছে যেতে হবে না। আমাকে ববং তোব বউয়েব কাছে নিয়ে চল।"

বামশবণেব কী যে কি হলো। কবিবাজেব কাছে না গিয়ে আউলচাঁদকে নিয়ে ফিবলেন। ফকিব সবস্বতীব শবীবে হাত বুলিয়ে দিতেই বোগেব উপশম হলো। মুগ্ধ,

ভক্তি আপ্লুত রামশরণ ও সরস্বতী আউলচাঁদ ফকিরের কাছে দীক্ষা নিলেন। সিদ্ধপুরুষ আউলচাঁদ জানান, সরস্বতী বাক্‌সিদ্ধ হবেন। পরবর্তী ছয় পুরুষও হবেন বাক্‌সিদ্ধ। রামশরণ ও সরস্বতীর কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কর্তা হয়ে আউলিয়া ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করেন। সরস্বতীর বাক্‌সিদ্ধ ক্ষমতার কথা প্রচারিত হতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষের স্রোত এসে ভেঙে পড়তে লাগল সরস্বতীর বাড়িতে। বাক্‌-সিদ্ধা সরস্বতী যাকে যা বলতেন তাই হতো। যে রোগীদের উপর সদয় হতেন, বলতেন, "যা ভাল হয়ে যাবি। একটু হিমসাগরের জল আর ডালিমতলার মাটি মুখে দে গে যা।" রোগীরা ভালও হয়ে যেত। একটিই শুধু নিষেধ ছিল—শুক্রবার মাছ, মাংস, ডিম, রসুন, পেঁয়াজ, মুসুরডাল আর পুঁই খাওয়া চলবে না, চলবে না কোনও নিমন্ত্রণ খাওয়া।

শুক্রবারটা সরস্বতী ও রামশরণের কাছে ছিল পুণ্য-বার। ওই দিনেই আউলচাঁদ ফকির ডালিমতলায় এসেছিলেন।

দ্রুত বাক্‌-সিদ্ধা সরস্বতী ভক্তদের কাছে হয়ে উঠলেন সতীমা। রামশরণ ও সতীমা বিশ্বাস করতেন গৌরাঙ্গই আউলচাঁদ ফকির বেশে এসেছিলেন। আউলচাঁদ দীক্ষা দিয়েছিলেন বাইশ জনকে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও বাইশ জনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। দু'জনের মধ্যে ছিল এমনি নাকি আরও অনেক মিল।

সতী'-মার মৃত্যুর পর দোল পূর্ণিমায় মেলা হচ্ছে তাও বহু বছর হলো। এই সতীমার মেলায় নাকি রামকৃষ্ণদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেরী সাহেব, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অনেকেই গিয়েছিলেন। নবীন সেনের আত্মজীবনীতেও মেলার গণ-ভরের বিবরণ মেলে—

"আমি দেখিয়াছি যে শতশত নরনারী 'সতীমাঈ'-র সমাধি সমীপস্থ 'দাডিম্বতলায়' বৈষ্ণবদের মত দশাপ্রাপ্তা হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় দিনরাত্রি ধরণা দিয়া পড়িয়া থাকে, কেহ বা অপদেবতাশ্রিত লোকের মত মাথা ঘুরাইতেছে ও কেহ উন্মাদের মত নৃত্য করিতেছে।"

এখনও একই জিনিস চলছে। অনেক ভক্তরাই হিমসাগরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে দণ্ডী খেটে ডালিম তলা ঘুরে আবার হিমসাগরে যায়। ডালিমতলার মাটি আর হিমসাগরের জল এখনও বহু বিশ্বাসীই পরম ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন। অনেকে মানত করে ডালিমতলায় বর্তমানে যে ডালিম গাছ আছে তাতে ঢিল বেঁধে যায়। মনস্কামনা পূর্ণ হলে অনেকেই ডালিমতলায় সতীমাকে শাড়ি চড়ায়। মেলায় তিন দিনে শ'পাঁচেক শাড়ি তো চড়েই। 'গদি'-তে আসীন 'বাবুমশায়'-কে ভক্তরা প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে তাঁদের সমস্যার কথা জানান। ভক্তেরা বিশ্বাস করেন, গদি'-তে বসার অধিকারী বাবুমশায় সতীমার কৃপায় সে-সময় বাক্‌-সিদ্ধ হন। বাবুমশায় অনেককেই বলেন, "যা তোর সেরে যাবে," কারও হাতে তুলে দেন ফুল, কাউকে আদেশ দেন ডালিমতলার মাটি নিয়ে যেতে, যাকে যেমন ইচ্ছে হয় তেমনই আদেশ করেন। প্রণামী পড়ে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।

মেলায় ভর দেখার মত ব্যাপার। কয়েক'শ মহিলা পুরুষ ভরে আক্রান্ত হন। তাদের মাথা প্রচণ্ডভাবে দুলতে থাকে, কেউ মাটিতে সশব্দে মাথা ঠুকতে থাকেন, কেউ ছেঁড়েন চুল। হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষগুলো এক সময় ঝিমিয়ে মাটিতে লুটিয়ে

পড়েন। 'গদি'-র 'বাবুমশায়' ভরে ঝিমিয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলোর হাতে ফুল ধরিয়ে দিতেই তাঁদের ভর কেটে যায়, উঠে পড়েন। গত পনের বছর ধরে গদিতে আসিন অজিতকুমার কুণ্ডুই এই দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন।

হাড়োয়ার উমা সতীমার মন্দিরে গণ-ভর

উত্তর ২৪-পরগনার হাড়োয়াতে জন্মাষ্টমীর দিন উমা সতীমার মন্দিরে কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয়। উমা বিশ্বাস সতীমা হিসেবেই পরিচিতা। ওখানেও গদিতে বসেন, 'বাবুমশায়' অজিতকুমার কুণ্ডু। ভক্তেরা রোগ ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বাবুমশায়ের কাছে প্রণামী নিয়ে মানত করে যান, বাবুমশায় নানাজনকে নানা রকমের ব্যবস্থাপত্র দেন।

এখানেও ৬০ থেকে ৮০ জনের ভর হয়। এই ভরও একান্তভাবেই গণ-হিস্টিরিয়া। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতই মাথা দোলানো, মাথা-ঠোকা, হাত-পা ছোঁড়া, সবই করেন এঁরা। শারীরিক তীব্র আক্ষেপের ফলে একসময় রোগীরা ঝিমিয়ে পড়েন। ঝিমিয়ে পড়ে থাকা রোগীদের হাতে বাবুমশায় অজিত কুণ্ডু ফুল গুঁজে দিতেই ভর কেটে যায়। রোগীরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।

যোগীপাড়ায় শ্রাবণী পূর্ণিমায় গণ-ভর

দমদমের যোগীপাড়ায় জীবনী দাসের মন্দির। জীবনী দাস কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। এখানে শ্রাবণী পূর্ণিমায় কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায়ের ভক্তরা আসেন। গানের মাঝে ভক্তদের অনেকেরই ভর হয়। প্রতি বছরই শ্রাবণী পূর্ণিমার উৎসবে ১৫ থেকে ২৫ জন ভরে পড়েন। এখানেও ভর থাকে মিনিট পঁয়তাল্লিশের মত। ভর একজনের শুরু হতেই তার দেখাদেখি অন্যরাও ভরে আক্রান্ত হয়। প্রত্যেকেই হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করেন, প্রচণ্ড বেগে মাথা ঘুরিয়ে দোলাতে থাকেন। যখন শরীর আর দেয় না, অবসন্ন হয়ে পড়েন তখন 'গদি'-র বাবুমশায় অজিত কুণ্ডু ভক্তদের হাতে ফুল ধরিয়ে দেন। ভক্তদের ভর কাটে।

সতী-মা মেলার 'গদি'-র বাবুমশায় যুক্তিবাদী হলেন

১৯ মার্চ '৯০-এর সন্ধ্যা। অজিতকুমার কুণ্ডু এলেন আমার ফ্ল্যাটে। কিছুটা অভাবনীয় ঘটনা, সন্দেহ নেই। আমিই সাধারণত অবতার– জ্যোতিষীদের কাছে যাই। তাঁদের আসাটা তুলনায় খুবই কম। অজিত কুণ্ডু হাসিখুশি মানুষ। চোখের দৃষ্টিতে যথেষ্ট বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। ফর্সা, মেদহীন লম্বা চেহারা। তীক্ষ্ণ নাক, কাঁচা-পাকা চুল, পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, যদিও বয়স সাতাত্তর কিন্তু চেহারা ও সপ্রতিভতা দেখে বয়সটা ষাটের বেশি কিছুতেই মনে হয় না।

আসার উদ্দেশ্যটা যখন জানালেন, তখন আরও কিছুটা বিস্মিত হলাম। অজিতবাবু

আমাদের সমিতির সদস্য হতে চাইলেন। অবশ্য অজিতবাবুই প্রথম ধর্মীয় নেতা নন, যিনি আমাদের সমিতির সদস্য হতে চাইলেন। এর আগে একাধিক জ্যোতিষী আমাদের সমিতির প্রচেষ্টায় বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্র আদৌ কোনও বিজ্ঞান নয়, লোক ঠকানোর ব্যবস্থামাত্র এবং তারপর জ্যোতিষ চর্চা বন্ধ করে আমাদের সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে মানুষ গড়ার কাজে ব্রতী হয়েছেন। একটি আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃ-স্থানীয় একাধিক ধর্মীয় নেতা আমাদের সদস্য হয়েছেন। তাঁরাই তথাকথিত ধর্মীয় সংস্থাটির অনেক নৈতিক অপরাধ, যৌন বিকৃতির খবর জানিয়েছিলেন। অতি উচ্চশিক্ষিত এই ধর্মীয় নেতারা প্রতিষ্ঠানটির নামে, ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুতিতে, মানব সেবার মধ্য দিয়ে মানবিকতার বিকাশ ইচ্ছাতে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মোহ ভঙ্গ হয়েছে। বুঝেছেন ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর অনুভূতি মানসিক ভারসাম্যহীনতা থেকে আসা অলীক দর্শন বা অলীক অনুভূতি মাত্র। আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় এমনই এক প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা জানিয়েছিলেন গ্রামাঞ্চলে ভূতে ভর দেখেছেন, আধুনিক মানসিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই সারিয়েছেন, কিন্তু সে বিষয়ে মুখ না খুলে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার দ্বারা ভূত তাড়িয়েছেন বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় নেতারা এ-ও জানিয়েছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন শাখায় তাঁদের উদ্যোগেই গোপনে পড়ানো হচ্ছে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি। জানিয়েছিলেন, অনেকেই আমাদের সমিতির হয়ে কাজ করতে উৎসাহী। অনেক সন্ন্যাসীই সরাসরি আমাদের হয়ে কুসংস্কার-বিরোধী কাজে সামিল হতে চান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে। আমাদের কাছে আলোচকরা একটি সমস্যার কথা বলেছিলেন, যেটা আমাদের ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা বাধার প্রাচীর তুলে রেখেছে। উচ্চ শিক্ষিত সন্ন্যাসীরা চেয়েছিলেন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে বহু সন্ন্যাসীরা তাঁদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। তবে, তার আগে আমাদের সমিতিকে সন্ন্যাসীদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

'৮৮-র ১১ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনেও আমরা এই প্রসঙ্গটি তুলে জানিয়েছিলাম, সরকারি সহযোগিতায়, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারলে আমরা সাংবাদিক সম্মেলনেই ওই সন্ন্যাসীদের হাজির করব।

সেদিন আর্থিক সঙ্গতি-শূন্য আমরা লড়াকু সন্ন্যাসীদের আরও কাছে আরও লড়াইতে নিয়ে আসতে পারিনি। আজ পর্যন্ত আমরা পারিনি তাঁদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিতে।

বাবু মশায় অজিতবাবুকে নিয়ে দ্বিধা ছিল অন্য রকম। তিনি কি বাস্তবিকই ওয়াকিবহাল তাঁর চিন্তাধারার বিপরীত শিবিরে আমাদের বাস। ধর্মগুরু সাজাটা যে মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে লোক ঠকানোরই নামান্তর মাত্র, এটাই তো তথ্য-প্রমাণ সহযোগে আমরা প্রমাণ করি।

অজিতবাবুকে সদস্য করতে আমাদের সমস্যা কোথায়, সবই খোলাখুলি জানালাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের একজন হওয়ার বিনিময়ে সতী মেলার গদীতে বসা বন্ধ রাখতে পারবেন?"

'অজিতবাবু জানালেন, "আমি কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আসিনি, আপনাদেব কাছ থেকে কিছু শিখে নিযে, সে-সব কাজে লাগিযে আবও বড অবতাব হযে বসব। আমাব এখানে আসাব কাবণ আপনাব 'অলৌকিক নয, লৌকিক' বইটি। আমি যখন গদীতে বসি, তখন আমি যেন কেমন একটা শক্তি পাই। কেউ যখন প্রণাম কবে উপায জানতে চায, আমাব তখন মনে হয সতীমাই যেন আমাব মুখ দিযে কথা বলিযে নিচ্ছেন। বছবেব পব বছব দেখে আসছি লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদেব মানত জানাতে আসছে। আবাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে প্রণাম জানিযে যাচ্ছে। আপনাব বইটা পডাব পব মনে হলো, আমি ছোটবেলা থেকেই সতীমা, তাঁব অলৌকিক বাক্-সিদ্ধ ক্ষমতা, সতী মেলায গদিব ক্ষমতা, এইসব শুনে শুনে এগুলোকে পবিপূর্ণভাবে বিশ্বাস কবেছিলাম। আমাব বিশ্বাস, আমাব প্রচণ্ড আবেগকে, লক্ষ লক্ষ মানুষেব ভক্তি, বাউল গান, সতীমাব জযধ্বনি এইসব মিলিযে অদ্ভুত একটা ভক্তিবসাশ্রিত পবিবেশ আবও বেশি প্রভাবিত কবত। তাবই ফলে গদিতে বসলেই আমি মানসিক ভাবসাম্য হাবিযে মনে কবতে থাকতাম আমাব মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হযেছে। আমাব কথাগুলো সতীমাবই নির্দেশ।

আপনাব বইটাব 'বিশ্বাসে অসুখ সাবে' অধ্যাযটা পডাব পব আমাব মনে হচ্ছে, যাবা সতীমাব মেলায এসে বোগ মুক্ত হচ্ছে, তাবা সতীমাব প্রতি বিশ্বাসে, আমাব কথায বিশ্বাস কবেই বোগ মুক্ত হচ্ছে। এবাব দোলেব মেলাব যাদেব ভব হযেছিল, তাদেব লক্ষ্য কবে আমাব মনে হযেছে আপনাব কথাই সত্যি। ওবা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড আবেগে, অন্ধবিশ্বাসে হিস্টিবিযা বোগেব শিকাব হযেছিল। একজনেব ভব দেখে আবেকজন, তাকে দেখে আবেক জন, এভাবেই জনে জনে স্রেফ হিস্টিবিযায আক্রান্ত হযে উন্মত্ততা দেখিযেছে, আব তাকেই সাধাবণ মানুষ মনে কবেছে সতীমাব কৃপাব ফল, স্থান মাহাত্ম্য ইত্যাদি। যখনই দেখেছি ভবে পাওযা মানুষগুলো উন্মত্ততা প্রকাশ কবতে কবতে ক্লান্ত হযে লুটিযে পডেছে তখনই ওদেব হাতে একটা কবে ফুল ধবিযে দিযেছি। যাবা এখানে আসে তাবা এও জানে আমি ফুল হাতে দিলে ভব কেটে যায। তাদেব এই অন্ধ-বিশ্বাসেব ফলেই ফুল হাতে পেতে ভব কেটেছে।

১৯ মার্চ '৯০ শেষ সন্ধ্যায বাবুমশায অজিতকুমাব কুণ্ডুকে যুক্তিবাদী অজিত কুণ্ডু কবে নিযেছি। লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে জানিযেছেন—আগামী বাব থেকে আব বাবুমশাযেব ভূমিকা নেবেন না। প্রত্যাশা বাখি, তিনি কথা বাখবেন।

আব একটি হিস্টিবিযা ভবেব দৃষ্টান্ত

এবাব যে ঘটনাব কথা বলছি সেটা ঘটেছিল তেলাডী গ্রামে। তেলাডী সাতগাছিযা বিধানসভাব অন্তর্গত একটি গ্রাম। খেটে খাওযা গবিববাই সংখ্যাধিক। শিক্ষিতেব হাব শতকবা কুডি ভাগ। গ্রামেব প্রভাবশালী মণ্ডল পবিবাবেব উদ্যোগে প্রতি বছব একবাব মহোৎসব হয। গ্রামে প্রতিটি বাডি থেকেই চাল, ডাল টাকা তোলা হয।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই মহোৎসবে যোগ দেয়।

বছর কয়েক আগে পূর্ণিমার পরের দিন মহোৎসবের অনুষ্ঠানে সহদেব পণ্ডিতের বউয়ের ভর হলো। বউটি উপোস করে ঘুরে ঘুরে মাগন মেগে (ঈশ্বরের নামে ভিক্ষা চাওয়া) এসে স্নান করে ভিজে কাপড়ে গণ্ডী কাটছিলেন। দু'তিনটে গণ্ডী কাটার পর উঠেই কেমন নাচতে লাগলেন। নেচে নেচে ঘুরতে ঘুরতে বলতে লাগলেন, "তোরা ঠিকমত আমার পুজো দিসনি। তোদের পুজোয় ত্রুটি রয়েছে।"

ধুলো-কাদা মাখা শাড়ি, খোলা লম্বা ধুলো মাখা ভেজা চুল, পাগলের মত দৃষ্টি, অনর্গল কথা শুনে উপস্থিত প্রায় সকলেই ধরে নিলেন—সহদেবের বউয়ের উপর ঠাকুরের ভর হয়েছে।

মহিলাটি পুজো মণ্ডপ ঘুরছেন আর নির্দেশ দিয়ে চলেছেন কী কী করতে হবে। ব্যবস্থাপকরা প্রত্যেকেই ওঁর কথাকেই ঠাকুরের নির্দেশ ধরে নিয়ে তা পালন করতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন। ঠাকুরের আদেশ অমান্য করার পরিণতির কথা ভেবে তাঁদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না।

আবার নতুন করে পুজোর আয়োজন চলতে লাগল। মহিলার আদেশে হরিনামের দল নামগান সর্বোচ্চসুর তুলে শুরু করলেন, খোলের উপর চাঁটিও পড়তে লাগল আরও জোরে। এমন এক অসাধারণ অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য যাঁরা দেখার সুযোগ পেলেন তাঁরা নিজের জীবন ধন্য মনে করে অনেকেই আনন্দে কেঁদে ফেললেন। ঝড়ের মত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহোৎসবের চারিপাশে শুধু মানুষ, আর মানুষ। অনেকেই ধারণা ব্যক্ত করলেন, "আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের দিয়ে কি আর আগের মত করে ভক্তি ভরে পুজো হয়? কেউরা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হাতটাও ভাল করে না ধুয়ে পুজোর আয়োজনে লেগে পড়ল। আরে পুজো কি তোদের ছেলেখেলা?"

এই ধরনের একটা মানসিকতা হয় তো মহিলাটিরও ছিল। হয় তো পরম ভক্ত মহিলাটির পুজোর আয়োজনের অনেক কিছুই মনে ধরেনি। বরং বিরক্তিতে মন ভরেছে। তারই ফলে এক সময় মেয়েটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন তার উপর দিয়েই বর্ষিত হচ্ছে ঈশ্বর নির্দেশ—বাস্তবে যা ছিল একান্তভাবে তাঁরই নির্দেশ।

চিন্তামণির ভর মানসিক অবসাদে

হিস্টিরিয়া ছাড়া ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ রোগীরাও অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তার প্রকাশ ঘটছে বলে বিশ্বাস করে অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা করতে থাকেন, যা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্ভব নয়। ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ রোগীরাও বেশির ভাগই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত এবং কুসংস্কারে ও ধর্মীয় বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। আক্রান্তদের বেশির ভাগই মহিলা এবং বিবাহিতা। পারিবারিক জীবনে এরা অনেক সময়ই অসুখী এবং দারিদ্রভাবে জর্জরিত। এবং তার দরুন মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত। বছর তিরিশ আগের ঘটনা। খড়গপুরের চিন্তামণি বাড়ি বাড়ি বাসন

মাজাব কাজ কবত। যখনকাব ঘটনা বলছি তখন চিন্তামণি তিনটি ছেলেমেযেব মা। স্বামী বেল ওযাগন ভেঙে মাঝে-মধ্যে যা বোজগাব কবে তাব সিংহভাগই নেশাব পিছনে শেষ কবে দেয। মাঝে-মধ্যে নানা কাবণে জেলে ঘুবে আসতে হয। চিন্তামণিব শ্বশুব-শাশুডি স্বামীব উচ্ছৃঙ্খলতাব জন্য চিন্তামণিকেই দোষ দেয। স্বামী মাঝে-মধ্যে নেশাব টাকাব জন্য চিন্তামণিকে প্রচণ্ড প্রহাব কবে। এক সময স্বামী কযেক মাস জেলেব লপ্‌সি খেযে ফিবে এসে চিন্তামণিব চবিত্র নিযে সন্দেহ প্রকাশ কবে কযেকটা দিন ওব ওপব শাবীবিক ও মানসিকভাবে অকথ্য অত্যাচাব চালাল। একদিন বাতে হঠাৎ স্বামীব তর্জন-গর্জন শুরু হতেই চিন্তামণি ততোধিক গর্জন কবে তাব স্বামীকে আদেশ কবল, সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম কবতে। আদেশ শুনে স্বামী তাকে প্রহাব কবতে যেতেই চিন্তামণি পাগলেব মত মাথা দোলাতে দোলাতে দিগম্ববী হযে স্বামীব দুগালে প্রচণ্ড কযেকটি চড কষিযে বলল, 'জানিস আমি কে? আমি শ্মা-কালী।'

চিন্তামণিব এই ম্যানিযাক ডিপ্রেসিভ বোগ অনেকেব চোখেই ছিল নেহাতই ঈশ্ববেব লীলা। জনৈক বেলওযে হাসপাতালেব চিকিৎসক চিন্তামণিব স্বামীকে বলেছিলেন, অসুস্থ চিন্তামণিব চিকিৎসা কবাতে। বুঝিযেছিলেন এটা একটা পাগলামো ছাড়া আব কিছু নয। কিন্তু চিন্তামণিব স্বামী, শ্বশুব-শাশুডি কেউই চিকিৎসকেব সাহায্য নিতে বাজি হযনি। বাজি না হওযাব একটা অর্থনৈতিক কাবণও বোধহয ছিল। ভক্তদেব কাছ থেকে বোজগাবপাতি খুব একটা কম হচ্ছিল না। স্কিজোফ্রিনিযা বোগীদেব মধ্যে

স্কিজোফ্রিনিযা বোগীদেব মধ্যে ভব জিনিসটা অনেক সময দেখা দেয। স্কিজোফ্রিনিযা বোগীবা অতি আবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণীব হোন না কেন। এই আবেগপ্রবণ মনে ঈশ্বব বিশ্বাস অনেক সময এমনই প্রভাব ফেলে যে বোগী মনে কবতে থাকেন ঈশ্বব বোধহয তাঁব সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁব সামনে দাঁডিযে আছেন। স্কিজোফ্রিনিযা এই ধবনেব ভুল দেখায বা ভুল শোনায। এই ভুল থেকেই তাঁবা নিজেব সত্তাব মধ্যে ঈশ্ববেব সত্তাকে অনুভব কবে।

আমাদেব দেশে ভবে পাওযা বোগীব চেযে ভবেব অভিনয কবা অবতাবদেব সংখ্যা অনেক বেশি। এইসব অবতাব মাতাজী বাবাজীদেব বেশিব ভাগই হিস্টিবিযা, ম্যানিযাক ডিপ্রেসিভ বা স্কিজোফ্রেনিযা বোগেব শিকাব নয। এবা মানুষেব অজ্ঞতাব ও দুর্বলতাব সুযোগ নিযে পকেট কাটে। সোজা কথায এবা বোগী নয, এবা অপবাধী প্রতাবক।

মা মনসাব ভব

দমদম জংশনেব কাছে নিমাই হাজবাব বাডিতে মনসাব থান। সেখানে ফি হপ্তাব মঙ্গলবাব নিমাইযেব বিবাহিতা বোন লক্ষ্মী মযবাব ভব হয। ভব কবেন মা মনসা। ভিড নেই-নেই কবেও কম হয না। ৭০ থেকে ১০০ ভক্তকে নানা সমস্যাব বিধান দেন মা মনসা। ভব দুপুবে ভব লাগে। শেষ ভক্তটি বিদায নিতে ঘণ্টা তিনেক সময কেটে যায।

আমাদেবই এক প্রতিবেশীব কাছে শুনেছিলাম লক্ষ্মীব অতিপ্রাকৃতিক সব ক্ষমতাব

কথা। তিনি বললেন, লক্ষ্মীকে দেখার আগে বিশ্বাসই করতেন না, ঈশ্বর সর্বত্রগামী, তাঁর অজ্ঞাত কিছুই নেই। তবে লক্ষ্মী এমন সব কথা বলেছে, যেগুলো সর্বত্রগামী ঈশ্বর ছাড়া কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। শুনলাম প্রতিবেশী স্বপ্নাদেশে মা মনসার ঘট পেতেছেন। ২৪ মার্চ'৯০-এ লক্ষ্মীমা ওঁর বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। দুপুরে গেলাম। লক্ষ্মীমা তখনও ভরে বসেননি। আলাপ করিয়ে দিলেন প্রতিবেশী। পাতলা, শ্যামা তরুণী। একমাথা রব্ রুবা চুলে আজ তেল ছোঁয়ানো হয়নি। ডাগর দুটি চোখ। কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম ফুলঝুড়িতে আগুন দিয়েছি। অনেক অনেক অলৌকিক ঘটনার কাহিনী শোনালেন। শুনলাম, স্বামী রিক্সা চালান। পুজোর সঙ্গী হিসেবে ভাই দেবাশিসও এসেছিলেন। বি কম পাশ। টিউশনি করে সামান্য রোজগার। লিখি শুনে তিনিও আমাকে শোনাতে লাগলেন দিদি ও মনসাকে ঘিরে অদ্ভুত সব ঘটনার বিবরণ। লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা মনসাকে দেখছেন?"

লক্ষ্মীর জড়তাহীন উত্তর, "বহুবার।"

আমি কেমনভাবে দেখেছেন, একেবারে স্পষ্ট?

লক্ষ্মী · "নিশ্চয়।"

আমি 'দেখতে কেমন?'

লক্ষ্মী দারুণ সুন্দরী। এক মাথা চুল প্রায় পায়ের হাঁটু ছুঁয়েছে।'

আমি 'গায়ের রঙ কেমন?'

লক্ষ্মী একটু শ্যামা, এই কিছুটা আমার মত, তবে এত সুন্দরী যে বলার নয়।'

আমি 'ফিগার কেমন? দেখলে বয়স কেমন মনে হয়?'

লক্ষ্মী 'একেবারে সিনেমার হিরোইনের মত। দেখলে মনে করবেন সদ্য যুবতী। উনি যখনই আসেন, তখন অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ সারা বাড়ি ছড়িয়ে থাকে।'

প্রতিবেশীর উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রী জানালেন, তিনিও মায়ের শরীরের অদ্ভুত গন্ধ পেয়েছেন।

এক সময় পুজো শুরু হলো। পুজোয় সময় লাগে খুবই কম। ইতিমধ্যে বহু ভক্ত মানুষই হাজির করলেন পেন, ডটপেন। এগুলো দিয়ে লিখলে নাকি কৃতকার্য অনিবার্য, দেবাশিস জানালেন।

তৃতীয় ও শেষবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়েই লক্ষ্মীমা শরীরে বার কয়েক দুলুনি দিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়লেন মেঝেতে। তারপর কাটা মুরগীর মত ছটফট করতে লাগলেন, সঙ্গে দুহাতে চুল ধরে টানাটানি।

শিক্ষিত-শিক্ষিতা ভক্তেরা লক্ষ্মীমাকে না ছুঁয়েই গদগদ ভক্তিতে প্রণাম জানাতে শুরু করলেন। কাঁসার ঘণ্টা, শাঁখ উলু বেজে চলল, সেই সঙ্গে ভক্তরা জোড় হাত করে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, 'মা তুমি শান্ত হও মা, মা তুমি শান্ত হও।'

মা এক সময় শান্ত হলেন। উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন। গৃহকর্ত্রী পরম ভক্তিভরে মাকে নানা সমস্যার কথা বলছিলেন। উত্তরণের উপায় হিসেবে মা মনসা ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছিলেন, কখনও পুজোর ফুল ছুঁড়ে দিয়ে সঙ্গে রাখতে বললেন, কখনও দিলেন ঘটের জল পানের বিধান, কখনও বা অদেখা মানুষটির রোগ মুক্ত করতে বিরহরি মা মনসা হঠাৎ হঠাৎ মাথা তুলে বড় বড় পাগল পাগল চোখে তাকিয়ে তিন বার ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে

দিলেন।

এক সময় আমাকে প্রশ্ন করতে বললেন গৃহকর্ত্রী। মা মনসার পাশে বসলাম। আমার সম্বন্ধে লক্ষ্মীমা এবং দেবাশিস কেউই বোধহয় কিছু জানতেন না। হাতে গ্রহরত্নের রূপোয় বাঁধান আংটি গলায় ঝোলান একটা তাবিজ দেখে সন্দেহের উর্দ্ধেই রেখেছিলেন। এটা-সেটা জিজ্ঞেস করার পর বললাম, "আমার ছোট বোনের গলায় ক্যানসার ধরা পড়েছে। চিকিৎসা চলছে। ভাল হবে মা?"

বহু ভক্ত কলরোল তুললেন, "বোনের নাম বলুন।"

বললাম, "রঞ্জিতা রুদ্র।'

মা মনসা বললেন, "ভাল হবে না। এই বৈশাখের আগেই মারা যাবে।"

আরও কিছু কথা-বার্তার পর ফিরে এসেছিলাম।

সে-রাতেই প্রতিবেশী আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। আমার বোনের ক্যানসারের কথা লক্ষ্মীমা কেমন অদ্ভুত রকম বলে দিলেন, সেই প্রসঙ্গ প্রতিবেশী উত্থাপন করতে জানালাম, "বোন রঞ্জিতা বহাল তবিয়তেই আছে ক্যানসার তো হয়নি। বৈশাখে গিয়ে দেখেও আসতে পারেন। এতদিন মা লক্ষ্মীর কথা শুধু শুনেছিলাম। ওর ভরের মহিমা পরীক্ষা করতেই মিথ্যে বলেছিলাম। আপনারা শিক্ষিত হয়েও এত আবেগতাড়িত হয়ে ঠকতে চান -কেন বলুন তো?"

জানি না আমার কথাগুলো উনি কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

মীরা সাঁই

মহারাষ্ট্রের কোকন জেলায় মীরার আদি নিবাস। আঠারটি বসন্ত অতিক্রম করার আগেই মীরা ভালোবেসে বিয়ে করেন মেহেমুদকে। মেহেমুদ যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন, তখন মীরা ছ-মেয়ের মা। মীরা এই সময় সিরডী'র সাঁই-এর ভক্ত হয়ে ওঠেন। সাঁই ভক্তদের সঙ্গে গড়ে ওঠে পরিচয় ও সম্পর্ক। সাঁই ভক্তদের সামনেই একদিন মীরার ভর হয়। ভরে মীরা জানান, তিনি সিরডীর সাঁই। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই মীরার ওপর সাঁইয়ের ভর হতে থাকে। দ্রুত ভক্ত সমাগমও বাড়তে থাকে। ভক্তরাই মীরার নতুন নাম রাখেন মীরা সাঁই, মীরা ভক্তদের পান করতে দিতেন মন্ত্রপড়া পবিত্র জল। মীরা বেশ কয়েকবার ভক্তসহ পদযাত্রায় তীর্থভ্রমণ করলেন, মীরা সাঁইয়ের খ্যাতি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, একটি সেবা সংস্থা তাঁকে দিল দু-একর জমি ও একটি বাংলো।

এই সময় মীরা বিয়ে করেন চন্দ্রকান্তকে। চন্দ্রকান্ত মীরা সাঁইয়ের নামে করে দিলেন তাঁর নাসিকের কারখানা। চন্দ্রকান্ত ও মীরার নতুন আবাস হয় ৫৫ আরামনগর কাকেরী কমপ্লেক্সে। মীরার ভর ও ভক্ত সমাগম বাড়তেই থাকে।

এই সময় নরেশ মাগনামী ডি এম নগর থানায় এফ আই আর করেন, মীরা সাঁই তাঁর স্ত্রী পুনমকে প্রতারণা করে আড়াই লক্ষ টাকার গয়না আত্মসাৎ করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে থানা একটি মামলা রুজু করে। পুলিশ কেসের তদন্তের দায়িত্ব এসে পড়ে সাব-ইন্সপেক্টর রাজা সন্তের উপর। সন্তের নেতৃত্বে পুলিশ প্রথমেই মীরা সাঁইয়ের

কাকোবী কমপ্লেক্সেব বাড়িতে হানা দেন। বাড়িতে মীবা ছিলেন না, ছিলেন তাঁব দুই মেয়ে। বাড়ি সার্চ কবাব সময ঠাকুব ঘরে একটি মাঝাবী আকাবেব তালাবন্ধ বাক্স দেখতে পান। মেযেবা জানান, বাক্সেব চাবি মাযেব কাছে আছে। মা আছেন সিবডীব কোপব গাঁও-এব বাড়িতে। স্থানীয বাসিন্দাদেব সামনে তালা ভাঙা হয। বাক্সে ছিল দু'লক্ষ টাকাব মত গযনা। বাক্সে একটি কাগজে 'উষা' লেখা ছিল, তলায ঠিকানা।

বাক্স নিযে পুলিশ বাহিনী থানায ফেবে। কাগজেব ঠিকানায পুলিশ পাঠান হয। পুলিশ সেখানে উষা নামেব এক বিবাহিত মহিলাব খোঁজ পেযে তাঁকে থানায আনেন।

থানায জেবাব জবাবে তিনি জানান, আমাব স্বামী মদ ও জুযায আসক্ত হযে পড়েন। স্বভাবতই তাঁব খবচেব বহবও দিন দিন বেড়েই চলেছিল। আমি মীবা সাঁই-এব কথা শুনে তাঁব কাছে হাজিব হই এবং তার উপব সাঁইযেব ভব দেখে বাস্তবিকই ভক্তি আপ্লুত হযে পড়েছিলাম। আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধাব কবতে মীবা সাঁইযেব শবণাপন্ন হই। মীবা সাঁই আমাদেব গযনাগুলো আমাব স্বামীব হাত থেকে বাঁচাতে সেগুলো তাঁব কাছে বাখতে বলেন। কিন্তু পববর্তীকালে বিভিন্ন সমযে মীবা সাঁইযেব কাছে গযনাগুলো ফেবত চাইলে তিনি প্রতিবাবই নানা বাহানা বানিযে আমাকে ঘুবিযেছেন। আজ পর্যন্ত সে গযনা আব ফিবিযে দেননি, ফিবে পাব এ আশাও ছেড়েছি।

থানায় কেন অভিযোগ কবেননি, গযনাব মূল্য কত হবে বলে উষার ধাবণা, ইত্যাদি প্রশ্নেব উত্তবে উষা জানান, তাঁব হাতে লিখিত কোনও প্রমাণ না থাকায তিনি মীবা সাঁইযেব মত প্রচণ্ড প্রভাবশালিনী মহিলাব বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে গিযে আবও বেশি বিপদে জড়িযে পড়তে চাননি। গযনাব আনুমানিক মূল্য ছিল দু থেকে আড়াই লাখ টাকা। কিছু কিছু গযনাব খুঁটিনাটি বিববণও উষা দেন। বিববণ মিলে যাওযায উষাকে বাক্সেব গযনাগুলো দেখান হয। তিনি জানান এগুলোই মীবা সাঁইযেব হাতে তুলে দিযেছিলেন।

মীবা সাঁইযেব দুই মেযেকে থানায এনে জিজ্ঞাসাবাদ কবা হতে থাকে। পুলিশবাহিনী সেদিনই বওনা হন কোপ গাঁও-এ। ভোব বাতে মীবা সাঁইকে গ্রেপ্তাব কবা হয। থানায নিযে এলে মীবা সাঁই জেবাব উত্তবে কোনও কথা বলতে অস্বীকাব কবেন। ১০ জানুযাবি '৮৬ পুলিশ মীবা সাঁইকে আন্ধেবীব মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে হাজিব কবেন, এবং ১৪ দিন পবে তাঁকে আবাব পুলিশ হাজতে ফিবিযে আনা হয। দু-দিনেব একটানা জেবায মীবা সাঁই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন এবং তাঁব অপবাধ স্বীকাব কবে জানান পুনমেব আত্মসাৎ কবা গযনা বযেছে তাঁব মেযে জামাই ফতিমা ও বুল্লু শেখেব কাছে। পুলিশ ফতিমা ও বুল্লুব হেফাজত থেকে পুনমেব গযনা উদ্ধাব কবেন।

তাবা মা-ব ভব

২২/১, বফি আহমেদ কিদওযাই বোড়ে তাবা কুটিবে প্রতি শনি, মঙ্গলবাব অসংখ্য

মানুষের ভিড় হয়। ভক্তেরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। কেউ তারা মাকে প্রণাম জানাতে ছুটে আসেন। কেউ আসেন সমস্যার সমাধানের আশায়।এখানে শনি-মঙ্গলে বিজলী চক্রবর্তীর ওপর মা তারার ভর হয়, অর্থাৎ সহজ-সরল অর্থে ঈশ্বর তারা মা ভক্তদের আর্জি মত প্রশ্নের উত্তর, সমাধানের উপায় বাৎলান মিডিয়াম বিজলী চক্রবর্তীর মাধ্যমে।

৩০-৩৫ বছর আগে স্বপ্নে তারা মূর্তি দেখেন বিজলী। এই সময় থেকে ভরের শুরু। প্রথম ভরের সময় পাড়ার ছেলেরাই ডাক্তার ডেকে আনেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে অবাক হন। সব কিছুই স্বাভাবিক। বিজলী দেবীর দাবি মত ডাক্তার রোগ সারাতে তাঁর অক্ষমতা জানান। কোনও ওষুধ প্রেসক্রাইব না করেই বিদায় নেন। এর কিছুদিন পর দ্বিতীয় ভর সন্ধ্যের সময় তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়ে, সেই সময় মা তারা নাকি বিজলীর মুখ দিয়ে জানান তাঁর ঘট-স্থাপন করে পুজো দিতে। তারপর থেকে ঘট-স্থাপন ও পুজো। মন্দিরে মায়ের যে মূর্তিটি আছে বিজলীর ভগ্নিপতিই তা তৈরি করান স্বপ্নে দেখা মূর্তির অনুকরণে।

বিজলী তারা মা নামেই বেশি পরিচিতা। তিনি যে সব ওষুধ দেন বা যাঁদের ঝেড়ে দেন, তাঁদের অনেকেই নাকি রোগমুক্ত হয়েছেন। তারামার কথায় দৈব ওষুধ-টষুদের আমি কিছুই জানি না। আমার অলৌকিক কোনও ক্ষমতাই নেই। যা করেন, যা ক্ষমতা সবই মা তারার।

অসুখ-বিসুখে অনেকে ঝাড়াতে যান। ভরে তারা মা ঝেড়েও দেন। কয়েক বছর আগে আমি তাঁরই এক ভক্ত শিষ্যের সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলাম। অতি স্পষ্টভাবেই জেনে ফিরেছিলাম, 'তারা মা'র সত্যি-মিথ্যা বোঝার সামান্যতম ক্ষমতাও নেই।

দুপুর থেকে সন্ধে তারাপীঠ ছেড়ে 'মা' নেমে আসেন নমিতা মাকাল-এর শরীরে

নাওভাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে শান্তিনগর ইস্টার্ন বাইপাসে ভাঙরের একটি অতি সাধারণ ঘরে থাকেন নমিতা মাকাল। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় ছবি সহ তাঁকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় সময় ভালই যাচ্ছে। ভক্তেরা প্রণামী দিচ্ছেন টাকা-পয়সা, শাড়ি, কাপড়, এটা-ওটা। শহরতলীর এই এলাকাটি কিছুদিন আগেও ছিল হতশ্রী। এখন কিছুটা রং ফিরেছে।

নমিতার বয়স বছর তিরিশ। বিয়ে বছর পনের আগে। স্বামী ও দুই ছেলে নিয়ে সংসার। দ্বিতীয় সন্তান হবার এক বছর বাদে বাড়িতে প্রথম কালীপুজো হলো নমিতারই একান্ত আগ্রহে। মূর্তি বিসর্জনের সময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। নমিতার দাবি—কেউই মায়ের মূর্তি তুলতে পারেনি। সকলে বললেন, মা যখন যেতে চান না, এখানেই থাকুন। সেই থেকে এখানেই মা আছেন। মায়ের মন্দিরও তৈরি হয়েছে বছর ছয়েক হলো।

কালীপুজোর মাস দুয়েক পরের ঘটনা। বাড়িতে জন্ম অশৌচ চলছিল। সেদিনটি ছিল মঙ্গলবার। নমিতার বোন এসেছেন বাড়িতে। তাঁকেই ঠাকুরের কাছে সন্ধ্যাদীপ

দিতে পাঠান নমিতা। বোন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ফিরে আসেন। বললেন, ঘরে কে যেন আছেন মনে হলো, সারা শরীরের লোম আমার খাড়া হয়ে উঠল সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে। আমি প্রদীপ জ্বালতে পারব না। অশৌচ থাকা সত্ত্বেও নমিতাই গেলেন। প্রদীপ জ্বালতেই কি যে হয়েছিল, নমিতার জানা নেই। পরে তিনি বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীদের কাছে শুনলেন, মা তারা তাঁর ওপর ভর করেছিলেন। ভরে জানিয়েছেন, প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার আসবেন।

আগে ভর হতো সন্ধ্যের সময়। এখন হয় দুপুরে। এই বিষয়ে নমিতার বক্তব্য—সন্ধ্যের সময় তারাপীঠে মায়ের সন্ধ্যারতি হয়, তাই দুপুর ১টা ১৫ থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত মা তারা আসেন নমিতার শরীরে।

নমিতার কথা শুনে একটা নতুন তথ্য জানতে পারলাম, তারা মা ঈশ্বর হলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে একই সঙ্গে একাধিক স্থানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। নমিতার দাবি, ভরের সময় যে কেউ যে কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে মায়ের কৃপা হলে সমস্যার সমাধানের পথও তিনি করে দেন। যাঁরাই বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন, তাঁরাই ফল



নমিতা মাকাল

পেয়েছেন, ডাক্তার না ডেকেও শুধুমাত্র মায়ের দয়ায় জীবন পেয়েছে এমন অনেক উদাহরণও আছে।

নমিতা মাকালকে বলেছিলাম, "আপনার কথা শুনে বুঝতেই পারছি মা শনি-মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যে থাকেন আপনার কাছে, রাতে তারাপীঠে। এবং রাতে তারাপীঠে থাকেন বলেই আপনার কাছে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ দেখুন, বেলেঘাটা থেকে এক ভদ্রলোক জ্যোতি মুখোপাধ্যায় আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন—শনি-মঙ্গলবার দুপুর ১ টা ১৫ থেকে ৬টা পর্যন্ত মা তারা তাঁর কাছেই থাকেন, এবং তিনি নাকি তাঁর এই কথার স্বপক্ষে প্রমাণও দেবেন। আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, আপনি স্রেফ টাকা রোজগারের ধান্দায় লোক ঠকাতে ভরের গপ্পো ফেঁদেছেন। জ্যোতিবাবু আরও জানিয়েছেন, আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে তিনি প্রমাণ করে দেবেন আপনি একজন প্রতারক। জ্যোতিবাবু এই বক্তব্য জানিয়েই আপনার বিষয়ে যে পত্রিকা প্রচার করেছে, তাদের কাছেও একটি চিঠি দিয়েছেন। আমি একটি বিজ্ঞান সংস্থার সম্পাদক, জ্যোতিবাবু চান, আমি আপনাদের দুজনের দাবির বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে জানাই কার দাবি যথার্থ। আপনি কি আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা করবেন ?"

নমিতা'র সহজ-সরল বক্তব্য, "আ মোলো যা, ওই লোকটার কুঠ হবে, কুঠ হবে গো! ভাত দেওয়ার মুরদ নেই কিল মারার গোঁসাই!"

না, নমিতা আমাদের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করতে রাজি হন না। এবার একটা গোপন খবর ফাঁস করছি, জ্যোতি মুখোপাধ্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে, ঘুমে-নিঘুমে যুক্তিবাদী, আমাদের সমিতির অতি সক্রিয় এক আটান্ন বছরের কিশোর, চ্যালেঞ্জটা রেখেছিলেন নমিতা মাকালকে 'মাকাল' প্রমাণ করতে।

একই অঙ্গে সোম-শুক্কুর 'বাবা' ও 'মা'য়ের ভর

নদীয়া জেলার মদনপুর স্টেশনে নেমে সগুণা গ্রাম, সে গ্রামের গৌরী মণ্ডলের ওপর ভোলাবাবা ও সন্তোষী মা'র অপার কৃপা। সোম-শুক্কুর পালা করে তাঁরা গৌরীর ওপর ভর করেন। গৌরী আঠাশ-তিরিশের সুঠাম যুবতী। ভরে পড়লে নাকি যে কোনও প্রশ্নের নিখুঁৎ উত্তর দেন। বাৎলে দেন নানা সমস্যার সমাধানের উপায়। হপ্তার ওই দুটি দিন গৌরী মা'র থানে রেজায় ভিড় হয় বলে লাইন ঠিক রাখতে স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকারা দর্শনার্থীদের নম্বর লেখা টিকিট ধরিয়ে দেয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির মদনপুর শাখার দুই সদস্য অসীম হালদার এবং সুবীর রায় শাখা সম্পাদক চিররঞ্জন পালের কথা মত হাজির হলেন গৌরী মা'র থানে। গৌরী মা'র ছোট বোন সন্ধ্যা অসীম ও সুবীরের হাতে নম্বর লেখা টিকিট ধরিয়ে দিলেন। বাঁশের বেড়ার দেওয়াল ও টালির ছাদের নিচে বসেন গৌরী মা। ধীরে ধীরে লাইন এগোচ্ছিল। সুবীরের ঢোকার সুযোগ যখন এলো, পিছনে তখনও বিরাট লাইন। এক স্বেচ্ছাসেবিকা জানালেন, জুতো খুলে পা ধুয়ে ঢুকুন। ভিতরে ঢুকতেই আবার

স্বেচ্ছাসেবিকা। তিনি বললেন, "ষোল আনা দক্ষিণা নামিয়ে রেখে প্রণাম করে বলুন—বাবা আমি এসেছি।"

আজ সোমবার ২০ অক্টোবর '৯০। অতএব বাবার ভর লেগেছে গৌরীর ওপর। সুবীর পরম ভক্তের মতই নির্দেশ পালন করলেন। চোখ বোলালেন ঘরের চারপাশে। একটা বড় সিংহাসনে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি। কিন্তু যে বস্তুটি বিশেষ করে নজর কাড়লো, সে হলো একটা বিশাল উই ঢিবি। ঢিবিটা কিসের প্রতীক কে জানে? তবে নজর টানে।

গৌরী মা, একটু ভুল হলো, আজ তিনি বাবা, সামনে পিছনে দোল খাচ্ছিলেন। খোলা ছড়ানো চুলগুলো একবার নেমে আসছিল সামনের দিকে, ঢেকে যাচ্ছিল মুখ। আর একবার চলে যাচ্ছিল পিছনে। 'বাবা'র পাশে বসে এক প্রৌঢ়া।

প্রৌঢ়া বললেন, "বাবা প্রশ্ন করলে উত্তর দিও। উত্তর দিলে সায় দিও।"

সুবীর মাথা নাড়ালেন। বাবা মাথা নাড়তে নাড়তেই জিজ্ঞেস করলেন, "কার জন্যে এসেছিস?"

"আমার আর দাদার জন্যে।"

"তোর মন স্থির নেই। কোনও কাজে মন দিতে পারিস না। নানা দিক থেকে বাধা বিপত্তি হাজির হচ্ছে। তোর কাজ হতে দিচ্ছে না।"

সুবীর প্রৌঢ়ার নির্দেশমত প্রতি কথায় সায় দিয়ে 'হ্যাঁ' বলে যেতে লাগলেন। 'বাবা' সামান্য সময়ের জন্য কথা বলা থামালেন। তারপর বললেন, "তোর সমস্যা মিটিয়ে দেবো, খুশি করে দেবো। তুইও আমাকে খুশি করবি তো?"

—"নিশ্চয়ই করব বাবা।"

—"তুচ্ছ করবি না তো?"

—"না, না।"

—"আমার আদেশ মানবি?"

—"নিশ্চয়ই মানব।"

—"আগামী সোমবার একটা জবা ফুল আর একটা বোতাল নিয়ে আসিস। ফুলটা পড়ে দেব। ওটাকে রোজ সন্ধ্যায় ধূপ আর বাতি দিবি, ভক্তি ভরে পুজো করবি। কাউকে নোংরা কাপড়ে ছুঁতে দিবি না। ঘটে জল পড়ে দেব। রোজ সন্ধ্যায় ফুল পুজো সেরে একটু করে খাবি। যা এবার।"

—"কিন্তু বাবা, আমার আসল সমস্যার কথাই তো কিছু বললেন না।"

—"সেটা আবার কী?"

—"পেটে প্রায়ই ব্যথা হয়"

—"সুবীরের কথা শেষ হবার আগেই স্বর্গ থেকে গৌরীতে নেমে আসা ভোলাবাবা বলতে শুরু করলেন, "তোর অম্বলের রোগ আছে। গলা বুক জ্বালা করে, প্যাটে ব্যথা হয়, খিচ ধরে। যখন ব্যথা ওঠে সহ্য করতে পারিস না।"'

সায় দেন সুবীর—"হ্যাঁ। কিন্তু কী করলে সারবে?"

—"আরে জল পড়াটা সে জন্যেই তো দিয়েছি। অসুখ তো তোর আসল সমস্যা নয়, আসল সমস্যা তোর মন নিয়ে, কাজে বাধা নিয়ে। যা, এবার আয়।"

—"আমার দাদার বিষয়ে কিছু বললেন না ?"

—"তোর দাদার বুকে যন্ত্রণা হয়, গা-হাত-পায়ে ব্যথা, বুক জ্বালা করে, প্যাটে ব্যথা হয়। তোর দাদাও ফুল পুজো করবে, ধূপ আর বাতি জ্বেলে। পুজো সেরে জল পড়া খাবে।"

—"কিন্তু দাদাকে ফুল-জল দেব কেমন করে ?"

—"কেন, বাড়ি এলে দিবি ?"

—"ওখানেই তো সমস্যা। দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কেমন আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কিছুই জানি না।"

—"চিন্তা করিস না। ওই ফুলের অপার ক্ষমতা। ফুলই তোর দাদাকে এনে দেবে।"

—"কবে ?'

—"তাড়াতাড়ি।"

—"তাড়াতাড়ি মানে দু মাসও হতে পারে, আবার দশ বছরও হতে পারে ? ঠিক কবে নাগাদ আসবে ?"

—"ছ'মাস থেকে এক বছরের মধ্যে।"

সুবীর বেরিয়ে আসতেই গৌরীর বোন সন্ধ্যা বললেন, "আপনি আমাকে আগে বলবেন তো—দাদা নিখোঁজ। সমস্ত উত্তর পাইয়ে দিতাম। মনে হয় ওকে কেউ ওষুধ করেছে।"

ইতিমধ্যে আরও কিছু ভক্ত ঘিরে ধরলো। তাদের অনেক প্রশ্ন—"আপনার দাদা বুঝি নিখোঁজ ?" "বাবা বলে দিয়েছেন কবে আপনার দাদা ফিরবে ?" "মনে হয় আপনাদের বাড়িতে কেউ ওষুধ পুঁতেছে।"

সন্ধ্যা ভক্তদের বোঝাতে লাগলেন, "বাবার কাছে অজানা তো কিছু নেই, তাই ওঁকে দাদা নিখোঁজ হওয়ার কথা বলে দিয়েছেন। কবে ফিরবে, তাও। তবে নিয়ম পালন করতে হবে নিষ্ঠার সঙ্গে।"

সন্ধ্যার কথায় আরো অনেক ভক্ত উৎসাহী হলেন। এঁদের অনেকেই হয় তো গৌরী-সন্ধ্যাদের এজেন্ট, কেউ বে-ফাঁস কিছু বলে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করলে নেবার জন্য মজুত রয়েছেন। সুবীর তাই ওখানেই সোচ্চার হতে পারলেন না—নিজের পেটে ব্যথার গপ্পোটা বাবা-মা'র ভরের পরীক্ষা নিতেই বলানো। আর দাদার নিখোঁজ হওয়াটা ? নিজেই বড় ভাই। দাদা কই, যে নিখোঁজ হবে ?

আমাদের সমিতির শাখা ও সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভরের জালিয়াতি ধরেছে কাজল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আমাদের সমিতির ময়নাগুড়ি শাখা—১৯টি। তারপরই অমিত নন্দীর নেতৃত্বে আমাদের চুঁচড়ো শাখা ৩টি। শশাঙ্ক বৈরাগ্যের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরের 'বিবর্তন'—৩টি।

ঈশ্বরে ভর নিয়ে আমাদের সমিতির বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থা কম করে এক'শর ওপর (আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির হিসেব বাদ দিয়ে) শীতলা, মনসা, কালী,

তারা, বগলা, তারকভোলা, পাঁচুঠাকুর, বনবিবি ওলাইচণ্ডী, জ্বরাসুর, পীর গোরাচাঁদ, ওলাবিবি ইত্যাদি দেবতার ভরের দাবিদারদের ওপর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে এবং অনুসন্ধানকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সঙ্গে সহমত হয়েছি—এঁরা কেউই মানসিক রোগী নন। ভর এঁদের ভড়ং। অর্থ উপার্জনের সহজতর পন্থা। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের শক্তি বা ক্ষমতা বিষয়ে অতি সচেতন। ভরের রোগী হলে সচেতনতা বোধ দ্বারা কখনই তাঁরা পরিচালিত হতে পারতেন না।

একশোর ওপর এই ভরে পাওয়া বাবাজী-মাতাজীর বিষয়ে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখতে পাচ্ছি—এঁরা প্রত্যেকেই রোগ মুক্তি ঘটাতে পারেন বলে দাবি রাখেন। ভরে পাওয়া অবস্থায় এঁরা বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় বাৎলে দেন বলেও দাবি করেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভর হওয়ার আগে নিম্নমধ্যবিত্ত বা গরিব ছিলেন। ভর পরবর্তীকালে এঁদের প্রত্যেকেরই আর্থিক সঙ্গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এঁরা অনেকেই ক্যানসার সারিয়েছেন, বোবাকে দিয়ে কথা বলিয়েছেন, অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি রেখেছেন। এইসব দাবিদারদের প্রতিটি দাবির ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানকারীরা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, ওই নাম-ঠিকানার কোনও মানুষের বাস্তব অস্তিত্বই নেই বা ছিল না। আবার কোন কোনও ক্ষেত্রে সেইসব মানুষদের হদিশ পাওয়া গেলেও তাঁরা বাস্তবিকই বোবা বা অন্ধ ছিলেন, অথবা ক্যানসারে ভুগছিলেন—এমন কোনও তথ্যই ওইসব মানুষগুলো হাজির করতে পারেননি। বরং দেখা গেছে ওইসব মানুষগুলো হয় ভর হওয়া বাবাজী-মাতাজীদের



কাজল ভট্টাচার্য ও জনৈক অলৌকিকক্ষমতার দাবিদার



আত্মীয, অথবা ভক্ত। ওবা যে এজেন্ট হিসেবে প্রচাবে নেমেছে, এই বিষযে কোনও সন্দেহেব অবকাশ থাকে না।

শ্রদ্ধেয পাঠকদেব কাছে একটি বিনীত অনুবোধ—কাবো কথায কাবো অলৌকিক ক্ষমতায আস্থা স্থাপন না কবে একটু জিজ্ঞাসু মন নিযে ভবেব অবতাবটিকে বাজিযে দেখুন—আপনাব চোখে তাব মিথ্যাচাবিতা ধবা পডবেই।

তবু আমবা, সাধাবণ মানুষবা, বিভ্রান্ত হই। আমাদেব বিভ্রান্ত কবা হয। নামী দামী বহু প্রচাবিত পত্র-পত্রিকায অলৌকিকতা, জ্যোতিষ বা ভবেব পক্ষে গুরুত্ব দিযে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিই আমাদেব, সাধাবণ মানুষদেব, বিভ্রান্ত কবাব হাতিযাব।

বহু থেকে একটি উদাহবণ হিসেবে আপনাদেব সামনে হাজিব কবছি। ৩০ মে '৯০ আনন্দবাজাব পত্রিকায বহুবর্ণেব তিনটি ছবি সহ একটি বিশাল প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো "পূজাবিণীব শবীব বেযে" শিবোনামে। আপনাদেব অবগতিব জন্য এখানে তুলে দিচ্ছি।

পূজারিণীর শরীর বেয়ে

দেবদেবীর ভর হয় পূজারিণীর শরীরে। সে সময় যা বলা যায় তাই মেলে। যা দাওয়াই দেওয়া হয় তাতেই রোগ নির্মূল হয়। ভর হয় কীভাবে?

শনিবার বেলা দুটো। ঢাকুরিয়া স্টেশনের পাশে তিন-চার হাত উঁচু ছোট্ট একটি কালী মন্দির। মন্দিরের মাথায় চক্র ও ত্রিশূল। মন্দিরটির নাম 'জয় মা বাঠের কালী।' মন্দিরের সামনে একটি সিমেন্টের বাঁধানো চাতাল। সেই চাতাল ও পাশের মাঠে ইতস্তত ছড়ানো অনেক লোক। আর সেই দাওয়ার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে এক যুবতী, পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি এলোমেলো, চোখ দুটি বোজা, নাকের পাটা ফোলা, মুখের



দুপাশে ক্ষীণ বক্তেব দাগ। মহিলাটিব ভব হযেছে। কালী পুজো কবতে কবতে অচেতন হযে চিৎ হযে শুযে পড়েন মহিলা। মুখ দিযে বক্ত বেবোতে থাকে। হঠাৎ মহিলা বলে উঠলেন, 'স্বামীব লগে এযেছিস কে ?' উপস্থিত জনতাব মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। শাঁখা-সিঁদুব মাঝবযসী এক আধা-শহুবে মহিলা ঠেলাঠেলি কবে সামনে এলেন। মন্দিবে ছোট দবজাব সামনে হাঁটু মুড়ে বসে 'মা' বলে হাতজোড় কবে ডাকতে লাগলেন। 'মা' বললেন—'সব ঠিক হযে যাবে। কিচ্ছু হবে না। আমাব জল পড়া খাইযেছিস ?'

'খাইযেছি মা। সাবছে না মা'।

'ওতেই সব ঠিক হযে যাবে।'

এবপব 'মা' ডেকে উঠলেন, "ব্যবসাব জন্য এযেছিস কে ? বোস। আমাব কাছে আয।" শার্ট-প্যান্ট পবা মাঝবযসী ব্যক্তি এগিযে এলেন। একইভাবে—হাত জোড়। হাঁটু মুড়ে বসা। 'মাযেব কাছে সমস্যাব কথা জানালেন। মা অভয দিলেন। ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফেব 'মা' ডাকলেন 'কোমবে পিঠে পেটে ব্যথাব জন্য এযেছিস কে ? আয, আয সামনে আয।'

এক এক কবে ছেলে মেযে বুড়ো মাঝবযসী সবাই হাজিব হতে লাগল। 'মা তাদেব কোমবে, পিঠে পেটে হাত বুলিযে দিতে লাগলেন। তাবা এক এক কবে চলে গেলে একটি যুবক এগিযে এল। 'মা' তাব পেটে হাত বুলিযে দিলেন নাভিতে হাত বাখলেন। 'মা'যেব মুখ দিযে বক্ত বেবিযে এল। মাযেব 'ঝাড়া'ব বকমই এই।

'সন্তানেব লগে এযেছিস কে ?' যুবকটি চলে যেতেই 'মা'-যেব ডাক। শিশুকোলে এক বমণী এগিযে এলেন। 'মা' শিশুটাকে তাঁব বুকেব ওপব শুইযে দুই হাতে সজোবে শিশুটিব পিঠেব ওপব চড় মাবতে লাগলেন। তাবপব শিশুটিকে দু হাত দিযে উঁচু কবে তুলে ধবলেন এবং আবাব চড় মাবতে লাগলেন, এবপব 'মা' শিশুটিকে তাব মা-যেব কাছে ফিবিযে দিলেন।

মাযেব ভবমুক্তিব সময হযে এল। মহিলা, পুরুষ ঠেলাঠেলি কবে এগোতে লাগলেন। নিজেব নিজেব সমস্যাব কথা বলবেন এঁবা। মাযেব ভবমুক্তি হল। চিৎ হওযাব অবস্থা থেকে উপুড় হযে শুলেন 'মা'। কিছুক্ষণ পব উঠে বসলেন তিনি। পুজো কবতে লাগলেন। মন্ত্র পড়ে, হাততালি দিযে দেবীব আবাধনা চলল।

এক মধ্যবযসী মহিলাব হাত-পা কাঁপে। উঠে বসতে পাবেন না। কথা বলতেও কষ্ট হয। জানা গেল, তাঁব অসুখ দীর্ঘদিনেব। তাঁকে 'মা' সামনে বসিযে প্রথমে মন্ত্র পড়ালেন। তাবপব ওঠ বস কবতে বললেন। মহিলা ওঠবস কবতে পাবছিলেন না। তাঁকে জল পড়া খাওযানো হল। মহিলা উঠে বসলেন। এক মধ্যবযস্ক পুরুষেব পিঠ ও কোমবেব ব্যথা এবং এক মহিলাব গ্যাসট্রিকেব বেদনাব একইভাবে উপশম কবলেন 'মা'। পবিচয হল বিজযভূষণ গুহব সঙ্গে। তিনি ন্যাশনাল হেবাল্ডেব সঙ্গে যুক্ত। তিন-চাব বছব আগে তাঁব স্ত্রীব হাঁপানি সেবে যাওযাব পব থেকে তিনি 'মা'যেব একনিষ্ঠ ভক্ত। এখন 'মা'যেব কাছে আসেন নিযমিত। কোনও উদ্দেশ্য নয, শুধু 'মা'-যেব টানে আসেন।

মহিলাব নাম প্রতিমা চক্রবর্তী। স্বামী বেলে কাজ কবেন। ছেলে একটিই। বযস,

বারো তেরো। স্বাস্থ্য মাঝারি, চোখগুলি কোটরে বসা, গভীর। চেহারার গড়ন মজবুত হলেও কোথাও একটা ক্লান্তির ছাপ আছে। মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কাজ করতে পারেন না। 'মা'য়ের দয়াতেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

যাদবপুর পলিটেকনিকের ঠিক পেছনে শীতলবাড়িতেও ভর হয়। এখানে একটি নেপালী পরিবার থাকে। যাদবপুর পলিটেকনিকের পিওনের কাজ করতেন ভদ্রলোক। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন।। তাঁর স্ত্রীর ভর হয় প্রতি শনিবার। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কোটায়, গায়ের রঙ কালো হলেও চেহারায় বেশ একটি সুশ্রী আছে। মুখের গড়নটি ভারি সুন্দর। ছেলে, নাতি-নাতনী নিয়ে তিরিশ বছরের পরিপূর্ণ সংসার। ৬৫ সালে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা। যাদবপুর পলিটেকনিকের কর্মী হিসেবে পলিটেকনিকের পিছনেই থাকার জায়গা পেয়েছিলেন তাঁরা। ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলনের সময় দিল্লি থেকে আসা ১৬০০ পুলিশ ইউনিভার্সিটির চত্বরেই বাস করতে থাকে। তারা চাঁদা তুলে 'মা'য়ের জন্য পাকা দালান তৈরি করে দেয়। এখন সেই দালানে প্রতি শনিবার ভক্ত সমাগম ঘটে। যে যার সমস্যা নিয়ে আসে। পুজো শুরু করার কিছুক্ষণ পরই 'মা'য়ের ভর হয়। তখন সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করে এবং 'মা' প্রশ্নের উত্তর দেন। সব মিলে যায়। একটি বোবা মেয়েকে সারিয়ে তুলেছেন 'মা'। মায়ের দেওয়া জলপড়ায় উপশম ঘটেছে একটি সুন্দরী নববধূর জটিল ব্যাধির, একটি শিশুর কঠিন অসুখ।

কলকাতার বাইরে আন্দুলের সরু রাস্তা দিয়ে ঘেরা একটি পুকুরের পিছনে বহুদিন থেকে একটি বাড়িতে পাশাপাশি রয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ ও কালী। বাংলা ১৩৭১ সালে মূর্তি প্রতিষ্ঠা। তার আগে একটি ছোট্ট বেড়া দেওয়া ঘরে পুজো হত। তখনই 'মা'-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এখানে ওখানে।

মন্দিরে যিনি পুজো করেন, তাঁর বয়স ষাটের কোঠায়। শীর্ণকায়। বিধবা, কিছুদিন হল স্বামী-বিয়োগ হয়েছে। ভক্তদের দেওয়া অর্থেই সংসার চলে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পুজোয় বসার পর 'মা'য়ের ভর হয়। তখন 'মা'-কে যে প্রশ্ন করা যায়, 'মা' তার উত্তর দেন। প্রশ্ন করার জন্য কুড়ি পয়সা দক্ষিণা। পুজোয় বসার কিছুক্ষণ পর মায়ের মাথা দুলতে থাকে। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মাথার দোলাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। তারপর একসময় 'মা'য়ের হাত থেকে ফুল খসে পড়ে, ঘণ্টা স্খলিত হয়। 'মা' আচ্ছন্ন হয়ে যান। ভর হয়। ভক্তরা তখন প্রশ্ন করতে শুরু করেন। 'মা' আচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তর দিয়ে থাকেন।

এবং উত্তর মিলেও যায়। রোগভোগ সেরে যায়। মানুষগুলির ভিড় তাই বাড়ে।

□ সাবর্ণী দাশগুপ্ত

ছবি □ শুভজিৎ পাল

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আমার ও আমাদের সমিতির কাছে প্রশ্ন হাজির করেছিলেন, এই বিষয়ে আমাদের মতামত কী? আমরা কি তুড়ি দিয়েই প্রতিবেদকের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে চাই? আমরা কি ঈশ্বরের ভরে পাওয়া ওইসব পূজারিণীদের মুখোমুখি হবো? আমার বন্ধু আকাশবাণী

কলকাতার অধিকর্তা ডঃ মলয় বিকাশ পাহাড়ীও জানতে চেয়েছিলেন, ভরে পাওয়া মানুষগুলো বাস্তবিকই রোগীদের সারাচ্ছেন কী ? সারালে কীভাবে সারাচ্ছেন ? উত্তর কি সত্যি মেলে ? মিললে তার পিছনে যুক্তি কী ? এ জাতীয় প্রশ্ন শুধু ডঃ পাহাড়ীকে নয়, বহু মানুষকেই দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল।

যথারীতি উত্তর দিয়েছিলাম। ৩ জুলাই, '৯০ আনন্দবাজারে আমাদের সমিতির একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

পূজারিণীর শরীরে দেবতার ভর ?

সাবর্ণী দাশগুপ্তের 'পূজারিণীর শরীর বেয়ে' প্রতিবেদনটি (৩০ মে) পড়ে অবাক হয়ে গেছি। লেখাটি পড়ে বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, সাবর্ণী দাশগুপ্ত 'ভর' হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত কারণগুলি বিষয়ে অবহিত নন এবং উনি ভরগ্রস্তদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অবশ্য তিনি তাঁর লেখার সত্যতা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন তবে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে মুক্ত মনে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছে। সাবর্ণীর হাতে তুলে দেব কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা ভরগ্রস্তদের কাছে প্রশ্ন রাখবেন। তুলে দেব পাঁচজন রোগী। ভর লাগা পূজারিণীরা রোগীদের রোগ মুক্ত করতে পারলে এবং প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নে সঠিক উত্তর পেলে আমরা সাবর্ণীর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব এবং আমরা অলৌকিকতা-বিরোধী ও কুসংস্কার বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকব।

শারীর-বিজ্ঞানের মতানুসারে 'ভর' কখনও মানসিক রোগ, কখনও স্রেফ অভিনয়। ভরলাগা মানুষগুলো হিস্টিরিয়া, ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ, স্কিটসোফ্রিনিয়া—ইত্যাদি রোগের শিকার মাত্র। এইসব উপসর্গকেই ভুল করা হয় ভূত বা দেবতার ভরের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। সাধারণভাবে যে সব মানুষ শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, পরিবেশগত ভাবে প্রগতির আলো থেকে বঞ্চিত, আবেগপ্রবণ, যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা সীমিত তাঁদের মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতাও কম। তাঁরা এক নাগাড়ে একই কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। দৈবশক্তির বা ভূতে বিশ্বাসের ফলে অনেক সময় রোগী ভাবতে থাকে, তাঁর শরীরে দেবতার বা ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। ফলে রোগী দেবতার বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভূত সব আচরণ করতে থাকেন। অনেক সময় পারিবারিক জীবনে অসুখী, দায়িত্বভারে জর্জরিত ও মানসিক অবসাদগ্রস্ততা থেকেও 'ভর' রোগ হয়। স্কিটসোফ্রিনিয়া রোগীরা হন অতি আবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণীরই হোন না কেন। এই আবেগপ্রবণতা থেকেই রোগীরা অনেকসময় বিশ্বাস করে বসেন তাঁর উপর দেবতা বা ভূত ভর করেছে।

তবে 'ভর' নিয়ে যারা ব্যবসা চালায় তারা সাধারণভাবে মানসিক রোগী নয়, প্রতারক মাত্র।

ভর-লাগা মানুষদের জলপড়া, তেলপড়ায় কেউ কেউ রোগমুক্তও হন বটে, কিন্তু

যাঁরা রোগমুক্ত হন তাঁদের আরোগ্যের পিছনে ভর-লাগা মানুষের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা সামান্যতমও কাজ করে না, কাজ করে ভর লাগা মানুষদের প্রতি রোগীদের অন্ধবিশ্বাস। রোগ নিরাময়েরর ক্ষেত্রে বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। হাড়ে, বুকে বা মাথায় ব্যথা, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, গ্যাসট্রিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল-অ্যাজমা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে রোগীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে ওষুধ-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইঞ্জেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। একে বলে 'প্ল্যাসিবো' চিকিৎসা পদ্ধতি।

'যা বলা যায় তাই মেলে'—এক্ষেত্রে কৃতিত্ব কিন্তু ভর-লাগা মানুষটির নয়, তাঁর খবর সংগ্রহকারী এজেন্টদের।

প্রবীর ঘোষ। সাধারণ সম্পাদক,
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি,
কলিকাতা-৭৪।

না, সাবর্ণী দাশগুপ্ত বা ভরে পাওয়া পূজারিণীদের কেউ আজ পর্যন্ত আমার বা আমাদের সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা বা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। কারণটি শ্রদ্ধেয় পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন।

অবাক মেয়ে মৌসুমী'র মধ্যে সরস্বতীর অধিষ্ঠান (?) ও প্রডিজি প্রসঙ্গ

মৌসুমী প্রসঙ্গে গণমাধ্যম

১৯৮৯-এ রকেট গতিতে প্রচারের ব্যাপকতা পেয়ে দেশ-বিদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবাংলার রুক্ষ জেলা পুরুলিয়ার এক সাত বছরের বালিকা মৌসুমী। অবাক মেয়ে মৌসুমী যে 'Prodigy' অর্থাৎ 'পরম বিস্ময়কর প্রতিভা', এই বিষয়ে প্রচার মাধ্যমগুলো সহমত পোষণ করলেও, কত বড় মাপের 'প্রডিজি' এটা প্রমাণ করতে দস্তুর মত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যেন, যে পত্র-পত্রিকা বা প্রচার-মাধ্যম মৌসুমীকে যত বড় প্রডিজি বলে প্রমাণ হাজির করতে পারবে, তার তত সুনাম, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাবে। সেই সময় মৌসুমী সম্বন্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোর বক্তব্য কী ধরনের ছিল সেটা বোঝাতে বহু থেকে গুটিকয়েক উদাহরণ এখানে হাজির করছি।

১৩ আগস্ট '৮৯-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতিবেদক বিমল বসুর প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো "বুদ্ধিতে যে প্রতিভার ব্যাখ্যা নেই" শিরোনামে। প্রতিবেদক বিজ্ঞান-লেখক হিসেবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিচিত। সাতটি ছবিসহ প্রচুর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শুরুতেই বড় বড় হরফে লেখা ছিল, "অল্প বয়সে অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সম্প্রতি হইচই ফেলে দিয়েছে পুরুলিয়ার মৌসুমী।" লেখাটিতে শ্রীবসুর স্পষ্ট ঘোষণা—"মৌসুমী এক বিস্ময় বালিকা। এককথায় প্রডিজি।

এখন তার বয়স ঠিক সাত। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি—এই তিনটি ভাষায় যেমন বিস্ময়কর তার দক্ষতা, তেমনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ইত্যাদি বিষয়েও সে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।"

ওই প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, "কলকাতা পাভলভ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডি এন গাঙ্গুলী বিস্ময় বালিকা মৌসুমী সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর রাখেন। তাঁর এক ছাত্রকে পাঠিয়েও ছিলেন আদ্রায় মৌসুমীর সঙ্গে কথা বলতে। শ্রীগাঙ্গুলীর মতে, মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির পিছনে আছে সম্ভবত বহু প্রজন্ম পূর্বের কোনও সুপ্ত জিন, এই মেয়েটির মধ্যে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।"

প্রতিবেদনটিতে ডি এন গাঙ্গুলীর মতামত হিসেবে আরও প্রকাশিত হয়েছে, "মৌসুমীর বুদ্ধির যে স্তর তাতে তার জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। বিদেশে, বিশেষত আমেরিকায় উচ্চবুদ্ধির ছেলেমেয়েদের বাছাই করে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের পাঠক্রম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"

প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং মস্তিষ্কবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডঃ জে জে ঘোষ আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, "মৌসুমীর মতো প্রডিজির সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও এখানকার বিজ্ঞানীরা ওকে নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেন না, সিরিয়াস গবেষণার কথা ভাবছেন না।"

জনপ্রিয় পাক্ষিক 'সানন্দা'র ৭ সেপ্টেম্বর '৮৯ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিয়ে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী "বিশেষ রচনা" প্রকাশিত হয়। শিরোনামে ছিল 'অবাক পৃথিবীর অবাক মেয়ে"। আটটি রঙিন ছবিতে সাজান এই বিশেষ রচনার রচয়িতা সুজন চন্দ মৌসুমীর ইংরেজি উচ্চারণ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, "একেবারে মেম সাহেবের মতো উচ্চারণ।" শ্রীচন্দ আরও জানাচ্ছেন, "সেই তুলনায় বাংলা উচ্চারণ ততটা ভাল নয়। কিছুটা আঞ্চলিক টান আছে তাতে। তবে হিন্দি উচ্চারণে বেশ মুন্সিয়ানা আছে।"

মৌসুমীর টাইপের স্পিড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীচন্দ জানাচ্ছেন, "ও যেভাবে দ্রুত টাইপ করছিল তাতে হলফ করেই বলা যায় স্পিড কম করেও ৪৫। চমৎকার ফিঙ্গারিং।"

প্রতিবেদক আরও জানিয়েছেন, শুধু জ্ঞানের পরীক্ষায় নয়, বুদ্ধির ও রাজনীতির পরীক্ষাতেও মৌসুমী পাকা ডিপ্লোমেট। মৌসুমী এখন গবেষণা করছে কয়লাকে সালফারমুক্ত করা নিয়ে। এ কাজে সফল হলে বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত হবে পৃথিবী। মৌসুমীর ধারণা ও সফল হবেই, নোবেল প্রাইজ পাবে ওর সাড়ে ন'বছর বয়সের মধ্যেই।

জনপ্রিয় বাংলা মাসিক 'আলোকপাত' মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করে সেপ্টেম্বর '৮৯ সংখ্যায়। শিরোনাম—"বিস্ময় বালিকা মৌসুমী সাত বছরের সরস্বতী", সঙ্গে ছিল আধ ডজন ছবি। প্রতিবেদনটির শুরুতেই বড় বড় হরফে লেখা ছিল—

"আদ্রা রেলশহরের ৭ বছরের মৌসুমী চক্রবর্তী বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি ভাষায় সারা বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে ৯ বছর বয়সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবার অনুমতি পেয়ে 'বিস্ময় বালিকা' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিস্ময়বালা মৌসুমীর এই জীবন কাহিনী পেশ করা হল তার সঙ্গে দুদিনব্যাপী দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা ধরে নেওয়া ইন্টারভিউ-এর প্রেক্ষাপটে।"

শিরোনামে মৌসুমীকে কেন সরস্বতী বলা হয়েছে, তারই উত্তর মেলে মৌসুমীর মা শিপ্রাদেবীর কথায়। প্রতিবেদকের ভাষায়, "শিপ্রাদেবী জানান, মৌসুমীর জন্মের আগে এক আশ্চর্য অনুভূতি মাঝে মধ্যে গ্রাস করে ফেলত শিপ্রাদেবীকে। শিপ্রাদেবী তা স্বামীকেও বলতেন। মাতৃগর্ভে মৌসুমীর আসার আগে শিপ্রাদেবী এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন তাঁর আরাধ্য দেবী লক্ষ্মী শ্বেতবর্ণা রূপ নিয়ে অনেক দূরের থেকে হেঁটে আসছেন তাঁর দিকে। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি দেখলেন কোলের কাছে আসামাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

শিপ্রাদেবীর এই স্বপ্নের কথা পাঠকরা 'খেয়েছিলেন' ভাল, যুক্তিটা তাঁদের অনেকেরই মনে ধরেছিল—স্বয়ং সরস্বতী ভর না করলে এমন বিদ্যে-বুদ্ধি কী এই বয়সে হওয়া সম্ভব?

প্রতিবেদক আরও জানিয়েছেন, "মৌসুমীর সঙ্গে বর্তমান প্রতিবেদক দু-দফায় প্রায় ১৮ ঘণ্টা সাক্ষাৎকার করেন। সেই সাক্ষাৎকারে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, আধ্যাত্মবাদ কিছুই বাদ ছিল না। আর প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী এই প্রতিবেদকের জ্ঞানের সীমারেখা থেকে অনেক উঁচুতে থেকে সব উত্তর দিয়েছেন।" "সাত বছরের মৌসুমী টাইপেও সিদ্ধহস্ত। ওর সমস্ত রিসার্চ পেপার ও নিজেই টাইপ করে। টাইপে ওর স্পিড ইংরাজিতে ৯০ এবং বাংলায় ৪০। মৌসুমী খুব ভাল গানও গাইতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগপ্রধান দুধরনেরই।"

আরও বহু পত্র-পত্রিকার মত এই পত্রিকাতেও ঘুরে ফিরে মৌসুমীর রিসার্চের কথা এসেছিল। প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, মৌসুমীর বাবা "সাধনবাবুর ব্যবহার খুবই আন্তরিক। আমাদের জন্য চা পর্বের ব্যবস্থা করে এসে জানালেন—মৌসুমী একটু রিসার্চের কাজ

করছে। আধঘণ্টা পরেই আসবে।

রিসার্চ ? চমকে উঠলাম, সাত বছরের মেয়ে রিসার্চ করছে—সে আবার কি ? মনের ভাব গোপন রেখে বললাম,—রিসার্চ ? আপনার মেয়ে রিসার্চও করে নাকি ?

—হ্যাঁ, তবে বিষয়টা বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, যে বিষয়টা নিয়ে ও রিসার্চ করছে সেটা অবশ্যই মানব কল্যাণের পক্ষে।

—মৌসুমী বহুবারই বলেছে সে ডাক্তার হতে ভালবাসে। তা এই রিসার্চ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কাজে লাগবে ?

—বললাম তো, ওর রিসার্চ সফল হলে ভারতের মর্যাদা বিশ্বের দরবারে বেড়ে যাবে। আর এই রিসার্চ এত গোপনীয় রাখার কারণ হল, বিষয়টি এতই নতুন এবং প্রয়োজনীয় যে খবর বাইরে গেলে আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি।”

—আচ্ছা, এর আগে মৌসুমী, কি কোন বিষয়ের উপর রিসার্চ করেছে ?

—“কয়লার ওপর কাজও করেছে। তবে সেটা উল্লেখ করার মত নয়। আর সে ব্যাপারটায় ওকে আগাতে দিইনি। এই বড় কাজটির দিকে তাকিয়ে। আসানসোল বি ই কলেজের অধ্যাপকরা ওকে নিয়ে এখানে একবার একটা গ্রুপ ডিসকাশন করেছিলেন।”

মৌসুমী রিসার্চ করছে। অর্থাৎ ওর জ্ঞান বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রির সীমাকে অতিক্রম করেছে এবং ও আর আড়াই বছরের মধ্যে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবে এই বিশ্বাস বহু বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীকে প্রাণীত করেছিল, গর্বিত করেছিল।

৩০ জুলাই ১৯৮৯। দিল্লি দূরদর্শনের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ইংরেজি সংবাদে প্রায় দুমিনিট ধরে নানাভাবে মৌসুমীকে হাজির করা হলো কোটি কোটি দর্শকদের কাছে। মানুষ দেখলেন, পরিচিত হলেন ‘ওয়াণ্ডার গার্ল’-এর বিস্ময়কর প্রতিভার সঙ্গে।

এরও দু'বছর আগে আমরা একটু পিছিয়ে গেলে মন্দ হয় না। ‘দ্য স্টেটসম্যান’ দৈনিক পত্রিকা ২১ এপ্রিল ’৮৭ মৌসুমীর এক বিশাল ছবি সহ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল, “Wonder girl of Purulia Village”। প্রতিবেদক অলোকেশ সেন। তখন মৌসুমীর বয়স মাত্র চার বছর আট মাস।

প্রতিবেদক মৌসুমী প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, “Mousumi's interest in studies became evident when she was only one and a half years old Since then she has learnt to read, write and speak in Bengali, Hindi and English At present, she is learning German at home ”'

অর্থাৎ, মৌসুমীর পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ সূচিত হয় মাত্র দেড় বছর বয়সে। তারপর ও বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে পড়তে, লিখতে ও বলতে শিখেছে। বর্তমানে বাড়িতেই জার্মান শিখছে।

প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী টাইপ করছে। ছবির তলায় লেখা—Mousumi Chakraborty typing out some paragraph from one of *her text books*

সমাজ সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক বলে স্ববিজ্ঞাপিত মাসিক পত্রিকা ‘উৎস মানুষ’ আগস্ট ’৮৭ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী করলেন, ছবি সহ। শিরোনাম ছিল,

"পুরুলিযাব আশ্চর্য মেযে মৌসুমী।" প্রতিবেদক অভিজিৎ মজুমদাব।

পাঠকরা একটু লক্ষ্য কবলেই দেখতে পাবেন, প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবাব সমযও মৌসুমী পাঁচেব কোঠায পা দেযনি। প্রতিবেদক অবশ্য জানাচ্ছেন সাডে চাব বছবেব মৌসুমীকে ধানবাদেব সেন্ট্রাল ফুযেল বিসার্চ ইনস্টিটিউট-এব বিজ্ঞানীবা "অজস্র প্রশ্ন কবেছে ইংবাজি, বাংলা বা হিন্দীতে। যেমন, সালফিউবিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডেব সাংকেতিক নাম কিংবা কযলা গবেষণা বিষযে নানা জটিল উত্তব দিযে সবাইকে অবাক কবেছে।" সেই সঙ্গে প্রতিবেদক এও জানিযেছেন, এত সব উত্তব দিচ্ছে—"যদিও সব কথা এখনো স্পষ্ট নয়।" সত্যিই তো সাডে চাব বছব আধো-আধো কথা বলাবই বযস।

উৎস মানুষ আবো জানাচ্ছে, "বিস্মযেব ব্যাপাব, মৌসুমী টাইপ মেসিনে অনাযাসে টাইপ করতে পাবে নির্ভুল ফিংগাবিং-এ প্রায চল্লিশ স্পিড-এ।" "এই শেষ নয। মৌসুমী জানে বাংলা ব্যাকবণ, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানেব নানা কথা। অঙ্কেব অনেক ফবমূলাই ওব ঠোঁটেব ডগায। অনুবাদ কবতে পাবে বাংলা, ইংবাজি বা হিন্দীতে। সম্প্রতি ও জার্মান ভাষা শিখছে।" "মৌসুমীব মাও খুব ভাল ছাত্রী ছিলেন।" আব মৌসুমীব বাবা? প্রচাব মাধ্যমগুলোব কল্যাণে তাও কাবোই অজানা ছিল না। তিনি ছিলেন জুনিযব সাইনটিস্ট।

মৌসুমীকে নিযে গণ-উন্মাদনাব মতই এক ধবনেব প্রচাব-উন্মাদনা শুরু হযে গিযেছিল। এবং তা প্রভাবিত করেছিল বিভিন্ন পেশাব মানুষকে। ফলশ্রুতিতে আমি এবং আমাদেব সমিতি প্রচুব চিঠি পেযেছি। চিঠিগুলো এসেছিল মৌসুমীব বিষযে বিভিন্ন বকমেব কৌতূহল নিযে, দ্বন্দ্ব নিযে, বিভ্রান্তি নিযে, জিজ্ঞাসা নিয়ে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত অগুনতি সেমিনাবে বক্তব্য বাখতে গিযে মৌসুমীকে নিযে হাজাবো প্রশ্নেব মুখোমুখি হযেই চলেছি। প্রশ্নগুলো মোটামুটি এই জাতীয—মৌসুমীব এই পবম বিস্মযকব প্রতিভাব ব্যাখ্যা কী? বাস্তবিকই কি মৌসুমী পবম বিস্মযকব প্রতিভা? মৌসুমী কি তবে জাতিস্মব? অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবিণী? ও কি মানুষেব ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে সক্ষম? ওব মধ্যে বাস্তবিকই কি ঈশ্ববেব প্রকাশ ঘটেছে? মা লক্ষ্মী ও সবস্বতীকে ঘিবে মৌসুমীব মা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মৌসুমীব প্রতিভা কি সেই স্বপ্নেবই বাস্তবরূপ নেওযাব প্রমাণ নয? মৌসুমী কি লক্ষ্মী ও সবস্বতীবই অংশ? স্বযং সবস্বতী মৌসুমীব জিবেব ডগায না থাকলে মুখে ভালমত বুলি ফোটাব আগেই কী কবে গবেষণা কবে, বিভিন্ন বিষযে জ্ঞানেব পবিচয দিযে পবীক্ষক গুণীজনদেব হতবাক্ কবে দেয?

এবই পাশাপাশি অন্য ধবনেব প্রশ্নও এসেছে— মৌসুমী '৯১-তে মাধ্যমিক দেবে, অর্থাৎ ওব বিদ্যে বুদ্ধি ক্লাস নাইনেব মানেব। অথচ অনেক পত্র-পত্রিকাব প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী গবেষণা কবছে বিজ্ঞান নিযে। ওব বিদ্যে-বুদ্ধি অনার্স গ্র্যাজুযেট স্তবেব। ইংবাজি টাইপেব স্পিড কেউ বলছেন কম কবে ৪৫, কেউ ৬০, কেউবা বলছেন ৯০। বাংলায টাইপ কবছে ৪০ স্পিডে। কখনও জানা যাচ্ছে মৌসুমী বিজ্ঞানী হতে ইচ্ছুক, কখনও জানা যাচ্ছে ডাক্তাব হতে চায। কোন প্রতিবেদক

লিখলেন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, অধ্যাত্মবাদ, নিয়ে প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী প্রতিবেদকের জ্ঞানের সীমারেখা থেকে অনেক উঁচুতে থেকে সব উত্তর দিয়েছে। কেউ জানাচ্ছেন, মৌসুমী তার সাড়ে ন'বছর বয়সেই গবেষণার ফসল হিসেবে আনবে নোবেল পুরস্কার। বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি তিনটি ভাষাতেই বিস্ময়কর তার দক্ষতা। জানে ডাচ, জার্মান। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত সবেই ওর অগ্রগতি বিস্ময়কর। স্বভাবতই বহুজনের কাছেই বিরাট জিজ্ঞাসা—মৌসুমীর শিক্ষার প্রকৃত মান কী? আর এইসব জিজ্ঞাসারই মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে বার বার এবং তা শুধু সেমিনারে নয়, বিয়েবাড়িতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, অফিসে, সহযোগী বিজ্ঞানীকর্মীদের কাছে, সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে। একাধিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এই বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রত্যেকেই বিনীতভাবে জানিয়েছিলাম, "এখনও মৌসুমীকে দেখিনি, মৌসুমীর মুখোমুখি হইনি। তাই মৌসুমীর বিষয়ে কোনও কিছু মন্তব্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" জনৈক সাংবাদিক কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম জানিয়ে বলেছেন, এঁরা প্রত্যেকেই মৌসুমীকে পরীক্ষা না করেই তো মতামত জানিয়েছেন। বলেছিলাম, ওঁরা আপনাদের বা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য কারও মাধ্যমে মৌসুমীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে মতামত জানাবার যে ক্ষমতা রাখেন, আমার সে ক্ষমতা নেই। এই অক্ষমতা বিনীতভাবে স্বীকার করে নিয়েই জানাচ্ছি—মৌসুমীকে নিজে পরীক্ষা না করে কোনও মন্তব্য করতে আমি অপারগ।"



প্রডিজি কী ? ও কিছু বিস্ময়কব শিশু প্রতিভা

পবম বিস্ময়কব শিশু প্রতিভাব অনেক কাহিনীই মাঝে-মধ্যে শোনা যায। এদেব বেশিব ভাগই বিখ্যাত হয মিথ্যা প্রচাবে, গুজবে, অলীক-কল্পনায। এদেব মধ্যে কেউ কেউ আবাব ঈশ্ববেব কৃপাধন্য, ঈশ্ববেব অংশ বা অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী, বুদ্ধিতে যাব ব্যাখ্যা নেই—ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হয। বেশ কিছু শিশু প্রতিভাব খবব অবশ্য নির্ভবযোগ্য তথ্যেব ভিত্তিতে আমবা অভ্রান্ত বলে মেনে নিই। বাস্তবিকই যাবা পবম বিস্ময়কব শিশু প্রতিভা তাদেব ক্ষেত্রেও 'বুদ্ধিতে যে প্রতিভাব ব্যাখ্যা নেই' ধবনেব কোনও বিশেষণ প্রযোগ একান্তই বিজ্ঞান বিবোধী, বিজ্ঞানমনস্কতা বিবোধী চিন্তাব ফসল। একজন বিজ্ঞান বিষযক লেখাব সঙ্গে যুক্ত মানুষ এই ধবনেব বাক্য প্রযোগ কবলে যে কোনও যুক্তিবাদী মানুষকেই তা ব্যথিত কবে, শঙ্কিত কবে। কাবণ,—

বিজ্ঞান বর্তমানে যতটুকু এগুতে পেরেছে তারই সাহায্যে যে কোনও অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভাধরের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ; তা সে শিশু মস্তিষ্কের স্বাভাবিক শারীরভিত্তিক ধর্মের অকাল বিকাশের ফলেই হোক, জেনেটিক কোনও কারণেই হোক, অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক।

সব দেশেই বিভিন্ন সমযে বিস্ময়কব প্রতিভাধব শিশুব দেখা মেলে। এবা কেউ পডাশুনোয, কেউ খেলাধুলায, কেউ সঙ্গীতে, কেউ নৃত্যে, কেউ বা ছবি আঁকায অথবা অন্য কোনও বিষযে বিবল প্রতিভা বলে চিহ্নিত হযেছে। এদেব অনেকেই পববর্তীকালে চূডান্তভাবে নিজেব প্রতিভাকে বিকশিত কবতে সমর্থ হযেছে, আবাব অনেকে হাবিযে গেছে সাধাবণেব মিছিলে।

আবাব এব বিপবীতটাও ঘটতে দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে। শৈশবে যাব মধ্যে অসাধাবণত্বেব হদিশ খুঁজে পাওযা যাযনি, পববর্তী সমযে তাবই প্রতিভাকে মানুষ বাব বাব সেলাম জানিযেছে। মাইক্রোসস্কোপেব আবিষ্কাবক লিউযেনহুক, বিবর্তনবাদেব প্রবক্তা চার্লস ডাবউইন, বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব বা শবৎচন্দ্র—এঁবা কেউই শিশু প্রডিজি ছিলেন না। ববং লিউযেনহুক এবং ডাবউইন

'ফালতু' বলেই চিহ্নিত হযেছিলেন। লেখাপড়ায মোটেই জুতসই ছিলেন না, ছিলেন নড়বড়ে। ছাত্র জীবনে আইনস্টাইনও এঁদেব থেকে ভিন্নতর কিছু ছিলেন না। একবার পদার্থবিদ্যায অকৃতকার্যও হযেছিলেন। ববীন্দ্রনাথেব ছাত্রজীবনও কৃতিত্বপূর্ণ ছিল না, শবৎচন্দ্রেব ক্ষেত্রেও একই কথাই বলতে হয়। বিশ্বত্রাস বোলাব চন্দ্রশেখর শৈশবে পোলিও-তে আক্রান্ত হযে চিহ্নিত হযেছিলেন 'বিকলাঙ্গ' হিসেবে। তাঁব ক্রীড়া-জগতে অক্ষয কীর্তি স্থাপনেব কথা সেই সময কাবো কষ্ট-কল্পনাতেও আসেনি। এমন উদাহবণ বহু আছে।

আমাদেব দেশে শুধু মৌসুমীই নয, বর্তমানে আবো কযেকজনেব সন্ধান পাওযা গেছে, যাবা বিস্মযকব শিশু প্রতিভাব স্বাক্ষব বেখেছে। এমনই একজন চাব বছবেব মেযে পাযেল। '৮৯-তে পুনে ম্যাবাথন দৌড় প্রতিযোগিতায ২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট ৫২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ কবে সাবা বিশ্বকে চমকিত কবেছে। দৌড়েব সময পাযেলেব ওজন ছিল মাত্র ১৫ কেজি, উচ্চতা ৫৪ মিটাব। অনসূযা নটবাজন ১১ বছবেব বালিকা। নিবাস কোলকাতায। ভবতনাট্যমে অসাধাবণ প্রতিভাব স্বাক্ষব রেখে বহু গুণীজনেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে ইতিমধ্যেই। তাল ও লযেব দখল, ভাব উপলব্ধিব ক্ষমতা বিস্মযকব।

মধ্যপ্রদেশেব গ্রামেব ছেলে ন' বছবেব বীবেন্দ্র সিং ইতিমধ্যেই ৩০০ কবিতা লিখেছে, যেগুলো কাব্যগুণে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বসিকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে। ভূপালেব কবি মহল থেকে পেযেছে 'বাল কবি নাদান' উপাধি। ওব প্রতিভাব প্রকাশ মাত্র চার বছব বযসে। ওর কাব্য প্রতিভা শুধু কবিতাতেই আবদ্ধ থাকেনি। বেশ কিছু গল্পও লিখেছে, লিখেছে সিনেমাব চিত্রনাট্য। ইতিমধ্যে বোম্বাই ফিল্ম জগতেব চিত্র-পবিচালক শেখব কাপুবেব ফিল্মে সাহায্যকাবী হিসেবে নাকি থাকাব আমন্ত্রণ পেযেছে।

অমিত পাল সিং চাড্ডা ক্লাস থ্রিব ছাত্র। পড়ে বালভাবতী এযাবফোর্স স্কুলে। ইতিমধ্যে জীবন্ত 'ইযাব বুক' হিসেবে অনেক প্রচাব মাধ্যমেব নজব কেড়েছে। টু-তে পড়তে ওব বাবা কিনে দিযেছিলেন 'কম্পিটিশন সাকসেস বিভিউ'। মাত্র দু-ঘণ্টায মুখস্থ কবে অমিত শুরু কবেছে ওব জযযাত্রা।

আমেবিকান টেলিভিশন একটি সাত বছবেব শিশুব অদ্ভুত কাণ্ডকাবখানাব সঙ্গে পবিচয় ঘটিযে দিযেছে কোটি কোটি দর্শকেব। শিশুটি ভাবতীয—জিপসা মাক্কব। মাৰুতি, ফিযাট ও মাৰুতি জিপসি ঘণ্টায ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটাব বেগেব দুবন্ত-গতিব স্টিযাবিং কন্ট্রোল কবছে চূড়ান্ত নিখুঁতভাবে।

অন্ধ্রে কিশোব শ্রীনিবাস মাত্র ছ-বছব বযসেই ম্যান্ডলিন বাজানো শুরু কবেছিল। বর্তমান বযস ১৯। বিদেশী এই যন্ত্রে ভাবতীয বাগ-বাগিণীব সুব সাগবে দেশ বিদেশেব সুব-বসিকদেব ভাসিযে দিযে গেছে।

পেবামবুবেব ন'বছবেব বাসুদেবন মুখে মুখে চাব অঙ্কেব যে কোনও সংখ্যাব স্কোযাব রুট, কিউব রুট, ফোবথ রুট কষে ফেলছে।

তেব বছবেব ভবতনাট্যম শিল্পী বর্ণনা বসু তালে, লযে, ভাবে বিস্মযকব শিশু প্রতিভার প্রমাণ বেখেছে।



অনুসূয়া নটবাজ:

বীরেন্দ্র সিং





আমিত পাল

জিপসা মাকব





বাসুদেবন

পিনাকী



ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবাসী ভারতীয় ন'বছরের শ্বেতা ভরদ্বাজ আজ ভরতনাট্যমের পেশাদার নৃত্য শিল্পী। মুদ্রা, তাল, লয়, ভাবে এক কথায় অনন্য।

বাঙ্গালোরের ১৬ বছরের কিশোর আর নিরঞ্জন কম্পিউটার প্রয়োগে নতুন তত্ত্ব হাজির করে বিশ্বের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে।

প্রবাসী ভারতীয় বালা অমৃতি মাত্র ১১ বছরের বয়সে অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ্‌দের স্তম্ভিত করে দিয়েছে। ও ইতিমধ্যে একটি বইও লিখেছে—এইডস্ নিয়ে। বালা এ বছর কলেজে পড়ছে, বয়স মাত্র ১৩।

১৬ বছরের কিরণ কেডলায়া ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ম্যাথামেটিক্যাল অলিম্পিয়াডে প্রথম স্থান দখলে রেখে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। অঙ্কের বিরল প্রতিভা কিরণের দখলে আজ বহু পুরস্কার।

নেহাতই উদাহরণ টানতে এই প্রসঙ্গে এমন একজনের প্রসঙ্গ টানতে চলেছি, যে আমারই পুত্র হওয়ার দরুন একান্তভাবেই সঙ্কোচ অনুভব করছি। পিনাকী যখন ১১ বছরের বালক, ক্লাস ফাইভের ছাত্র তখন থেকেই সম্মোহন করতে সক্ষম। না ; জাদুকরদের মত নকল বা সাজান অথবা লোক ঠকানো সম্মোহনের কথা বলছি না , বলছি পাভলভিয় পদ্ধতি অনুসরণ করে মনোরোগ চিকিৎসকরা বা মনোবিজ্ঞানীরা যে সম্মোহন করেন—তার কথা। আমার যে কোনও পাণ্ডুলিপি প্রকাশের আগে একজনই পড়ে, পিনাকী। সংযোজন, সংকোচন বা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে ওর মতামতকে বহুক্ষেত্রেই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনার দায়িত্ব ওর ওপরই তুলে দিয়েছিলাম। ওর বয়স এখন ষোল, ক্লাস টেনের ছাত্র।

আমরা আপাতভাবে যে-সব ঘটনা দেখে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলে মনে করি, সাধারণভাবে সে-সবই ঘটে থাকে হয় কৌশলের সাহায্যে, নতুবা আমাদের বিশেষ শরীরবৃত্তির জন্য। জাদু কৌশল ও শরীরবৃত্তি বিষয়ক বিষয়ে পিনাকীর আপাতত যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে কোনও অলৌকিক বাবার পক্ষে পিনাকীর সামনে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব, পিনাকীর চ্যালেঞ্জে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় একশো ভাগ।

এতক্ষণ যাদের কথা বললাম, তারা সকলেই এ-যুগেরই মানুষ। এ-বার যাঁর কথা বলবো, তাঁর মুঠোতেই রয়েছে সবচেয়ে কম বয়সে ম্যাট্রিক অর্থাৎ দশম মান পাশ করার রেকর্ড।

১৯৩৯ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৫১ বছর আগে মাত্র ১০ বছর ৭ মাস বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন বাণী ঘোষ। পাশ করেছিলেন প্রথম বিভাগে।

বাণীদেবীর বিয়ের পর পদবী হয়েছে গুহঠাকুরতা। থাকেন কলকাতার বেহালায়। বাবা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রমোহন ঘোষ ছিলেন নেপাল সরকারের চিকিৎসক। থাকতেন কাঠমাণ্ডুতে। নেপালে সে সময় মেয়েদের পড়াশোনার চল ছিল না। তাই মেয়েদের স্কুলও ছিল না। গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়াশোনা। গৃহশিক্ষক আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে, নেপালের মহারাজা এনে দিয়েছিলেন জিতেন্দ্রমোহনের অনুরোধে। কাকা

শচীন্দ্রমোহন ছিলেন কলকাতায় স্মল জাজেস কোর্টের উকিল। তিনিই নিয়মিত বইপত্র ও সিলেবাস পাঠাতেন কাঠমাণ্ডুতে। পরীক্ষার তিন মাস আগে কলকাতায় এলেন। এখানেও গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়েছিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি গার্লস স্কুল থেকে পরীক্ষা দেন।

দশ বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেই বাণীদেবী বসে থাকেননি। '৪১-এ মাত্র ১২ বছর বয়সে বেথুন কলেজ থেকে পাশ করেন ইন্টারমিডিয়েট। এটাও সবচেয়ে কম বয়েসে ইন্টারমিডিয়েট পাশের রেকর্ড। খবরটা লন্ডন টাইমস, আনন্দবাজার, যুগান্তর সহ বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। '৪৩-এ বি এ পাশ করলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে। বয়স তখন ১৪। ভর্তি হলেন এম এ ক্লাসে। '৪৫-এ বিয়ে হলো। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। তারপর আর পড়তে পারেননি।

বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রে বাণীদেবীর বহু রম্যরচনা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অংশ নিয়েছেন আকাশবাণীর কথিকায়। বাণীদেবী এখনও প্রচণ্ড কর্মক্ষম। দুই মেয়ে এক ছেলে। এক মেয়ে ডাক্তার, অন্যজন আর্কিটেক্ট। একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনিয়ার।



বাণী গুহঠাকুরতা (ঘোষ)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয় দেশগুলোতে প্রডিজি চিহ্নিত প্রতিভার দেখা মেলে আমাদের দেশের তুলনায় বহুগুণ বেশি। প্রডিজির আবির্ভাব অনেক ঘটে, কিন্তু কালজয়ী প্রতিভার আবির্ভাবের ঘটনা একান্তই বিরল। প্রডিজি পরম বিস্ময়কর প্রতিভা বলে যাকে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি তার প্রতিভার সঙ্গে মৌলিকত্ব যুক্ত হলে তবেই কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে বিকশিত হওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভার দ্রুত বিকাশ-গতি শিশুকাল থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়েই চলে। ফলে সমাজ পায় এক এক অসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরকালে এদের বিকাশ-গতি মন্থর হয়ে আসে। ফলে সম্ভাবনাময় শিশু-প্রতিভা পরবর্তীকালে নেমে আসে প্রায় সাধারণের পর্যায়ে। যে হেতু শিশু বিকাশের উচ্চগতির সঙ্গে সাধারণভাবে আমরা পরিচিত নই। তাই এই ধরনের শিশু প্রতিভার সঙ্গে যখন আমরা পরিচিত হই, তখন তার অনেক কিছুই আমাদের কাছে রহস্যময়, বিস্ময়কর, ব্যাখ্যাহীন,অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ, ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরের প্রকাশ, জাতিস্মরতার প্রমাণ ইত্যাদি মনে হয়।

'আই কিউ' প্রসঙ্গে

মানুষ আজ অনেক এগিয়েছে, এগিয়েছে বিজ্ঞান। বহু আবিষ্কার মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বহু তত্ত্ব ও তথ্য অজানা অনেক কিছুকে জানতে সাহায্য করেছে। আমরা আপাত অদৃশ্য অণু-পরমাণুর অবয়ব নির্ণয় করতে পেরেছি। পেরেছি মহাকাশ গবেষণার মাধ্যমে বহু অজানাকে জানতে, অধরাকে ধরতে। অথচ আমাদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিষয়ে আমরা শতকরা দশভাগ খবরও জানতে পেরেছি কি না সন্দেহ। এ সন্দেহ আমার নয়, বিজ্ঞানীদের। এই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ থেকেই চিন্তা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞার উৎপত্তি। উনিশ শতকে হার্বার্ট স্পেনসার, কার্ল পিয়ারসন, ফ্রান্সিস গ্যালটন প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দার্শনিকরা বুদ্ধির বিকাশ, বিবর্তন, বংশগত ভিত্তি, বুদ্ধির পরিমাপ ইত্যাদি নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন।

ইংলন্ডের প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ চার্লস স্পিয়ারম্যান প্রথম বুদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণাকে রূপ দেন এক সুনির্দিষ্ট গাণিতিক তত্ত্বে। স্পিয়ারম্যানের ওই মতবাদ সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানীদের কেউই প্রায় মেনে নেননি। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্ব অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। স্পিয়ারম্যান মনে করতেন, একটি মানুষের সার্বিক বোধশক্তি জন্মগত।

এলেন ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনেট। সে সময় ফ্রান্সে ছাত্রদের নিয়ে এক অভূতপূর্ব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশাল সংখ্যক স্কুল ছাত্ররা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতে থাকে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা কোন্ কোন্ ছাত্রদের বেশি, তাদের সনাক্তকরণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিনেটকে। উদ্দেশ্য ওই সব চিহ্নিত ছাত্রদের বিশেষ প্রশিক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষায় কৃতকার্য করা যায়। বিনেটের দায়িত্ব

পাওযাব সময ১৯০৪-০৫ সাল। সনাক্তকবণেব উদ্দেশ্যে বিনেট যে অভীক্ষাব প্রশ্ন তৈবি কবেন, তা সবই ছিল ছাত্রদেব বিভিন্ন ক্লাসেব পাঠ্যক্রমেব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্কুলেব পবীক্ষায সাফল্য ও ব্যর্থতা বুদ্ধি ও মেধাব তাবতম্যেব ফল, এই ধাবণা থেকেই এই অভীক্ষা প্রশ্নকে 'বুদ্ধি অভীক্ষা' নামে বা আই কিউ (Intelligence Quotient সংক্ষেপে I Q) নামে অবহিত কবা হতে থাকে।

'আই কিউ'তে যে নম্বব দেওযা হতো, তাব হিসেব কবা হতো এইভাবে প্রশ্নাবলীব বিন্যাস হতো বযস অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন ধবনেব। উত্তবদাতা যে বযসেব, সেই বযসেব জন্য নির্ধাবিত সঠিক উত্তব দিলে উত্তবদাতাব মানসিক বযস (mental age) ও প্রকৃত বযস (chronological age) সমান বলে ধবে নিযে তাকে দেওযা হতো ১০০ নম্বব। অর্থাৎ দশ বছবেব কোনও বালক দশ বছবেব জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত প্রশ্নেব ঠিক উত্তব দিতে পাবলে তাকে দেওযা হবে ১০০। এব অর্থ দশ বছব বযসে সাধাবণ মানেব ছেলেমেযেদেব যে ধবনেব বুদ্ধি থাকা উচিত, তা আছে। ১০ বছবেব বালকটি ২০ বছব বযসেব জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নেব সবগুলোব ঠিক উত্তব দিতে পাবলে তাব প্রাপ্য বুদ্ধি পবিমাপক সংখ্যাটি বাব কবতে হলে যে বযসেব উপযোগী প্রশ্নেব উত্তব দিচ্ছে, সেই মানসিক বযসেব সংখ্যাটিকে উত্তবদাতাব প্রকৃত বযসেব সংখ্যা দিযে ভাগ কবে ১০০ দিযে গুণ কবতে হবে। এই ক্ষেত্রে বালকটিব বুদ্ধি পবিমাপক সংখ্যাটি হবে $\frac{২০}{১০} \times ১০০ = ২০০$। আবাব দশ বছবেব বালকটি যদি কেবল মাত্র ৫ বছবেব একটি শিশুব বযসেব উপযোগী প্রশ্নগুচ্ছেব উত্তব দিতে সক্ষম হয, তবে তাব মানসিক বযস ধবা হবে ৫। অতএব বালকটিব বুদ্ধি পবিমাপক সংখ্যাটি হবে $\frac{৫}{১০} \times ১০০ = ৫০$। মানসিক বযস — প্রকৃত বযস × ১০০ কবলে বেবিযে আসবে বুদ্ধি পবিমাপক সংখ্যাটি।

বিশ শতকেব প্রথম দশকে আলফ্রেড বিনেট যে বুদ্ধি পবিমাপক প্রশ্নাবলী তত্ত্ব হাজিব কবেছিলেন, বিভিন্ন সমযে তাব পবিবর্তন, পবিবর্ধন ও সংশোধনেব নামে বিকৃতকবণেব পব আমবা পেলাম বর্তমান আই কিউ-এব রূপ। ব্রিটেন ও আমেবিকাব বর্ণবিদ্বেষীবা আউ-কিউকে সামাজিক শ্রেণী ও জাতি গোষ্ঠীব ক্ষেত্রে প্রযোগ শুরু কবলো। অর্থাৎ, যে আই কিউ বিনেট প্রযোগ কবা শুরু কবেছিলেন ব্যক্তিব ক্ষেত্রে, তাই প্রযুক্ত হতে লাগলো সমষ্টিব ক্ষেত্রে। বিকৃতকাবীবা এই প্রযোগেব দ্বাবা তথ্য সংগ্রহেব মাধ্যমে প্রমাণ কবতে চাইলো, সাদা চামডাদেব আই-কিউ কালো চামডাদেব চেযে অনেক বেশি, আই কিউ মেধা বা বুদ্ধিব পবিমাপক এবং মেধা বা বুদ্ধি অপবিবর্তনশীল। অর্থাৎ জন্মগতভাবে সাদা চামডাদেব মেধা ও বুদ্ধি কালো চামডাদেব তুলনায অনেক উন্নত।

আই কিউ-এব প্রযোগ সামাজিক শ্রেণী, বর্ণ বা জাতি গোষ্ঠীব উপব প্রযোগ না কবে ব্যক্তিব ক্ষেত্রে প্রযোগ কবলেই আই কিউ অভীক্ষাব প্রশ্নাবলী নির্ভবযোগ্যতা পাবে, এমনটা ভাবাবও কোন যুক্তিগ্রাহ্য কাবণ নেই। কাবণ প্রযোজনীয বা উপযুক্ত অনুশীলনে আই কিউ বাডানো সম্ভব, এমনকি স্মৃতিকেও বাডানো সম্ভব। প্রতিভা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, যা আই কিউ-এব প্রাপ্ত সংখ্যা বা পবীক্ষা সাফল্যেব ওপব সব সময নির্ভব কবে না। বহু ক্ষেত্রেই আই কিউ-এব সাহায্যে জিনিযাস দূবে থাক, বুদ্ধি

বৃত্তিরও কোনও হদিশ মেলে না। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যার 'নিউ সাইনটিস্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক একজেটার (Exeter বিশ্ববিদ্যালয়ের Human cognition বিভাগের অধ্যাপক এম হাও (M Howe) সত্তর জন বিরল সংগীত প্রতিভার জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—

জিনিয়াস তৈরি হয়,জন্মায় না (Geniuses may be made rather than born)

আমরা পরীক্ষার সাফল্য নিয়ে বিচারে বসলে আইনস্টাইন, ডারউইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু প্রমুখ বহু প্রতিভাধরদের ক্ষেত্রেই একেবারে বোকা বনে যেতাম।

বংশগতি বা জিন প্রসঙ্গে কিছু কথা

বিগত একশো বছরে আমরা Biological determinist (এঁরা মনে করেন মানব প্রতিভা বিকাশে জিনই সব) Cultural determinist (এঁদের মতে পরিবেশই মানব প্রতিভা বিকাশে সব) এবং Interactionist (এঁদের মতে জিন ও পরিবেশ দুইই মানব প্রতিভা বিকাশে ক্রিয়াশীল)-এদের নানা বক্তব্য ও ব্যাখা শুনেছি। সে-সব নিয়ে সামান্য আলোচনায় ঢোকার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ইদানীং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ব্যাপক গবেষণা চলছে মানুষের বুদ্ধির ওপর বংশগতি বা জিনের প্রভাব ও পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে।

আধুনিক বংশগতি বিদ্যা ও জিন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে আপনাদের মূল বিষয় জানার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে চাই না। জিন আলোচনা তাই স্বল্প বাক্যে সীমাবদ্ধ রাখবো।

মানুষের জন্মের শুরু ডিম্বকোষ শুক্রাণুদ্বারা নিষিক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকে। নিষিক্ত কোষ দু-ভাগ হয়ে গিয়ে হয়ে যায় দু-টি কোষ। দুটি কোষ বিভক্ত হয়ে হয় চারটি কোষে। এমনিভাবে চার থেকে আট, আট থেকে ষোল—প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত বিভাজন ক্রিয়া চলতেই থাকে।

বেশিরভাগ কোষের দুটি অংশ। মাঝখানে থাকে 'নিউক্লিয়াস' ও তার চারপাশে ঘিরে থাকে জেলির মত জলীয় পদার্থ 'সাইটোপ্লাজম'। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে 'ক্রোমোজোম'। এই ক্রোমোজোম আবার জোড়া বেঁধে অবস্থান করে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোম আবার এক বিশেষ ধরনের 'ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড'-এর (Deoxyribonucleic

acid) অণুর সমষ্টি—সংক্ষেপে ডি এন এ। দু-গাছা দড়ি পাকালে যেমন দেখতে হবে, অণুগুলো তেমনি ভাবেই পরস্পরকে পেঁচিয়ে থাকে। সব প্রাণীর বংশগতির সংকেত এই ডি এন এ-তেই ধরা থাকে। ডি এন এ থেকে আর এন এ বা (Ribonucleic acid) তৈরি হয়। আর এন এ থেকে তৈরি হয় প্রোটিন (Protein)।

২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রতিটি জোড়ার ক্ষেত্রে একটি আসে পুরুষের শুক্রাণু থেকে, অন্যটি নারীর ডিম্বাণু কোষ থেকে। ক্রোমোজোমের এই জিন এককভাবে বা অন্য জিনের সঙ্গে মিলে দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। চুলের রঙ, চোখের তারার রঙ, দেহের রঙ ও গঠন, রক্তের শ্রেণী (O, A, B, AB) ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ বিশেষ জিনের ভূমিকা রয়েছে।

জিন বিষয়ক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা মনে করেন নারী-পুরুষের মিলনের ফলে ক্রোমোজোমের সংযুক্তি ৮০ লক্ষ রকমের যে কোনও একটি হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই দেখা যায়, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে বহু ধরনের অমিল থাকতেই পারে। লম্বা-বেঁটে, মোটা-রোগা, বাদামী চোখ, নীল চোখ, শান্ত-ছটফটে ইত্যাদি।

মা-বাবার চোখের মণি কালো, কিন্তু সন্তানের চোখের মণি কটা, মা বাবা স্বল্প দৈর্ঘ্যের মানুষ সন্তান বেজায় লম্বা, মা বাবা ফর্সা সন্তান কালো অথবা এর বিপরীত দৃষ্টান্তও প্রচুর চোখে পড়বে একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেললে। বাবা সন্তানের প্রকৃত জনক হলেও এমনটা ঘটা সম্ভব। কিছু মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, পিতা সন্তানের প্রকৃত জনক হলেও এমন ঘটা সম্ভব একাধিক বা বহু প্রজন্ম পরে জিনের সুপ্তি ভাঙার জন্য। যেখানে বাবাই প্রকৃত সন্তানের জনক সেখানে অনুসন্ধান চালালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাবে সন্তানটির মা অথবা বাবার পূর্বপুরুষদের কারো না কারো চোখের মণি ছিল কটা, কেউ না কেউ ছিলেন লম্বা, গায়ের রঙ ছিল কালো ইত্যাদি। আমার এক নিকট আত্মীয়ার দু-হাতের কড়ে আঙুল থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাড়তি দুটো আঙুল। আত্মীয়ার নামটি প্রকাশ করায় অসুবিধে থাকায় আমরা এখানে বোঝার সুবিধের জন্য ধরে নিলাম, নামটি তার মাধুরী। মাধুরীর মা এবং বাবার নাম মনে করুন মিতা ও আদিত্য। মিতা ও আদিত্যের কোনও হাতেই বাড়তি আঙুল নেই। মাধুরীর এই বাড়তি আঙুলের মধ্যে আদিত্য রহস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। মিতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। নিজেকে মাধুরীর জনক হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। স্রেফ দুটি বাড়তি আঙুল ওদের শান্তির পরিবারে নিয়ে এসেছিল অশান্তির আগুন।

ওঁদের অশান্তির কথা আমার কানেও এসেছিল। মিতা বাবাকে হারিয়ে ছিলেন শৈশবে। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে জানতে পারি, মিতার বাবার দু'কড়ে আঙুল থেকেই বেরিয়েছিল বাড়তি দুটি আঙুল। একটা পুরোন ছবিও উদ্ধার করা গিয়েছিল, যাতে মিতার মা ছিলেন চেয়ারে বসে, বাবা দাঁড়িয়ে। বাঁ হাতের দৃশ্যমান কড়ে আঙুল নজর করলেই চোখে পড়ে বাড়তি আঙুল। এটুকু বললে বোধহয় খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আদিত্যকে বুঝিয়েছিলাম, জিনের সুপ্তি ভাঙার তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের মতামত। ওদের পরিবারে ফিরে এসেছিল শান্তি।

এই তত্ত্ব ঠিক হলে এমনটা ঘটাও অস্বাভাবিক নয়—যে পূর্বপুরুষের প্রতিভা

বিকশিত হওযাব সম্ভাবনা ছিল, অনুকূল পবিবেশেব অভাবে বিকশিত হযনি, সেই প্রতিভাই আজ বিকশিত হযেছে উত্তব-পুরুষেব মধ্যে।

বিস্ময়কব স্মৃতি নিযে দু-চাব কথা

বেদ বচিত হযেছিল ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বে। সে-যুগেব ঋষিবা বেদকে লিপিবদ্ধ না কবে কণ্ঠস্থ কবে বাখতেন। বিপুল সংখ্যক শ্লোকগুলো তাঁবা যে অসাধাবণ স্মৃতিব মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চাবণে, সুব ও ছন্দ বজায বেখে কণ্ঠস্থ বেখেছিলেন, তা বাস্তবিকই অতি-বিস্ময়কব।

প্রাচীন যুগে স্মৃতিব সাহায্যেই গুরু শিক্ষাদান কবতেন। শিষ্যবাও তা স্মৃতিতেই ধবে বাখতেন এবং পববর্তীকালে স্মৃতিকে কাজে লাগিযেই শিক্ষা দিতেন। স্বভাবতই সে যুগেব পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুদেব স্মৃতি হযে উঠেছিল অসাধাবণ। তাঁদেবই কিছু কিছু প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (recessive) জিন বিবর্তন পবম্পরায বাহিত হযে বহু প্রজন্ম পবে কোনও ব্যক্তিব মধ্যে এসে থাকতে পাবে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিন ঋষিবা পেয়েছিলেন কোন্ পূর্বপুরুষের থেকে? আসলে এঁবা শ্লোকগুলো স্মৃতিতে ধবে বাখতে তীব্রভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রযোজনে স্মৃতিতে ধবে বাখতে বাধ্য হযেছিলেন।

এত দীর্ঘ সময় কি জিন প্রচ্ছন্নভাবে নিজ বৈশিষ্ট্যকে বজায বাখতে সক্ষম? এই প্রশ্নেব উত্তবে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীবা উদাহবণ হাজিব কবেন—অনেক শিশু জন্মায মনুষ্যেতব প্রাণীব অঙ্গ নিযে—যেমন ছোট্ট 'লেজ' একটি দৃষ্টান্ত। তাঁদেব মতে মনুষ্যেতব যে প্রাণীটি অতীতে ছিল, তাবই প্রচ্ছন্ন জিনেব বর্তমান উপস্থিতিই এব জন্য দাযী।

একান্ত প্রযোজনে ঋষিবা বা গুরুবা শাস্ত্রকে স্মৃতিতে ধবে বাখতেন, তেমন উদাহবণ এ যুগে আমাদেব দেশে বিবল হলেও অসম্ভব নয। বিদেশে প্রচুব উদাহবণ তো আছেই। আমেবিকা যুক্তবাষ্ট্রে তুমুল আলোড়ন তুলেছে কর্নাটকেব যুবক বাজেন শ্রীনিভাসন মহাদেবন। অংক শাস্ত্রে 'পাই' π এব অর্থ বৃত্তেব পবিধিকে ব্যাস দ্বাবা ভাগেব ফল। এই ফল প্রায ২২-৭ এবং মোটামুটি ধবে নেওযা হয সংখ্যাটা ৩.১৪। কাবণ দশমিকেব পব সংখ্যাব শেষ নেই। ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫ এভাবে চলতেই থাকবে। বাজন ১৯৮১ সালে ৫ জুলাই গিনিস বুক অফ ওযার্ল্ড রেকর্ড-এব নেওযা পবীক্ষায দশমিকেব পব ৩১, ৮১১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একেব পব এক বলে গেছে নির্ভুল ভাবে স্মৃতি থেকে। সময লেগেছিল ৩ ঘন্টা ৫৯ মিনিট। প্রতি মিনিটে বাজন বলেছিল গড়ে ১৫৬৭টি কবে সংখ্যা। কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে বলেছিল, ভাবতে অবাক হতে হয। এখানেই বাজনেব বিস্ময়কব স্মৃতিব শেষ নয, ও উল্টো দিক থেকেও 'পাই' বলে যেতে পাবে। বাজনেব এই অনন্যসাধাবণ স্মৃতি-শক্তিব কার্য-কাবণ জানতে আমেবিকান বিজ্ঞানীবা ১ লক্ষ ৫৭ হাজাব ডলাবেব গবেষণা প্রকল্পে হাত দিযেছেন।



বাজেন শ্রীনিবাসন মহাদেবন

বাজন-বিস্ময এখানেও শেষ নয। 'গীতা' বাজনেব মুখস্থ। স্মৃতি থেকে বলে যেতে পাবে ব্র্যাডমানেব লেখা 'ফেযাবওযেল টু ক্রিকেট' বইটিব প্রতিটি লাইন, ভাবতীয বেলওয়ের 'টাইম টেবিল' ওব কণ্ঠস্থ দূবত্ব, ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য সবই স্মৃতি থেকে যখন তখন আহবণ কবতে পাবে।

বিদেশেব প্রচুব উদাহবণ থেকে একটি দিই। জাপানেব হিদেযাকি টোমোওবি ১৯৮৭ সালে রাজনেব গিনিস বেকর্ড ভেঙে বলেছে দশমিকেব পব ৪০ হাজাব পর্যন্ত সংখ্যা। বাজনও ছাড়াব পাত্র নয। প্রস্তুত হচ্ছে ১ লক্ষ সংখ্যা পর্যন্ত বলে বেকর্ডকে নিবাপদে বাখতে।

পানিহাটিব এক পণ্ডিতেব অসাধাবণ স্মৃতিব কথা আজও কিংবদন্তি হযে বযেছে। পণ্ডিতেব নাম জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তখন ইংবেজ আমল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একদিন নিত্যকাব মত গেছেন গঙ্গা স্নানে। ঘাটে তখন দুই সাহেবেব মধ্যে তুমুল ঝগড়া আব হাতাহাতি চলছে। কযেক দিনেব মধ্যে দুই সাহেবের লড়াই গড়ালো আদালতেব কাঠগোড়ায। সাক্ষ্য দিতে পণ্ডিতেব ডাক পড়ে। পণ্ডিত সাক্ষ্য দিতে গিযে দু'জনেব হুবহু ইংরেজি কথোপকথন তুলে ধবেন বিচাবকেব সামনে। বাদী-বিবাদী দু-জনেই পণ্ডিতেব বক্তব্যেব সত্যতা মেনে নিলেন। বিচাবক পণ্ডিতেব স্মৃতিশক্তিব পবিচয় পেযে অবাক। বললেন, "আপনি এতদিন আগেব দু'জনেব প্রতিটি কথা কি কবে মনে বাখলেন? সত্যিই আপনাব অসাধাবণ স্মৃতি।"

পণ্ডিত তো সাহেবেব ইংবেজি বুঝতে না পেবে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে পেশকাবকে জিজ্ঞেস কবলেন, "সাহেব কি বলছেন?"

পণ্ডিতকে পেশকাব বললেন, "সে কি, আপনি ইংবেজি জানেন না?"

পণ্ডিত জানালেন, "না।"

"তাহলে দু-সাহেবেব এত ঝগড়াব কথা মনে বাখলেন কি কবে?"

পণ্ডিতেব সবল জবাব, "সে তো শুনেছিলাম, তাই মনে ছিল।"

পেশকাবেব কাছে পণ্ডিতেব কথা শুনে বিচাবক তো আবো অবাক্‌। এমন আশ্চর্য স্মৃতিও মানুষেব হয।

'দুর্বল স্মৃতি' বলে কিছু নেই, ঘাটতি শুধু স্মবণে

একটা কথা বলি। অনেকেব কাছেই হযতো অদ্ভুত শোনাবে। স্বাভাবিক মস্তিষ্কেকোষেব অধিকাবী মানুষদেব ক্ষেত্রে 'দুর্বল স্মৃতি' বলে কিছু নেই। আমাদেব স্মৃতি-শক্তিব একটা পর্যায সংবক্ষণ (Retention)। শেষ পর্যাযে আছে স্মরণ (Recall)। যা দেখি, যা শুনি সে-সব সংবক্ষণেব বিষযে আমাদেব কাকবই কোনও ঘাটতি নেই। স্মবণেব ক্ষেত্রেই দেখা যায আমাদেব নানা ধবনেব ত্রুটি।

আমাব কর্মক্ষেত্রে একটি ছেলে ঘুবে ঘুবে আমাদেব চা দিত। প্রতিদিন দেডশো মানুষকে চা খাওযাতো। কেউ নিতেন এক কাপ, কেউ দু'কাপ, কেউ অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানাতে নিতেন পাঁচ কাপ। প্রতিদিনই প্রায সকলেব ক্ষেত্রেই হিসেবেরও তাবতম্য হতো। কাল যিনি এক কাপ নিযেছিলেন, আজ তিনি হয তো নিযেছেন তিন কাপ। 'টি-বয' ছেলেটি প্রত্যেকেব হিসেব স্মৃতিতে ধবে বাখতো এবং প্রয়োজনেব সময স্মবণ কবতে পাবতো। এমনকি সে পাঁচ কাপেব হিসেব দিলে যদি কেউ অভ্যাগতব কথা ভুলে তিন কাপ নিযেছেন বলে জানাতেন, 'টি বয' ছেলেটিই মনে কবিযে দিত—'এগাবোটা নাগাদ নীলশার্ট সাদা প্যান্ট পবা এক ভদ্রলোককে এক কাপ চা খাওযালেন, দুটো তিবিশ নাগাদ একটা ঝাঁকডা চুলো ইযং ছেলেকে খাওযালেন এক কাপ।' এমন অসাধাবণ স্মৃতিব অধিকাবী ছেলেটিব দৃঢ় ধাবণা, ওব স্মৃতি খুবই দুর্বল তাই লেখাপডা শেখা হযে ওঠেনি।

আমাব শৈশব কেটেছে পুকলিযা জেলাব ছোট্ট বেল-শহব আদ্রাব বড-পলাশখোলায। বোজকাব দুধ নেওযা হতো একটি আদিবাসী প্রবীণাব কাছ থেকে। তিনি ছিলেন নিবক্ষব। কিন্তু কবে কতটা বাডতি দুধ বাখতাম, তাব পাক্কা হিসেব বাখতেন। ওঁকে জিজ্ঞেস কবেছিলাম, "তুমি তো আবো অনেক বাডিতেই দুধ দাও, না লিখে সবাব বাডিব হিসেব বাখ কি কবে।"

প্রবীণা জানিযেছিলেন, "কী কবে আবাব ? সে তো মনে থেকেই যায।"

সে সময প্রবীণাব উত্তবে অবাক হযে গিযেছিলাম, ভেবেছিলাম মা মুদিব দোকান থেকে সাতটা জিনিস আনতে বললে ছ'টা আনি, একটা ভুলে যাই, আব ও এত বাডিব এত হিসেব মনে বাখে কী কবে ?

এমন অনেক মা-বাবা আমাব কাছে এসেছেন, যাঁদেব সমস্যা সন্তানেব দুর্বল স্মৃতিশক্তি। পডলে মনে থাকে না, পবীক্ষাব ফল খাবাপ হচ্ছে। সন্তানদেব সঙ্গে কথা বলে দেখেছি এদেব অনেকেই এক একটি জীবন্ত তথ্যভাণ্ডাব। কেউ কপিল, ববি শাস্ত্রী, ইমবান, মুদস্‌সব নজব, আজাহাবউদ্দিন, হ্যাডলি, বণতুঙ্গেব ব্যাটিং, বোলিং-এব গড বলে চলেছে , কেউ বা ব্রুস লী, সিলভেস্টাব স্ট্যালোন প্রমুখদেব বহু তথ্য স্মৃতি থেকে উদ্ধাব কবে অনর্গল বলে চলেছে চবম উত্তেজনাব সঙ্গে। কোনও কিশোবীকে দেখেছি

বোম্বের নায়ক-নায়িকাদের যত খবর জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত হয় সবই কণ্ঠস্থ। কেউবা টিমা, চিবুজোব, সুব্রত, মনোরঞ্জনের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানে। এর পরও এদের কাউকেই কি আমরা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার জন্য অভিযুক্ত করতে পারি? ওরা সেই সব তথ্যই মনে রাখে যা মনে রাখতে ওরা খুব ভালোবাসে অথবা প্রয়োজনে বাধ্য হয়। আমাদের টি-বয়টি বা আদিবাসী দুধওয়ালী অমনি বাধ্য হয়ে মনে রাখার নজির। অমন নজির আরো বহু সহস্র আছে। আমার জীবনেই অমন বহু নজির দেখেছি। আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় দেখেছেন।

মানবগুণ বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব

আমাদের মানসিক জিন বৈশিষ্ট্য কিন্তু পুরোপুরি জিন বা বংশগতি প্রভাবিত নয়। পরিবেশও আমাদের মানসিক বৃত্তির ওপর বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

আমরা যে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয় পশুর মত জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করি—এ-সবের কোনোটাই জন্মগত নয়।

এইসব অতি সাধারণ মানব-ধর্মগুলোও আমরা শিখেছি, অনুশীলন দ্বারা অর্জন করেছি। শিখিয়েছে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোই, অর্থাৎ আমাদের সামাজিক পরিবেশ।

মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনের প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হবার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা (Protentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, পরিচিত ও আশেপাশের মানুষরা অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ। এই মানব শিশুই কোনও কারণে মানুষের পরিবর্তে পশু সমাজের পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে সেই পশু সমাজের প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। আমার সমবয়স্ক বা তার চেয়ে প্রাচীন সংবাদ পাঠকদের অনেকেরই জানা নেকড়েদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া 'রামু' ও 'কমলার' ঘটনা। নেকড়েদের ডেরা থেকে বালক-বালিকা দুটিকে উদ্ধার করার পর তাদের এই নামকরণ করা হয়েছিল। ওরা দুজনেই হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতো, জিব দিয়ে চেটে জল পান করতো, রান্না করা খাবার খেত না। কথাও বলতে জানতো না, পরিবর্তে নেকড়ের মতই আওয়াজ করতো। এরা মানুষের সমাজের সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পেরে বেশি

দিন বাঁচেনি।

আমাব আপনাব পবিবারেব কোনও শিশু সভ্যতাব আলো না দেখা আন্দামানেব আদিবাসী জাডোয়াদেব মধ্যে বেড়ে উঠলে তাব আচাব আচবণে, মেধায জাডোযাদেবই গড প্রতিফলন দেখতে পাব। আবাব একটি জাডোযা শিশুকে শিশুকাল থেকে আপনি-আমি আমাদেব সামাজিক পবিবেশে মানুষ কবলে দেখতে পাব শিশুটি বড হযে আমাদেব সমাজেব আব দশটি ছেলে-মেযেব গড বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধাব পবিচয দিচ্ছে। কিন্তু একটি মানুষেব পবিবর্তে একটি বনমানুষকে বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদেব সামাজিক পবিবেশে মানুষ কবলেও এবং আমাদেব পবিবাবেব শিশুব মতই তাকেও পডাশোনা শেখাবাব সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদেব সমাজেব স্বাভাবিক শিশুদেব বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধাব অধিকাবী কবতে পাববো না , কাবণ ওই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিব ভিতব বংশগতিব ধাবায বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায তা অনুকূল পবিবেশ পেলেও বিকশিত হওযা কোনও ভাবেই সম্ভব নয। অর্থাৎ মানব গুণ বিকাশে জিন ও পবিবেশ দুযেবই প্রভাব বিদ্যমান।

আমাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে অনুকূল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে । জিনগত কারণে বা বংশানুক্রমিক কারণে পশুদের মধ্যে মানবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে পশুদের মানবিক গুণের অধিকারী করা সম্ভব নয় ।

এই তত্ত্ব আজ সমস্ত মনোবিজ্ঞানীদেব স্বীকৃতি পেযেছে।

মানবগুণ বিকাশে পবিবেশেব প্রভাব

একটি মানুষেব শিশু বযস থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানবিক গুণেব ক্রমবিকাশেব বিষযে উন্নততব দেশগুলোতে বহু পবীক্ষা-নিবীক্ষা চালান হযেছে এবং এখনও হচ্ছে। ওইসব দেশেব মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীবা এখন স্বীকাব কবেই নিযেছেন—মানুষেব বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পবিবেশ দ্বাবা প্রভাবিত। সেই কাবণে "মানবিক গুণেব বিকাশে কাব প্রভাব বেশি—বংশগতি অথবা পবিবেশ ?" এই জাতীয শিবোনামেব বিতর্কে ওসব দেশেব বিজ্ঞানীবা আজকাল আব অবতীর্ণ হন না, এককালে যেমনটি হতেন। তবে এখনও এদেশেব বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানী বংশগতিকে অত্যধিক বা

চূড়ান্ত গুরুত্ব দিতে গিযে আধুনিক বিজ্ঞানীবা পবীক্ষা-নীবিক্ষাব মাধ্যমে যে সব তথ্য সংগ্রহ কবেছেন তাকেই অস্বীকাব কবে বসেন, নাকচ কবে দেন। এমনটা কবাব কাবণ সম্ভবত, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেব অগ্রগতি বিষযে খোঁজ-খবব না বাখা, এক সময বিজ্ঞান নিযে পড়াশোনা কবাব পব প্রতিষ্ঠা পেতেই নিশ্চল হযে যাওযা।

বিজ্ঞানীবা কিন্তু বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, বিগত বহু হাজাব বছবেব মধ্যে মানুষেব শাবীববৃত্তিক কোনও উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন হযনি।

এই কম্পিউটার যুগের আধুনিক সমাজের মানব শিশুর সঙ্গে বিশ হাজার বছর আগের ভাষাহীন, কাঁচামাংসভোজী সমাজের মানব শিশুর মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না।

অর্থাৎ সেই আদিম যুগেব মানব শিশুকে এ-যুগেব অতি উন্নততব বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী কোনও সমাজে বড় কবতে পাবলে ওই আদিম যুগেব শিশুটি আধুনিকতম উন্নত সমাজেব গড় মানুষদেব মতই বিদ্যে-বুদ্ধিব অধিকাবী হতো। হয তো গবেষণা কবত মহাকাশ নিযে অথবা সুপাব-কম্পিউটাব নিযে, অর্থাৎ অনুকূল পবিবেশে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠাব সুযোগ পেলে এশিযা, আফ্রিকা, লাতিন আমেবিকান দেশেব নিবন্ন, হতদবিদ্র, মূর্খ মানুষগুলোও হতে পাবে ইউবোপ, আমেবিকা যুক্তবাষ্ট্র বা জাপানেব উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যাব মধ্যে গড়ে ওঠা মানুষগুলোব সমকক্ষ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যেব জন্য স্বাতন্ত্র্যতা নিশ্চযই থাকতো, যেমনটি এখনও থাকে।

বর্ণপ্রাধান্য, জাতিপ্রাধান্য, পুরুষপ্রাধান্য বজায বাখতে বিজ্ঞানেব বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিযে এক ধবনেব প্রচাব চালান হয, উন্নত দেশেব উন্নতিব মূলে বযেছে তাদেব বর্ণেব, তাদের জাতিব মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষতা ও বৈশিষ্ট্য। পুরুষবাও একইভাবে প্রচাব কবে নাবীব চেযে তাদেব মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকর্ষতাব। বুদ্ধি মাপেব নামে বুদ্ধ্যাঙ্ককে কাজে লাগিযে অনেক সাদা-চামড়াই প্রমাণ কবতে চায কালো চামড়াব তুলনায তাদেব মেধা ও বুদ্ধিব উৎকর্ষতা। আবাবও বলি এ যুগেব বিজ্ঞানীবা কিন্তু যে বংশগতিব তথ্য হাজিব কবেছেন, তাকে স্বীকাব কবলে বলতেই হয, অনুকূল সুযোগ সুবিধে না পাওযাব দরুনই নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষগুলো অনুকূলতাব সুযোগ পাওযা মানুষেব মত মানবিক গুণগুলোকে বিকশিত কবাব সুযোগ পাযনি।

এ কথাও সত্যি সামান্য অনুশীলনেই কিন্তু বুদ্ধ্যাঙ্কপ্রচুর বাড়ানো সম্ভব—প্রজ্ঞা বা মেধাকে আদৌ না বাড়িযেই।

বাশিযাব শিক্ষাসংক্রান্ত আকাদেমিব (Pedagogical Acedemy)-ব পূর্ণ সদস্য এ

পেট্রোভস্কি (A Petrovsky)-র পঠিত প্রবন্ধ থেকে জানতে পারছি—স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই শিশুদের অনেক বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের কার্যক্রম রাশিয়ায় গ্রহণ করা হয়েছে যাতে বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা সৃষ্টি করা যায়। দু-সপ্তাহের শিশুকে সাঁতার শেখান হচ্ছে, স্কুলে ঢোকার আগেই তিন মিটার স্প্রিং বোর্ড থেকে ডাইভিং শিখছে। অনুকূল সুযোগ অনেককেই বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। অনেকে প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে পরিণত বয়সে।

পরিবেশকে আমরা প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। এক প্রাকৃতিক পরিবেশ, দুই · সামাজিক পরিবেশ। মানব জীবনকে এই দুই পরিবেশই প্রভাবিত করে।

মানব-জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হলেও পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে অনুকূলে আনার চেষ্টা কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আমাদের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যতা দিয়েছে। আমরা যে অঞ্চলে বসবাস করি তার উচ্চতা, তাপাঙ্ক, বৃষ্টিপাত, জমির উর্বরতা ইত্যাদির উপর আমাদের বহু শারীরিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। তাইতেই গ্রাম-বাংলার মানুষের সঙ্গে পাঞ্জাবের মানুষের, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মানুষদের, আফ্রিকার দক্ষিণবাসী মানুষদের সঙ্গে ইউরোপের মানুষদের, মেরু অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে মরু অঞ্চলের মানুষদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখতে পাই।

বিজ্ঞানরা স্বীকার করেন—চুলের রঙ, দেহের রঙ, চোখের তারার রঙ, দেহ গঠন, ইত্যাদির মত অনেক কিছুর পিছনেই যদিও জিন বা বংশগতির অবদান যেমন আছে, তেমনই এও সত্যি—দীর্ঘকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব শরীরগত নানা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যই আবার জিনকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানীরা এও স্বীকার করেন—অতি বিস্ময়কর জটিল আধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও ডি এন-এর ক্ষমতা ও কার্যকলাপ অনেক বেশি জটিল এবং অনেক বেশি বিস্ময়কর।

প্রকৃতির প্রভাব যে দেহগত বৈশিষ্ট্য, দেহ বর্ণের উপর প্রভাব ফেলে থাকে, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ আমাদের নেই। পরিবর্তে বিষয়টা বুঝতে আমরা একটি দৃষ্টান্তকে ধরে নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

যে মনুষ্যগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের চামড়ার নীচে ঘোর কৃষ্ণ রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি ঘটেছে তীব্র তাপ থেকে দেহের ভেতরের যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করতে। শরীরের ভেতরে যন্ত্রপাতিকে বাঁচানোর প্রয়োজনেই দেহ বর্ণের এই পরিবর্তন বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে সূচিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু আমাদের শরীরবৃত্তির ওপর নয়, মানসিকতার ওপরও

প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলের চাষী উর্বর জমির মালিক, সহজেই সেচের জল পায়, সে অঞ্চলের চাষীরা আয়াসপ্রিয় হয়ে পড়ে। হাতে বাড়তি সময় থাকার জন্য গ্রামীণ নানা সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে। এমনি ভাবেই তো বঙ্গ সংস্কৃতিতে এসেছে 'বারো মাসে তের পার্বণ'। আবার একই সঙ্গে আয়াসপ্রিয়তা আমাদের আড্ডা প্রিয়, পরনিন্দা প্রিয়, ঈর্ষাকাতর, তোষামোদ প্রিয় ইত্যাদির মত বদ্‌দোষের পাশাপাশি বড় বেশি নিরীহ, আপোষমুখি করতেই পারে, দূরে সরিয়ে রাখতে পারে লড়াকু মানসিকতাকে, যদি না সামাজিক পরিবেশের প্রভাব তাদের এইসব দোষ থেকে মুক্ত করে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বা মরু অঞ্চলের মানুষ নিজেদের ন্যূনতম খাদ্য পানীয় সংগ্রহেই, বেঁচে থাকার সংগ্রামেই দিন-রাতের প্রায় পুরোটা সময়ই ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের পক্ষে বুদ্ধি, মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ করার মত সময়টুকুও থাকে না।

আবার যে অঞ্চল পেট্রলের ওপর ভাসছে, সে অঞ্চলের মানুষদের পায়ের তলাতেই তো গলানো সোনা। আয়াসহীন ভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচুর্যের অধিকারী যে ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে পারে না তাদের সুবিশাল আয়ের ভগ্নাংশটুকুও। শ্রমহীন, প্রয়াসহীন মানুষগুলো স্রেফ প্রকৃতির অপার দাক্ষিণ্যে ধনকুবের বনে গিয়ে ভোগ সর্বস্ব হয়ে পড়ে। ভোগ থেকে কিছু সময় বুদ্ধি মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে খরচ করতেও এদের অনীহা হিমালয়ের মত বিশাল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কী প্রয়োজন শ্রমে, বুদ্ধি মেধা বাড়াবার শ্রমে? জীবিকার জন্যেই তো? প্রাচুর্য যেখানে অসীম, ফুরিয়ে দেওয়ার ফুরসৎ নেই, সেখানে শ্রম একান্তই নিষ্প্রয়োজন। পেট্রল-খনির মালিকদের অর্থ প্রাচুর্যের ছোঁয়া লাগে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যেও। অনেক কম শ্রমে অনেক আয়াস কেনার সুযোগ গড়াগড়ি দেয় এদের হাতের মুঠোয়। প্রায় আয়াসহীন প্রাচুর্য এদেরও ভোগ-সর্বস্ব করে। ফলে মানসিক প্রগতি এই অঞ্চলের মানুষদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে যাদের বাসভূমি তাদের না আছে আবাদী জমি, না আছে শিল্প-কারখানা, না আছে কাজ পাওয়ার সুযোগ। বেঁচে থাকার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সামান্যতম খাদ্য পানীয় যোগাড় করতে এরা প্রতিটি দিন যে সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রামই এদের অনেক বেশি অনমনীয় করে তোলে। আবার যে সব পাহাড়ি অঞ্চল ঘিরে ভ্রমণ ব্যবসা জমে উঠেছে, সে অঞ্চলের মানুষরা ভিন্নতর মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষদের যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে।

বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় দীর্ঘস্থায়ী হলে বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষদের অনেকেই কষ্টকর এই চাপের মুখে মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়েন, এবং মানসিক রোগের কারণেই রক্তচাপ বৃদ্ধি, হাঁপানি, আন্ত্রিক ক্ষত, বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগও অনেকেই ভোগ করেন।

মানবিক গুণের বিকাশে জনসংখ্যার ঘনত্বেরও কিছু প্রভাব আছে। ঘনবসতি

অঞ্চলে বেড়ে ওঠা কিশোর-কিশোরীরা না পায় খেলার মাঠ, না দেখে মুক্ত আকাশ। বিরল বসতি বা পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠা অঞ্চলে যে সব ছেলে মেয়েরা বড় হয়, তারা পার্কে ঘোরে, মাঠে খেলে, নদীতে বা পুকুরে সাঁতার দেয়, নীল আকাশ, সবুজ গাছ, সবই তাদের ভিন্ন ভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এখান থেকেই দেশের ভবিষ্যৎ সাঁতারু, ভবিষ্যৎ ফুটবলার, ক্রিকেটার কি অ্যাথেলিট তৈরি করে।

সামাজিক পরিবেশের দু'টি ভাগ

সামাজিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

সামাজিক পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করলে সুবিধে হয়। এক আর্থ-সামাজিক, দুই · সমাজ-সাংস্কৃতিক।

মানব-জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাব

দরিদ্র ও উন্নতিশীল দেশে, যেখানে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে রয়েছে বঞ্চনা ও অনিশ্চয়তা, সেখানে মানুষের জীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এ-সব দেশের সংখ্যাগুরু জনসাধারণের হাতে নেই জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ, নেই চিকিৎসার সুযোগ, নেই শিক্ষা লাভের সুযোগ, আছে অপুষ্টি, আছে রোগ, আছে পানীয় জলের অভাব, আছে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকুরও অভাব, আছে বঞ্চনা, আছে দুর্নীতি, আছে শোষণ।

শৈশবে সন্তানের সবচেয়ে কাছের মানুষ মা। মায়ের স্বাস্থ্য, মায়ের মানসিকতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সন্তানের স্বাস্থ্য ও মানসিকতা। মায়ের অপুষ্টি, মায়ের বুকের দুধ দানের অক্ষমতা, শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে অক্ষমতা· যে অক্ষমতার কারণ মাকে বেঁচে থাকার ভাত রুটি যোগাড়েই জেগে থাকা সময়ের পুরোটাই প্রায় ব্যয় করতে হয়। সময়ের অভাব ছাড়াও থাকে অর্থের অভাবজনিত অক্ষমতা। মায়ের দরিদ্র রুগ্ন স্বাস্থ্য ও মানসিক অবসাদ শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার ওপর বিশাল প্রভাব ফেলে।

শৈশব ও কৈশোরে শিশুরা ভোগে অপুষ্টিতে। খাদ্যাভাবে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন ও ক্যালোরির অভাবে আমাদের দেশে কিশোর-কিশোরীরা বেশির ভাগই অপরিণত দুর্বল দেহ ও মনের অধিকারী। এরা স্নায়ু দুর্বলতায় ভোগে, বোধ-শক্তি কম। আমাদের দেশে প্রতি বছর আড়াই লক্ষ শিশু ও কিশোর-কিশোরী দৃষ্টি শক্তি হারায় স্রেফ ভিটামিন 'এ'-র অভাবে।

'ইউনিসেফ'-এর হিসেব মত এই দুনিয়ায় প্রতিবছর উদরাময়ে মৃত্যু হয় চল্লিশ লক্ষ শিশুর, নিউমোনিয়ায় বাইশ লক্ষ, হামে পনের লক্ষ, ম্যালেরিয়ার দশ লক্ষ, ধনুষ্টঙ্কারে

আট লক্ষ। অনাহারের তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণায় শিকার পনের কোটি শিশু—যাদের বয়স পাঁচ বছরের নিচে। ক্ষুধা আর রোগের আক্রমণে মৃত্যু পরোয়ানা লেখা জীবন্ত কঙ্কাল এইসব শিশুদের প্রায় সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশ, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার সাহারা মরু সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী।

বর্তমানে আমাদের দেশে দশ কোটি শিশু কোন দিনই স্কুলের মুখ দেখেনি ও দেখবেও না—যাদের বয়স পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে। '৯০ সালে যে দশ কোটি শিশু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাদের মধ্যে চার কোটি শিশুই প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও শেষ করতে পারবে না স্রেফ দারিদ্র্যতার কারণে।

যে বয়সের শিশুরা পড়ে খেলে, আবদার করে, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশের শিশুরা সেই বয়সেই নিজের পেট চালাতে, পরিবারকে সাহায্য করতে শ্রম বিক্রি করে। এরা কাজ করে ক্ষেতে, ইট ভাটায়, চায়ের দোকানে, মুদির দোকানে, গাড়ি সারাইয়ের গ্যারেজে, বিড়ি তৈরির কারিগররূপে, গৃহভৃত্যরূপে, বাস, লরীর ক্লিনাররূপে, ফেরিওয়ালারূপে, দোকানীরূপে, ঠোঙা তৈরির শ্রমিকরূপে, আরও বহু বহু রূপে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত ১৯৭৯-এর তথ্য অনুসারে ভারতবর্ষে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা ১১ কোটির কাছাকাছি।

এর বাইরেও আরো কয়েক কোটি শিশু ও কিশোর-কিশোরী আছে জীবন ধারণের জন্য পাচার করে চোলাই মদ, অন্যান্য মাদকদ্রব্য, বেআইনি বিদেশী দ্রব্য, বেআইনি খাদ্যশস্য। কয়েক লক্ষ কিশোরী বেঁচে থাকার তাগিদে দেহ বিক্রি করে।

এরাই যখন বড় হয়, হয়ে ওঠে সমাজবিরোধী শক্তি। চুরি, ডাকাতি, লুঠ-পাট ওয়াগান ভাঙা, ছিনতাই করা, দোকান-বাজার থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা, সাট্টা, জুয়া, চোলাই-হেরোইন ইত্যাদির ব্যবসা করা, নির্বাচনে বুথ দখল করা, লালসা মেটাতে ধর্ষণ করা ইত্যাদি নানা সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। যে কোনও উপায়ে জৈবিক প্রয়োজন মেটানোই এদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রামের কিশোরী-যুবতীদের চেয়ে শহর ও শহরতলী বস্তিবাসী ও ঘিঞ্জি এলাকার বস্তিবাসী কিশোরী ও যুবতীদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এখানে একটি ছোট্ট ঘরে বহু মানুষকে গাদাগাদি হয়ে ভোরের সূর্যের প্রতীক্ষা করতে হয়। অনেক সময়ই এরা নারী-পুরুষের গোপন ক্রিয়াকলাপ দেখে যৌন আবেগ দ্বারা চালিত হয়। ফুটপাতবাসী কিশোরীদের অবস্থাও একই রকম। অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও এবং অনেক সময় অপরিণত যৌন আবেগে এরা যৌনজীবনে প্রবেশ করে মস্তান, আত্মীয় বা পরিচিতদের হাত ধরে। বহুক্ষেত্রেই কর্মজীবনে ঠিকাদারদের কাছে কাজ করতে গিয়ে, পরের বাড়ি রাঁধুনী বা দাসীর কাজ করতে গিয়ে, অনেকের লালসা মেটাতে বাধ্য হয়।

এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনে জিততে জনগণের চেয়ে পেশী শক্তির ওপর উত্তরোত্তর নির্ভরতা বাড়িয়েই চলেছেন। এই নির্ভরশীলতা যত বাড়বে, সমাজে সমাজবিরোধীদের অত্যাচারও ততই বাড়বে। কারণ সমাজবিরোধীরা জানে—আমরা হত্যাই করি আর ধর্ষণই করি রাজনৈতিক দাদারা তাদের স্বার্থেই, এলাকা দখলের স্বার্থে আমাদের উদ্ধার করতে বাধ্য।

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় স্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদে

অসামাজিক কাজে নামতে হয, মেযেদেব নিজেকে ও সংসাবকে বাঁচাতে ইজ্জত বেচতে হয। হবিজন নাবীকে বিযে কবাব অপবাধে বর্ণহিন্দুব চাকবী হাবাতে হয। বযেছে অস্পৃশ্যতা। বযেছে বেগাব-শ্রম। বাজনীতিকদেব আশীর্বাদধন্য না হলে 'ঋণ-মেলা'য ঋণ মেলে না। চাকবীব সুযোগ সীমিত, বেকাব অসীম। ফলশ্রুতি প্রাযশই 'খুঁটিব জোব'ই প্রধান যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয। তাই যে মুষ্টিমেযবা শেষ পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিযে (তা সে 'খুঁটি' পাকডাবাব হলেও) জীবন ধাবণেব জন্য একান্ত প্রযোজনীয একটা কোনও চাকবী জোটানোই বিবেচিত হয 'অপাব ভাগ্য', 'মানতেব ফল', 'গুরুদেবেব আশীর্বাদ,' 'গ্রহবত্নেব ভেল্কি' ইত্যাদি বলে। দেশেব প্রতিটি মানুষেব জন্য 'কাজেব অধিকাব'-এব ফাঁকা আওযাজেব পবিবর্তে যত বেকাব তত কাজ থাকলে এমনটা ভাবাব কোনও সুযোগ বা কাবণ ঘটতো না। এটাও তো সত্যি,—

মানুষগুলো শুধু
খাওয়ার জন্য মুখ আর পেট
নিয়ে জন্মায় না, কাজের জন্য
দুটো হাত আর মগজও
নিয়ে জন্মায়।

ওদেব হাত ও মগজকে কাজে লাগিযে দেশকে সমৃদ্ধ কবাব দাযিত্ব যদি শাসক শ্রেণী পালন না কবে, তবে অবশ্যই আমবা ধবে নিতে পাবি—শাসক শ্রেণী এমনটা কবছে অক্ষমতা থেকে, নতুবা শোষণেব স্বার্থে। সমাজে 'ধনী' আব 'গবিব' এই ধবনেব দুটি শ্রেণীব মানুষ যদি থাকে, তবে ধনীবা তো নিজেদেব স্বার্থেই গবিবদেব বাঁচিযে বাখাব জন্য যতটুকু নিতান্তই দেওযা প্রযোজন, তাব বেশি দিতে চাইবে না। ছলে, বলে, কৌশলে গবিবদেব ন্যায্য পাওনাটুকু থেকে বঞ্চিত কববে। শোষণ না কবলে কাকে বঞ্চিত কবে ধনী হবে? আবাব গবিবদেব বাঁচতেও হবে নিজেদেবই প্রযোজনে। গবিববা না বাঁচলে কাদেব শ্রমে ধনী হবে? কাদেব শোষণ কববে? ওবা জোঁকেব মতই এমন চতুব সাবল্যে নিঃশব্দে গবিবদেব শোষণ কবতে চায। তাই কতই না ব্যাপক ব্যবস্থা, কতই না অসাধাবণ প্রচাব। ওবা আমাদেব ঢালাও অধিকাব দেয চিকিৎসাব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণেব, শিক্ষা গ্রহণেব এবং আবও অনেক কিছুব, কিন্তু অধিকাব বক্ষাব কোনও ব্যবস্থা কবে না। গবিব ঘবেব মানুষেব বিনে মাইনেব স্কুলে সন্তান পডাবাব স্বাদ থাকলেও সাধ্যে কুলোয না। ঘবেব ছেলে মেযে পডতে গেলে বোজগাব কববে কে? শিশু শ্রমেব ওপব প্রায সমস্ত দবিদ্র পবিবাবকেই কিছুটা নির্ভব কবতে হয। এটাও কঠিন সত্য যে আব্রুবক্ষা কবে স্কুলে যাওযাব মত সাধাবণ পোশাকটুকুও অনেকেব জোটে না। এখন এইসব নির্যাতিত মানুষদেব গবিষ্ঠ অংশই মনে কবেন—এসবই গত জন্মেব পাপেব ফল। এখনও অচ্ছুৎ-বক্তে হোলি খেলা হয। এখনও ওঁবা পানীয জলেব ছিটে-ফোঁটা পেতে কুযোব কাছে অপেক্ষা কবে।

উচ্চবর্ণের কেউ কৃপা করে তাদের পাত্রে সামান্য জল ঢেলে দিলেই ওঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। নতুবা পান করেন খাল বিল-ডোবার দূষিত জল।

'৮৯ মার্চের একটি ঘটনা। আমাদের সমিতির চাইবাসা ও জামশেদপুরের সদস্য মারফৎ খবর পেলাম বিহারের সিংভূম, গুমলা ও সাহেবগঞ্জ জেলায় এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে গত এক মাসের ভিতর মারা গেছে একশোর ওপর মানুষ। এটা অবশ্য সরকারি মত। আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বহু গবাদি পশু। ইতিমধ্যে এই অসুস্থতার খবর এসেছে সংলগ্ন ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের অঞ্চল সমূহ থেকে। সিংভূম জেলার ওপর একটা বিস্তৃত রিপোর্ট পেলাম। রোগাক্রান্তরা সকলেই আদিবাসী, দরিদ্র, নিরক্ষর ও সংস্কারাচ্ছন্ন। রোগটা এই ধরনের—রোগীর ধুম জ্বর হচ্ছে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, গলা বুঁজে যাওয়া এবং তিনচার দিনের মধ্যে মৃত্যু। অজানা রোগটি সম্পর্কে স্থানীয় আদিবাসীদের ধারণা—এসবই বোঙ্গার অভিশাপের ফল। রোগের শিকার যেহেতু অতি-অবহেলিত সম্প্রদায় এবং এই মৃত্যুর জন্য, রোগ-ভোগের জন্য তাদের সরকার ও সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, অভিযুক্ত করছে নিজেদের ভাগ্যকেই, তাই ওসব ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেননি কোনও বিধানসভার প্রতিনিধি বা সাংসদ। স্থানীয় সাংসদ বাগুণ সমব্রই মারণ রোগের খবর পেয়ে একবারের জন্যেও ওসব অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। যে বিষয়টির প্রতিকারের সোচ্চারে কোনও দাবি ওঠেনি, ওঠেনি প্রতিবাদের ঝড়, সেখানে হেতুহীন সময় নষ্ট না করে কংগ্রেস সাংসদ নয়াদিল্লির আসল খুঁটির আশেপাশে থাকা ও তোষামোদ করাকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। তাঁর এই মনে করার পিছনেও ছিল আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই প্রভাব।

গিয়েছিলাম পিনাকীকে সঙ্গী করে সিংভূম জেলার বান্দিজারি গ্রামে। চাইবাসা থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের পথ। কিন্তু বেশ দুর্গম। গ্রামটি জঙ্গলের ভেতর। জঙ্গল ভেদ করে আলো আসে না, সবসময় অন্ধকার ঘেরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি এলাকা। গ্রামে শ'দুই ঘর—শ' দুই পরিবার। প্রত্যেক পরিবারেই কেউ না কেউ মারণ ব্যাধির শিকার। খাওয়ার জল চাওয়াতে যে জল এনে দিলেন সে জলের রঙ কালচে শ্যাওলার মতো, তীব্র দুর্গন্ধ। জল খেতে পারিনি। শুনলাম এ জলই ওরা পান করেন। সংগ্রহ করেন একটা প্রাচীন কুয়ো থেকে। এক বাড়ির জলের হাঁড়িতে উঁকি মারতেই দেখতে পেলাম জলের পোকা ও বেঙাচি।

গাঁয়ের অধিকাংশ লোকজনই দেখলাম নেশাগ্রস্ত। হাড়িয়ার নেশা আর কুসংস্কারের নেশায় ওদের ডুবিয়ে রেখে রাজনীতিকদের যখন ভালই চলে যাচ্ছে, তখন নেশা কাটাবার চেষ্টায় নামবে, এমন আকাঠ বোকা তাঁরা নন। অবাক বিস্ময়ে এও জানলাম, এও শুনলাম, উপজাতি বা অনুপজাতীয় কোনও নেতাই এই মারণ রোগের প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলে তুচ্ছ কারণে ব্যতিব্যস্ত করতে চাননি সভার শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিদের। ওঁরা তোলেননি কারণ ওঁরা শাসক শ্রেণী ও শোষক শ্রেণীরই প্রতিনিধি হিসেবেই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন, ওইসব বঞ্চিত আদিবাসীদের আদৌ আপনজন ওঁরা কেউ নন। পদবি ভাঙিয়ে উপজাতি, অনুপজাতির প্রতিনিধি সেজে বিধানসভা,

লোকসভা, বাজ্যসভা ইত্যাদিতে স্থান কবে নিযেছেন মাত্র।

বান্দিজাবি গ্রামেব মোড়ল লুগদি মুণ্ডাব সঙ্গে কথা বলেছি। ওব নিজেব ছেলেটিও এই অজানা বোগে মাবা গেছে দিনকযেক আগে। লুগদিব ধাবণা, বোঙ্গাব অভিশাপেই এই মড়ক। দূবেব হাসপাতালে বোগী পাঠাযনি। কাবণ পাঠিযে লাভ নেই। যাদেব মাববাব, বোঙ্গা তাদেব মাববেই। এই বিপদ থেকে উদ্ধাব পাবাব একটিই পথ, তা হলো বোঙ্গাকে সন্তুষ্ট কবা। তুষ্ট কবতে তাই বোঙ্গাব পুজো দেওযা হযেছে, বলি দেওযা হযেছে ছাঁগল-মুবগী।

বান্দিজাবিব কাছেই মনোহবপুব অঞ্চল। মনোহবপুব ব্লকেব বাবোটি গ্রামই আক্রান্ত। মনোবহবপুবেব আদিবাসীদেবও ধাবণা বান্দিজাবিব আদিবাসীদেব মতই। তাবাও বোঙ্গাব বোষ কমাতে পুজো দিযেছে। বাড়ি বাড়ি মবাব খবব দিতে গিযে তাঁবা কাঁদছিলেন। না দোষাবোপ কবেননি সবকাবেব উদাসীনতাব। দোষ দেননি বোঙ্গাকে পর্যন্ত। দোষ দিযেছেন নিজেদেব ভাগ্যকে।

এবকম গ্রাম আমাদেব দেশে একটি দুটি বা দশটি বিশটি নয, আছে লক্ষ লক্ষ। এমন বঞ্চিত মানুষ কোটি কোটি। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতেব আলো আব স্যাটেলাইটেব মাধ্যমে টি ভি যোগাযোগেব বিজ্ঞাপনেব বা তথ্যচিত্রে যে ছবি দূবদর্শনে প্রচাবিত হয, তাব চেযে বহুগুণ বেশি গ্রাম দূবদর্শনে হাজিব হযনা, আপনাব আমাব কাছে অধবাই থেকে যায।

দূবদর্শনেব পর্দায বা বাণিজ্যিক সিনেমায আমবা যে সুন্দব শান্ত গ্রামেব ছবি দেখি, তা নিযে কিন্তু আমাদেব দেশ নয। আমাদেব দেশ লক্ষ বান্দিজাবি গ্রাম নিযেই।

এত সবই আর্থ-সামাজিক পবিবেশেবই ফল।

**এই পরিবেশের
চাবিকাঠি যাদের হাতে
তারা চায় না ওইসব বঞ্চিত
মানুষগুলোর নেশা কাটুক, ঘুম
ভাঙুক, নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন
হোক। এই সচেতনতা আনতে পারে
অনুকূল, সুস্থ সমাজ—
সাংস্কৃতিক পরিবেশ।**

আব এও চবমতম সত্য—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে চিকিৎসা লাভেব স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণেব স্বাধীনতা, জীবিকাব স্বাধীনতা ইত্যাদি সব স্বাধীনতাই অর্থহীন বসিকতা মনে হয।

মানব জীবনে সমাজ-সাংস্কৃতিক পবিবেশেব প্রভাব

সংস্কৃতি দেশে দেশে ভিন্নতব। আবাব একই দেশেব ধর্মভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, অর্থভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক অঞ্চলভিত্তিক আলাদা আলাদা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আমাদেব দেশেব কথা ভাবুন, দেখতে পাবেন বিভিন্ন অঞ্চলেব বা প্রদেশেব সংস্কৃতিব মধ্যে বযেছে বিভিন্নতা, বৈচিত্রেব অভাব নেই। দার্জিলিং জেলাব সংস্কৃতিব সঙ্গে মালদা জেলাব সংস্কৃতিব বযেছে বহু বিভিন্নতা, যদিও দুটিই উত্তববঙ্গেবই জেলা। মেদিনীপুব ও পুরুলিযাব সংস্কৃতিতেও বযেছে অনেক অসাদৃশ্য, যদিও দুটি জেলাব অবস্থান পাশাপাশি হাত ধবাধবি কবে। আমাদেব দেশেব হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদাযেব সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনই আছে তামিল, গুজবাতি, ওড়িযা, বাংলা, বিহাবী ইত্যাদি ভাষাভাষীদেব সংস্কৃতিব মধ্যে অসাদৃশ্য। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিব সঙ্গে শূদ্রেব সংস্কৃতিব যেমন অসাদৃশ্য আছে, তেমনই অসাদৃশ্য আছে ধনী, মধ্যবিত্ত ও গবিবদেব গড়ে ওঠা সংস্কৃতিব মধ্যেও।

আবাব এই পশ্চিমবাংলাব সংস্কৃতিব সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তব-দক্ষিণ ভাবত এমনকি অন্য বাষ্ট্র বাংলাদেশেব সাংস্কৃতিক উপকবণে ও গডনে বহু সাদৃশ্য বযেছে। তাই এ-কথাও মনে হয ভাবত-সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ-সংস্কৃতিব প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে বঙ্গ-সংস্কৃতিব রূপবেখা তৈবি কবা অসম্ভব। বিভিন্ন দেশেব মধ্যেও আবাব খুঁজলেই সংস্কৃতিগত মিল আমবা অনেক পাব। পাওযাই স্বাভাবিক, কাবণ, আমবা 'মানব সংস্কৃতিব'ই অংশ।

আমাদেব বিভিন্ন মানব গোষ্ঠিব' মধ্যে বযেছে নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, সঙ্গীত, শিল্প সাহিত্য, নৃত্য, নীতিবোধ, সমাজ ও পবিবাব চালাবাব বীতিনীতি, পোশাক-পবিচ্ছদ ইত্যাদি। সুতবাং একজন মানুষ কোন দেশেব কোন্ গোষ্ঠিব, কোন্ ধর্মেব, কোন্ ভাষাব, কোন্ শ্রেণীব প্রতিনিধি, তাব উপবই নির্ভব কববে মানুষটি কোন্ ভাষায কথা বলবে, কী জাতীয খাদ্য গ্রহণ কববে, কোন্ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদিব দ্বাবা প্রভাবিত হবে, অংশ নেবে , কোন জাতীয পোশাক-পবিচ্ছদ পবিধান কববে , কোন্ বীতিনীতির দ্বাবা পবিচালিত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিশুকাল থেকে আমবণ আমাদেব প্রভাবিত কবে আমাদেব সমাজ, আমাদেব সংস্কৃতি, ফলে আমবা সাধাবণভাবেই সেই সমাজ ও সংস্কৃতিব অংশীদাব হযে পড়ি। শিশুকালে ও কৈশোবে আমাদেব খাওযা-দাওযাব অভ্যাস, শিক্ষা চেতনাব স্ফুবণ শুরু হয মা-বাবা, আত্মীয, গৃহশিক্ষক, স্কুলেব শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশীদেব মাধ্যমে। প্রভাব পড়তে থাকে স্কুলেব বন্ধু, খেলাব সঙ্গী ও সমবযসী বন্ধুদের আচবণ, ব্যবহাব, কথাবার্তা ভালোলাগা, খাবাপ লাগাব। গড়ে উঠতে থাকে বাজনৈতিক মতবাদ বা বাজনৈতিক দলেব প্রতি সমর্থন কবাব মানসিকতা। কেউ জেনে বুঝে, কেউ না জেনে তাব স্কুলেব শিক্ষকেব প্রভাবে, পবিবারেব গুরুজনদেব প্রভাবে অথবা কলেজেব নিকটতম বন্ধুদেব অথবা কোনও বাজনৈতিক সচেতন কাবো প্রভাবে কোনও বাজনৈতিক দলকে সমর্থন কবতে শুরু কবে, অথবা কেউ ব্যক্তিস্বার্থে জড়িযে পড়ে কলেজ-বাজনীতিতে। এমন দেখাই যায বাবা-মা'যেব বাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক-মতাদর্শকে অগ্রহণীয, ভ্রান্ত মনে কবে সন্তান বিপবীত কোনও মতাদর্শকে গ্রহণ কবেছে।

আমাদের এবং অন্যান্য বহু সমাজেই শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের কী পড়াশোনায়, কী জীবনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সন্তানের মা-বাবারাও ভীষণ ভাবেই চাইতে শুরু করেছে, এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে আমার সন্তানকে টিকে থাকতে হলে, ভাল হতে হবে, দারুণ কিছু ফল করতে হবে। সন্তান স্কুলে প্রথম দু-চারজনের মধ্যে না থাকলে মা-বাবারা শঙ্কিত হন। সন্তানের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন তাঁরা। এর ফল অনেক সময়ই প্রীতিপ্রদ হয় না। অনেক মনোরোগ চিকিৎসকই এর জন্য সাধারণত অভিভাবকদের সরাসরি অভিযুক্ত করেন, অথবা পত্র-পত্রিকা ও বেতার মারফৎ মা-বাবাদের দোষারোপ করেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণত কেউই বলেন না এই সামাজিক পরিবেশের জন্য আমাদের সমাজের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তাই দায়ী। অর্থাৎ এ সবই আর্থ-সামাজিক অবস্থারই ফল।

মানুষ যে ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে বেড়ে ওঠে, যে গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম, সেই গোষ্ঠির চোখ দিয়েই দেখে, কান দিয়ে শোনে। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, অন্য গোষ্ঠীর অনেক কিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করে, তাদের আচার-ব্যবহার, ভালো লাগার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যে পূর্ববঙ্গীয় বালক উদ্বাস্তু হয়ে এপার বাংলায় এসে 'জবরদখল' কলোনীর বাসিন্দা, তার ক্লাসের প্রিয় বন্ধুটিই হয়তো কলকাতার কোনও বনেদি পরিবারের ছেলে। বইয়ের অভাব মেটাতে, একসঙ্গে পড়াশোনা করতে, কলের গান শুনতে, রেডিও শুনতে 'বাঙাল' ছেলেটি অনেকটা সময়ই কাটায় বনেদি 'ঘটি'র বাড়িতে। বনেদি বাড়ির অনেক কিছুই একটু একটু করে ভালো লাগতে থাকে। ভালো লাগে বনেদি সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, মহিলাদের অন্দরমহলের আড়ালকে মনে হয় আভিজাত্যের লক্ষণ। 'বাঙাল'দের প্রাণখোলা উচ্চস্বরে খুঁজে পায় রুচির অভাব। ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে মোহনবাগানের জয় রক্তে বেশি তুফান তোলে।

একই ঘটনা ঘটে প্রবাসীদের ক্ষেত্রেও। তাঁরা প্রবাসভূমির মানুষদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেন পরম সমাদরে।

আমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক চলচ্চিত্র, পত্র-পত্রিকা, দূরদর্শন আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। নারী-পুরুষদের 'ফ্রি-মিকসিং' যখন সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে বিপুলভাবে বিরাজ করে তখন সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার সঙ্কট সংযোজিত হয়। ছাপার অক্ষর বা সেলুলয়েডের বুকে অপরাধ যখন অ্যাডভেঞ্চারের রূপ পায় তখন অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তরুণ-তরুণীরা অপরাধ প্রবণতার মধ্যে উত্তেজনার আগুন পোহাতে চায়। পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলো যখন শোভরাজের মত ঘৃণ্য অপরাধীদের 'সুপার হিরো' করার তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন, তখন বহু কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরাই যে তাদের আদর্শ হিসেবে শোভরাজের মত সমাজবিরোধীদের জীবনচর্যাকেই গ্রহণ করতে চাইবে—এটাই স্বাভাবিক। দূরদর্শনে রামায়ণ, মহাভারত যেমন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তেমনই অসাধারণ দক্ষতায় চতুর সাবল্যে মানুষকে আবার ভাববাদী, অদৃষ্টবাদীর খাঁচায় পুড়তে চাইছে, ঘড়ির কাঁটাকে প্রগতির বিপরীতে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। ভক্তির প্লাবন এনে ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে মৌলবাদী শক্তিগুলোকেই উৎসাহিত করছে, শক্তিশালী করছে। প্রচার

মাধ্যমগুলো নানা আজগুবি অলৌকিক ঘটনার গালগপ্পো ছেপে এক তরফাভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। লটারি কালচার আজ সর্বগ্রাসী হতে চলেছে। পুজোর আড়ম্বর ও পুজো কালচার যতই বাড়ছে ততই দেখতে পাচ্ছি যে স্বঘোষিত বস্তুবাদীরা জনগণকে সঙ্গে পেতে পুজো কালচারের সঙ্গী হয়েছিলেন, তাঁরাই স্বয়ং ঘোর আস্তিক হয়ে উঠেছেন—একটু চোখ কান খোলা রাখলে দৃষ্টান্ত মিলবে হাজার নয়, লাখে লাখে। সাংস্কৃতিক নানা 'উৎসব'-এ হাজির হয়েছে নানা ঝাঁ-চকচক আড়ম্বর ও হুল্লোড়। চার্টার্ড প্লেন, ফাইভ স্টার হোটেল, গ্ল্যামার কিং ও কুইনদের গা থেকে ঠিকরে পড়া আলো, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, কী নেই ?—সুস্থ সংস্কৃতি ছাড়া অনেক কিছুই উপস্থিত।

এরই মাঝে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পাল্টাতে তৎপর একদল। পাল্টে যাচ্ছেও। এরই পাশাপাশি সাধারণের সাংস্কৃতিক চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গ্রামে-শহরে হাজির হয়েছেন আর একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী মানুষ। মানুষ পাল্টে যাচ্ছেও। এরই নাম ইতিহাস।

আমরা সমাজবদ্ধ জীব।
সমাজের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিফলন
তাই আমাদের জীবনে দেখতে পাই। আমরা
কীভাবে বিকশিত হবো, তার অনেকটাই
তাই আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক
পরিবেশের ওপরও নির্ভর করে।

অবাক মেয়ে মৌসুমী ও বিস্ময়কর প্রতিভা বা Prodigy নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এতক্ষণ খুবই সংক্ষেপে যেটুকু আলোচনা করলাম তাতে অনেকে হয় তো 'ধান ভানতে শিবের গান'-এর উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে এ সবই অতি প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। কারণ আমি চাই, ভবিষ্যতে আবার কোনও বিস্ময়কর প্রতিভার খবর প্রচারিত হলে পাঠক-পাঠিকারা বিভ্রান্ত বোধ না করেন, নিজেরাই সঠিক অনুসন্ধানে নামতে পারেন, অথবা এমন বিস্ময়কর প্রতিভার পিছনে জাগতিক কারণগুলোর হদিশ অপরকেও দিতে পারেন।

অবাক মেয়ে মৌসুমীর রহস্য সন্ধানে

মৌসুমীকে জানতে, মৌসুমীর ওপর প্রাথমিক পরীক্ষা চালাতে আদ্রায় যাবো ঠিক করে ফেললাম। ২৯ আগস্ট '৮৯ সন্ধ্যায় পাভলভ ইনস্টিটিউটে ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়কে পেয়ে গেলাম। ডাঃ মুখোপাধ্যায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মনোরোগ

বিশেষজ্ঞ। তিনি মৌসুমীর কাছে গিয়েছিলেন। ১৩ আগস্ট '৮৯-র আনন্দবাজারে এঁকেই পাভলভ ইন্সটিটিউটের অধিকর্তা ডাঃ ডি এন গাঙ্গুলীর ছাত্র বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মৌসুমীকে পরীক্ষা করে কী মনে হলো আপনার?"

—"অসাধারণ। কথা বললে অবাক হয়ে যাবেন। যে কোনও প্রশ্ন করুন, কম্পিউটারের মত উত্তর দিয়ে যাবে। আপনিও কি যাবেন নাকি?"

বললাম, "যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আপনি কী ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন?"

—"ও অনেক কিছু। যেমন অসাধারণ স্মৃতি, তেমনই মেধা। এইটুকুন তো বয়েস, এর মধ্যেই ডাচ্, জার্মান ও দস্তুর মতো শিখে ফেলেছে। স্মার্টলি ডাচ্, জার্মান বলে।"

এই পর্যন্ত বলেই সুর পাল্টালেন বাসুদেববাবু, "আমি মশাই শুধুই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, আপনার মত গোয়েন্দা নই। দেখুন, আপনি হয়তো মৌসুমীর মধ্যে অন্য কিছু খুঁজে পাবেন।"

কথায় শ্লেষের সুর স্পষ্ট। অবতার, অলৌকিক ক্ষমতাধর ও জ্যোতিষীদের দাবি যাচাই করতে সত্যানুসন্ধান করি বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি তো আমার নেশা বা পেশা নয়। এই ধরনের ঠেস দেওয়া কথা কি নিজের প্রতি আস্থাহীনতার ফল? মৌসুমীর মেধা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেটা সঠিক নাও হতে পারে মনে করেই কি এমন কথা বললেন?

২ সেপ্টেম্বর '৮৯ রাতে 'হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার' ধরলাম। সঙ্গী হলেন চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তী ও আমাদের সমিতির সদস্য মানিক মৈত্র। ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে পেলাম সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর মালাকারকে। ওঁরাও মৌসুমীর বাড়িই যাচ্ছেন 'প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থা'র তরফ থেকে। ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাবেন প্রমার তরফ থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, তারই প্রয়োজনে কিছু কথা সারতে। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানের বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছে প্রমা।

আদ্রায় যখন পৌঁছলাম তখন সকাল ছ'টা। ঝড়িয়াডিহির রেল কোয়ার্টারে মৌসুমীদের বাড়ি পৌঁছলাম সাড়ে ছ'টায়। পাহারারত পুলিশ ঢোকার মুখে বাধা দিলেন। মৌসুমীর বাবা সাধনবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সুবীরবাবু। সাধনবাবু ভিতরে নিয়ে গেলেন। এক ঘরের ছোট কোয়ার্টার। সামনে একফালি কাঠের জাফরি ঘেরা বারান্দা। ভিতরে রান্না ঘর। ঘরে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়। সাধনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন স্ত্রী শিপ্রা ও দুই মেয়ে মৌসুমী এবং মহুয়ার সঙ্গে।

সাধনবাবু টানা ঘণ্টা দুয়েক মৌসুমী বিষয়ে নানা কথা শোনালেন, দেখালেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পত্র-পত্রিকায় মৌসুমীকে নিয়ে প্রকাশিত লেখা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে আসা চিঠি ও টেলিগ্রাম। জানালেন ২১, ২২, ২৩ সেপ্টেম্বর মৌসুমীকে নিয়ে দিল্লিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে। অফিস 'স্পেশাল লিভ' দিয়েছে। আমন্ত্রণের চিঠি দেখতে চাওয়ায় বললেন, চিঠি অফিসে আছে। শুনলাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট আইন স্টিভেনসন সাধনবাবুকে

চিঠি পাঠিযে জানিয়েছেন, মৌসুমীকে পবীক্ষা কবতে আসছেন।

সাধনবাবুর কথায় মাঝেই জিজ্ঞেস কবলাম, "কিছু কিছু পত্রিকায লেখা হযেছে মৌসুমীব জ্ঞান গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের। মৌসুমী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা কবছে। কথাগুলো কি সত্যি?"

সাধনবাবু জানালেন "গ্র্যাজুযেশন কী বলছেন, ওব জ্ঞান অনার্স লেভেলেব। ও মাধ্যমিকে বসতে বাধ্য হচ্ছে, মাধ্যমিক না দিলে কলেজে ভর্তি কবায আইনগত অসুবিধে আছে বলে। তবে এটুকু জেনে রাখুন মাধ্যমিকে ও ফার্স্ট হবেই এবং বেকর্ড নাম্বার পেয়েই। ওর হাই স্ট্যান্ডার্ডেব উত্তর কজন এগজামিনাব বুঝবেন সে বিষযেই সন্দেহ আছে। আর ওর গবেষণাব যে সব খবব প্রকাশিত হযেছে, তা সবই সত্যি। ওব রিসার্চের কাজ শেষ হলে পৃথিবী জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। একটুও না বাড়িয়েই বলছি, প্রত্যাশা বাখছি ও নোবেল প্রাইজ পাবে এবং শিগগিবই।"

"কী বিষয় নিয়ে রিসার্চ কবছো তুমি?" মৌসুমীকে প্রশ্নটা কবলে উত্তব দিলেন সাধনবাবুই "তিনটি বিষয নিযে বিসার্চ কবছে। বিষয তিনটি খুবই গোপনীয। আব যে সব সাংবাদিক এসেছিলেন তাঁদেব কাউকে বলিনি। আপনাকে বলেই শুধু বলছি—এযার পলিউশন, সোলাব এনার্জি ও কোলকে সালফার মুক্ত কবাব বিষয নিযে বর্তমানে গবেষণা কবছে। পববর্তীকালে জেনেটিকস নিযে গবেষণাব ইচ্ছে আছে। অনেক দেশের নজর ওর ওপর বয়েছে। গবেষণাব বিষযটি জানাজানি হযে গেলে বিদেশী শক্তি ওকে কিডন্যাপ কবতে পারে। তাই এই গোপনীযতা।"

"মৌসুমী তোমাব গবেষণাব কাজ কেমন এগোচ্ছে।"

এবাবের উত্তর মৌসুমীই দিল, "খুব ভালমতই এগোচ্ছে, আশা কবছি এব জন্যে নোবেল পাব আড়াই বছবের মধ্যে।"

ঘণ্টা দুযেকেব মধ্যে নানাবকম গল্প-সল্প, হালকা বসিকতা, মুড়ি-তেলেভাজা, চা ইত্যাদিব মাঝে মাঝে মৌসুমীকে যত বাবই প্রশ্ন কবেছি প্রায ততবাবই উত্তব দিয়েছেন সাধনবাবু এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিপ্রাদেবী। ইতিমধ্যে ওঁবা দুজনেই জানালেন, বিভিন্ন সংবাদপত্রেব প্রতিনিধিদেব কথা, যাঁবা প্রত্যেকেই মৌসুমীব জ্ঞানেব দীর্ঘ পবীক্ষা নিযে বিস্মিত হযেছেন। আমাকে সাধনবাবু বললেন, "আপনি যে কোনও কেন্দ্রীয় বা বাজ্য মন্ত্রীব নাম জিজ্ঞেস করুন, দেখবেন পটাপট উত্তব দেবে, অথবা জিজ্ঞেস করুন না কোনও দেশেব বাষ্ট্র প্রধানেব নাম। অথবা অন্য কিছুও জিজ্ঞেস কবতে পাবেন।"

সাধনবাবু মৌসুমীকে জিজ্ঞেস কবলেন, "বাজীব গান্ধী কবে প্রধানমন্ত্রী হন?"

মৌসুমী বলে গেল, "থার্টি ফার্স্ট অক্টোবব নাইনটিন এইট্টি ফোব।"

সাধনবাবুব আবাব প্রশ্ন, "কবে কলকাতাব জন্ম হযেছিল?"

সাধনবাবুব চকচকে চোখে উৎসাহিত প্রশ্নে ও মৌসুমীব জবাবে সুবীববাবু ও শঙ্কববাবু যথেষ্ট উৎসাহিত হচ্ছিলেন।

সুবীববাবু আমাকে জিজ্ঞেস কবলেন, "সব ঠিক ঠিক উত্তব দিচ্ছে তো?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

ইতিমধ্যে সাধনবাবু আবও অনেক প্রশ্নই কবেছেন। আমাকেও এই ধবনেব প্রশ্ন কবে মৌসুমীব স্মবণ শক্তির পবীক্ষা নিতে আবাবও উৎসাহিত কবলেন সাধনবাবু ও

শিপ্রাদেবী।

না, জিজ্ঞেস কবলাম না। কাবণ মৌসুমীব বাবা মা যেভাবে আমাকে পবীক্ষা নিতে মানসিক ভাবে চালিত কববেন সেভাবে পবীক্ষা নিলে যে বাস্তবিকই পবীক্ষাটা আব পবীক্ষা থাকবে' না, সে বিষযে সচেতন ছিলাম।

পত্র-পত্রিকা পড়ে ও দূবদর্শনেব কল্যাণে জেনেছিলাম সাধনবাবু বিজ্ঞানী। মৌসুমী তাঁকে বিজ্ঞান গবেষণাব সাহায্য কবে। এও জেনেছি মৌসুমীব মা শিপ্রাদেবীও ভাল ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধনবাবু আব শিপ্রাদেবীব কথাবার্তায, ব্যবহাবে এই জানাকে সত্য বলে মেনে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল দুজনেব বাক্ চাতুর্যকে তাবিফ কবেও বাস্তব সত্যকে টেনে আনতে বললাম, "ডাক্তাব ডি এন গাঙ্গুলী আনন্দবাজাবেব প্রতিবেদককে বলেছেন, "'মৌসুমীব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিব পিছনে আছে সম্ভবত বহু প্রজন্ম পূর্বেব কোনও সুপ্ত জিন, এই মেযেটিব মধ্যে যাব আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।'" এই পবিপ্রেক্ষিতে আপনাব ও আপনাব স্ত্রীব কাছে আপনাদেব পূর্ব পুরুষদেব বিষযে জানতে চাই।"

সাধনবাবু জানালেন, "আমাদেব পূর্বপুরুষদেব কেউ শ্রুতিধব ছিলেন বলে কোন দিনই শুনিনি।" আবও জানালেন চাষ-বাসই ছিল পূর্ব পুরুষদেব জীবিকা। সাধনবাবু ও তাঁব দাদাই প্রথম চাকবী কবছেন। শিপ্রাদেবী জানালেন, "আমাব বাবা ঠাকবুদারা ছিলেন বড বড অফিসাব।"

"কি ধবনেব বড অফিসাব ?" প্রশ্ন কবে জানতে পাবলাম, বাবা ছিলেন গ্রামেব পোস্ট অফিসেব পোস্ট মাস্টাব এবং ঠাকুবদা ছিলেন বাঁকুড়া জেলাব একটি গ্রামেব প্রাইমাবি স্কুলেব হেডমাস্টাব।

সাধনবাবু '৬৯ সালে স্কুল ফাইনালে পাশ কবেছেন থার্ড ডিভিশনে। '৭৩-এ পাশ কোর্সেব বি এস সি পাশ কবেন। বিষয ছিল ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স। '৭৮ এ ধানবাদেব ফুয়েল বিসার্চ ইন্সিটিটিউট-এ স্টেনোগ্রাফাব হিসাবে যোগ দেন। '৮২-তে প্রমোশন পেযে জুনিযাব লেববোবেটবি অ্যাসিস্ট্যান্ট হন এবং বর্তমানে জুনিযব সাইনটিস্ট পদে কাজ কবেছেন।

শিপ্রা দেবী স্কুল ফাইনাল পাশ কবেছেন '৭৪-এ থার্ড ডিভিশনে। '৭৮-এ পাশ কোর্সে বি এ পাশ কবেন। স্টেনোগ্রাফি জানেন। '৮৬-তে ইনটিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভলাপমেন্ট-এ সুপাবভাইজাব পদে যোগ দেন।

শিপ্রা দেবী লক্ষ্মীব ভক্ত। সাধনবাবু মা-কালীব। শিপ্রা দেবীকে জিজ্ঞেস কবলাম, "একটি পত্রিকায প্রকাশিত হযেছে, আপনি নাকি মৌসুমীব জন্মেব সময দেখেছিলেন মা লক্ষ্মী শ্বেতবর্ণা সবস্বতীব রূপ নিযে আপনাব কোলেব কাছে এসে মিলিযে যান। ঘটনাটা কি সত্যি ?"

শিপ্রা দেবী উত্তব দিলেন, "পুবোপুবি সত্যি।"

"আপনি কি বিশ্বাস কবেন মৌসুমীই সবস্বতী ?"

"মৌসুমী এই বযসেই যেভাবে গবেষণাব কাজ দ্রুততাব সঙ্গে এগিযে নিযে চলেছে তাতে এমনটা বিশ্বাস কবা কি অবাস্তব কিছু ?"

"মৌসুমী কী কী ভাষা তুমি জান ?" জিজ্ঞেস কবায মৌসুমীব বাবা ও মা জানালেন, বাংলা, হিন্দি, ইংবেজি, জার্মান ও ডাচ ভাষা জানে।

আমার লেখা 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি থেকে দুটি বাক্য একটি সাদা পাতায় লিখে ফেলল মানিক। পাতাটা এগিয়ে দিল মৌসুমীর কাছে। অনুরোধ করলাম চারটি ভাষাতেই বাক্য দুটি অনুবাদ করে দিতে।

সাধনবাবু বললেন, "ও পরীক্ষা করতে চাইছেন? আপনাদের এত ঝামেলার ও কষ্টের কোনও দরকার হবে না।" তাক থেকে একটা বই বের করে তার থেকে একটা পৃষ্ঠা মৌসুমীর সামনে মেলে ধরে বললেন, "এখান থেকে বাংলাটা পড়ে চারটে ভাষাতেই অনুবাদ করে কাকুদের শুনিয়ে দাও।"

সাধনবাবুর রাখা বইটা তুলে নিয়ে বললাম, "হিন্দি, ডাচ, জার্মানের কিছুই বুঝবো না। তাইতেই মৌসুমীকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছি। যাঁরা জানেন তাঁদের দেখিয়ে নেব।"

মৌসুমী বার কয়েক পড়ে বললো, "ইংরেজি করতে পারবো না।" বললাম, "তাই লিখে দাও।" 'English'-এর জায়গায় 'No' লিখে তলায় নিজের নাম সই করে দিল। হিন্দিতে প্রথম দুটি বাক্য অনুবাদ করলো। ইতিমধ্যে মা বললেন, "কেন, তুমি ইংরেজি পারবে না, চেষ্টা কর না।" মৌসুমী বললো, "যুগের ইংরেজি কি?" মা বললেন, "তুমি তো জান যুগের ইংরেজি era। চেষ্টা কর চেষ্টা কর।' মৌসুমী 'In modern era' পর্যন্ত লিখে প্রথম বাক্যটা অসমাপ্ত রাখলো কয়েকটা ডট্ চিহ্ন দিয়ে। তারপর দ্বিতীয় বাক্যটা শেষ করলো। Dutch লিখে লিখলো No। German লিখেও No। তারপর স্বাক্ষর ও তারিখ।

সাধনবাবু আমাকে কিছু বলছিলেন। শুনছিলাম। সেই সুযোগে শিপ্রা দেবী মৌসুমীকে ইংরেজি অনুবাদের অসমাপ্ত অংশটুকুর ইংরেজিটা বলে দিয়ে লেখালেন আমাদের পাঁচ আগন্তুকের উপস্থিতিতেই। আমি শিপ্রাদেবীকে বললাম, "পরীক্ষাটা মৌসুমীর নিচ্ছি, আপনার নয়। অতএব, আপনার বলে দেওয়া অংশটা কাটুন।" অসন্তুষ্ট শিপ্রা দেবী লম্বা দাগ টেনে কাটলেন। অবশ্য না কেটে মৌসুমীর ইংরেজি জ্ঞানের প্রমাণ হিসেবে ধরে নিলেও মৌসুমীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামান্যতম তারতম্য ঘটতো না। কারণ শিপ্রা দেবীর অনুবাদও ছিল সম্পূর্ণ ভুলে ভরা। কাটা অংশে মৌসুমী, সাধনবাবু ও সুবীর চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষর করলেন।

শিপ্রা দেবী আবার মুখ খুললেন, "মৌসুমী, তুমি ডাচ ও জার্মান যে সব শব্দগুলো শিখেছ সেগুলো বলে দাও তো।" বললাম, "তার কোন প্রয়োজন নেই। 'ধন্যবাদ' কথাটা ২৫টি ভাষায় কেউ বলতে বা লিখতে শিখলে এই প্রমাণ হয় না যে সে ২৫টি ভাষা জানে।"

দুটি বাক্যের হিন্দি অনুবাদে মৌসুমী ভুল করেছিল ১৩টি। একথা পরের দিন জেনেছিলাম কলকাতা ৫৫-র রাষ্ট্রভাষা জ্ঞানচক্রের অধ্যক্ষ নিমাই মণ্ডলের কাছ থেকে। ইংরেজি অনুবাদের অবস্থা আরও খারাপ। প্রথম বাক্যটির কথা তো আগেই বলেছি। দ্বিতীয় বাক্যটির অনুবাদও ছিল আগাগোড়া অর্থহীন ও ভুলে ভরা।

সাধনবাবু এক সময় বলতে শুরু করলেন, "বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে 'প্রডিজি' বলে ঘোষণা করেছে। মৌসুমীর আই কিউ অবশ্যই প্রডিজি মিনিমাম লেভেলের চেয়ে অনেক বেশি, ওর আই কিউ ২৮০।"

তৈরিই ছিলাম। নর্মান সুলিভান-এর লেখা 'টেস্ট ইয়োর ইনটেলিজেন্স' বই-এর

অনুবাদ কর:

আধুনিক যুগের সম্মোহনের সূচনা আঠারো-শো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। পাভলভ বললেন- সম্মোহন আংশিক ঘুম, জেগে থাকা ও ঘুমের একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা।

English : No Mousumi chakraborty

Hindi

आधुनिक ढंग में सम्मोहन का सूत्र [illegible] अठारह सौ शतकीय समय में हुआ था।

पावलव बोले सम्मोहन का मतलब घुम, जागकर रहना घुम का एक बीच का अवस्था।

English

In modern era, ~~(in the middle time)~~

~~(In 18 ...)~~ Mousumi chakraborty Mousumi chakraborty

A.K. Chatterjee 5.3.89

... view said Somebody's has 'feeling sleep', Asleep is the 'in' situation.

Dutch - No

German - No

M. Chakraborty

2/3/89

A.K. Chatterjee
134/3A, Rashbehari Avenue
Calcutta - 4/3-1989

5/3/89

'ইজি' গ্রুপ থেকে তিনটি এবং 'মোব ডিফিকাল্ট' গ্রুপ থেকে দুটি আই কিউ দিলাম। যাবা আই কিউ ক্ষমতাব ন্যূনতম দাবীদাব তাবা প্রত্যেকেই এই পাঁচটিব মধ্যে অন্তত তিনটি প্রশ্নেব উত্তব দিতে সক্ষম। মৌসুমী আমাদেব প্রত্যেককে নিবাশ কবে সাধনবাবুব দাবিব চূড়ান্ত অসাড়তা প্রমাণ কবলো দুটিব ক্ষেত্রে "পাববো না" জানিযে এবং তিনটিব ক্ষেত্রে ভুল উত্তব দিযে।

তিনটি অংক দেওযা হলো। যাব মধ্যে দুটি সিক্স সেভেন লেভেলেব। প্রথম অংকটি—দুটি মৌলিক সংখ্যাব যোগফল ৭৫। সম্ভাব্য সংখ্যা দুটি কত? ইংবেজিতে লেখা প্রশ্নটা মানিককেই পড়ে দিতে হলো। মৌসুমী মানে বুঝতে পাবছিল না। বাংলা মানে কবে মৌলিক সংখ্যাব ব্যাখ্যা করে দেওযা হলো—যে সংখ্যাকে শুধু মাত্র সেই সংখ্যা এবং ১ দিযে ভাগ কবা যায তাকেই বলে মৌলিক সংখ্যা।

এত বোঝানোব পবও মৌসুমী লিখলো ৫২ ও ২৩। উত্তবটা অবশ্যই ভুল। কাবণ ৫২কে ২, ৪, ১৩ ইত্যাদি দিযে ভাগ কবা যায।

দ্বিতীয অংকটি ছিল, বাম শ্যামেব দোকানে এলো। ৫০ টাকাব জিনিস কিনে ১০০ টাকা দিল। শ্যামেব কাছে খুচবো না থাকায শ্যাম মধুব দোকান থেকে বামেব ১০০ টাকা দিযে খুচবো এনে ৫০ টাকা বামকে দিল বাম চলে গেল। মধু এসে জানালো ১০০ টাকাটা নকল। শ্যাম মধুকে ১০০ টাকাব একটা নোট ফেবত দিতে বাধ্য হলো। শ্যামেব কত টাকা ক্ষতি হলো?

মৌসুমী বাব কযেক প্রশ্নটা পড়লো। ওব বাবাও প্রশ্নটা বুঝিযে দিতে সাহায্য কবলেন। মৌসুমী বাবাব দিকে তাকিযে প্রশ্ন কবলো, "২০০ টাকা হবে না বাবা।"

সাধনবাবু বললেন, "তাই লেখো"। এই কথাব মধ্য দিযেই সাধনবাবু মৌসুমীকে ২০০ টাকা লেখাব সংকেত দিলেন। আমি নিশ্চিত, সাধনবাবুব কাছে উত্তবটা অন্য কিছু মনে হলে "আব একটু ভাব" জাতীয কিছু বলে বুঝিযে দিতেন উত্তব ঠিক হচ্ছে না।

মৌসুমী উত্তব ২০০ টাকা লিখে স্বাক্ষব কবলো। এই উত্তবটাও মৌসুমী ও সাধনবাবুব ভুল হলো। উত্তব হবে ১০০ টাকা। কাবণ, শ্যাম মধুব কাছ থেকে ১০০ টাকা পেযেছিল, ১০০ টাকাই ফিবিযে দিল। লাভ-ক্ষতি শূন্য। ক্ষতি শুধু বামকে, দেওযা ৫০ টাকাব জিনিস ও ৫০টি টাকা।

ব্যর্থতা ও অনিশ্চিত অবস্থা থেকে বেবিযে আসতে সাধনবাবু বললেন, "ও ফিজিক্স, কেমেস্ট্রিতে অনার্স স্ট্যান্ডার্ডেব। ওকে বুঝতে হলে ওই সব নিযে প্রশ্ন করুন।"

এমন একটা অবস্থাব জন্যও তৈবি ছিলাম। পাঁচটা প্রশ্ন লিখে উত্তব দেওযাব মত জাযগা বেখে হাজিব করলাম মৌসুমীব সামনে। প্রশ্নগুলো অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বি এস সি পাশ কোর্স মানেব। প্রথম প্রশ্ন "What is the formula of Chrome alum ?"

মৌসুমী পবিষ্কাব অক্ষবে লেখা ইংবেজিও পড়তে পাবছিল না। পড়ে বাংলা মানে কবে দেওযাব পবও মৌসুমী উত্তবেব সংকেতেব আশায বাবাব মুখেব দিকে চেযে বইলো। বাবা বললেন, "মনে নেই পটাসিযাম অ্যালার্মেব ফর্মূলা?" বাবাব সব চেষ্টাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিযে মৌসুমী লিখল "No"। কবলো স্বাক্ষব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল "What is the clue of chemical reactions ?" মৌসুমীকে পূর্ববৎ বাংলা মানে করে দিতে হলো। মৌসুমী আবার দীর্ঘ সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত লিখলো "No"। করলো স্বাক্ষর।

তৃতীয় প্রশ্ন "What is the equivalent weight of an acid ?" প্রশ্ন নিয়ে মৌসুমী এবারও খাবি খেল। সাধনবাবু বললেন, "অ্যাসিড কাকে বলে মনে নেই।" মৌসুমী দম দেওয়া পুতুলের মত বলে গেল, অ্যাসিড কাকে বলে। সাধনবাবু মেয়েকে বার বার করে ধরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মৌসুমী আবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে লিখলো "No"।

চতুর্থ প্রশ্ন "What is dynamic allotropy ?" বাংলা মানে বলে দেওয়া সত্ত্বেও মৌসুমীর কিছুই বোধগম্য হলো না। বাবা allotropy-র মানে ধরিয়ে দিতে বলেছিলেন, "কার্বন মানে হিবে।" না, মৌসুমী তাও উত্তর খুঁজে পায়নি। লিখেছিল "No"।

শেষ প্রশ্ন ছিল "What is the condition for the angle of contact to wet the surface ?" এবার বাংলা করে দেওয়া সত্ত্বেও মৌসুমী কেন, সাধনবাবুও মানে ধরতে পারলেন না।

প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তরের পাতায় সাধনবাবু ও সাক্ষী হিসেবে সুবীরকুমার চ্যাটার্জির স্বাক্ষর করিয়ে নিলাম।

সাধনবাবুর নিজের বাড়ি রেল-কোয়ার্টারের কাছেই। সেখানেই মৌসুমীর গবেষণাগার। আমরা সকলেই গেলাম সেখানে। ছোট বাড়ি। তারই ঘরের দেওয়ালের র‍্যাকের দুটি সারিতে কয়েকটা টেস্ট টিউব, রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক ইত্যাদি সাজান। এটাকে গবেষণাগার বললে গবেষণা ব্যাপারটাকেই ছেলেখেলা পর্যায়ে টেনে নামান হয়।

সাধনবাবুকে বললাম, "আলোকপাত পড়ে জানলাম, মৌসুমীর টাইপের স্পিড ইংরেজিতে ৯০ এবং বাংলায় ৪০। ওর টাইপের স্পিড নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন কথা লেখা হয়েছে। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে—আমার মত অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না। এ বিষয়ে আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।"

সাধনবাবু জানালেন, "ইংরেজিতে ওর স্পিড মিনিটে ৬০, তবে বাংলায় ধরে ধরে টাইপ করে। কোনও স্পিড নেই।"

ইংরেজি টাইপের পরীক্ষা নিতে চাওয়ায় শিপ্রা দেবী একটা বই এগিয়ে দিলেন মেয়ের দিকে। আমি সেই বইটা সরিয়ে এগিয়ে দিলাম 'সানডে' পত্রিকার ২৩—২৯ জুলাই সংখ্যার পৃষ্ঠা ২১। মৌসুমী টাইপ করলো ১ মিনিট সময়ে যতটা পারলো। স্বাক্ষর করলো নিজেই। সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিলেন সাধনবাবু ও সুবীরবাবু। সাধনবাবু এও লিখে দিলেন এটা এক মিনিটে টাইপ করা হয়েছে।

দমদম মতিঝিল কলেজের গায়ে হিলনার কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট-এর ইনস্ট্রাক্টর নিরঞ্জন দাসের সঙ্গে দেখা করে মৌসুমীর করা টাইপের পাতাটা দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, এটার টাইপিং স্পিড কত ? শ্রীদাস এই কাগজেই লিখে দিলেন স্পিড ২২। অবশ্য টাইপিং নির্ভুল ছিল না। ভুল ছিল তিনটি। আমরা কয়েকজন টাইপ

One given working day, the office of Maharashtra's secretary of urban development, Dinesh Kumar Jain, is invaded by any number of represent



মৌসুমী ও তার গবেষণাগার

শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, তাঁরা ওই অংশটুকু ৩৫ থেকে ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে করে দিতে পেরেছেন।

বিদায় লগ্নে মৌসুমীর বাবা অনুরোধ করলেন, মেয়ের ঐ অকৃতকার্যতাকে প্রকাশ না করার জন্য। সেই সঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালেন।

আমাদের পাঁচ আগন্তুককে বিদায় তুলে দিতে এলেন সাধনবাবু। সাধনবাবুকে বললাম, "মৌসুমী খুব সুন্দর যথেষ্ট সম্ভাবনাময় একটি মেয়ে। ওর মুখ চেয়ে আপনাকে একটি অনুরোধ, ওকে না বুঝিয়ে মুখস্থ করাবেন না। এতে প্রচার হয়তো পাবেন কিন্তু এই না বুঝে মুখস্থ করার-প্রবণতা ওর বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে বাধা হতে পারে।"

৭ আগস্ট "The Telegraph" দৈনিক পত্রিকায় বক্স করে প্রকাশিত হলো মৌসুমীকে পরীক্ষা করার ও তার অনুত্তীর্ণ হওয়ার খবর।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

The Telegraph

THURSDAY 7 SEPTEMBER 1989 VOL VIII NO 62

Prodigy fails test by rationalist

By Pathik Guha

Calcutta, Sept. 6: Six-year-old Mousami Chakraborty is not the prodigy her parents have been making her out to be

As a special case, Mousami has been allowed by the state government to sit for the Madhyamik examination in 1991. But rationalist Prabir Ghosh, masquarading as a journalist, met her on September 3 at Adra in Purulia and found that she could not answer a single of his IQ posers

Mr Ghosh interviewed Mousami for an hour He had for her five IQ posers, three class-VIII mathematical problems and five science problems Mousami drew a blank on each of these and Ghosh has the answers on paper.

Mousami made headlines when her father took her to Writers' Buildings to meet the state relief minister, Ms Chhaya Bera The minister was so impressed that she persuaded the education department to allow the girl to sit for the Madhyamik examination.

Earlier, Mousami's father had failed to get her admitted to class-VIII of a local school because she was underaged

Since the visit to Writers', Mousami has been something of a celebrity Her father has an appointment with the Prime Minister later this month And tomorrow an organisation called Proma will be "honouring" the little girl at Sisir Mancha

Mousami's parents say she knows Dutch, German, Hindi and has a typing speed of 45 words per minute

Mr Ghosh, who is a secretary of the Science and Rationalists' Association, found none of this to be true Mr Ghosh is a veteran at debunking godmen and investigating paranormal feats

One of the mathematical puzzles he put her was Ram bought items worth Rs 50 from Shyam's shop He gave him a 100-rupee note Shyam did not have change and so he got it (exchanging the note) from a shop next to his After Ram left Shyam's shop with the purchase, the shopkeeper came to Shyam to tell him that the 100-rupee note was a forged one and Shyam had to compensate him How much loss did Shyam incur? Mousami's answer. Rs 200 (The correct answer Rs 100)

Mr Ghosh believes that Mousami has an extraordinary memory and may have been tutored to answer questions by rote. But a prodigy, he says, she definitely is not

৭ আগস্ট সন্ধ্যায় আমাদের সমিতির পক্ষে আমি এবং কয়েকজন 'রবীন্দ্র সদন'-এ উপস্থিত ছিলাম মৌসুমীর অভিনন্দন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে।

মৌসুমীকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা মত অন্নদাশঙ্কর রায় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। মামুলি প্রশ্ন। সচেতন দর্শকরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের ইংরেজিতে করা প্রশ্ন "ডু ইউ ওয়ান্ট হ্যাপিনেস ?" স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও ও মানে ধরতে পারলো না। উত্তর দিল "আই ওয়ান্ট টু বি এ সায়েনটিস্ট"। অন্নদাশঙ্কর হেসে ফেলে আবার প্রশ্নটা করলেন। মৌসুমী বিষয়টা ধরতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না। পাশে বসা কৃষ্ণ ধর প্রশ্নটা বাংলা করে দিলেন। এরপরও অন্নদাশঙ্কর যেসব ইংরেজি প্রশ্ন করেছিলেন, তার বাংলা অনুবাদ করে দিতে হয় পাশে বসা কৃষ্ণ ধরকে।

সাধনবাবু কিছু বলতে উঠলেন। মেয়ের বিষয়ে অনেক কিছুই বললেন। আবারও ঘোষণা করলেন হিন্দি, ইংরাজি, ডাচ, জার্মান ভাষা জানে। সাধনবাবুই মেয়েকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। ও উত্তর দিল। আমি প্রমা সংস্থার অন্যতম ব্যবস্থাপক সুধীরবাবু ও শংকরবাবুকে বললাম আমাকে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি দেবেন ? সভার পরিচালক অমিতাভ চৌধুরী আমাকে অনুরোধ করলেন কোনও প্রশ্ন না করতে এবং সাধনবাবুর মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদ না করতে। যুক্তি হিসাবে শ্রীচৌধুরী দুটি কারণ দেখিয়েছিলেন। এক মেয়েটি তার অভিনন্দন অনুষ্ঠানেই অপমানিত হলে চরম আঘাত পাবে। দুই অনুষ্ঠানে গোলমাল হতে পারে। অগ্রজ-প্রতিম অমিতাভ চৌধুরীর অনুরোধকে আদেশ হিসেবে শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম।

৭ সেপ্টেম্বরের টেলিগ্রাফে মৌসুমীর বিষয়ে আমাদের সমিতির মতামত প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই, অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বরের টেলিগ্রাফে দেখলাম সাধনবাবু টেলিগ্রাফের সাংবাদিককে জানিয়েছেন, সে দিনের পরীক্ষায় খারাপ করার কারণ মৌসুমী সেদিন 'ব্যাড মুড'-এ ছিল এবং কিছু প্রশ্ন ছিল সাধনবাবুরও বোধশক্তির অগম্য। মৌসুমীকে নাকি আমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলের প্রশ্ন করেছি। আই কিউ-এর প্রশ্নগুলো নাকি ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ পরীক্ষায় দেওয়া হয়। অনুবাদ করতে দিয়েছিলাম গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের। তারপরই সাধনবাবু আবার পরীক্ষা করার জন্য আমার ও আমাদের সমিতির উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

সেই সঙ্গে জানিয়েছেন এটা ভুললে চলবে না সে সাত বছরের শিশু এবং ১৯৯১-এ মাধ্যমিকে বসবে।

মৌসুমীর মুড ছিল না বলে সবই ভুল করেছে, এমনটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। তবু আমরা সাধনবাবুর দেওয়া আবার পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছি।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, সংবাদ সরবরাহ সংস্থা সহ প্রচার মাধ্যমগুলো, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত এক বক্তব্যে আমাদের সমিতির পক্ষে সভাপতি ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জি জানান, মৌসুমীকে পরীক্ষা করতে কী কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌসুমীর ব্যর্থতার খবর। আরও জানান, মৌসুমী লিখিতভাবেই জানিয়েছে 'ডাচ', 'জার্মান' জানে না, হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, ইংরেজিতে টাইপ করেছে ২২ স্পিডে, তাও টাইপে

Child prodigy was in a bad mood

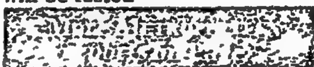
Calcutta, Sept. 7. The seven-year-old child prodigy, Mousami Chakraborty, said here today that she "performed miserably" in a recent test by rationalists because she was "in a bad mood on the day of the interview and some of the questions were beyond my comprehension."

Mousami was honoured by Proma a cultural organisation for "being endowed with surprising qualities of memory and intelligence" at a function in Rabindra Sadan here today. The noted litterateur Ananda Shankar Ray presented Mousami with a trophy and praised the girl's "unique perception of knowledge considering her tender age."

Mousami's father, Mr Sadhan Chakraborty, a resident of Adra, today criticised Mr Prabir Ghosh, secretary of the Science and Rationalist Association for "passing a hurried judgment about the girl's intelligence without resorting to any scientific ways of assessing her intelligence." He said, "Mousami is just seven years old and she has been allowed to sit for the Madhyamik examinations in 1991 whe she would be nine years old. But the questions asked by Mr Ghosh were of post graduate level."

Referring to the IQ posers which Mousami could not answer, Mr Chakraborty said the questions asked were those asked in tests for probationary officers in Indian banks. The Bengali to Hindi translation was "too difficult and surely of the graduate level. You cannot just expect her to know everything. It would be unjust to say that because she is out of the ordinary, there is nothing she does not know."

Mr Chakraborty said he challenged the rationalist to test his daughter once again after the questions were vetted by independent authority. "It is not without reason that the West Bengal government has allowed my daughter to appear for the Madhyamik examinations in 1991 where her actual talents will be tested."



Mousami's mother said it was true that the seven-year-old girl had an exceptional memory and "does not forget anything if she has read it only once." Mousami is also a talented singer and has composed many songs, she added. "We must appreciate that the girl has several marvellous qualities which she has proved to several journalists, ministers and professors. And it is they who discovered the prodigy." After being honoured at the function here, Mousami recited by rote the Oath of President of India.

However, Mousami faulted while mentioning the birthday of Ananda Shankar Ray.

ভুল ছিল। মৌসুমীর বাবা দাবি করেছেন—অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল গ্রাজুয়েট লেভেলের, আই কিউ ছিল ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ পরীক্ষা পর্যায়ের এবং প্রশ্নগুলো ছিল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলের। আমরা সেভেন, এইটের কয়েকজন ভাল ছাত্র-ছাত্রীকে ওইসব অঙ্ক, আই কিউ ও ইংরেজি অনুবাদ করতে দিয়ে দেখেছি, তারা প্রত্যেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরদানে সমর্থ হয়েছিল। মৌসুমীর বাবা আমাদের সমিতিকে জানিয়েছিলেন, মৌসুমীর জ্ঞান যদিও অনার্স গ্রাজুয়েটের মান অতিক্রম করেছে, কিন্তু শুধুমাত্র আইনসম্মতভাবে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়োজনে ও '৯১-তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। মৌসুমীর বাবা যে হেতু জানিয়েছিলেন পরীক্ষা গ্রহণের দিন মৌসুমী মুডে ছিল না, আমরা মৌসুমীকে কিছু প্রস্তাব রাখছি।

১। মৌসুমী যখন ভাল 'মুডে' থাকবে তখন আবার ওর পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের সংস্থা মৌসুমীর এবং ওর মা-বাবার যাতায়াত খরচ পর্যন্ত বহন করবে।

২। সংবাদপত্র, দূরদর্শন, বেতার এবং অন্যান্য প্রচার-মাধ্যম, শিক্ষা দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি দপ্তর মৌসুমীর বিষয়ে পরীক্ষা চালাতে চাইলে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো।

৩। মৌসুমীর মা-বাবা মৌসুমীর মেধার সত্যিকার মান বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করুন।

তাঁরা কখনো বলছেন মৌসুমীর জ্ঞান অনার্স গ্রাজুয়েট মানের, কখনো বা বলছেন, এটা ভুললে চলবে না, মৌসুমী '৯১-এ মাধ্যমিক দেবে।

বহু ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় আমাদের সমিতির এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে আবার পরীক্ষায় হাজির করতে সম্ভাব্য সমস্ত রকম চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মৌসুমীর বাবা-মা তাঁদের দাবির সত্যতা প্রমাণে এগিয়ে আসেননি।

সেই সময় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কোলফিল্ড টাইমস'-এ প্রকাশিত একটি লেখায় বলেছিলাম—

সাধনবাবুকে একটা স্পষ্ট কথা বলি, আপনি নিজে চিন্তা-ভাবনা করে জানান মৌসুমীর জ্ঞান কোন্ পর্যায়ের। তারপর তা আবার ঘোষণা করুন। আপনিই এতদিন সংবাদ মাধ্যমগুলোকে বলেছেন মৌসুমী গবেষণা করছে, জ্ঞান অনার্স লেভেলের, দারুণ আই কিউ, দারুণ টাইপ স্পিড, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ডাচ জানে (যা ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনেও প্রকাশ্যে বলেছেন), আজ তা হলে বলছেন কেন এটা ভুললে চলবে না ও সাত বছরের মেয়ে ১৯৯১-তে মাধ্যমিক দেবে। আপনি কি মানুষকে বোকা বানাতে সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতে চাইছেন?

ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের পক্ষে ২২ স্পিডে টাইপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু ৬০-৯০-এ তোলার মিথ্যে চেষ্টা কেন? কোন উদ্দেশ্যে ডাচ, জার্মানের মিথ্যে গল্প ফাঁদছেন? কোন্ উদ্দেশ্যে ওর গায়ে অনার্স লেভেলের তকমা এঁটেছেন? গবেষক ইত্যাদি উদ্ভট কথা বলেছেন? বহু সংবাদ মাধ্যমকে এইসব কথা বলার পর এখনি কি আবার 'বলিনি' বলবেন ভাবছেন? আপনি যে বাস্তবিকই ওসব কথা বলেছেন, এমন প্রমাণ হাজির করলে কী করবেন ভেবেছেন কি? আবার একটি বিনীত অনুরোধ, মৌসুমীকে 'দেবী' বা 'দেবশিশু' বানিয়ে শেষ করে দেবেন না।

একটি স্বার্থান্বেষী মহল থেকে চক্রান্তও শুরু হয়ে যায় তারপরেই। প্রচার করতে থাকেন, 'সাত বছরের বাচ্চার পিছনে লেগেছে,' 'বাঙালী হয়ে বাঙালীকে বাঁশ দিচ্ছে', 'নাম কেনার জন্য চিপ স্টান্ট দিচ্ছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের উদ্দেশ্যে জানাই—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রসার চায়। যুক্তি মিথ্যেকে আশ্রয় করে থাকতে পারেনা। কোন্ রাজনৈতিক নেতা, কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি, কোন্ প্রচার মাধ্যম কাকে সমর্থন করেছে দেখে সত্যানুসন্ধানে নামা বা না নামাটা আমাদের সমিতি ঠিক করে না। যাঁরা সাত বছরের বাচ্চার প্রসঙ্গ তুলেছেন, সাত বছরের বাচ্চাটির ক্ষতি তাঁরাই করছেন। তিলে তিলে মিথ্যে প্রচারের পাঁকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন একটা শিশুর সম্ভাবনাকে, একটা সত্যকে। ধ্বংস করতে চাইছেন একটা আন্দোলনকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে। মিথ্যাচারীদের সহানুভূতি ও কৃপার উপর কোনও আন্দোলন কোনদিনই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠবেও না। সমালোচকদের প্রতি আর একটা জিজ্ঞাসা—আপনারা কি চান এরপর থেকে যুক্তিবাদী সমিতি বয়স, লিঙ্গ, বাঙালি-অবাঙালি ইত্যাদি বিচার করে মিথ্যাচারিতা ধরতে নামবে? যাঁরা সমালোচনার গণ্ডি পার হয়ে 'নাম কেনার জন্য মিথ্যা চিপ স্টান্ট' বলে নোংরা কুৎসা ছড়াচ্ছেন, তাঁদের কাছে আমাদের চ্যালেঞ্জ—সাহস থাকলে সামনাসামনি প্রমাণ করুন আপনাদের বক্তব্যের সত্যতা।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন ও পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি'র অষ্টম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বক্তা হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর '৯০ আমন্ত্রিত ছিলাম। কয়েক হাজার শিক্ষক ও সাক্ষরতা কর্মীদের সোচ্চার জিজ্ঞাসা ছিল মৌসুমীকে ঘিরে। উত্তরে সব কিছুই জানিয়েছিলাম। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, মৌসুমী কি সত্যিই মাধ্যমিকে প্রথম হবে বলে মনে করেন?

বলেছিলাম, আগের দাবি প্রমাণের ক্ষেত্রে দেখেছি মৌসুমীর মা-বাবা যে ধরনের ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে এমনটা ঘটা অস্বাভাবিক নয়, মৌসুমীর মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রেও কিছু ফাঁক ও ফাঁকির ব্যবস্থা থেকেই যাবে, অর্থাৎ বাইরে থেকে মৌসুমীকে সহায়তা করার সুযোগ থেকেই যাবে।

১৭ সেপ্টেম্বর '৯০-এ 'আজকাল' দৈনিক পত্রিকায় 'রবিবাসর'-এ পাভলভ ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখা প্রকাশিত হলো। ১৩ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য থেকে তিনি অদ্ভুত রকম সরে এসেছেন, লক্ষ্য করলাম। ১৭ সেপ্টেম্বর লিখছেন, "মৌসুমীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। কাগজপত্রে তার কথা পড়েছি, আর শুনেছি আমার সহকর্মী ডঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। ডঃ মুখোপাধ্যায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি মৌসুমীর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি তিনি আর সকলের মত কোন প্রশ্ন না করে মৌসুমীকে শুধু অবজার্ভ করে গেছেন। তাঁর কাছে যা শুনেছি এবং কাগজপত্রে যা পড়েছি তাতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। সকলেই বলেছেন, মৌসুমীর তাৎক্ষণিক স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। সুতরাং মৌসুমীকে নিয়ে হইচই করার কোন কারণ নেই। মনে রাখতে হবে স্মৃতির সঙ্গে বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। তার স্মৃতির মত বুদ্ধি ততটা নেই শুনেছি।"

কিন্তু বাসুদেববাবুর কাছ থেকে শুনে ও কাগজপত্র পড়ে আনন্দবাজার প্রতিনিধিকে যে জানিয়েছিলেন, মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পিছনে সুপ্ত জিনের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনার কথা। মৌসুমীর বুদ্ধির যে স্তর তাতে বিদেশে বিশেষত আমেরিকায় ওর শিক্ষার ব্যবস্থা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এরপর এমন কী ঘটলো, যাতে মাত্র ১ মাস ৪ দিনের মধ্যেই তাঁর মত খ্যাতিমান মানসিক ব্যাধির চিকিৎসককে এমন অস্বাভাবিক রকমের মত পাল্টে বিপরীত কথা বলতে বাধ্য হলেন? তবে কি 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ৭ সেপ্টেম্বরে "Prodigy fails test by rationalist" শিরোনামের প্রকাশিত খবরটিই তাঁকে এই বিপরীত বক্তব্য প্রকাশে বাধ্য করেছে? ওই সংবাদের শেষ পংক্তিতে ছিল "Mr Ghosh believes that Mousami has an extra-ordinary memory and may have been tutored to answer questions by rote" অর্থাৎ 'শ্রী ঘোষ মনে করেন, মৌসুমীর স্মৃতি অসাধারণ এবং ওকে কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করান হয়েছে।" আর তাইতেই কি মৌসুমীর স্মৃতিকে 'খুব প্রখর' বলে মেনে নিয়েছেন? জানিনা, প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্ণধার সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর মালাকারের সঙ্গে ওই ৩ সেপ্টেম্বরই আমার মৌসুমীর স্মৃতি বিষয়ে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা যদি কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলীর নজরে পড়ত, তারপরও ডঃ গাঙ্গুলি মৌসুমীর স্মৃতি বিষয়ে নিজের বর্তমান মতে স্থির থাকতেন কি না? সুবীরবাবু ও শঙ্করবাবুকে বলেছিলাম, "মৌসুমীর যে স্মৃতি দেখে আপনারা বিস্মিত তেমন স্মৃতি শক্তি তৈরি করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আপনারা তো অনুষ্ঠান স্পনসর করেন। স্মৃতি শক্তির এক মজার পরীক্ষার সঙ্গে উৎসাহী দর্শকদের পরীক্ষা করতেই না হয় স্পনসর করলেন। ফেব্রুয়ারি নাগাদ রবীন্দ্রসদন 'বুক' করুন। হিন্দু, বেথুন, রামকৃষ্ণ মিশন, সেন্ট জেভিয়াস, সাউথ পয়েন্টের মত ভাল স্কুলের ক্লাস এইট-নাইনের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ছটি আগ্রহী ভাল ছাত্র-ছাত্রী বেছে আমার হাতে তুলে দিন সাত দিনের মধ্যে। অনুষ্ঠানের দিন দর্শকদের সামনে হাজির করুন মৌসুমীকে ও আমার হাতে তুলে দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের। হলের যে কোনও একটা অংশকে বেছে নিয়ে পঞ্চাশটির মত দর্শকাসন রঙিন রিবন দিয়ে ঘিরে দিন। রিবন ঘেরা দর্শকদের এক এক করে নিজেদের নাম বলতে বলুন। নামগুলো টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখুন। তারপর মৌসুমী ও ওই ছ'টি ছেলে-মেয়েকে দর্শকদের নাম বলতে বলুন। দেখুন, মৌসুমী কতজনের ঠিক বলতে পারে। আশা রাখি আমার ছ'জনই প্রতিটি দর্শকের নাম বলতে পারবে।

সুবীরবাবু ও শঙ্করবাবু যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, "মৌসুমীরা দু-চার দিনের মধ্যেই তো কলকাতায় আসছে, সেই সময় এ বিষয়ে সাধনবাবুর সঙ্গে কথা বলে নেব। ওঁরা রাজি হলে নিশ্চয়ই স্পনসর করবো।" জানুয়ারি '৯১ অতিক্রান্ত। সুবীরবাবুদের মৌসুমীকে হাজির করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, চলতি কথায় যাকে 'স্মৃতিশক্তি বাড়ানো' বলে, সেই 'স্মৃতি বৃদ্ধি' বিষয়ে জানতে ও স্মৃতি বাড়াতে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের উৎসাহ মেটাতে 'স্মৃতি প্রসঙ্গ' নিয়ে ভবিষ্যতে একটি বই লেখার ইচ্ছে আছে।

মৌসুমী প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রথম ঘটনা ১৭ সেপ্টেম্বর '৮৯

আজকাল পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অমিতাভ চৌধুরী লিখলেন, "মৌসুমীকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে বছর দুয়েক। মৌসুমী যে একটি অসাধারণ প্রতিভা সে বিষয়ে কোন কাগজেরই দ্বিমত নেই। কিন্তু যে মেয়ে বলে আগামী আড়াই বছরের মধ্যে, অর্থাৎ সাড়ে ন'বছর বয়সে সে নোবেল প্রাইজ পাবে, তখন সন্দেহ হয় তার এই প্রতিভা ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে তো? তাছাড়া সেদিন রবীন্দ্রসদনে সে প্রতিভার পরিচয় দিলেও অন্নদাশঙ্কর যেসব ইংরেজি প্রশ্ন করেছিলেন, তার বাংলা অনুবাদ করে দিতে হয় পাশে বসা কৃষ্ণ ধরকে।" "মৌসুমীর বিস্ময়কর প্রতিভা স্বীকার করে নিয়েও বলতে ইচ্ছে করছে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? প্রথমত একটা রঙ্গমঞ্চে তাকে হাজির করে একমাত্র তার বাবাই অনবরত প্রশ্ন করে যাবেন এবং সে সবকটির নির্ভুল উত্তর দেবে—এর মধ্যে কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে বলে মনে হয়।" "মৌসুমীর প্রতিভা যাচাইয়ের ভার তার বাবার ওপর না ছেড়ে অন্য কোন বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে দেওয়া উচিত।"

দ্বিতীয় ঘটনা আগ্রা থেকে ফেরার পর মৌসুমীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আগে সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তের সঙ্গে মৌসুমীর প্রসঙ্গ নিয়ে ফোনে কথা হয়। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, মৌসুমী অন্য পত্রিকা প্রতিনিধিদের সামনে অত দ্রুততার সঙ্গে টাইপ করছে কী করে?

বলেছিলাম, "সাংবাদিকদের সামনে মৌসুমী টাইপ করেছিল নিশ্চয়ই ওর মা-বাবার এগিয়ে দেওয়া কোনও বইয়ের অংশ, যে সব অংশ ও দীর্ঘকাল ধরে টাইপ করে করে অতি-অভ্যস্ত।" মৌসুমীর অসাধারণ সব উত্তরদান প্রসঙ্গে জানিয়েছিলাম, "সাধারণত মৌসুমীকে প্রশ্ন করার দায়িত্ব পালন করেন সাধনবাবু স্বয়ং। এমনভাবে উনি প্রশ্ন করা শুরু করেন যেন সাংবাদিকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করতেই ওঁর প্রশ্নকর্তার ভূমিকা নেওয়া। সাধনবাবুর বাক্য-বিন্যাসে মোহিত হয়ে এরপর কেউ যদি সাধনবাবুর ধরনের প্রশ্ন করতে থাকেন, তবে দেখা যাবে মৌসুমী সঠিক উত্তর দিয়ে চমকে দিচ্ছে। সাধনবাবুর দ্বারা চালিত না হয়ে প্রশ্ন করলে অর্থাৎ প্রকৃত পরীক্ষা করলে মৌসুমীর তেমন বিস্ময়কর প্রতিভার কিন্তু হদিশ মিলবে না।"

১৭ সেপ্টেম্বর '৮৯ 'আজকাল', 'রবিবাসর'-এর একটা পুরো পৃষ্ঠা ছিল মৌসুমীকে নিয়ে লেখায় ও ছবিতে সাজান। তাতে ছিল মৌসুমীর এক দীর্ঘ ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরে। নিয়েছিলেন অরুন্ধতী মুখার্জী। শ্রীমতী মুখার্জীর লেখা দুজনের কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। "মৌসুমীকে প্রশ্ন করার ভার নিলেন ওর বাবা—সাধন চক্রবর্তী। জিজ্ঞেস করলেন, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কী কী উদ্দেশ্য। মৌসুমী প্রথমত, দ্বিতীয়ত করে পাঁচটি পয়েন্ট টানা মুখস্থ বলে গেল। অদ্ভুত দ্রুত উচ্চারণে—একবারও না থেমে। আর আমি সুযোগ পেলাম না। ওর সাত বছরের মেয়ের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত প্রশ্ন করে চললেন ইংরেজিতে। ইংরেজিতে উত্তরও। সবই সঠিক। গড়গড় করে উত্তর—কোন অ্যাকসেন্টের বালাই না রেখেই। বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস সবের ওপর প্রশ্নবান ছুঁড়লেন তিনি। একটি বানও বিদ্ধ করতে পারেনি তার মেয়েকে।" "প্রায় আধঘণ্টা চলল বাবা-মেয়ের কুইজ টাইম। জিজ্ঞেস করলাম "তুমি যা বলছ বাংলায়

বলতে পারবে ?”

পাশ থেকে ওর বাবা—হ্যাঁ পারবে।

ইংরেজিতে আবার বাবার প্রশ্ন, রাজীব গান্ধী করে প্রধানমন্ত্রী হন ?

—থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইট্টি ফোর।

প্রশ্নটা বাংলায় বলে বাংলায় উত্তর চাইলাম। এবারও স্মার্ট মেয়ে মৌসুমী দ্রুততার সঙ্গে বলল, থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইট্টি ফোর।

(এখানেও সাধারণ বোধ-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে স্রেফ মুখস্থ উগড়ে গেছে।)

আবার ওর বাবা শুরু করলেন, কলকাতার জন্ম করে হয়েছিল ? এটা কলকাতার কত বছর ? কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে হয়েছিল ?

এবার বাধা দিলাম আমরা—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জিনিসটা কী ?

—উত্তর দেয়নি মৌসুমী।”

“"স্টেফি গ্রাফের নাম শুনেছ ?

—১৯৮৮-র গোল্ডেন গার্ল।

—সে কী করে ?

—(একটু চুপ থেকে) রান রান করে ।

পাশ থেকে উৎসাহে ওর বাবা বললেন—বল, বল, কত মিটার।”

মৌসুমী এই বয়সে মৌসুমী যা পারে, অনেকেই পারে না। মৌসুমীর স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের স্বার্থেই তার মা বাবার উচিত ওই ধরনের মুখস্থ করাবার প্রবণতা থেকে বিরত থাকা। মৌসুমী জীবন্ত সরস্বতী বা সরস্বতীর অংশ, প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা তাৎক্ষণিক লাভের আশায় শুধুমাত্র মানুষকে প্রতারিতই করছেন না, একটি শিশুকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছেন।

বক্সিংয়ের কিংবদন্তী মহম্মদ আলি শূন্যে ভাসেন আল্লা-বিশ্বাসে।

কিংবদন্তী বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলি তাঁর সোনালি দিনগুলোয় দুনিয়া কাঁপিয়ে ছিলেন স্ব-উদ্ভাসিত ‘রোপ-এ-ডোপ’ কৌশলে। আবার কাঁপালেন বড়দিনের ঠিক পরের দিনই।

মঙ্গলবার বড়দিনের রাতে আলি কলকাতায় পৌঁছোন। কলকাতায় আসার আগে আলি কালিকট ও বোম্বাই গিয়েছিলেন বিভিন্ন সমাজসেবী ধর্মীয় সংস্থাকে উৎসাহিত করতে। গত কয়েকটা বছর আলিকে দেখা গেছে ধর্মীয় ও সমাজসেবী সংস্থাগুলোর পাশে। অধ্যাত্মবাদী চিন্তা যে তাঁকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে, অধ্যাত্ম-জগতেই যে তিনি ডুবে থাকতে চান, তা তাঁর জীবনচর্যা থেকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতা থেকে আলি নেমে এসেছিলেন মানুষ দেবতাদের কাছাকাছি। আর্ত ও শিশুদের সেবার মধ্যেই আল্লার সেবা করতে চেয়েছিলেন, আল্লাকে পেতে

চেয়েছেন আপন করে। এমনই এক সন্ধিক্ষণে আলি এমন এক বিশ্ব-কাঁপানো ঘটনা ঘটালেন, যা তাঁকে রাতারাতি মানুষের দেবতা করে দিল। দীর্ঘদেহী আলি শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোরে নিজেকে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে বুঝিয়ে দিলেন—মাটির বুকে নেমে এসেও রয়ে গিয়েছেন সবার চেয়ে কিছুটা উপরে। যে কথা বারংবার শুনিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে, "আলি ইজ আলি। আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট।" সে কথাটাই আবার সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন বক্সিং জগৎ থেকে অধ্যাত্মিক জগৎ ও সেবার জগৎ-এ প্রবেশ করে।

২৭ ডিসেম্বর '৯০ বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকাগুলোয় বিশাল গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হলো আলির শূন্যে ভেসে থাকার অসাধারণ কাহিনী। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মেটাতে নমুনা হিসেবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজার থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি। খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠাতেই আলির বিশাল ছবি সহ বিরাট করে।

বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বলেন আলি

স্টার্ফ রিপোর্টার. ছয় ফুটের উপরে লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মহম্মদ আলি। হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন দেহের সমান্তরালে। কয়েক সেকেণ্ড পরে উপস্থিত সাংবাদিক, আলোকচিত্রীদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হোটেলের ঘরে মেঝে থেকে ইঞ্চি দুয়েক উপরে উঠে গেলেন তিনি। প্রায় নির্ভার একটি পালকের মতো কয়েক সেকেণ্ড শূন্যে ভেসে থাকলেন বক্সিংয়ের কিংবদন্তী নায়ক। তারপরে মাটি ছুঁলো তাঁর পা। হতবাক দর্শকদের দিকে ফিরে অস্ফুটে বললেন আলি - বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বিশ্বাসই আসল।" "আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতা থেকে নেমে এসেছেন মাটির কাছাকাছি। তবু সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকেও নেই তিনি," "শূন্যে ভেসে থেকে তিনি সেটাই বোঝালেন সবাইকে।"

আলির শূন্যে ভাসা নিয়ে তোলপাড় শুরু হতেই রহস্যভেদের আমন্ত্রণ এলো 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে। আমন্ত্রণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

বিশ্বাসের জোরে, স্রেফ বিশ্বাসের জোরে আলি ভেসে ছিলেন ‼ মেনে নিতে মন চায় না। যতই প্রত্যক্ষদর্শী থাকুক, নিজের চোখে একবার না দেখে আমার পক্ষে মেনে নেওয়াটা না, কিছুতেই পারলাম না। বারবারই মনে হতে লাগলো ফাঁকিটা প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি এ-জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় কিছু কিছু ফাঁক থেকেই যায়। তবু প্রাথমিক একটা ধারণা গড়ে তুলতে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এক সাংবাদিক বললেন, "আলি একটা অন্য ব্যাপার। উনি যখন এসে দাঁড়ালেন, ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো ওঁর সারা শরীর থেকে যেন একটা জ্যোতি বেরুচ্ছে।

এখনও ভাবতে গেলে গা শিরশির করে। ও এখন অন্য জগতের মানুষ। খুব কাছ থেকে ওঁর শূন্যে ভাসা দেখেছি। না স্টেজ, না আলোর কারসাজি, উনি শূন্যে ভেসে রইলেন। না না, এতে কোনও কৌশল-টৌশলের ব্যাপার ছিল না।"

আর এক সাংবাদিক বন্ধু জানালেন, "আলি তো অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করেননি। যোগ ক্ষমতার দ্বারা তো এমনটা করা যায়ই। আমাদের দেশে এ তো নতুন কিছু নয়। অনেক সাধু-সন্তরাই যোগ ক্ষমতায় এমনটা ভেসে দেখিয়েছেন। এমনটা যে ভেসে থাকা যায় সে তো প্রমাণ হয়েই গেছে।"

এক সাহিত্যিক বন্ধু তো একটা গল্পই শোনালেন। একটি বিখ্যাত সাধকদের জীবন-গ্রন্থে নাকি আছে, কোনও এক সাধু গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসে ভর করে হেঁটে উত্তাল নদী পার হচ্ছিলেন। সাধু হেঁটে চলেছেন ঈশ্বর বিশ্বাসে বুঁদ হয়ে, নেশাগ্রস্ত মানুষের মত। পাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ সাধু হুঁশ ফিরে পেলেন—আমি এতটা পায়ে হেঁটে চলে এসেছি। শেষ পথটুকু পার হতে পারব তো ? যেমনি ভাবা,অমনি টুপ করে এক টুকরো পাথরের মতই ডুবে গেলেন। আসলে বিশ্বাসই সব। ঈশ্বরে অন্ধ বিশ্বাস রাখলে অমন অনেক কিছুই ঘটে, ঘটান যায়—যেগুলো সাধারণ মানুষদের চোখে 'অলৌকিক' বলেই প্রতিভাত হয়।

স্টেজে নয়,.হোটেলের ফ্লোরে মোট দু'বার সাংবাদিকদের শূন্যে ভেসে দেখিয়েছেন আলি। কী এমন কৌশল !! যার ফলে একজন মানুষ একটু একটু করে উঠে পড়েন শূন্যে ? যে সব তথাকথিত অবতাররা শূন্যে ভাসেন বলে কথিত আছে তাঁদের সে-সব কৌশল আমার অজানা নয় (উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানাই 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর প্রথম খণ্ডে সেইসব গোপন কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি বহু ছবি সহ)। তাঁরা কেউই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে উঠে পারেননি। এ এক নতুন ভাবে শূন্যে ভাসা, নতুন পদ্ধতিতে শূন্যে ভাসা।

২৯ ডিসেম্বর শনিবার দুপুরে আমাদের সমিতির জ্যোতি মুখার্জিকে সঙ্গী করে তাজ বেঙ্গল হোটেলে পৌঁছোলাম। তখন হোটেলের লাউঞ্জে আলির খবর সংগ্রহ করতে সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদের ভিড়। শুনলাম, তিনদিন ধরে সকাল থেকে রাত ওঁরা ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন। কিন্তু আলিকে যাঁরা এদেশে এনেছেন তাঁদের হার্ডেল টপ্‌কে ৩২৪ নম্বর ঘরে ঢুকে আলির সঙ্গে আলাপ জমাবার সুযোগ পাননি কেউই। আলি একতলার রেঁস্তোরায় এলে বা বাইরে বেরুলে আলিকে ফিল্ম বন্দী করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু নিশ্ছিদ্র পাহারা এড়িয়ে কথা বলার তেমন সুযোগ জুটছে না।

'আজকাল'-এর সাংবাদিক অনুরূপ ভৌমিক ও চিত্র-সাংবাদিক সজল মুখার্জির দেখা পেলাম হোটেল লাউঞ্জেই। তারপর প্রতীক্ষা। আলির মুখোমুখি হতে পারলেও তাঁর মত বিশাল ব্যক্তিত্ব আমার অনুরোধকে মর্যাদা দিয়ে আবার শূন্যে ভেসে দেখাবেন কি না, এ বিষয়ে আমারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখানে এসে দেখছি—প্রবেশাধিকারের হার্ডেলই এভারেস্টের উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এরই ফাঁকে আলাপ হলো আলির জীবনী নিয়ে গড়ে ওঠা 'দ্য হোল স্টোরি'র পরিচালক লিণ্ডসে ক্লেনেল-এর সঙ্গে। জানালেন, 'দ্য হোল স্টোরি'র শুটিং উপলক্ষেই তাঁর ভারতে আগমন। ছবিটির প্রযোজক মহমেডান ক্লাবের সহ-সভাপতি মির মহম্মদ

ওমরের দাদা। খরচ হবে কয়েক লক্ষ ডলার। সারা পৃথিবীতে ছবিটি মুক্তি পাবে।

মির মহম্মদ ওমরের সহযোগিতায় ৩২৪ নম্বর ঘরে আলির মুখোমুখি হলাম। তখনও দুটো হার্ডেল অতিক্রম করা বাকি। এক আলির শূন্যে ভাসা দেখা, দুই শূন্যে ভাসার রহস্যভেদ। শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল? না, আমি আর মুখ খুলছি না। আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ৩০ ডিসেম্বর 'আজকাল'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়। আলি এবং আমার ছবি সহ প্রতিবেদনটি থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি।

ফেরার দিন ম্যাজিক দেখলেন, দেখালেনও

আজকালের প্রতিবেদন মহম্মদ আলি আবার শূন্যে ভেসে উঠলেন। একবার নয়, পাঁচবার। এবং এবার পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল ব্যাপারটা অলৌকিক নয়। যতবার শূন্যে উঠলেন একটা দিকে কাউকে থাকতে দেননি। ব্যালে নর্তকীর মত সেদিকে মুখ করে এক পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটি থেকে উঠলেন, দূর থেকে বোঝার উপায়ও নেই, পা মাটি স্পর্শ করে আছে। বোঝা যেতও না, যদি না প্রবীর ঘোষ থাকতেন। শনিবার আলি ফিরে গেলেন। তার আগে দুপুরে তাঁর কাছে



মহম্মদ আলি ও লেখক

গিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ, যিনি নিজে ম্যাজিকের ভাণ্ডার এবং যাঁর কাজ অলৌকিক ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া। তিনিই ধরলেন ম্যাজিকটা। পরে হোটেলের লাউঞ্জে নিজে করেও দেখালেন। আধ ঘণ্টা আলির সঙ্গে ছিলেন ভদ্রলোক। জমে উঠল দারুণ আড্ডা। দুজনে মেতে উঠলেন ম্যাজিক বিনিময়ে। আলি বের করলেন ম্যাজিক বক্স। দুটো ছোট স্পঞ্জের বল নিয়ে একটা নিজের বাঁ হাতে রেখে অন্যটি দিলেন প্রবীরবাবুর হাতে। কয়েক সেকেণ্ড পর আলি হাত খুললেন, দেখা গেল হাত ফাঁকা। দুটি বলই প্রবীরবাবুর হাতে। প্রবীরবাবু এক টাকার মুদ্রা ঢুকিয়ে ফেললেন সরু মুখের একটা বোতলের মধ্যে। আবার বের করে আনলেন বোতল ও মুদ্রা অক্ষত রেখে। পরে বিস্মিত আলিকে রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন প্রবীর ঘোষ—মুদ্রাটা বিশেষভাবে নির্মিত, ভাঁজ করে সরু করা যায়। আলিকে কয়েকটা উপহার দিলেন। আলি আরও অবাক একটা মুদ্রা থেকে দুটো হওয়া দেখে।



অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার ও জ্যোতিষীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সহযোগী সংস্থায় সমন্বয়কারী হিসেবে এবং নিজের শাখা সংগঠনগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে কাজ করছে। এই আন্দোলনেরই এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল—'চ্যালেঞ্জ'। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গল্পের গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যেই এই 'চ্যালেঞ্জ'। দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী ও ঈর্ষাকাতরদের কাছে চ্যালেঞ্জ 'অশোভন' মনে হতেই পারে, কেন না, 'চ্যালেঞ্জ' বাস্তব সত্যকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সাধারণ মানুষের কাছে তাই আজকের জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তব সত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন ?

পৃথিবীর সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাধর ও জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে সাধারণ মানুষকে এই উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে চাই—অলৌকিকত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততার অস্তিত্ব আছে শুধু পত্র-পত্রিকায়, ধর্মগ্রন্থে, বইয়ের পাতায় এবং অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়েদের গল্পে। তাই ঘোষণা করছি—

আমি প্রবীর ঘোষ, এই বইটির লেখক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ঘোষণা করছি বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও ব্যক্তি কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা যদি আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে সমর্থ হন, তাঁকে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব। আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি কৌশল ছাড়া অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যেই ঘটিয়ে দেখাতে হবে—

১। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখা।

২। যোগবলে শূন্যে ভাসা।

৩। একই সঙ্গে একাধিক স্থানে হাজির হওয়া।

৪। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জেনে দেওয়া।

৫। জলের ওপর হাঁটা।

৬। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করা, যার ছবি তোলা যায়।

৭। বিদেহী আত্মা এনে তার সাহায্যে পকেটবন্দী বা খাম-বন্দী নোটের নম্বর বলা।

৮। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

৯। একটা নোট দেখাবো, সেই নোটের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে হবে।

১০। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চলন্ত গাড়ি থামাতে হবে।

১১। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

১২। জলকে পেট্রলে বা ডিজেলে পরিণত করতে হবে।

১৩। অলৌকিক ক্ষমতাবলে বা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের ছাপের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে হবে।

১৪। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে—

১। আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেই সঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর ব্যস্ততার মধ্যে ফেলার জন্য এগুতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া কারও সঙ্গেই চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৪। চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তির সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে অথবা দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত ও শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারলে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব। একই সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি তাদের সমস্ত রকম অলৌকিক ও জ্যোতিষ বিরোধী প্রচার অভিযান ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবে।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেইসব অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলো নিয়ে বিভিন্ন অবতারদের বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে বা কিংবদন্তির রূপ পেয়েছে।

যদি বইটি যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার কাজে, মানুষের কুসংস্কার মুক্তির কাজে সামান্যতম ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে—আমার চেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

গ্রন্থটিব সাহায্যকাবী সূত্র ঃ

১। Essays in Modern Indian History Aparna Basu
২। Communal Interpretation of Indian History Satish Chandra
৩। Communalism in Modern India Bipan Chandra
৪। ভাবতবর্ষেব ইতিহাস বোমিলা থাপাব
৫। The Communal Triangle in India Ashoka Mehta
৬। Flim-Flam James Randi
৭। Arigo,Surgeon of the Rusty Knife John Fuller
৮। পবিবর্তন
৯। আজকাল
১০। আনন্দবাজাব
১১। আলোকপাত
১২। বর্তমান
১৩। বর্তিকা
১৪। বাঁকুড়া জেলা হ্যাণ্ডবুক
১৫। সুচেতনা
১৬। Witch Killing Among The Santals A B Chowdhury
১৭। সাঁওতাল গণসংগ্রামেব ইতিহাস, ধীবেন্দ্রনাথ বাস্‌কে
১৮। The Tribes and Castes of Bengal H H Risley
১৯। Witchcraft and Sorcery Max Marwick
২০। কৈশোব ও তাব সমস্যা ধীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায
২১। Labashev M Genetics Leningrad referred by Dmitri Lebayev
২২। Fedosyev P The Problem of the Social and Biological in Philosophy and Sociology Moscow
২৩। Gasell A and Amatruda C The Embryology of Behaviour Newyork
২৪। Piaget Jean, Genetic Approach of The Psychology & Thoughts, Journal of Educational Psychology
২৫। Linton The Study of Man New York
২৬। Merril Society and Culture New Jersey
২৭। Child of the Third World P P H, New Delhi

বিষয়-সূচী





অধ্যায় এক ভূতের ভর

অধ্যায় দুই পত্র-পত্রিকার খবরে ভূত

অধ্যায় তিন যে ভূতুড়ে-চ্যালেঞ্জের মুখে বিপদে পড়েছিলাম

অধ্যায় চার ভূতুড়ে চিকিৎসা